বাংলা
সাহিত্যের
ইতিকথা

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় এগারো বছর আগে। সেদিনের শঙ্কিত কুণ্ঠাজড়িত ভাবনায় যে অস্ফুট কল্পনা গড়ে উঠেছিল, এই চারটি সংস্করণে তাকে পরিণতি দেবার চেষ্টা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। পুরাতন দিনের অনেক সমস্যা আজ দূর হয়েছে, নতুন নতুন অনেক জটিলতাও দেখা দিয়েছে। তারই প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে আর একবার বিচার করে দেখার প্রয়োজন নিজের মধ্যেই অনুভব করছি।

একেবারে প্রথম থেকেই বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের এক অবিভাজ্য অংশ রূপে বিবেচিত হয়ে আসার ফলে ইতিহাসের ধারায় তার স্বতন্ত্র স্বরূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনা নিরুদ্ধ হয়েছিল। আরো পরবর্তী কালে ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাস আলোচনার সুস্থির আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে বাঙালি-জীবনধর্মের হৃৎপদ্ম-সম্ভব শিল্পপ্রকৃতির অ-পরতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান দূরপ্রসারী হতে পারে নি।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ছিল বাঙালি-জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকশিত ইতিহাসের পটে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব-পরিণতির নিজস্ব মূল্যানুসন্ধান। এই উপলক্ষ্যে বাংলা দেশের ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ...ায়িত অনুসন্ধান আবশ্যিক হয়েছিল। জাতির সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বিকাশের শতদল- ...র্ক সাহিত্যের জন্ম। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যে এবং ...রার প্রাসঙ্গিক সংযোগ-সংগতির মূল্যেও অনুসন্ধান করতে হয়েছে। ... বিষয়ের বৈচিত্র্য ও বিস্তারের মোহে 'বিষয়ী'র সংহত ...ার উপযোগী পরিমিতিবোধের সমস্যা। এই সমস্যা- ...তি নেই।

...ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আজ অনিবার্য ...বিভাগ ও পারস্পরিক সহ- ... স্বরে নিতেই হবে।

হয়েছে। বইটির নূতন রূপ দেখে বন্ধুদের কেউ কেউ বলেছিলেন,—নূতন সংস্করণ না বলে একে একটি নূতন বই বললেই ঠিক হয়। এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ধারণ করবেন সহৃদয় পাঠকবর্গ।

এবারে ঋণ-স্বীকারের পালা। লেখকের আন্তরিক উপলব্ধিও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে। প্রথমেই স-শ্রদ্ধায় স্মরণ করব অধ্যাপক বন্ধু শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যের কথা। তাঁর বিশ্রুত পিতৃদেব ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক অধুনালুপ্ত রচনার সংগে পরিচিত হতে দিয়ে তিনি আমায় চরিতার্থ করেছেন। এ-বিষয়ে ঋণস্বীকারের দায় নেই বলেই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্বও করব অস্বীকার।

বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুথিশালা গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র বহু দুর্লভ রচনা দেখতে দিয়ে যথাপূর্ব তাঁর স্নেহঋণে বদ্ধ করেছেন। এ-বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগারের সহায়ক-কর্মীদের সহৃদয়তাও সমুল্লেখ্য। বিশেষ করে শ্রীফণিভূষণ পাল, শ্রীবিমলেন্দু গুহ ও শ্রীবৈদ্যনাথ গাঙুলি প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করতে প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অপেক্ষা তাঁরা রাখেননি: আমিই কেবল কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

আমার ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান্ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শ্রীমান্ শীতল চৌধুরী ও শ্রীমান্ অরুণোদয় ভট্টাচার্য বহু দুর্লভ গ্রন্থ যোগাড় করে দিয়েছেন। শ্রীমান্ শিশিরকুমার দাশ গ্রন্থের নির্ঘণ্ট ও সূচীপত্র রচনার দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। এঁদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড়তা সকল আনুষ্ঠানিকতার অতীত। কিন্তু এইসব তরুণ মনের অকুণ্ঠ অনুরাগের কাছে মনে মনে ঋণী হয়ে থাকতে পারার তৃপ্তি ও আনন্দ অপরিসীম।

প্রকাশক শ্রীজানকীনাথ বসুর সংগে বৈষয়িক সম্পর্ক আজ হৃদ্যতায় পরিণত হয়েছে। তাই, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাব না; বরং মুদ্রণাশুদ্ধির দায়িত্ব তাঁর সংগে ভাগ করে নিতে চাইব।

সবশেষে স্মরণ করি, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র প্রথম সংস্করণ '৺মার প্রীতি-কামনায় বাবার পায়ে' নিবেদন করেছিলাম। প্রথম সংস্করণের সমাপ্তি ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রস্তুতি বিষয়ে আমার আজীবন জ্ঞানতাপস বাবা নিয়ত উৎসাহিত ছিলেন। কিন্তু আজ যখন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তখন তাঁর স্নেহ-স্নিগ্ধ শ্রীচরণাশ্রয় আমার স্পর্শাতীত। তাই দুর্ভাগ্যহত চিত্তে এই দ্বিতীয় সংস্করণ নিবেদন করছি '৺মা ও ৺বাবার শ্রীচরণোদ্দেশে।'

...২০ শে আষাঢ়, ১৩৬৪ }　　　　গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যের ইতিহাস

সাহিত্যের ইতিহাস নিছক সাহিত্য কিংবা নিছক ইতিহাস নয়,—সাহিত্য এবং ইতিহাস। প্রধানতঃ সাহিত্যিক জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধিৎসাই সাহিত্য-ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সাহিত্য-রসিকের সেই জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার ক্রম-বদ্ধ পূর্ণাবয়ব উত্তর রচনা করেছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাই, এই প্রসঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্য-সম্পর্কের অন্তর্বর্তী গ্রন্থিমোচন প্রয়োজন।

সাহিত্যের ইতিহাস

ইতিহাস অর্থে মূলতঃ প্রাচীন গল্প, লোক-কথা, তথ্যপঞ্জী ইত্যাদিকেই বোঝাত। তারপরে সেই পুরাতন অর্থ ধীরে ধীরে বিবর্তিত পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস অর্থে একদা দেবাসুরের 'যুদ্ধ বর্ণনাদি উপাখ্যান'-মাত্রই বোঝান হত।[1] আর একদিন ব্যুৎপত্তি আলোচনা করে[2] ইতিহাস অর্থে বোঝানো হয়েছে 'লোক-ক্রমাগত কথা'।[3] আরো একদিন 'মনুসংহিতা' ইতিহাস শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করে লিখেছিলেন,—

ইতিহাস শব্দার্থের বিবর্তন

> "ধর্মার্থ কাম-মোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।
> পূর্ববৃত্ত-কথাযুক্তমিতিহাস প্রচক্ষতে ॥"

—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ (লাভ)-এর উপদেশ সমন্বিত কথাযুক্ত পুরাবৃত্তই ইতিহাস।

ইংরেজি ভাষারও যে-কোন নির্ভরযোগ্য অভিধানেই 'ইতিহাস' (History) শব্দের অর্থ-বিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'The shorter Oxford English dictionary' ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ইতিহাস' শব্দার্থের নানারূপ বিবর্তনের পরিচয় দিয়েছেন। সব অর্থকে স্বীকার করেও 'ইতিহাস' বলতে আজ আমরা সাধারণভাবে বুঝি,—"History, in its broadest sense, is the story of man's

১। দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয়ঃ ইতিহাস (বঙ্গেদোপোদ্ঘাত)
২। 'ইতিহ্ (এবং কিল) আছে'।
৩। দ্রষ্টব্য -'বঙ্গীয় শব্দকোষ'—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

past. More specially it means the record of that past, not only in chronicles and treaties on the past, but in all sorts of forms." ।[৪]

এই অর্থকেই একান্তভাবে স্বীকার করে নিলে সাহিত্যের জগৎ থেকে ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে; কিন্তু সাহিত্যিক রসাস্বাদনের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের কোন সার্থকতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্যিক ইতিবৃত্ত সমূহের বহু অমূল্য গ্রন্থ এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রচিত হয়েছে। কিন্তু সময় যতই অগ্রসর হয়েছে, ইতিহাসের অর্থ-বোধ যতই পরিবর্তিত হয়েছে, ততই সাহিত্য-ইতিহাস আলোচনার এক নবতর সাহিত্যিক প্রয়োজন-বোধ গড়ে উঠেছে দিনে দিনে। 'History' শব্দের অর্থ-বিবর্তনের সুদীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে Encyclopaedia Britannica এই নবীন প্রয়োজন বোধের প্রাঞ্জল পরিচয় দিয়েছেন। ঐ মহাগ্রন্থের মতে ব্যাপকতম অর্থে ইতিহাস "Includes everythiug that undergoes change." আর আধুনিককালে—"We recognise the unstable nature of our whole social fabric, and are therefore, more and more capable of transforming it. Our institutions are no longer held to be inevitable and immutable creations. We do not attempt to fit them to absolute formulae, but continually adapt them to a changing environment. ....our whole society not only bears the marks of its evolution but shows its growing consciousness of the fact in most evident of its arts. In literature, philosophy and political science there is the same historical trend. Criticism no longer judges by absolute standards; it applies the standards of the author's own environment. We no longer condemn Shakespeare for having violated the ancient dramatic laws, nor Voltaire for having objected to the violations. Each age has its own expression, and in judging each we enter the field of history."

সাহিত্য-ইতিহাসের সাহিত্যিক প্রয়োজন

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার সাহিত্যিক প্রয়োজনীয়তা এই সুদীর্ঘ

৪। The Columbia Encyclopædia, 2nd Edn.

উদ্ধৃতি স্পষ্ট ব্যক্ত করেছে নিশ্চয়ই। মানব জীবনের ক্রমবিবর্তমান এই ঐতিহ্যানুসরণ কেবল অধুনাতন সাহিত্য-ইতিহাস আলোচনারই নয়, সর্বকালের সফল ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসারও আদর্শ হওয়া উচিত। মনুসংহিতা থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটি ও 'ইতিহাসে'র এই পরিণত অর্থকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছে বলে মনে করি।—

ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিক ভাবনার মতৈক্য ঘটবে না ;— এ কথাও ইতিহাসের নিয়ম অনুসারেই সত্য। কিন্তু, আধুনিক মানুষের মতই মনুসংহিতা-কারও নিঃসন্দেহে ঘোষণা করেছেন,—পুরাবৃত্ত অর্থাৎ প্রাচীন কাহিনী-তথ্যাদি-ক্রমে পাওয়া 'চতুর্বর্গ-ফল'লাভের আদর্শ সৃষ্টিই ইতিহাসের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আবার, জীবনের সকল পথেই অন্তর্মুক্তি ও আত্মবিকাশের অতীতানুসারী ধারাকেই আমরা 'ঐতিহ্য' বলে থাকি। অতএব, ঐতিহ্যানুসরণই সার্থক ইতিহাসের লক্ষ্য যে, তাতে সন্দেহ থাকে না।

এদিক থেকে ইতিহাসের কর্তব্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ পুরাবৃত্ত বা প্রাচীন তথ্যপঞ্জীর উদ্ধার, উদ্ভাবন কিংবা আবিষ্কার। দ্বিতীয়তঃ আবিষ্কৃত তথ্যাদির সাহায্যে জাতীয় ঐতিহ্যের যুগগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং সেই যুগবৈশিষ্ট্যের কালক্রমিক বিবর্তন সন্ধান। বলা-বাহুল্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের আলোচনায় এই দ্বিবিধ কর্তব্যের কোনটিই সহজসাধ্য নয়।

সাহিত্য-ইতিহাসের দ্বিবিধ দায়িত্ব

প্রাচীন বাঙালির ঐতিহাসিক অনবধানতা আজ প্রায় লোক-প্রবচনের অন্তর্ভূত হয়েছে। আমাদের পূর্বসূরীরা তাঁদের জীবন-ঐতিহ্যের পদ্ধতি-নিবদ্ধ পরিচয় রক্ষা করেন নি। তাছাড়া, সকল অযত্নের মধ্যেও অন্যান্য দেশে যে সকল ঐতিহাসিক উপাদান টিঁকে যেতে পারত, বাংলার জলো আবহাওয়া, উই এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গের উৎপীড়নে তাও হয় দুর্লভ, নয় লুপ্ত হয়েছে। তাই, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে প্রথমে তথ্যের উদ্ভাবন ও আবিষ্কারই ছিল অপরিহার্য। পূর্বাচার্যগণের অক্লান্ত সাধনা ও চেষ্টায় বাঙালি-ঐতিহ্যের সে সকল রত্ন ধরে ধরে আহৃত হয়ে এসেছে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই। গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রকে এই মহৎ সাধনার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

১। তথ্য সংগ্রহ

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অনাবিষ্কৃত সম্পদসম্ভার আবিষ্কারে বাঙালির মনীষা ও অধ্যবসায় যে পরিমাণে ব্যয়িত হয়েছে, আবিষ্কৃত তথ্যাদির মধ্যে বাঙালি ঐতিহ্যের অনুসন্ধানের চেষ্টা সেই পরিমাণে ব্যাপক হয় নি। ফলে, প্রত্ন-সম্পদের তুলনায় বাঙালির জীবন-সম্পদের অভাবে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস রয়েছে দুর্বল। আর তাই, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'ইতিহাসের' তুলনায় 'সাহিত্য' দুর্লভ হয়েছে, এমন অভিযোগ অসঙ্গত নয়। সত্য বটে, সার্ধ শতাব্দীর অক্লান্ত পরিশ্রমেও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্রমানুগত ইতিহাস আলোচনার সকল উপাদান আজও আহৃত হয়ে ওঠেনি ;—নানা জায়গায় নানা ফাঁক্ ভরাট্ করে তুল্‌তে হবে, নানা জটিল সমস্যার এখনও করতে হবে গ্রন্থিমোচন। তবু, যতটুকু তথ্যের আয়োজন আমাদের প্রত্ন-ভাণ্ডারে এ পর্যন্ত জমা হয়েছে, তার 'ঐতিহাসিক' সদ্ব্যবহারও আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তা' না হলে সাহিত্যিক মূল্য রচনায় ইতিহাসের দান চিরকাল শূন্য হয়ে থাকবে।

২। সাহিত্য-ইতিহাসে ঐতিহ্য-পরিচয়

এ-ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকের পথ নিরঙ্কুশ নয়। দীর্ঘ দিনের অনবধানতার ফলে বাঙালি ঐতিহ্যের স্বতন্ত্র স্বরূপটি আজ আমাদের কাছে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ইতিহাসের আধুনিক আদর্শ ও ব্যবহারের প্রসঙ্গে Encyclopaedia Britannica স্মরণ করেছেন,—প্রত্যেক যুগেরই এক একটি স্বতন্ত্র প্রকাশ-ভঙ্গি রয়েছে। ঐটুকুই সব নয়, প্রত্যেক দেশেরও রয়েছে পৃথক্ জীবন-বাচ্য। য়ুরোপের জীবন-ভঙ্গির (Pattern of life) সংগে ভারতীয় জীবন-ভঙ্গির যেমন মিল নেই ; তেম্‌নি ভারতীয় অন্যান্য দেশাংশের সংগেও বাংলা এবং বাঙালির জীবন-বোধের পার্থক্য দূর-প্রসারী। সর্ব-ভারতীয়তার সমর্থকদের এ-কথায় বিব্রত বোধ করবার কারণ নেই ;—বিভেদের মধ্যে সমন্বয়,—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের শিক্ষা। আর, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা এই ঐতিহাসিক শিক্ষারই এক বৃহৎ অধ্যায়। আমাদের ঐতিহাসিক বুদ্ধি সে কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্য বাঙালি জীবন-সম্ভব

একদা হিন্দুর ব্যবহার শাস্ত্র নারীকে চিরপরাধীনা করে কল্পনা করেছিল,—বাল্যে নারী হবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের।

তেম্‌নি, বাঙালির মাতৃভাষা-সাহিত্যকেও আমরা বাল্যে প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃত এবং যৌবনে ইংরেজি প্রভৃতি প্রতীচ্য সাহিত্যের অধীন করেছি। দুর্বল কল্পনার জটিল গ্রন্থি ভেদ করে বাংলা সাহিত্য-জননী তাঁর স্বরূপ-মহিমায় আজও আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। তাই, বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভেই স্মরণ করি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশুদ্ধ বাঙালি-জীবন-ঐতিহ্যের ধারক, বাহক এবং পরিচায়ক। এই ইতিহাসের বিবর্তন-পথে সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই।

সত্য বটে, ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের 'একমেবাদ্বিতীয়' পূর্বসূরী হচ্ছে বৈদিক ভাষা-সাহিত্য ; আর সেই সাধারণ সূত্রকেই আশ্রয় করে একাধিক সহস্রাব্দীর পারে বাংলা ভাষাও জন্ম নিয়েছিল। আবার সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যও সেই বৈদিক ভাষা-সাহিত্যেরই প্রত্যক্ষ সন্তান। এদিক্ থেকে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সংগে বলিষ্ঠ সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের সংযোগ বংশগত। কিন্তু কেবল এই হেতু সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের জীবন-প্রেরণা কখনোই এক হতে পারে না। বরং ভারতীয় সমাজের পরস্পর-বিপরীত দুইটি পৃথক্ জীবন-উৎসকে আশ্রয় করে উৎসারিত বলেই সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের জীবন-ঐতিহ্যের পার্থক্য হয়েছিল আমূল।

সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য-স্বভাব বর্তমান প্রসংগে আলোচিতব্য নয়। কেবল বাঙালি জীবন-ধর্ম ও সাহিত্য-স্বভাবের সংগে তার পার্থক্যটুকুর যাথার্থ্যই আমাদের নির্দেশ্য। এই উপলক্ষ্যে প্রথমেই লক্ষ্য করব, সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেণিগত সীমায়তি (Limitation)। সন্দেহ নেই, 'ধ্বনি' এবং 'রস'বাদের বুদ্ধিগম্য আলংকারিক পথ বেয়ে পাঠকসাধারণও সংস্কৃত সাহিত্যের শিল্প-লোকে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। কিন্তু, সে কেবল তত্ত্ব-বিচারেরই ক্ষেত্রে। বাস্তবিক পক্ষে কাব্য-সাহিত্যকে 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য' আখ্যা দিয়ে অভিজাত সংস্কৃত কবিগণ ভারতের বৃহত্তম মানব-সমাজকে দেব-ভাষার দেব-লোক থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ-ক্ষেত্রে রস-আস্বাদনে অধিকারিভেদের প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু সকল বিতর্ককে মেনে নিয়েও স্বীকার করতেই হবে,—বৃহৎ ভারতের বৃহত্তম জনতার প্রবল জীবন-স্পন্দনকে 'প্রাকৃত' বলে উপেক্ষা-অবজ্ঞা করেই সংস্কৃত সাহিত্য দিনে দিনে বলশালী হয়েছে ;—মুষ্টিমেয়ের অতিসূক্ষ্ম মনন-চিন্তা,

ভাব-ভাবনাকে আশ্রয় করে। সংস্কৃত সাহিত্যের সমুন্নতি ভারতে জাতিগত শ্রেণিভেদের সংগে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ—তাই সংস্কৃত ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিজাত সাহিত্য। আভিজাত্যের সমুচ্চ সিংহাসন যেদিন কালের হাতে বিচূর্ণ হয়েছে, সেদিন দেবভাষার অলৌকিক সম্পদ-সম্ভারও সংস্কৃত সাহিত্যকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি।

ইংরেজি সাহিত্যের জন্মলগ্নেও এই শ্রেণিভেদের পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। Chaucher ও Langland এর কাব্যালোচনায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রবেশক পাঠকও অনুভব করবেন,– রচনাশক্তির বিদগ্ধতা এবং অতিসূক্ষ্ম রুচি ও চিন্তা-ধারায় সমৃদ্ধ ফরাসি আভিজাত্যগন্ধী Chaucher-এর সৃষ্টির সংগে Langlad এর কণ্ঠে আট-পৌরে ইংরেজ-জীবন-কথার ছিল কী আমূল প্রভেদ। ইংরেজ জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ এই শ্রেণিভেদের পরিচয় দিনে দিনে লুপ্ত হয়েছে, ইংরেজি সাহিত্য আজ ইংরেজ জাতির সর্বজনীন সাহিত্য। কিন্তু, শিক্ষা-সংস্কৃতিগত সেই শ্রেণিভেদের ধারা ইংরেজি সাহিত্যে আজ রূপান্তরিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় সংঘাতের মধ্যে। ইংরেজের জাতীয় জীবনের মত তার সাহিত্যও রাষ্ট্রীয় সচেতনা প্রধান।

ইংরেজী সাহিত্য-স্বভাব

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য কিন্তু এই বিভেদ-মূলকতার বিপরীত। আর্য-ভারতীয় ভাষাসমূহের বংশপঞ্জী বিচার করলে দেখ্‌ব,—বাংলা ভাষা জন্মসূত্রে প্রত্যক্ষতঃ 'প্রাকৃত'ভাষা সাহিত্যের সংগেই সংলগ্ন। অর্থাৎ, শ্রেণীর সাহিত্য সংস্কৃত যে বৃহত্তম ভারতীয় জনতাকে উপেক্ষা করেছে, সেই 'প্রাকৃত'-জনের সমষ্টিবদ্ধ জীবন-স্পন্দনকে ধারণ ও বহন করার ঐতিহ্যের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম। তাই, আলংকারিক রীতির অনুসরণে, কাহিনীর আহরণে কিংবা তৎসমশব্দের ব্যবহার-প্রাচুর্যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য দেব-ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট হলেও, জন্ম সূত্রের মৌলঐতিহ্যের বিচারে এই দুই সাহিত্য আমূল পৃথক্। এই কারণেই সংস্কৃত থেকে বাংলা সাহিত্য যেটুকু গ্রহণ করেছে, তা'কে আপন জীবন-স্বভাবের 'ভাবাধিবাসনে' 'স্বী-কৃত' (Assimilate) করে নিয়েছে; বাংলা সাহিত্য কোন দিনই সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের অন্ধ অনুবর্তন করে নি।

সংস্কৃত ও বাংলা

ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধেও একই কথা বক্তব্য। উনিশ শতকের এক

ঐতিহাসিক বিপর্যয়লগ্নে নগর বাংলা ইংরেজ জাতির সান্নিধ্য পেয়েছিল; পেয়েছিল ইংরেজি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভেদমূলক স্বভাবের সংস্পর্শ। সেদিনকার ইংরেজ শাসক ও শিক্ষা-বিদ্গণ স্পর্ধার সংগে প্রত্যাশা করেছিলেন,—কিছুদিন এই দেশে ইংরেজি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসার অক্ষুন্ন রাখ্‌তে পারলে বাংলার নগরে নগরে তাঁরা গড়ে তুল্‌তে পারবেন ইংরেজ জাতির এক একটি কৃষ্ণাঙ্গ সংস্করণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠককে আজ শ্লাঘার সংগে স্মরণ রাখ্‌তে হবে, ইংরেজের সেই স্পর্ধিত দুরাশা বাঙালি-জীবন-বিধাতার হাতে বার্থতার চরম আঘাত লাভ করেছে। আর সেই চরম সাধনই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র স্বকীয় ঐতিহ্য।

ইংরেজি-প্রভাব

লক্ষ্য করব, আলোচ্য যুগের বাংলাদেশ নগর-বাংলা ও পল্লিবাংলায় স্বতোবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল; আর সেদিনকার বাংলাদেশে রাষ্ট্রনৈতিক উত্থানপতনের জটিলতা ছিল প্রায় নিরবধি। কিন্তু, এ-সব সত্ত্বেও উনিশ শতকের নাগরিক বাঙালি নূতন রেনেশাঁর সৃষ্টি করেছে সমাজ বিপ্লবের রাজপথ বেয়ে,—বিশ শতকের নাগরিক বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার আভিজাত্য-মোহকে ভূলুণ্ঠিত করে হয়েছে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের অভিমুখী। সর্বাবস্থায় এই সমাজ-অভিমুখিতা,—এই নিঃসংঘাত সমষ্টিমূলকতাই বাঙালি জীবন-স্বভাবের মৌল ধর্ম। আর এই জীবনধর্মের স্বতন্ত্র স্বভাবকে ধারণ করেই বাংলাসাহিত্য নিত্য-নব বিবর্তনের অধিকার আয়ত্ত করেছে ইতিহাসের চিরন্তন পথ ধরে।

এবং বাংলা সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেণি-সীমায়ত গগনচুম্বী শিল্পসমৃদ্ধির পাশে প্রাকৃত এবং তজ্জাত বাংলা সাহিত্য ভারতীয় সর্বজনীন সমষ্টি-ধর্মিতার ঐতিহ্যকে বহন করে জাত ও বর্ধিত হয়েছে। আবার, ইংরেজি সাহিত্যের স্পর্ধিত বিভেদমূলকতাকে যৌবনোচিত শক্তিতে অতিক্রম করে এই বাংলা সাহিত্যই মিলনমূলক সামাজিক আদর্শের অভিমুখী হয়েছে। অথচ, বারে বারেই 'দেবভাষা' ও তৎকালীন 'রাজভাষা'র শ্রেষ্ঠ সম্পদকে করে নিয়েছে আয়ত্ত,—স্বী-কৃত। বাংলা সাহিত্যের এই সর্বাভিমুখী স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, অনুবর্তন, অনুসরণই বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হওয়া উচিত।

বাংলা সাহিত্যের সর্বায়তরূপ এবং তার ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের সন্ধানে

বাংলা দেশে ভাষা-সাহিত্যের চর্চা যে কত প্রাচীন, ইতিহাস সে বিষয়ে নিরুত্তর :—"সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে বাংলাদেশে মানুষের বসতি আরম্ভ হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই।"[১] অতএব, এদেশের মাটিতে কখন যে প্রথম মনুষ্য কণ্ঠের বাঙ্‌ময় ঝংকার শোনা গিয়েছিল, সে খবরও জানবার উপায় নেই।

বাংলা দেশের প্রাচীনতম ভাষা

বাঙালি-সাধারণের কথায় ও লেখায় আজ যে বাংলা ভাষা প্রচলিত আছে, তার জন্মসূত্র 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা' থেকে বিলম্বিত। কিন্তু আর্যেরাই বাংলাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী ছিলেন না। আর্য-পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের জাতি-কুল-পরিচয় নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে, "ভাষাতত্ত্ব হইতে এটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলা দেশে আর্য-ভাষা আসিবার পূর্বে এদেশের লোকেরা কোল বা অস্ট্রিক্ জাতীয় ভাষা এবং কতটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত।"[২] কিন্তু সে সকল আর্যেতর ভাষার উল্লেখ্য কোন পরিচয় আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল কয়েকটি প্রাচীন স্থান ও বস্তুর নাম আজও বাঙালির সেই প্রাচীনতম ভাষার ঐতিহ্য কিছু কিছু ধারণ করে রেখেছে।

আর্যেতর ভাষা ও প্রাচীন বাঙালি

এবারে 'আর্য-ভারতীয়' বাংলা ভাষার কথা। 'ভারতীয় আর্যভাষা'-গোষ্ঠীর জন্মলগ্ন সূচিত হয়েছে আর্যগণের ভারতে প্রবেশের সংগে সংগে,—খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ১৫০০ বছর আগে। ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে বেদ-এর উল্লেখ করা হয় ;—এদেশে আর্য ধর্ম ও সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ। কিন্তু, "বৈদিক যুগের শেষ ভাগে অথবা তাহার অব্যহিত পরেই

বাংলা ও আর্য-ভারতীয় ভাষা

১। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ২। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাংলা দেশে আর্য-উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়।"[৩] অতএব, বাংলা দেশে আর্যভাষার প্রাদুর্ভাবও তার আগে ঘট্‌তে পারে নি।

বেদ ও বাংলা ভাষা

বেদের ভাষার সংগে বাংলা ভাষার সংযোগ প্রত্যক্ষ হলেও অব্যবহিত নয়। 'বেদ' এবং 'ব্রাহ্মণ'এর ভাষা ছিল ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা। বলা বাহুল্য, আটপৌরে জীবনের প্রয়োজন সাধনের জন্য তাঁদের একটি কথ্য ভাষাও ছিল। ভাষার ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান নিয়ে অনুমান করা যেতে পারে,—সাহিত্যিক বৈদিক ভাষা ছিল ঐ যুগের কথ্য ভাষার চেয়ে শালীন এবং শুদ্ধ রূপ-বিশিষ্ট। কালে কালে,—বহু শতাব্দীর পরে সেই সাহিত্যিক ভাষার স্থানে আর্যদের সাহিত্য-ভাবনার ভাষারূপে দেখা দেয় সংস্কৃত। ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন,—বেদ-সমকালীন অভিজাত আর্যদের কথ্য ভাষার সংস্কার করেই সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়েছিল:—"It was a polite form of speech based on the language of the aristocracy and the priest-hood of the Midland, perfected or improved,—'Samskṛta', in the sense that in its phonetics and in a great deal of grammar it was made to adhere to the OIA (Vedic and Brāhmaṇa speeches); and as such, it very closely agreed with the speech of the North-West as well।"[৪]

সংস্কৃত ও বাংলা

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার জননী। ভারতীয় আর্য ভাষার কুলপঞ্জী কিন্তু এই ধারণা সমর্থন করে না—তাই বর্তমান প্রসঙ্গে সেই কুলপঞ্জীর একটি মোটামুটি হলেও স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন :—

৩। বাংলা দেশের ইতিহাস।

৪। Origin and Development of Bengali Language—ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

নিদর্শন—ঋগ্‌বেদ ও পরবর্তী বেদ ও ব্রাহ্মণাদির ভাষা
(খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ১৫০০—খ্রীঃ পূঃ ·০০ অব্দ)

সংস্কৃত
(আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে)

পালি
নিদর্শন—অশোক-যুগের শিলালেখ এবং পালি-সাহিত্য
(আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০ -২০০ খ্রীঃ)

সাহিত্যিক-প্রাকৃত
নিদর্শন - নাটকীয় প্রাকৃত,—শৌর-সেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী ও জৈন-অর্ধমাগধী।
(আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ—৬০০ খ্রীঃ

অপভ্রংশ
নিদর্শন—পশ্চিমা অথবা শৌরসেনী অপভ্রংশ
(আনুমানিক—৬০০ খ্রীঃ—৯৫০ খ্রীঃ

আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষা
নিদর্শন-বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, মৈথিল, অসমীয়া ইত্যাদি,
(আনুমানিক—৯৫০ খ্রীঃ—আধুনিককাল পর্যন্ত)

এই কুলপঞ্জী থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, ভারতীয় আর্য ভাষার অ. জননী বৈদিক ভাষার ছিল অভিজাত ও অনভিজাত দু'টি সন্তান।—প্রথম

বৈদিক ভাষার দ্বিমুখী বিবর্তন

সর্বভারতীয় অভিজাত-সাহিত্য-সাধনার ভাষা সংস্কৃত অপরটির বিকাশ ঘটেছে পালি এবং বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা রচিত জন-জীবনাশ্রিত সাহিত্য ধারার মাধ্যমে।

বেদ-সমকালীন অভিজাত আর্য সমাজের মুখের ভাষাকে 'সংস্কৃত ("Perfected and improved") করে সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরি

সংস্কৃত ভাষা

করার শ্রেষ্ঠ গৌরব বৈয়াকরণ পাণিনির। তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণই সংস্কৃত ভাষার সর্বজনীনতার বৈজ্ঞানিক ভি

সুদৃঢ় করেছিল। পাণিনির আবির্ভাবকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে ; তা হলেও খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেই সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার সূত্রপাত যে ঘটেছিল, সে বিষয়ে বড় একটা সংশয় নেই।

কিন্তু, আগেই বলেছি, সংস্কৃত ভাষার সংগে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা প্রত্যক্ষ জন্ম-সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। সাধু জীবনের 'সংস্কৃত' লিখ্য সাহিত্যিক ভাষার সমান্তরাল ভাবে আর একটি সর্বজনীন ভাষা-সাহিত্য লোক-'নিরুক্তি'কে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছিল। সেই ভাষার উৎস অনভিজাত লোক-মুখের অপেক্ষাকৃত অমার্জিত-স্বভাব কথ্য ভাষা ; সংস্কৃতি-গর্বিত সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এই ভাষার উল্লেখ করেছেন 'প্রাকৃত' নামে,—অবজ্ঞাভরে। 'প্রকৃতি-বিষয়ক'—এই অর্থেই 'প্রাকৃত' শব্দের মূল উদ্ভব ঘটে ; আর 'প্রকৃতি' শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে,—প্রজাপুঞ্জ বা জনসাধারণ। অতএব 'প্রাকৃত ভাষা' অর্থে 'জনসাধারণের ভাষা'কেই বোঝা উচিত। কিন্তু অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারকগণ জন সাধারণের অমার্জিত (vulgar) রুচির প্রতি ইঙ্গিত করে অপূর্ণ-গঠিত, অমসৃণ ভাষা অর্থেই উল্লেখ করেছেন প্রাকৃত ভাষার। আমাদের বাংলা ভাষা, শুধু বাংলাই নয়, হিন্দী, মৈথিল, ওড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা মাত্রই জন্মসূত্রে 'প্রাকৃত' ;—প্রকৃতি-পুঞ্জের ভাবনার ধাত্রী,—প্রকৃতি মাতার সন্তান।

কথ্য প্রাকৃত ভাষা

লোক-মুখের দুর্বল. অপূর্ণগঠিত ভাষার পক্ষে হঠাৎ একেবারে সাহিত্যিক রূপলাভ করা সম্ভব হয় নি। প্রকৃতি-পুঞ্জের ভাষার প্রথম কুণ্ঠামোচন করলেন তথাগত বুদ্ধদেব। বৌদ্ধ-গ্রন্থ 'বিনয়-পিটক' উল্লেখ করেছেন,—বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ সাতজন শিষ্য সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধ-বাণী প্রচার করতে উদ্যত হলে. তথাগত নির্দেশ দিয়েছিলেন,—"সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধ বচনং পরিয়াপুনিতম্"—স্বকীয় 'নিরুক্তি'র[৫] মধ্য দিয়ে বুদ্ধ-বচন অনুধাবনীয়।

এখানে স্বকীয় শব্দের তাৎপর্য নিয়ে পণ্ডিত মহলে মত ভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেছেন, বুদ্ধদেব প্রত্যেককে স্ব-স্ব কথ্য ভাষার মাধ্যমে বুদ্ধ-বচন অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার আরো অনেকের মতে বুদ্ধদেব

৫। 'নিরুক্তি—Etymology, নির্বচন'—চলন্তিকা।

কেবল তাঁর নিজে (স্বকীয়) মাতৃভাষাতেই বুদ্ধ-কথা চর্চার আদেশ দিয়েছিলেন। উদ্ধৃত বুদ্ধ-কথার যে তাৎপর্যই গৃহীত হোক্ না কেন, তথাগতের এই নির্দেশকে উপলক্ষ্য করেই 'জনপদ-নিরুক্তি' সাহিত্য-কর্মের মাধ্যম ও লিখ্যভাষা রূপে ক্রমশঃ মর্যাদাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে, তা'তে সংশয় নেই। আর, এপথে 'পালি' ভাষা লোক-ভারতের প্রথম সাহিত্যিক ভাষার ঐতিহাসিক মার্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

পালি ভাষার জন্ম-কথা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বহুল। মোটামুটি বলা যেতে পারে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সংগ্রন্থনের মৌল প্রয়োজন থেকেই এই ভাষার প্রথম উদ্ভব ঘটে। পালি একটি বিমিশ্র কৃত্রিম ভাষা। অনুমান করা হয়ে থাকে,—বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই ভারতের বিভিন্ন অংশের শ্রমণগণের সংস্কৃতি ও ধর্মগত মনোভাব আদান-প্রদানের প্রয়োজনে দুর্বল অথচ সর্বজনবোধ্য একটি কথ্য ভাষার কাঠামো গড়ে উঠেছিল। তথাগতের পরিনির্বাণের পর বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রন্থণের জন্য বিভিন্ন সময়ে যে-সকল শ্রমণ সভা আহূত হয়েছিল, তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক পণ্ডিতগণের আলোচনার সাধারণ মাধ্যম ছিল ঐ দুর্বল কাঠামোটি। সেই কাঠামোর ওপরে বিভিন্ন আঞ্চলিক জনপদ-নিরুক্তির যৌগিক সংমিশ্রণের দ্বারা পালি ভাষার সাহিত্যিক স্বরূপটি বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

পালি ভাষা

কিন্তু এই কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার প্রাধান্যকে ছাপিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক কথ্য-প্রাকৃত ভাষাই বলিষ্ঠ সাহিত্যিক মর্যাদায় ক্রম-বিকশিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; ক্রমশঃ দেখা দিল শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী ও পৈশাচী প্রাকৃতের সমৃদ্ধ সাহিত্য-সম্ভার। স্বতন্ত্র প্রাকৃত গ্রন্থের সীমা ছাড়িয়েও সংস্কৃত নাটকাবলীর সংলাপ রচনায় প্রাকৃত ভাষার বহুল ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল।

সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষা

এই চতুর্বিধ প্রাকৃত ভাষা স্বাভাবিক বিনষ্টির পথ ('Natural process of decay') বেয়ে বিপর্যস্ত,—'অপভ্রংশ' রূপ লাভ করে। বাংলা ভাষা ঐরূপ এক অপভ্রংশ ভাষা থেকেই সঞ্জাত বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এদিক থেকে বাংলা ভাষার অব্যবহিত জনয়িত্রী 'মাগধী অপভ্রংশ ভাষা'। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'এ কিছুটা মাগধী অপভ্রংশের সংগে বহুল পরিমাণ শৌরসেনী

অপভ্রংশ ভাষা

অপভ্রংশেরও ব্যবহার লক্ষিত হয়ে থাকে। অতএব, জন্মসূত্রে বাংলা ভাষা 'সংস্কৃত' (Perfected & improved) নয়,—'প্রাকৃত',—প্রকৃতিপুঞ্জের ঐতিহ্য-সম্পদ।

বাংলা ভাষার জন্মকাল দশম শতাব্দীর পূর্বে বলে মনে করা যেতে পারে না। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম বাংলা গ্রন্থ 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' বা চর্যাপদের কোন অংশই ঐ সময়কার পূর্বে রচিত হয়নি বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

বাংলা ভাষা

আর চর্যাপদের ভাষাতেই অপভ্রংশের জঠর-জাল ছিন্ন করে দু'য়েকটি বাংলা শব্দের সম্ভাবনা কেবল অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছে। অতএব, চর্যার কালই যে বাংলা ভাষার জন্মের উষা লগ্ন, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের ও সূচনা এখান থেকেই।

কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। আর বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের আলোচনায় বাঙালির সেই প্রাচীনতম ঐতিহ্যের পরিচয় অবশ্য স্মর্তব্য। কারণ, বাংলা সাহিত্যের জন্ম লগ্ন সেই ঐতিহ্যের দ্বারাই একান্ত পরিপুষ্ট।

বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পূর্ব সূত্র

কেবলমাত্র চর্যাপদ'র প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখ্‌ব, সদ্য অঙ্কুরিত ভাষার দীনতা সত্ত্বেও, বাগ্‌ বৈদগ্ধ্যের কৌশলে, ছন্দ ও অলংকারগত সৌন্দর্যের সুসংগঠনে, ভাব-বিষয়ের জীবনানুসারিতায় চর্যার সাহিত্যিক বলিষ্ঠতা মনোমুগ্ধকর। অস্ফুট ভাষার গদ-গদ্‌ কণ্ঠের কাকলিতে যৌবনশক্তির এই বিস্ময়কর দীপ্তি সঞ্চার করেছে বাংলা ভাষার জন্ম-পূর্ব যুগের বাঙালি সাহিত্য-সংস্কৃতির মহৎ ঐতিহ্য। অ-বাংলা ভাষায় রচিত সেই রচনা সম্ভারের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের মূল প্রোথিত হয়ে আছে; অতএব আমাদের ঐতিহাসিক যাত্রার সুরু হবে সেখান থেকেই।

তৃতীয় অধ্যায়

১ ইতিহাসের পূর্বসূত্র

বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস বাঙালির লেখা সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় সাহিত্যেরই সংগে যুগপৎ পূর্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে আছে। আগেই বলেছি, বাংলা ভাষা জন্ম-সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষার সংগে অব্যবহিতভাবে আবদ্ধ নয়।

বাংলা সাহিত্যের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সূত্র

তবু, অভিজাত জনের সাহিত্য সাধনার সর্বভারতীয় মাধ্যম সংস্কৃত ভাষা বাংলা দেশে এসেই বাঙালির জীবন-সম্পর্কের সংগে একান্ত জড়িত হয়ে পড়েছিল। বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার রীতিকে অতিক্রম করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী কালের পূর্বেই গৌড়ী রীতির স্বাতন্ত্র্যকে বাঙালি গড়ে তুলতে পেরেছিল। অভিজাত ভারতীয়ের 'দেবভাষা' অভিজাত বাঙালির জীবন-ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে বাঙালি সাধারণেরও জীবন-সন্নিকটে এসে পৌচেছিল।

প্রাচীন বাংলায় উচ্চ এবং অনুচ্চের শ্রেণি-বিভেদ ছিল; এমন কি প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেও ধর্মগত সম্প্রদায়-বিভাগ ছিল। কিন্তু প্রাচীন বাংলা দেশ অথবা সাহিত্যের ইতিহাসে এই বিভাগ ও বিভেদ কখনো বিরোধের উগ্রতা সৃষ্টি করেনি। এবিষয়ে ঐতিহাসিকেরা সকলেই একমত। ডঃ, রমেশচন্দ্র মজুমদার বাঙালির এই ঐতিহ্য সম্বন্ধে দ্বিধাহীন ঘোষণা করেছেন,— "প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মদ্বেষের কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত আছে। ইহা হুয়েন্ সাঙ্ বর্ণিত শশাঙ্কের কাহিনী।" পরে, হুয়েন্ সাঙ-এর এই বর্ণনার সম্পূর্ণ যথার্থতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে ডঃ মজুমদার আবার বলেছেন—"হুয়েন-সাঙ-এর বর্ণনা সত্য হইলেও···প্রাচীন বাংলার ধর্মমতের উদারতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা যায় না।"[১] অপর পক্ষে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পালযুগে সংস্কৃত-ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের পরিবর্তে বৌদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করেছিল। পরে হিন্দু-বৈষ্ণব সেন বংশের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে সংস্কৃত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুদ্ভব ঘটে। কিন্তু এই পরিবর্তন ধারার সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করেও ডঃ সুশীলকুমার দে অবদমন অথবা উৎপীড়ন

১। বাংলা দেশের ইতিহাস।

(Suppression or persecution)-এর সন্ধান পান নি; বরং সর্বত্রই অনুভব করেছেন একটি সমন্বয় মূলক সহনশীলতার ভাব (accomodating spirit)।[২] এই সহনশীলতাময় সমন্বয়-আকাংক্ষার ফলে অভিজাত সংস্কৃত সাহিত্যের বহু ভাব-ভাবনা এবং কাব্যাদর্শও লোকসাহিত্যের প্রাণলোকে অনুপ্রবেশ করেছিল; চর্যার সন্ধ্যাভাষা, এবং চিত্র-কল্পের মধ্যে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। অপর পক্ষে লোক-সাহিত্যও সমকালীন বাংলার সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাব এবং রূপকল্পকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল যে, সেবিষয়ে ঐতিহাসিক নিঃসংশয়।[৩] অভিজাত বাঙালির জীবন-কথার সংগে লোক-বাঙালির জীবন-কথার এই ভাব-সাযুজ্যের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের সমন্বয়ধর্মী মূল প্রেরণা ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠ্ছিল। দুই স্বাধীন, স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত বাঙালি সংস্কৃতির এই সাধারণ ঐতিহ্যই বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূত্রকে দিনে দিনে গেঁথে তুলেছে।

বাঙালির সংস্কৃত সাধনার ত্রিবিধ পরিচয়

বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে;—(১) প্রাগৈতাসিক পর্যায়; (২) শিলালেখ এবং সাহিত্যেতর বিষয়ের রচনায় নিবদ্ধ পর্যায়; (৩) সাহিত্যিক পর্যায়।

(১) প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়

ভারতবর্ষে আর্য সমাগমের তারিখ নির্ণয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন; কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ দেড়হাজার বছর আগে তাঁরা উত্তরাপথে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাতে সংশয় নেই। বাংলাদেশে, এমন কি গোটা পূর্বভারতেই আর্য-প্রতিষ্ঠা এবং আর্য-প্রভাব বিস্তারে আরো অনেক বিলম্ব ঘটেছিল। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন,—…"The Aryanization of Bengal may be said to have commenced in right earnest from the closing centuries of the first millennium BC."[৪]। এ'র আগেকার আর্য-পূর্ব বাংলার পরিচয় যে অপ্রাপ্য-প্রায়, সে কথা আগেই বলেছি। কেবল, নানা পরবর্তী রচনায় বিপ্রস্তভাবে ছড়িয়ে আছে সেই প্রাগৈতাসিক যুগের বিচ্ছিন্ন একাধিক উল্লেখ।

২। History of Bengal Vol I—Ch XI। ৩। ঐ। ৪। ঐ—Ch XII—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জাতি হিসেবে 'বঙ্গ' শব্দের প্রাচীনতম ব্যবহার আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এ। বঙ্গ জাতির বাসস্থানই বঙ্গদেশ নামে পরিচিত। পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত বর্তমানের

বঙ্গদেশের প্রাচীন উল্লেখ-পরিচয়

ভৌগোলিক বাংলাদেশ প্রাচীন একাধিক দেশের সংমিশ্রণে গঠিত। এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে (১) বঙ্গ (বর্তমান পূর্ববঙ্গ), (২) রাঢ়-সুহ্ম (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ), (৩) বরেন্দ্রী-পুণ্ড্র (বর্তমান উত্তরবঙ্গ)। (৪) চট্টল (দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ), (৫) সমতট (বদ্বীপ বঙ্গ)। রাঢ় ও সুহ্মদেশের প্রাচীনতম উল্লেখ আছে জৈন আচারঙ্গ সূত্রে (আয়ারাঙ্গ সুত্ত)। পুণ্ড্র জাতির কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই লিপিবদ্ধ আছে।

কিন্তু এই সময়ের বাংলাদেশে সাহিত্য-সাধনার কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়নি। যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত বাজসনেয়ি সংহিতায় পূর্বভারতীয়

গৌড়বঙ্গে সাহিত্য কর্মের প্রাচীনতম উল্লেখ

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রধান ভূমিকা লক্ষ্য করবার মত। মহাভারতের যুগে 'মাগধ' গাথাকারদের উল্লেখ পাওয়া গেছে। কিন্তু মগধের পূর্বদিকে বর্তমান বঙ্গাঞ্চলের অধিবাসীরাও 'মাগধ' পর্যায়ের মধ্যে ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাচ্য রীতির স্বভাব নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অবশ্য কৌশীতকী ব্রাহ্মণেও প্রাচ্যরীতির উল্লেখ আছে। কিন্তু পাণিনির রচনাতেও 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' শব্দের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। অতএব, গৌড়-বঙ্গের সাহিত্য-কৃতির সমকালীন নিদর্শনও পাণিনির প্রাচ্য-রীতি বিচারের অঙ্গীভূত হয়েছিল, এমন অনুমান করা যেতে পারে।[৫] সুতরাং পাণিনির যুগে বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চা ব্যাপক হয়েছিল, এমন কথা ভাবতে বাধা নেই। পাণিনির পরে পাতঞ্জলি বঙ্গাদি দেশ এবং প্রাচ্য দেশীয় কথ্য ভাষা বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছিলেন। এসব সত্ত্বেও সে যুগের বঙ্গীয় সাহিত্যের কোন পরিচয়ই রক্ষা পায়নি। তার একটি কারণ হয়ত ছিল আর্য ভাষা-সাহিত্য-রীতি থেকে এই ভাষা-সাহিত্যের মৌল পার্থক্য। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাচ্য ভাষাকে 'আসুর' ভাষা বলা হয়েছে, পাতঞ্জলিও এদেশে 'আসুর' উচ্চারণের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব,

৫। ঐ Ch XI দ্রষ্টব্য।

'দেব-ভাষার' প্রবল প্রসারের দিনে 'দেবেতর' এই 'অসুর ভাষার' সাহিত্য-কর্ম একদিন অবহেলায় বিলুপ্ত হয়েছে ; এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মৌর্য যুগেই বাংলাদেশে উল্লেখ্য আর্য-সংযোগ ঘটে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেছেন। কিন্তু এ-যুগেও বাঙালির সাহিত্য-সাধনার কোন পরিচয় নেই।

২। (ক) শিলালেখ

এমনকি, অশোক শিলালিপির একটিও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয়নি। বাংলাদেশে আর্য ভাষায় রচিত প্রাচীনতম লেখা পাওয়া গেছে মহাস্থানগড়ে ; লিপিটি খণ্ডিত ; ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। অনুমিত হয়েছে লিপিটি মৌর্য যুগের ; হয়ত খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অপূর্ণ এবং লুপ্তপ্রায় ঐ লেখার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি কেবল মনে করা হয়েছে এর "ভাষা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত"।[৬] এর পরবর্তী প্রামাণ্য লিপিটি সুসুনিয়া পর্বতে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে, রাজা চন্দ্রবর্মা লিপিটির উৎকর্তা। প্রত্ন-বিশারদদের মতে এটির লিপিকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী। এ'ছাড়াও গুপ্তযুগের এমন অন্তত: আটটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে, যাদের লিপিকাল ৪৪৩ থেকে ৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

কিন্তু আর্য-ভাষায় রচনার এই সকল প্রমাণ-প্রাচুর্য সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগে বাংলাদেশে সাহিত্য গুণান্বিত গদ্য বা পদ্য লেখার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে সপ্তম শতকের আগেই সাহিত্যেতর বিষয়ে বাঙালির সংস্কৃত রচনার নিদর্শন দুর্লভ নয়। এ'দের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে পালকাপ্য রচিত 'হস্তি-আয়ুর্বেদ' গ্রন্থ।

২। (খ) সাহিত্যেতর বিষয়ে রচনা :— পালকাপ্য

ব্রহ্মপুত্র তীরে পালকাপ্যের আশ্রম ছিল, এরূপ জনশ্রুতি আছে। ডঃ সুশীলকুমার দে'র অনুমান সত্য হলে পালকাপ্য অন্তত: কালিদাস-পূর্ব যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৭] রাজা রোমপাদ ও পালকাপ্য ঋষির কথোপকথনের মাধ্যমে হস্তি-চিকিৎসা বিষয়ক নানা তথ্য এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বিখ্যাত চান্দ্রব্যাকরণের প্রণেতা চন্দ্রাচার্য অথবা চন্দ্রগোমী আলোচ্যযুগের বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনুমিত হয়। ৪৬৫ থেকে ৫৪৪

৬। বাঙালির ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

৭। দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol I Ch XI.

খ্রীষ্টীয় সনের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়েছে।[৮] চন্দ্রগোমী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁর ব্যাকরণ একদা কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও চীনে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এ'ছাড়াও, চন্দ্রগোমী তর্কবিদ্যা ও তান্ত্রিক বজ্রযানী ধর্মবিষয়ক অন্যান্য শ্লোকাদির রচয়িতা হিসাবে তিব্বতী বৌদ্ধ ঐতিহ্যে উল্লিখিত হয়েছেন। কথিত আছে, তারা ও মঞ্জুশ্রী দেবীর সম্বন্ধে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক, লোকানন্দ নামক নাটক এবং শিষ্যলেখ নামীয় ধর্মকাব্যের রচয়িতাও ছিলেন ঐ একই চন্দ্রগোমী।

চন্দ্রগোমী

'গৌড়পাদকারিকা'র লেখক-পরিচয় সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। কথিত আছে, গ্রন্থকার গৌড়পাদ শুকদেবের শিষ্য এবং বিখ্যাত শঙ্করাচার্যের 'পরমগুরু' অর্থাৎ গুরুর গুরু ছিলেন। যাইহোক্, গৌড়পাদ হয়ত গৌড়বাসী ছিলেন; আর তাঁর কারিকা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়েছিল। অন্যান্য একাধিক রচনার গ্রন্থকর্তা হিসাবেও গৌড়পাদ জনশ্রুতি-খ্যাত হয়ে আছেন।

গৌড়পাদ

এ সকল সাহিত্যেতর বিষয়ের বিতর্কিত পরিচয় ছাড়া বাঙালির রচিত যথার্থ সংস্কৃত সাহিত্য-কীর্তির নিদর্শ পালযুগের আগে বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সাহিত্য-কীর্তির স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকেই। ঐ শতকের প্রথমার্ধেই বাণভট্ট তাঁর হর্ষ-চরিত রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে বাণভট্ট বলেছেন, —সমকালীন ভারতের প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যরীতির মধ্যে গৌড়ী-রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল "অক্ষর ডম্বর"। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন,—"অক্ষরাড়ম্বর অর্থ হইতেছে শব্দ প্রয়োগগত ধ্বনি-সমারোহ।"[৯] সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর আলংকারিকদ্বয় ভামহ এবং দণ্ডী 'গৌড়ীরীতি'র এই স্বভাবকে সমর্থন করেছেন; এঁরা দু'জনেই বৈদর্ভীরীতির সংগে গৌড়ীরীতি বা গৌড় মার্গেরও বিশেষ আলোচনা করেন। দণ্ডীর মতে,—"গৌড়জনেরাও অতি ও উচ্চ কথন এবং অলংকার ও আড়ম্বর প্রিয়;

৩। সাহিত্যিক পর্যায়

গৌড় রীতির উল্লেখ

৮। দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol. I Ch. XI.

৯। বাঙালির ইতিহাস।

গৌড়রীতির প্রধান লক্ষণ হইতেছে অর্থ-ডম্বর, এবং অলংকার-ডম্বর, অনুপ্রাস-প্রিয়তা এবং বন্ধ-গৌরব বা রচনার গাঢ়তা।"[১০]

এই সকল আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা চলে, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই বাঙালির আযভাষা-সাহিত্য চর্চার স্বাতন্ত্র্য বৃহত্তর ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বাঙালিধর্মী এই স্বতন্ত্রতা পরবর্তী কালের সংস্কৃত অলংকারিকদের নিকট যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করতে পারেনি। ফলে, বৃহত্তর ভারতীয়তার ক্ষেত্র থেকে বিযুক্ত হয়ে এই 'আড়ম্বর'-প্রধান শিল্প-সাহিত্যের রীতি বাঙালির ব্যাপক জীবন-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছিল। আর বাঙালি জীবন-স্বভাবের অনুকূল এই কাব্য-রীতিই ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি জয়দেবের হাতে চরম পরিণাম লাভ করেছিল;—সংস্কৃত ভাষায় রচিত জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' ভাবে এবং রূপেও বাংলা ভাষা-সাহিত্যেরই পূর্ব-সূরী যে, সে বিষয়ে আজ সন্দেহ নেই।

এবং ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে এসে বাঙালির সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার নিশ্চিত প্রমাণ ও নিদর্শন সুলভ হয়েছে। নবম শতক থেকেই এমন অজস্র লিপি পাওয়া গেছে, যাদের সাহিত্য-গুণ সমুল্লেখ্য। ঐ সকল রচনা থেকে আরো বোঝা যায় যে, আলোচ্য সময়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা বহুল হয়েছিল। তা'ছাড়া সংস্কৃত ভাষার কয়েকটি বিখ্যাত প্রাচীন সাহিত্য-কীর্তিকেও বাঙালির রচনা বলে দাবি করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে, (১) ভট্ট নারায়ণের বেণীসংহার, (২) মুরারি লিখিত অনর্ঘরাঘব, (৩) শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিত, (৪) ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক, (৫) নীতিবর্মার কীচকবধ ইত্যাদি। কিন্তু এ-সকল দাবির পেছনে সংশয়হীন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।[১১] বস্তুতঃ, গৌড়-অভিনন্দই এঁদের মধ্যে একমাত্র কবি যাঁকে বাঙালি বলে নিঃসংশয়ে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু, তাঁর রচনার নিদর্শন সুপ্রচুর নয়।

বাঙালি বলে অনুমিত বিখ্যাত সংস্কৃত কবিগণ

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত্র-ই এ সময়কার সাহিত্য কর্মের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন। রচনাটি সংস্কৃত 'শ্লেষ-কাব্যে'র উৎকৃষ্ট প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি

১০। বাঙালির ইতিহাস। ১১। দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol. I—Ch XI.

পেয়েছে। এই কাব্যের বিষয়বস্তু অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের কাহিনীর রূপক মাধ্যমে বঙ্গাধিপ রামপালদেবের ঐতিহাসিক কীর্তি খ্যাপন। এ-দিক থেকে 'রামচরিত্র' ঐতিহাসিক কাব্যের মর্যাদাও দাবি করে থাকে। কিন্তু, কাব্য-কাহিনীতে রামকথা যেমন প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশিত হয়েছে, রামপালদেবের ইতিহাস তেমন সুব্যক্ত হয় নি। পরবর্তী টীকাকারদের ব্যাখ্যার সাহায্যে সেই ঐতিহাসিক অর্থ বোধগম্য হয়েছে। কাব্যার্থের এই রহস্যময় সীমায়তি সাহিত্যকর্ম হিসাবে রাম-চরিত্রের মর্যাদাহানি করেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠক এই গ্রন্থেরই আঙ্গিক-সাধর্ম্য লক্ষ্য করবে চর্যাপদাবলীর মধ্যে। এখানেও 'সন্ধ্যা-ভাষা' নামক শ্লেষাত্মক রূপাবয়বের মাধ্যমে কবি-বাচ্যকে অভিব্যঞ্জিত করা হয়েছে। সেখানে লোক-জীবন-কথার রূপকাশ্রয়ে বজ্রযানী সাধক সম্প্রদায়ের গূঢ় সাধন-তত্ত্বকেই প্রতিপাদিত করবার চেষ্টা হয়েছে। আর, সেই বিশেষার্থের প্রকটনের জন্যও অপরিহার্য হয়েছিল পরবর্তী টীকাকারদের ব্যাখ্যা-সহায়তা। সন্ধ্যাকর নন্দী শ্লেষ-কাব্য রচনায় বাঙালি-ধর্মী কোন পূর্বৈতিহ্যকে অনুসরণ করেছিলেন কিনা, সে কথা বলা দুষ্কর। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় রচিত রাম-চরিত্র নিজস্ব কাব্য-স্বভাবে বাংলা ভাষার আদি গ্রন্থ চর্যাপদের সমধর্মিতা নিঃসন্দেহে দাবি করতে পারে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী ছিলেন বরেন্দ্র পুণ্ড্র-বর্ধনের অধিবাসী; তাঁর পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালদেবের রাজসভায় একজন সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। রামপালদেবের ঐতিহাসিক কীর্তিই রামচরিত্রের প্রধান উপাদান হলেও, গ্রন্থটি রামপাল-পুত্র মদনপালের রাজত্ব কালে সমাপ্ত হয়। কাব্যের শেষাংশে মদনপাল-কথাও অনুপস্থিত নয়।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত্র

পাল যুগের কবি-কীর্তির এই একমাত্র নিদর্শনের কথা ছেড়ে দিলেও আলোচ্য সময়ে সাহিত্যেতর বিষয়ে বাঙালির রচনার নিদর্শন অপ্রচুর নয়। এই সব গ্রন্থের মধ্যে ন্যায়, চিকিৎসা ও স্মৃতি-বিষয়ক গ্রন্থই প্রধান। শ্রীধর ভট্টের ন্যায়-কন্দলী বিদগ্ধ সমাজে সর্বজন-সমাদৃত হয়ে আছে। আয়ুর্বেদ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে মাধব, চক্রপাণি দত্ত, এবং অন্যান্য অনেক বাঙালি লেখক সুবিখ্যাত হয়েছেন। আলোচ্য সময়ের স্মৃতি-বিষয়ক বাঙালি গ্রন্থ-লেখকদের মধ্যে ভবদেব ভট্ট এবং জীমূতবাহন প্রধানতম।

পালযুগের বাংলায় সাহিত্যেতর বিষয়ে সংস্কৃত রচনা

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিষয়ক এই সকল রচনাবলী ছাড়া পালযুগ থেকেই সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানা শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থ রচনার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। অবশ্য এই সকল রচনার প্রত্যক্ষ নিদর্শন অপ্রাপ্যপ্রায়; তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত অনুবাদ-প্রমাণাদি থেকেই এদের পরিচয় উদ্ধার করতে হয়।[১২]

বৌদ্ধাচার্যদের সংস্কৃত রচনা

নালন্দার বিখ্যাত পণ্ডিত শীলভদ্র কিংবা অতীশ দীপঙ্কর যে বঙ্গভূমির সন্তান ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত ভাষায় এঁরা গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন, তারও প্রমাণ আছে; যদিও নিশ্চিত নিদর্শন বড় একটা নেই।

কিন্তু বর্তমান প্রসংগে এতাধিক স্মরণীয় বিষয়ও রয়েছে। লুইপাদ, কৃষ্ণপাদ (কাহ্নপা), ভুসুকপাদ (ভুসুক) ইত্যাদি বিখ্যাত চর্যাকারগণও সংস্কৃত ভাষায় মহাযান ধর্মমতাশ্রিত বিবিধ বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়েছে।[১৩] এই অনুমান সত্য হলে বাংলা সাহিত্যের উষা লগ্নের দু'টি স্বভাব বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা সহজ হয়ে পড়ে।

প্রথমতঃ, চর্যাপদাবলীর মধ্যে সন্ধ্যা-ভাষার যে রূপাবরণ লক্ষ্য করা যায়, আগেই বলেছি, তা সংস্কৃত শ্লেষ-কাব্যধর্মের অনুবর্তী। শুধু তাই নয়, চর্যার শব্দ ও অর্থালংকার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যেও সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় স্পষ্ট-ব্যক্ত। লুইপাদ প্রভৃতি চর্যাকারগণের সম্বন্ধে উপরিধৃত অনুমানের প্রতি

এবং ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

লক্ষ্য রেখে বলা চলে,—বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ কাব্য-গ্রন্থাদির মধ্যে সংস্কৃত ও লোকভাষার কাব্য-সাহিত্য রচয়িতাদের অন্তরঙ্গ ভাব-সাযুজ্যের পরিচয় অন্ততঃ পাওয়া যায়। ফলে, সংস্কৃত কাব্যের রূপ-সমৃদ্ধি লোক-জীবন-কথাকে অলংকার-সুষম বহিরঙ্গ অবয়ব দান করেছে; অপর দিক থেকে লোক-বাঙালির জীবনাবেগ বাঙালি-রচিত সংস্কৃত কাব্যের মর্মলোকে রচনা করেছে ভাবোদ্বেল গীতি-কাব্য সৃষ্টির নবীনতর আকৃতি। আগেই দেখেছি, বাঙালি স্বভাবানুকূল অনুরূপ সংস্কৃত রচনার পদ্ধতি গৌড়ীরীতি নামে তত্ত্বজ্ঞদের কাছে অনাদৃত হতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু, এ কথা মনে করতে বাধা নেই যে, সেই অনাদরের পথ বেয়েই সংস্কৃত সাহিত্যের বাঙালি কবির শিল্প-দৃষ্টি বাঙালি-জীবনের গভীরে নিবদ্ধ হয়েছে,—সংস্কৃতভাষায় বাংলা-ধর্মী, বাঙালিধর্মী নূতন

১২। দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol. I—Ch XI. ১৩। ঐ।

কাব্যের অজস্র প্রবাহকে করেছে উৎসারিত। 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' উদ্ধৃত শত শত শ্লোক এই অনুমানের ঐতিহাসিক পোষকতা করে থাকে।

এখানেই বাঙালির সাহিত্যের মৌল স্বভাবটিকেও দ্বিতীয়বার স্মরণ করে রাখা চলে। বাংলা এবং বাঙালির সাহিত্য-স্বভাব প্রথমাবধি ছিল মিলন-মূলক। বাংলা-সাহিত্যের ঊষালগ্নে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের দুটি বিভিন্ন ধারায় বাঙালির সাহিত্য-মানস উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিভিন্নতা কখনো বিভেদ বিরোধের কারণ হয় নি ; বরং পারস্পরিক পরিপূরকতার প্রভাবের ফলে বৈচিত্র্যের মধ্যেও সূচনা করেছিল ঐক্যের এক মহৎ সম্ভাবনা। আর 'বিচিত্র' যেখানে 'একে'র মধ্যে বিধৃত-সম্মিলিত হয়েছে, সেই সংগম-উৎসেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম। চর্যার বহিরঙ্গ রূপাবয়ব এবং অন্তরংগ জীবন-সিদ্ধির মধ্যে এই মিলন-মূলকতার পরিচয়ই আভাসিত হয়ে আছে।

সে যাই হোক্‌, বৌদ্ধ ধর্ম-প্রভাবিত সংস্কৃত সাহিত্য রচনার এই ধারা যে আজ বিলুপ্তপ্রায় সে কথা আগেই বলেছি। আর এই বিলুপ্তি সূচিত

সেনযুগের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য

এবং সম্পূর্ণও হয়েছিল হিন্দু-বৈষ্ণব সেন-রাজবংশের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে। কিন্তু এর পেছনে কোন সাম্প্রদায়িক পীড়নের ইতিহাস যে নিহিত নেই, সে কথাও পূর্বাবধি বলে এসেছি। এ সম্বন্ধে ডঃ সুশীল কুমার দে নিঃসংশয় মন্তব্য করেছেন,—"We hear of no suppression or persecution of Buddhism under the overlordship of the Senas, but it was probably a part of their policy to encourage Brahmanical studies as a reaction against the Buddhistic tendencies of the Pāla Kings."[১৪]। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের এই পরিপোষণের ফলে বাংলা দেশে সেন আমলে সংস্কৃত শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল ; এবং সেন-শ্রেষ্ঠ বল্লাল সেন হিন্দু-কৌলীন্যকে স্থির-প্রতিষ্ঠ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। ফলে, বল্লালী যুগে বিবিধ ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থের রচনাই প্রাধান্য পেয়েছিল। বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন ; স্বয়ং রাজাও যে স্মার্ত আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ লিখেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। এ'ছাড়া এ-যুগের সমুল্লেখ্য

১৪। দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol. I—Ch XI.

আরো দুজন পণ্ডিত ছিলেন গুণবিষ্ণু এবং হলায়ুধ। আবার এই যুগেই বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ সর্বানন্দ ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব' নামক ব্যাখ্যা লিখে সুখ্যাত হয়েছিলেন।

তার পরে আসে সেন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্মের ইতিহাস; বস্তুত তুর্কী-আক্রমণ-পূর্ব বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তির ঐতিহ্য এই সময়েই আবিষ্কৃত হতে পেরেছে সংস্কৃত কাব্য-সংকলন 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' মধ্যে। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত-চূড়ামণি বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস ছিলেন এই সাহিত্য-কীর্তির সংকলয়িতা;—সংকলন কাল ছিল ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ বা তন্নিকটবর্তী সময়। সদুক্তি কর্ণামৃত ৪৮৫ জন জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতনামা কবির ২৩৭০টি পদ ধারণ করে আছে। সংকলিত পদগুলি পাঁচটি বিভিন্ন 'প্রবাহে' সজ্জিত রয়েছে। প্রত্যেক প্রবাহ আবার নানা 'বীচি'তে বিভক্ত। কেবল ভণিতা দেখে, কিংবা কবিতাবলীর বর্ণনা থেকে কবিদের ব্যক্তি-পরিচয় আবিষ্কার অসম্ভব। এঁদের মধ্যে অনেকেই বাঙালিও ছিলেন না যে, সে বিষয়ে সংশয় নেই; গ্রন্থটিতে কালিদাস-ভবভূতির রচিত পদও উদ্ধৃত আছে। তবে বাঙালি লেখকের পদ্যাংশও এই লেখায় কম উদ্ধৃত হয় নি, এঁদের মধ্যে রয়েছেন,—রাজবংশীয় বল্লাল, লক্ষ্মণ এবং কেশব সেন; তাছাড়া আছেন বিখ্যাত কবিগোষ্ঠী ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন, শরণ এবং স্বয়ং কবিচূড়ামণি জয়দেব গোস্বামী। এই কবি-পঞ্চক লক্ষ্মণসেনের রাজসভাকে অলংকৃত করেছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য জনশ্রুতি রয়েছে। ধোয়ী-কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুসরণে মন্দাক্রান্তা ছন্দে নূতন দূত-কাব্য লিখেছিলেন 'পবনদূত' নামে। উমাপতিধরের একাধিক পদ পাওয়া গেছে বাংলা দেশে ছড়ানো বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপিতে। এ-সবের কিছু-কিছুও অন্যান্য পদের সংগে সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত রয়েছে। কবি গোবর্ধনাচার্য বিখ্যাত 'আর্যা সপ্তশতী'র লেখক বলে অনুমিত হয়েছেন। শরণের একাধিক পদ সদুক্তিকর্ণামৃতে রয়েছে; তাছাড়া জয়দেব গোস্বামী গীতগোবিন্দে অন্যান্য সতীর্থ কবিদের সংগে শরণেরও সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি জয়দেব গোস্বামী স্বয়ং তাঁর গীতগোবিন্দ নিয়ে এ যুগের কবি-কীর্তির শিরোমণি হয়ে আছেন।

'সদুক্তি কর্ণামৃতের' কবিগোষ্ঠী

কিন্তু এই কবি-গোষ্ঠীর আলোচনা এখানে নয়; এঁদের আগেই বাংলা দেশে প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য সুগঠিত হয়ে ওঠার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। তা' ছাড়া চর্যাপদাবলীরও অনেক কয়টি ইতঃপূর্বে রচিত হয়ে গেছে সদ্য-অঙ্কুরিত বাংলা ভাষায়। আর ডঃ সুশীল দে'র এই সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সত্য যে, "……Even in its beginnings, the vernacular literature did not fail to exercise some influence on the theme, temper and expression of the contemporary Sanskrit literature."[১৫] একাধারে সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্বৈতিহ্য এবং লোকসাহিত্যের (Vernacular Literature) সজীব প্রভাব একসংগে ধারণ করেই বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নে গীতগোবিন্দ আদি-সৃষ্টিত্বের দাবি নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এদিক্ থেকে জয়দেবের কবি-কীর্তি তাঁর একক প্রতিভার দিগ্‌দর্শনই করছে না, সমকালীন লক্ষ্মণসেন-রাজসভার কবি-গোষ্ঠী এবং অন্যান্য কাব্যধারার ঐতিহ্যগত প্রতিভূরূপেই জয়দেব বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রথম দিগ্‌দর্শক হয়ে আছেন। চর্যাপদের অ-গঠিত বাংলা ভাষায় রচিত পদাবলী জয়দেবীয় যুগ-প্রতিভার প্রাণস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েই কৃষ্ণকীর্তনে সম্পূর্ণ বাঙালি স্বভাব অর্জন করেছে। ইতিহাসের এই ধারাকে অনুসরণের জন্য প্রাকৃত-অপভ্রংশ বাংলা ভাষার সেই পূর্বৈতিহ্যকেই আগে স্মরণ করতে হবে।

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলেছি,—বাংলা দেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপিকৃত্যটি 'প্রাচ্য-প্রাকৃত' ভাষায় রচিত। প্রাচ্য-প্রাকৃত অর্থে মাগধী প্রাকৃতকেই বোঝানো হয়ে থাকে;—এই ভাষারই বিকশিত নবরূপগুলির একটি হচ্ছে প্রাচীন বাংলা ভাষা। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন মৌর্য যুগেই বাংলা দেশে মাগধী প্রাকৃত ভাষার ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল; আর এই ভাষাই বাঙালির কণ্ঠে উচ্চারিত প্রাচীনতম আর্য কথ্য-ভাষা।[১৬] কিন্তু শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ সুপ্রাচীন লিপি ছাড়া প্রাকৃত ভাষার আর কোন উল্লেখ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নি। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বিভিন্ন

অপভ্রংশ রচনার প্রাচীন নিদর্শন

১৫। দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol. I—Ch XI.

১৬। ঐ-Ch. XII.

সংস্কৃত নাটকে মাগধী প্রাকৃতের একাধিক কথ্য রূপের ব্যবহার লক্ষ্য করা চলে। ডঃ সুনীতিকুমারের মতে ঐ সকল রচনা বিশুদ্ধ মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন বলে বিবেচিত হতে পারে না :—ঐ সব ছিল "rather a kind of North Indian dramatists' conception of what the backward provincial of the extreme east of Āryāvarta spoke like"[১৭]।

এই সাহিত্যের ক্রম-বিলোপ

কৃত্রিমতার এই ভার অতিক্রম করে বিশুদ্ধ মাগধী প্রাকৃতের (অপভ্রংশ) নিদর্শন এ দেশে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আগেকার রচনায় আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এ'র কারণ হিসেবে অনুমান করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে আর্য সমাগমের পর থেকেই সংস্কৃত হয়েছিল আভিজাত বাঙালির সাহিত্য- সাধনার একমাত্র ভাষা। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর শুরু থেকেই বৌদ্ধদের জনপদ-নিরুক্তি সাধনার ধারা লুপ্ত হয় ;—আভিজাত সংস্কৃত ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি দেখা দেয় নূতন প্রবণতা। প্রথমে সংস্কৃত স্বভাব-বিশিষ্ট প্রাকৃত রচনার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, পরে বৌদ্ধ সাহিত্যও সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ শরণ গ্রহণ করে। ফলে অনভিজাতদের রচিত লোক-ভাষা-সাহিত্য অকিঞ্চিৎকরতার জন্যই কালের হাতে আত্মরক্ষা করতে পারে নি।[১৮]

দোহাকোষ, ডাকার্ণব ইত্যাদি

দশম-একাদশ শতকে অপভ্রংশ সাহিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা'তেও প্রাচ্য-অপভ্রংশ মাগধীর সংগে মধ্যভারতীয় শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশের বিমিশ্রতার চিহ্ন সুপ্রচুর। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাত কারণে অভিজাত সংস্কৃতের প্রভাবের বাইরে শৌরসেনী প্রাকৃতই প্রথম স্বতন্ত্র, সুপুষ্ট সাহিত্যরূপ পরিগ্রহ করেছিল। ফলে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে 'প্রাকৃত'জনের মধ্যে এই ভাষা-সাহিত্য সশ্রদ্ধ প্রতিষ্ঠার ভাগী হয়েছিল ; মধ্যযুগের বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত-সাহিত্যের সর্বত্রই শৌরসেনী-প্রভাব হয়েছিল অবারিত। চর্যাপদর ভাষাতেও সদ্য-অঙ্কুরিত কয়েকটি বাংলা শব্দ এবং কিছু মাগধী অপভ্রংশের সঙ্গে প্রচুর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব ছড়িয়ে আছে।

১৭। দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol. I—Ch XII. ১৮। ঐ।

বাংলাদেশে প্রাকৃত-অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলাভাষা রচনার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কার করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। নেপালের রাজ-দরবার থেকে চর্যাপদ'র পাণ্ডুলিপির সংগে আরো তিনটি পুথি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন :--

(১) অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃত টীকাসহ সরোজবজ্রের দোহাকোষ (দোহাসংখ্যা ১০০)

(২) 'সংস্কৃত টীকামেখলা' সহ কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ (দোহাসংখ্যা ৩৩)

(৩) সংস্কৃত রচনাংশ সংবলিত ডাকার্ণব।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী সব কয়টি রচনাকেই চর্যাপদেরই মত বাংলা ভাষায় রচিত বলে অনুমান করেছিলেন। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন,--কেবল চর্যাপদই আলোচ্য যুগের বাংলা রচনার একমাত্র নিদর্শন; বাকি সব কয়টি গ্রন্থের ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ। অবশ্য ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই সকল রচনা 'প্রাচ্য' ভারতীয়গণের 'শৌরসেনী' রচনার নিদর্শন বলেই মনে করেছেন। দোহাকোষগুলোর অন্ততঃ একটি যে বাঙালিরই লেখা, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ নেই;—দোহাকোষের কৃষ্ণাচার্য এবং চর্যাপদর কাহ্নপা অভিন্ন ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। সরোরুহ বা সরোজবজ্রকেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি বলেই দাবি করেছেন। অন্ততঃ সরোজবজ্রের দোহা-কোষ ও চর্যাপদ'র লিখনভঙ্গি এবং ভাববিষয়ে যে মৌলিক সাধর্ম্য রয়েছে, এ-কথা পদগুলো পাশাপাশি পড়লেই বোঝা যাবে। চর্যার পাঠকদের প্রতীতির জন্য একটি পদ মাত্র উদ্ধার করছি :—

"জহি মন পবন ন সঞ্চরই
রবি শসি নাহ পবেশ।
তহি বট চিত্ত বিসাম করু
সরহে কহিঅ উবেশ।

চর্যাপদর বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা হবে; সাধারণ ধারণা নিয়েও এ'কথা অনুভব করা চলে যে, ভাব এবং প্রকাশরীতিতেও চর্যা ও দোহাকোষ একই ভাব-গোষ্ঠীর (School of thought) ভাবনা-সঞ্জাত। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, এই দোহাকোষ ও চর্যাপদের আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন বাংলায় 'প্রাকৃত'-বাঙালির সাহিত্য কর্মের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হতে

পেয়েছে। আলোচ্য রচনাবলীর মধ্যে ইতিহাসের বিশেষ স্বভাবকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে,—দীর্ঘকাল ধরে কতকগুলি বিশেষ ভাবকে নির্দিষ্ট কতক-গুলি বাচনভঙ্গি ও রূপচিত্রের মাধ্যমে অভিব্যঞ্জিত করবার একটি সাধারণ সংস্কার (common convention) এই যুগে গড়ে উঠেছিল। ঐ সকল গ্রন্থের মূল ভাববাচ্যটি সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সাধারণ সূত্র থেকে এসেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বত্রই সেই ধর্ম-কথা সন্ধ্যা-ভাষা নামক এক রহস্যময় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই ভাষার স্বভাবেই আছে ধর্মতত্ত্বকে জীবন-রূপকের মাধ্যমে অনূদিত করে তোলার স্বভাব। এখানে দেখ্‌ব, একই ধর্মকথার নানা অংশকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করতে গিয়ে একই জীবনের অভিজ্ঞতাকে নানাক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,—অদ্বয়জ্ঞানের সাহায্যে মোহমুক্তির আদর্শটিকে ব্যক্ত করে সরোজবজ্র তাঁর দোহায় বলেছেন,—

"অদ্বঅ চিত্ত ত[রু]রুঅর ফরাউ তিহুঅণেঁ বিত্থা[র]।
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই ণামে পর উআর ॥

আর চর্যাপদে প্রায় একই উদ্দেশ্যে চাটিল বলেছেন :—

"ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গি নিবাণে করিঅ ॥"

ধর্মকথার এই অভিন্ন-কল্পনাযুক্ত জীবনায়নের ইতিহাস দেখে স্বতঃই মনে হয়,— দীর্ঘদিন ধরে জীবনানুভূতিময় এই সাহিত্য-কর্মের ধারা লোক-বাংলার শিল্প-সাধনায় প্রচলিত হয়েছিল। সুদীর্ঘ ব্যবহারের ফলে দশম-একাদশ শতাব্দীতে জীবন-রস-সমৃদ্ধ এই সাহিত্য-সাধনার ঐতিহ্য বাঙালির সংস্কারগত সাধারণ সম্পদে পরিণত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে রচিত প্রাকৃত ছন্দ-বিষয়ক গ্রন্থ প্রাকৃত পৈঙ্গলের মধ্যেও বাঙালিধর্মী যে দু-একটি অপভ্রংশ পদ পাওয়া গেছে, তাতেও এই জীবন-সন্নিবিষ্টতার পরিচয় সুস্পষ্ট :—

অপভ্রংশ সাহিত্যের জীবন-রস সমৃদ্ধি

"ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ-পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা ॥

পূর্বালোচিত সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার অভিজাত মনন-চিন্তার সংগে অনভিজাত বাঙালি চেতনার এই নিবিড় জীবন-রসবোধের সমৃদ্ধিকে একত্র-বদ্ধ,—একসঙ্গে আয়ত্ত করে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সম্ভাবনা জন্মলাভ করেছে চর্যাপদ'র মধ্যে। আদিযুগ অতিক্রম করে মধ্যযুগের পথে বাংলা সাহিত্য যতই অগ্রসর হয়েছে, এই মিলন-বন্ধন হয়েছে ততই ঘন-সন্নিবিষ্ট। অভিজাত বাংলার সংগে অনভিজাত বাংলার জীবন-সম্মিলনের এই ঐতিহ্য-সূত্রেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম-ইতিহাস বাঁধা পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূত্র

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাসের পথ

এ পর্যন্ত একাধিকবার বলেছি, বাংলা ভাষায় বাঙালির সাহিত্য-রচনার প্রাচীন পরিচয় নিহিত আছে চর্যাপদে। আর, পণ্ডিতেরা মনে করেছেন,

বাংলা সাহিত্যের জন্মকাল

চর্যার কোন কোন পদ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগেই রচিত হয়। এই সিদ্ধান্ত সত্য হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জন্মকাল এসে দাঁড়ায় ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ বা তা'র কাছাকাছি সময়ে।[১]

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে দেখেছি, এই ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে; আর জন্ম-পূর্ব সেই প্রাচীন যুগে বাঙালির ক্রমবিকশিত জীবন-চৈতন্যের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের সম্ভাবনা দিনে দিনে অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌ছিল। অতএব, বাংলা সাহিত্যকে বাঙালির স্বতন্ত্র জীবন-স্বভাবের সৃষ্টিধর্মী রূপ বলে অনায়াসে

বাংলা সাহিত্যের স্বভাব-স্বরূপ

অভিহিত করা চলে। বাংলা সাহিত্যের এই বাঙালি-জীবন-সম্ভব চরিত্রকে পরিচায়িত করে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—"বাঙালা দেশে, বাঙালা-ভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার ফল-স্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্য-যুগের ভারতের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই বাঙালি সংস্কৃতি; এবং এই সংস্কৃতি, বাঙালা ভাষার সৃষ্টি-কাল হইতে বাঙালা ভাষায় রচিত যে সকল কাব্যে-কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাই বাঙালা সাহিত্য।"[২]

বাংলার সাহিত্য-স্বভাবের একটি সর্বকাল-সাধারণ স্থায়ি-পরিচয় এই

বাঙালি সংস্কৃতির বিবর্তন

সুদীর্ঘ বাক্যে প্রকাশিত হতে পেরেছে। কিন্তু কাল এবং পাত্রের পরিবর্তনের সংগে সংগে বাংলা দেশে বাঙালির সংস্কৃতি বারে বারে বিশেষিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে, বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ চরিত্রে প্রতিবারই বৈচিত্র্য ও

১। দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol. I—Ch XII. ২। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য।

বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় সেই বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য স্থপরিস্ফুট করেছেন। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরাও বলেছি,—এই বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্যমূলক বিবর্তনের ধারানুসরণই সাহিত্য-ইতিহাসের প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

বাঙালির মৌল স্বভাবের একটি সাধারণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তার ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সংগে তার পার্থক্য স্বতঃ-ই পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আগেও বলেছি, আবার বলি, 'পার্থক্য' শব্দের ব্যবহারে ভীত হবার কারণ নেই। বরং এই পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনেই ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপোষণ সম্ভব হতে পারে। যাই হোক্, এই মৌল স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের জন্যই অ-ভারতীয় অন্যান্য জাতি থেকে বাঙালি পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র; এই কারণেই একদা প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি শিখেও বাঙালি 'কৃষ্ণচর্মাবৃত' ইংরেজ হয়ে পড়ে নি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

আবার, এই মৌলিকতার প্রভাবেই এক বাঙালির সংগে অপর বাঙালি,—একালের বাঙালির সংগে অপর যে-কোন কালের বাঙালি একাত্ম-বিশিষ্ট। কিন্তু, আগেই বলেছি, সেই মৌল স্বভাবকে আজ আমরা কোন অবস্থাতেই 'অজরামরবৎ' স্থবির (static বলে মনে করতে পারি না। কালে কালে নানাজনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাংলা সংস্কৃতি,—বাঙালিত্ব ক্রমবিবর্তিত হচ্ছে; তার আনুষঙ্গিক লক্ষণসমূহের ক্ষয়-বৃদ্ধি ঘট্ছে। ফলে, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও জীবন-পরিবেশের বিভিন্নতা নিয়ে এ যুগের বাঙালি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাঙালি থেকে পৃথক্; অনাগত কালের বাঙালি আবার আধুনিক কালের হাতে সেই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের অধিকার স্বভাবতঃই দাবি করবে। এই বিবর্তনই ত ইতিহাসের জিজ্ঞাস্য; ঐতিহ্য যেখানে স্থবিরত্বের বন্ধন নয়, প্রগতির প্রস্থত জীবন-সূত্র,—ইতিহাস কেবল সেখানেই জীবন্ত।

সাহিত্যের ভাব-রূপের বিবর্তন

ইতিহাসের এই জীবনীশক্তির প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের আন্তর ভাব (spirit) এবং বহিরঙ্গ অবয়ব (form)-এ বারে বারে বিবর্তন-পরিবর্তনের স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়েছে। আর, জীবন-মূলীভূত ধর্ম-রাজনীতি, অর্থ-ও-সমাজনীতি বিষয়ক নানা প্রভাবের অভিঘাতেই বিবর্তনের এই বৈচিত্র্য নিত্য-নূতনরূপে

স্ফুরিত হয়ে উঠ্‌ছে। এইরূপে নিয়ত বিকাশমানতার মধ্য দিয়ে সাহিত্য-স্বভাবের রূপে এবং ভাবে যখন পরিবর্তনের ছাপ সুচিহ্নিত হয়ে ওঠে,—স্বাতন্ত্র্য-স্বভাব হয় স্বয়ংস্ফুট, তখনই জীবন ও সভ্যতার মতই নূতন যুগ-সম্ভাবনা আভাসিত হয়ে ওঠে সাহিত্যেও। কালের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে বাঙালি-সংস্কৃতির মৌল স্বভাবের বৈচিত্র্য অর্জনের এই ইতিহাসকে প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :—

১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায় (প্রাক-তুর্কী-আক্রমণ যুগ) (আনুমানিক ৯০০—১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

ও ইতিহাসের পর্যায়-বিভাগ

২। বাংলা সাহিত্যের মধ্য পর্যায় (তুর্কী আক্রমণ-পরবর্তী যুগ) (আনুমানিক ১২০০—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

৩। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্যায় (য়ুরোপ-প্রভাবিত যুগ) (মোটামুটি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ—বর্তমান কাল)।

বাংলা ভাষার ক্রমাগ্রস্থতির পথে কালগত এই পর্যায়-বিভাগ পাণ্ডিত মহলে মোটামুটি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু, এই সকল বিভাগকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ অথবা বহিরঙ্গ স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গেলে নানারকম আপত্তি উঠে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বিভিন্ন কালপর্যায়ে বিভক্ত করেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বভাবকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন। তা' হলেও অনেক ক্ষেত্রে আবার শতাব্দী ধরে ধরে বাংলা সাহিত্য-রচনার খবর-সংগ্রহ নিরাপৎ-তর বিবেচিত হয়েছে।

কিন্তু, এ-বিষয়ে মনে রাখা উচিত যে, জীবনের গতি অঙ্কের হিসেব মেপে দশক অথবা শতকের চিহ্ন-সীমায় আবর্তিত হয় না। বিভিন্ন যুগান্তকারী

জীবনের বিবর্তন এবং

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতকে আশ্রয় করে অকস্মাৎ জীবনী-শক্তি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; তখন সমকালীন জীবনাভিঘাতের স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই নবযুগ-স্বভাবকে পরিমাপ করে নিতে হয়। আমাদের ধারণা, আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যুগোত্তরণের সন্ধিক্ষেত্রে অভিঘাত রূপে অবস্থান করছে তুর্কী আক্রমণ। তর্ক উঠ্‌তে পারে,—তুর্কীরা ছিল ধর্ম-ভাষা, সংস্কৃতি-স্বভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশি জাতি; এই আকস্মিক-ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় সাহিত্য-স্বভাবের বিবর্তন-ইতিহাস নির্ণীত হবে কেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া

দুঃসাধ্য নয়। সন্দেহ নেই, কোন বিশেষ জাতির মৌল স্বভাবকে কেন্দ্রে রেখেই তার সমাজ-সংস্কৃতি অথবা সাহিত্যের বিকাশ-বিবর্তন ঘটে থাকে। এ-পথে জাতির অন্তর্নিহিত আকাংক্ষা এবং প্রয়োজন-বুদ্ধিই তার নবীন বিকাশ-পথকে নির্দিষ্ট, সুচিহ্নিত করে থাকে। কিন্তু, জীবন অথবা জীবন-বাসনা কোন-পর্যায়েই স্বয়ম্ভূ নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, তার অভিঘাতকে একই সংগে স্বীকার ও অতিক্রম করেই নবযুগ-বাসনা জাতির জীবনে অঙ্কুরিত হতে পারে। এদিক থেকে বাঙালি জাতির একদা-নির্জীব-হয়ে-পড়া চেতনার 'পরে তুর্কী আক্রমণ ইতিহাসের অভিঘাত রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল; আর সেই অভিঘাতের দুর্যোগকে অতিক্রম করে যাবার উদ্দীপনাতেই বাঙালির জীবন ও সাহিত্যে নবীন উদ্বোধনী শক্তির বিকাশ ঘটে। তুর্কী আক্রমণের প্রতিক্রিয়া-মুখেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি পর্যায় নব-প্রকাশিত হয়েছে, এ'টি নিছক কাক-তালীয় সংযোগ নয়; ইতিহাসের সজীব সক্রিয়তার প্রমাণ।

সাহিত্যিক যুগ-বিভাগ

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্যায় বলতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ বা নিকটবর্তী-কালে সদ্যজাগ্রত জীবন-বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইংগিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই জীবনধারা সেকালের মূল্যবোধকে নিয়ে আজ বাঙালি জীবনের দিকে দিকে নানা আকার-প্রকারে প্রসৃত হয়ে পড়েছে; ফলে সেদিনকার মানদণ্ড এবং অভিধাবুদ্ধি নিয়ে এই মহাবিস্তারের ঐতিহ্যকে পরিমাপ করা আজ অসম্ভব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেই সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক মূল্যায়ন অপেক্ষাকৃত জটিল বলেই এ-পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়ে এসেছে। বর্তমান প্রসংগে আমরাও সেই প্রচেষ্টা পরিহার করব। কারণ, এই পর্যায়ে আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যই আমাদের একমাত্র আলোচ্য।

মধ্যযুগের সাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বভাব সুচিহ্নিত করবার জন্য এই পর্যায়ের সাহিত্যকে দু'টি উপ-পর্যায়ে ভাগ করা অপরিহার্য হয়েছে:—

বাংলা সাহিত্যে মধ্য-যুগের উপপর্যায়

১। বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য পর্যায় (চৈতন্য-পূর্ব যুগ) (আনুমানিক ১২০০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

২। বাংলা সাহিত্যের পর মধ্য পর্যায় (চৈতন্য-প্রভাবিত ও পরবর্তী যুগ)। (১৫০০—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

এই পর্যায় দু'টির অন্তঃস্বভাবে মৌলিক বিভিন্নতা নেই ; পার্থক্য যেটুকু, সে কেবল পরিমাণগত (Quantitative), গুণগত (Qualitative) নয়। প্রথম পর্যায়ে তুর্কী আক্রমণের অভিঘাতকে অতিক্রম করবার প্রয়োজন-বুদ্ধি থেকেই আত্মরক্ষামূলক গুটিকয় স্বাভাবিক বৃত্তি (Instinct) জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ আভাসিত হয়ে উঠ্‌ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে চৈতন্য-জীবনাদর্শের ফলশ্রুতির প্রভাবে সেই বৃত্তি কয়টিই স্বভাবানুকূল স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তি পেয়েছে। তাই এই দুটি স্তর একই ধারার দুটি পরস্পর-সাপেক্ষ (Relative) পৃথক্ অবস্থানমাত্র,—দুটি পৃথক্ পর্যায় নয়,—একই পর্যায়ের দুটি উপপর্যায়। প্রথমটি বহিরঙ্গ পরিবেশের উত্তাপে অঙ্কুরোদ্গমের স্তর, দ্বিতীয়টি স্ব-শক্তিতে মুক্ত ও স্বয়ম্পূর্ণ হয়ে ওঠার পরিণামী উপপর্যায়।

এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত নিদর্শন অনুযায়ী চর্যাপদই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রায় একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। চর্যাপদাবলীর রচনাকাল আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যে। প্রায় একই সময়ে যে সকল সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য এদেশে রচিত হয়েছিল, তার উল্লেখ আগেই করেছি। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারার পক্ষে সেটুকু পূর্বৈতিহ্য মাত্র, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উপকরণ নয় ; অতএব বর্তমান প্রসংগে তা অনুল্লেখ্য। এদের কথা বাদ দিলে চর্যাপদ ছাড়া বাংলা ভাষায় রচিত আর কোন সম্বল থাকে না, যা'র সাহায্যে এই যুগের বাংলা সাহিত্য-স্বভাবকে চিনে নেওয়া চলে। তবু, অন্যান্য সমকালীন সাহিত্য-কৃতির সহায়তায় এ'কালের বাঙালির সাহিত্যের যুগ-স্বভাবকে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য নয়। চর্যার সাহিত্য একান্তরূপে ধর্ম-নির্ভর, আধ্যাত্মিক এবং বিশেষভাবে আত্মগত ভাবানুভূতিপ্রধান (Subjective)। এই যুগের সাহিত্য-কর্মের একদিকে বাঙালি সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ রয়েছে,—অভিজাত-অনভিজাত সংস্কৃত ও লোকভাষার কাব্য রচনায়। অপরপক্ষে সম্প্রদায়গত বিভিন্নতাও কম ছিল না। এই সকল বিভেদ-বিচ্ছেদকে উপেক্ষা করে আলোচ্যকালের বাঙালির সাহিত্য স্বয়ম্পূর্ণতার আত্ম-প্রসাদ নিয়ে স্বতো-সীমাবদ্ধ হয়েছিল। ফলে, এ-যুগের বাংলা অথবা বঙ্গেতর ভাষায় রচিত সাহিত্যে ভাবাকৃতি ও আত্মলীন তন্ময়তার স্বতোবিচ্ছিন্নতার তুলনায় সর্বাত্মক সংগঠন মূলকতার

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ

পরিচয় কম ;—বৈচিত্র্যের তুলনায় সংহতিহীনতাই যেন এ-কালের বাংলা সাহিত্যের যুগ-স্বভাব।

এই সংহতি-বিযুক্ত আত্মলীনতার পথ বেয়েই বাঙালির জীবনে এসেছিল তুর্কী আক্রমণের বিপর্যয়। কেবল আত্মসংগঠনের বলিষ্ঠতা ও বাস্তব (Objective) দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে বাঙালি সেদিন আক্রমণের মুখে একটিও উল্লেখ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি।[৩] ফলে, প্রত্যাশাতীত অভিঘাতের প্রথম পর্যায়ে বাঙালি অভিভূত হয়েছিল ; বাংলার সংস্কৃতি হয়েছিল নির্বাক্,—নিঃস্তব্ধ। কিন্তু. এই অভিভূতিকে অতিক্রম করে বাঙালি সংস্কৃতি আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে শতাব্দীকালের মধ্যেই। সেই প্রচেষ্টার মূল আকাংখা ছিল অভিজাত-অনভিজাত চেতনার সংহতি বিধান ;—একত্র সংবন্ধন। ফলে, বাংলা সাহিত্যও দৃঢ়পিনদ্ধ (Compact), বস্তুনিষ্ঠ (Objective) নবাকৃতির মধ্যে এই নবযুগ-বাসনাকে ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

আদি-মধ্যযুগ

তার পরে এলেন শ্রীচৈতন্যদেব ; আক্রমণাভিঘাতে সদ্য-অঙ্কুরিত জাতির চৈতন্য নূতন মুক্তির পথ খুঁজে পেল। কেবল আত্মরক্ষার জন্য নয়, জীবনের সহজ আকৃতি-বশে মিলন-মূলক এক জীবন-মূল্যবোধকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলল বৃহত্তর সর্বজনীন জীবনভূমিতে।

পরমধ্যযুগ

সবশেষে এল সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের ধাপ। প্রাণ-ধর্মের সহজ নিয়মে চৈতন্য-যুগ-জীবন-বোধ বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে ক্রমশঃ বিকশিত, পূর্ণ-পরিণত হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিপর্যস্ত-বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। এই বিপর্যয় ধারার চরম অবস্থায় জাতীয় জীবন পর্যুদস্ত হতে চলেছিল। সেই দুর্যোগ লগ্নে নিঃসাড় বাঙালির প্রাণচেতনায় নূতন আঘাত হান্‌ল বিজ্ঞানদম্ভী য়ুরোপীয় বণিক্ সভ্যতার অভিযান। বণিকের 'মানদণ্ড' যেদিন 'রাজদণ্ড' হয়ে দেখা দিল, সেদিন বাঙালি শক্তি অনায়াসে জাগ্রত হয়ে ওঠেনি ; বরং মনোজগতেও স্বীকার করে নিতে বসেছিল 'বিজাতীয়তা'র রাজশাসন। কিন্তু ইতিহাস-বিধাতা বাঙালির অবচেতনার মধ্যে সেদিন সংগ্রামের ঝড় তুলেছিলেন ; দীর্ঘ সাধনার শেষে তপঃসিদ্ধ

আধুনিকযুগ

৩। দ্রষ্টব্য—মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালি—ডঃ সুকুমার সেন।

নবীন বাঙালি সংস্কৃতি নবজন্ম লাভ করেছিল 'বিজাতীয়তা'কে শাশ্বত ভারতীয়তার মধ্যে,—বাঙালির মৌল-স্বভাবের মধ্যে স্বী-কৃত (Assimilate) করে নিয়ে। সেই নবীন বাঙালিত্বের, নবভারতীয়তার প্রথম উদ্গাতা বাঙালি-শিল্পী কবি শ্রীমধুসূদন। বাংলা সাহিত্য মধুসূদনের কাল থেকেই অসংশয়িত পদক্ষেপে আধুনিকতার পথে ক্রমাগ্রসর হয়ে চলেছে।

কিন্তু সে কথা পৃথক্ গ্রন্থে আমাদের পরবর্তী পর্যায়ের আলোচ্য ;—আপাততঃ বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা-পূর্ব কালের বিকাশ-পথই আমাদের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের এক এবং অনন্য মহাপথ।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ

একাধিকবার বলেছি,—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যের সূচনা। তারপরে মোটামুটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ, অর্থাৎ তুর্কী-আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বিস্তৃত।

আদিযুগ ও চর্যাপদ

আর, চর্যাপদই আদিযুগের বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিদর্শন। এই একটিমাত্র কাব্যের 'পরে নির্ভর করেই এই যুগের সাহিত্য-স্বভাব নির্ণয়ের নানারূপ প্রচেষ্টা হয়ে এসেছে। অবশ্য, একই সময়ে রচিত বঙ্গেতর ভাষার সাহিত্যিক প্রমাণও এ-সকল প্রচেষ্টার সহায়তা করেছে যথেষ্ট। তবু, একক গ্রন্থ হিসেবে চর্যা-সাহিত্যের মধ্যেও যুগ-স্বভাবের সমৃদ্ধি রয়েছে অ-পূর্ব পরিমাণে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের এই যুগ-স্বভাবকে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ' নামে অভিহিত করেছেন; এই যুগ সীমায় লক্ষ্য করেছেন ধর্ম-বিরোধে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ।[১] সন্দেহ নেই, আলোচ্য

'হিন্দু বৌদ্ধ যুগ'? ও ডঃ দীনেশচন্দ্র

কালের বাঙালির সাহিত্যমাত্রই ছিল প্রধানতঃ ধর্ম-নির্ভর। ধর্মেতর বিষয়ে রচনার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেলেও তার প্রাধান্য উল্লেখ্য নয়। আর, ধর্ম-প্রধান আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্ম-বিভিন্নতার পরিচয়ও সুপ্রচুর। তবু, আগেই বলেছি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা দেশে ধর্ম-বিভিন্নতা ধর্ম-বিরোধকে কখনোই অপরিহার্য করে তোলেনি। প্রাচীন বাংলার ধর্মক্ষেত্রে সহনশীলতা এবং সমতাবুদ্ধির ঐতিহাসিক পরিচয় ইতঃপূর্বেই উদ্ধার করেছি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়। বাঙালির সাহিত্যের জন্মলগ্নেও বিভিন্ন ধর্মচেতনার এই সহনশীলতার প্রভাব ডঃ সুশীল কুমার দে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অতএব, বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব-মূলে বিরোধমূলক প্রতিযোগিতার কল্পনা সমুচিত বলে মনে হয় না। বর্তমান গ্রন্থের সূচনাতেই আমরাও অনুভব

১। দ্রষ্টব্য—বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য।

করেছি,—সমাজ-অভিমুখী সমন্বয় ধর্মের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যের মৌল স্বভাব চিহ্নিত ; সংস্কৃত সাহিত্যের মত শ্রেণি-বৈষম্য অথবা ইংরেজি সাহিত্যের মত সংঘাত-মূলক প্রতিযোগিতার পূর্ব-কল্পনাকে এই সাহিত্য আশ্রয় করেনি কোন অবস্থাতেই। বাঙালি-স্বভাবের এই স্বতন্ত্র-ঐতিহ্যই বাংলা সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণকে চির ভাস্বর করেছে ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এ-কথা কখনোই ভোলবার নয়।

ধর্ম-বিরোধ নয়,—ধর্ম-বৈচিত্র্য আদিযুগ সাহিত্যের প্রাণ

তবু, ধর্ম-বিরোধ না হলেও, ধর্ম-বৈচিত্র্যই যে আদিযুগের বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির সাহিত্যেরও প্রাণকেন্দ্র ছিল, এ-কথা মান্‌তেই হবে। সাহিত্য-মাত্রই জীবন-সম্ভব। আর মানবের জীবন-স্বভাব ধর্ম-সমাজ, অর্থ-রাজনীতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ক মূল্যবোধের সমবেত ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাসের আলোচনায় দেখা গেছে, ধর্মাদি মানবিক বৃত্তির সব কয়টি আদর্শই একসংগে একই জীবনে কখনো প্রধান হয়ে ওঠেনি বড় একটা। দেশ-কাল-পাত্রের বিচিত্র জীবন-বিক্রিয়ার ফলে কোন পর্যায়ে কোন জনসমষ্টির মধ্যে ধর্মগত মূল্যবোধগুলি প্রধান হয়ে ওঠে ; আবার কখনো প্রাধান্যের সেই আসন গ্রহণ করে সমাজ-অর্থ-রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক মূল্য-চেতনা। সাধারণতঃ সমাজ ও সভ্যতার প্রাচীনতম পর্যায় ধর্মগত মূল্যমানকেই বিশেষ ভাবে আশ্রয় করে থাকে। যে-যুগে সভ্য মানুষের শক্তি এবং সম্ভাবনা পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠেনি, সমাজ-জীবনের সেই শৈশবে মানুষ লোকোত্তর দৈবী আদর্শকে সম্মুখে রেখে জীবনের পথে অগ্রসর হতে চেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ-স্বভাব সম্বন্ধেও ধর্মাভিমুখিতার এই আদর্শ সমপরিমাণে প্রযোজ্য।

প্রাচীন বাংলায় ধর্ম-বৈচিত্র্য

ইতিহাসের আদিপর্বে বাংলা দেশে তিনটি প্রধান আর্য ধর্মের যুগপৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। (১) প্রাচীনতম আর্যধর্ম হিসেবে জৈনধর্মই হয়ত এদেশে প্রথম প্রবেশ করেছিল ;—স্বয়ং মহাবীর পশ্চিমবঙ্গে কিছুকাল বিচরণ করেছিলেন বলে জৈনগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। তারপরে (২) বৌদ্ধ এবং সর্বশেষে হয়ত এদেশে এসেছিল (৩) আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বঙ্গভূমিতে আর্য-প্রভাবের প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর্য ধর্মের প্রথম

প্রবেশও একই যুগে ঘটেছিল নিশ্চয়ই। তবে গুপ্তযুগের আগে বাংলায় আর্য ইতিহাস বিস্তারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যথেষ্ট নয়। ঐ সময় থেকেই বৈদিক-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়েছে বাঙালি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে; কখনো এক ধর্ম অপরগুলির চেয়ে প্রবলতর হয়েছে; অন্যান্য সময়ে প্রবল হয়েছে আরো এক-একটি।

একই সংগে আর্য-পূর্ব বাংলার লোকধর্মের প্রভাবও কিছু কিছু যে ছিল, তাতে সংশয় নেই। বাংলার আর্যেতর যুগের ধর্মসাধনার নিশ্চিত ইতিহাস আজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব-প্রায়। তবু, সহস্রাব্দীর সীমা পেরিয়েও ভারতীয় আর্য প্রভাবকে যাঁরা প্রতিহত করে রেখেছিলেন, সেই আর্য-পূর্ব বাঙালিদের ধর্ম-সংস্কারের স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা চলে না। কালে কালে উন্নততর আর্য প্রভাবের আওতায় তারা বিমিশ্রতা লাভ করেছে;—কখনো বা আর্যধর্মের অভ্যন্তরে নবরূপে সাংগীভূত হয়ে গেছে, কখনো লোকাচার—স্ত্রী-আচার ইত্যাদিরূপে আর্য-ধর্মাচরণের পাশাপাশি চলে এসেছে সমান্তরাল ভাবে, কখনো বা হয়েছে একান্ত লুপ্ত। কিন্তু এই সকল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াবলীর শেষেও নির্ভুল ভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, বাংলার আর্যেতর ধর্মসংস্কার ছিল স্ত্রী-দেবতা প্রধান; তান্ত্রিক শক্তিবাদ বাঙালির সেই আদিম ধর্ম-স্বভাবের ঐতিহ্যাবহ বলে কোথাও কোথাও অনুমিত হয়েছে। বলা হয়েছে, বাঙালির এই মৌল ধর্ম-প্রবণতারই প্রভাবে এদেশে বিভিন্ন বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচরণ শক্তিবাদ-সমাশ্রিত হয়ে পড়েছে।[২]

বাংলার লোক ধর্ম

কিন্তু অত সব ধর্ম সম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাসের সমান্তরাল প্রবহমানতা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক বলেছেন,—"There was no sectarian jealousy or exclusiveness."।[৩] এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন রাজা অন্যান্য ধর্মমতের পোষকতা করেছেন,—এমন একাধিক প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়েছে। ত'ছাড়া আন্তর্ধর্মীয় বিবাহাদির প্রমাণও রয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রসংগে আমাদের প্রধান স্মরণীয় হচ্ছে এই ধর্মীয় উদারতা-মাত্রই নয়; বিভিন্ন

প্রাচীন বাংলায় ধর্মীয় প্রতিযোগিতার স্বরূপ সমন্বয়মূলক

২। দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol. I Ch. XIII। ৩। ঐ—ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি

সম্প্রদায়ের ঈর্ষাহীনতা ও সেই সংগে পরস্পর সাপেক্ষতা। আলোচ্য যুগে কোন ধর্মই নিজ সম্প্রদায় সীমায় একান্তবদ্ধ (Exclusive) হয়ে ছিল না। পরস্পরের মধ্যে সংযোগ-সান্নিধ্য ঘটেছিল, একে-অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিল। এক ধর্মের থেকে আর এক ধর্ম প্রচুর উপাদান যেমন গ্রহণ করেছে, সেই সংগে আপন স্বাতন্ত্র্যকেও অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করেছে। ফলে এই ধর্মসমষ্টির মধ্যে বিরোধমূলক নয়,—আত্মরক্ষামূলক প্রতিযোগিতা চলেছে। প্রতিযোগিতার বিরোধমূলক রূপ বিপক্ষকে নির্মূল করে আত্মপ্রাধান্য অর্জন করে; এ'টি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য-প্রধান উগ্ররূপ। অন্যবিধ প্রতিযোগিতা সমন্বয়মূলক,—চতুর্দিকের অজস্র উপাদান থেকে জীবন-রস আহরণ করে নিজেকে পুষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠ করে তোলাই এই ধরণের প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের জীবন-স্বভাবে এই সমন্বয়-ধর্মী প্রাণ-লক্ষণকেই বারে বারে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর বাঙালির ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও, ঐতিহাসিক লক্ষ্য করেছেন,—"মোটামুটি খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্য ধর্মের প্রবাহ প্রবলতর হওয়ার সময় হইতেই সদ্যোক্ত সমন্বয় ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে; মধ্য যুগে এই সমন্বয় সাধনা সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আজ তা চলিতেছে লোকচক্ষুর অগোচরে।"[৪]

সপ্তম শতাব্দীর পরবর্তী কোন কাল থেকে বাংলা দেশে জৈন ধর্মের বিস্তার ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পরে বিলুপ্তপ্রায় হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য যুগের (দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী কালের) বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ধর্মাচরণের স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর সৌহৃদ্য-সম্পন্ন একাধিক ধারা একই কালে প্রচলিত হয়েছিল।

'হিন্দু বৌদ্ধ যুগ' অভিধার সার্থকতা

সেন রাজ-বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আপেক্ষিক প্রাধান্য লাভ করে থাকলেও লোক-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, এমন কি সমুন্নত সমাজেও নানাপ্রকার বৌদ্ধ সাধনার ধারা ক্ষীণ হয় নি। এই সকল সমকাল-প্রচলিত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আত্মরক্ষামূলক বিচিত্রমুখী প্রয়াসকে আশ্রয় করেই আদি যুগের বাংলা সাহিত্য মুক্তি ও বিকাশ লাভ করেছিল। এই ঐতিহাসিক অর্থেই ডঃ দীনেশচন্দ্র-কৃত আলোচ্য যুগ-নামাঙ্কন সার্থক।

৪। বাঙালির ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

আদিযুগের ধর্মবৈচিত্র্য-প্রধান এই সাহিত্য-প্রবাহের প্রায় একমাত্র পরিচয় হিসেবে কেবল চর্যাপদই যে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে, একাধিকবার সে কথা বলেছি। কিন্তু অন্যান্য ধর্মনির্ভর রচনারও ঐতিহাসিক প্রমাণ-নির্ভর উল্লেখ কিংবা আংশিক পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া গেছে। তা'ছাড়া ধর্মেতর বিষয়েও এই সময়কার রচনার কিছু কিছু প্রমাণ বা অনুমান-সহ নিদর্শন যে পাওয়া গেছে, সে কথাও আগে বলেছি। সব কিছু মিলিয়ে আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের পূর্ণায়ত পরিচয়টিকে নিম্নরূপে চিত্রিত করা চলে :—

আদিযুগের বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়

(আনুমানিক ৯০০—১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)

ধর্ম-প্রধান সাহিত্য — ধর্মেতর বিষয়ে রচিত সাহিত্য

বৌদ্ধধর্ম	'ধর্ম'-সম্প্রদায়	নাথধর্ম	ব্রাহ্মণ্য ধর্ম
চর্যাপদ	শূন্যপুরাণ-এর কাঠামো (?)	ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয় ইত্যাদি কাব্যের প্রাচীনতম রূপ (?)	প্রাকৃত পৈঙ্গল ও মানসোল্লাসে প্রাপ্ত রচনাংশ

শেক শুভোদয়ায় প্রাপ্ত একটি পদ (?) (প্রেমগীতি)	রূপকথা (?)	ডাক ও খনার বচন (?)

বারে বারে বলেছি আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম নিদর্শন 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' ;—এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাংলা পুথিগুলির মধ্যে এটি প্রাচীনতমও বটে। এর আগে বলা হয়েছে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে চর্যাপদর পুথি আবিষ্কার করেন : ঐ একই সংগে যুক্ত ছিল সরহ এবং কাহ্নপাদের রচিত দুটি দোহাকোষ, আর ছিল ডাকার্ণব নামক দোহাবলী।

চর্যাপদ ও অনুরূপ রচনাবলী

(?) চিহ্নিত রচনা কয়টির প্রথম অভ্যুদয়-কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য রয়েছে।

শাস্ত্রীমহাশয় সব ক'খানি পুথির ভাষাকেই বাংলা মনে করে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়ে এদের সব কয়টিকেই একত্র মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দোহাকোষ দু'টি এবং ডাকার্ণবের ভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশ; আর কেবল চর্যাপদেই বাংলা ভাষার নিঃসংশয় নিদর্শন রয়েছে।

চর্যাপদ-পরিচয়

চর্যাপদ গীতের আকারে লেখা কিছু সংখ্যক পদের সমষ্টি। প্রত্যেক পদের সূচনায় রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। এর থেকে সহজেই বোঝা যায়,—মূলতঃ গান হিসেবেই পদগুলো রচিত হয়েছিল। নানা সূত্র থেকে হিসেব করে দেখা গেছে চর্যাপদের পুথিতে সর্বশুদ্ধ ৫০টি পদ থাকা উচিত ছিল; কিন্তু তার বদলে আছে ৪৬½টি। চর্যাপদের মূল পুথিটি খণ্ডিত বলে তিনটি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি পদাংশ লুপ্ত। তা'ছাড়া আলোচ্য পুথিতে একটি পদসংখ্যা নির্দিষ্ট নেই; ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগ্‌চি চর্যাপদ'র একটি তিব্বতী অনুবাদ গ্রন্থে এই পদ-সংখ্যাটির পরিচয় আবিষ্কার করেন। যাই হোক্, চর্যার এই পদ-সমষ্টি একই কবির রচনা নয়; বিভিন্ন প্রকারের ২৪টি পৃথক্ নামযুক্ত ভণিতা পদগুলোর মধ্যে পাওয়া গেছে। তার সবক্ষেত্রেই পৃথক্ পৃথক্ নাম পৃথক্ ব্যক্তির অস্তিত্ব সূচনা করে না; একই ব্যক্তির পরিবর্তে একাধিক নামের ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে মনে করেছেন,—শান্তিদেব, ভুসুকু এবং রাউতু একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম ছাড়া কিছু নয়; আবার কারো কারো মতে লুইপাদ ও মীননাথ ছিলেন অভিন্ন ব্যক্তি।[৫]

চর্যার ভাষা

একেবারে প্রথম পর্যায়ে চর্যার কাব্য-বিষয় এবং কবি-পরিচয় নির্ণয়ে নানা রকম সংশয় দেখা দিয়েছিল। সদ্য-অঙ্কুরিত বাংলা ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন ধারণ করে থাক্‌লেও আমাদের পরিচিত বাংলা ভাষার সংগে চর্যার ভাষার পার্থক্য ছিল সুদূর প্রসারী। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের অর্থ-নিষ্পত্তির জন্য প্রধান ভাবে আশ্রয় নিতে হয়েছিল সংস্কৃত টীকার। যে-কোন একটি উদাহরণ থেকেই চর্যার এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হতে পারবে,—

৫। দ্রষ্টব্য বাঙালা সাহিত্য (১ম খণ্ড)—মণীন্দ্রমোহন বসু এবং বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ডঃ সুকুমার সেন।

সঅ-সম্বেঅণ-সরুঅ-বিআরেতেঁ অলক্‌খলক্‌খন ণ জাই
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঙ্গ ॥
কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা
বাল ভিণ একু বাকু ন ভুলহ রাজপথ কণ্টারা ॥
মাআমোহা সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা
আগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥
সুনাপান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে
এষা অট-মহাসিদ্ধি সিঝএ উজুবাট জাঅন্তে ॥
বাম দাহিন দো বাটা ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ
ঘাট ন গুমা খড়তডি নো হোই আখি বুজি বাট জাইউ ॥

—১৫ নং চর্যা

—স্বরূপ বিচারে স্বীয় সংবেদন অলক্ষ্য,—তার লক্ষণ জানা যায় না। যারাই ঋজুপথে গিয়েছে, তারাই ফিরে আসে নি! ওরে মূঢ়, সংসারকেই সোজা পথ মনে করে কূলেই ভুলে থেকো না;—বালকের মত এ'টা ও'টায় ভুল করে সোনায়-বাঁধা রাজপথ মনে করো না। মায়া-মোহ-সমুদ্রের বুঝে ঠাঁই পাচ্ছ না,—সামনে নৌকা-ভেলা কিছুই না যদি দেখ্‌তে পাও ভুল করে 'নাথ'কে (গুরুকে) কেন জিজ্ঞাসা করো না! শূন্য প্রান্তরে যেতে ভুল করো না,—এই সোজা পথে যেতে পারলে অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ করা চলে। ডান-বাঁয়ের দু'টি পথই ছেড়ে (সোজা পথে) শান্তি কেলি করে ফিরছে, এ-পথে ঘাট-গুল্ম-লতা কিছুই নেই; চোখ বুঁজে সোজা চলে যাও।—

চর্যাপদাবলীর এই দুর্বোধ্য ভাষাভঙ্গির জন্যই তা'র 'বাংলাত্ব' সম্বন্ধে আধুনিক মনে সংশয় জাগে। এই উপলক্ষ্যে পূর্বভারতীয় অন্যান্য ভাষাভাষী একাধিক জনগোষ্ঠী চর্যাপদের উত্তরাধিকার দাবি করেছেন; এদের মধ্যে ওড়িয়া আর মৈথিল ভাষিগণ প্রধান। অবশ্য, এর কারণও রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দেখা গেছে, মাগধী অথবা জৈন অর্ধমাগধী অপভ্রংশের তুলনায় চর্যাপদের ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের পরিমাণ অনেক বেশি; অথচ মাগধী ইত্যাদি পূর্বী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ-বিষয়ে

মিঃসংশয়ে বাংলা

ডঃ সুনীতি কুমারের সিদ্ধান্ত পূর্বে আলোচনা করেছি।[৬] তাঁর মতে সংস্কৃত যেমন অভিজাত ভারতের, তেমনি শৌরসেনী প্রাকৃত ছিল লোক-ভারতের সাহিত্য-সাধনার সাধারণ মাধ্যম। কারণ যাই থাক্, শৌরসেনী প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ যে ভারতের সকল ভাষাভাষী লোক-সাহিত্যিকদের রচনায় ব্যাপক স্থান অধিকার করেছিল, তার প্রমাণ আছে। অতএব, বাংলাদেশের লোক-সাহিত্যের ভাষায় শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব পড়েছিল, এ'কথা মনে করতে বাধা নেই। বাংলাভাষার নব-সৃজ্যমানতার যুগে চর্যাপদাবলীতেও মাগধীর সংগে শৌরসেনী অপভ্রংশেরও প্রভাব-বাহুল্য থাকবে, তা'তে বিস্মিত হবার কারণ নেই। তবে চর্যার ভাষায় ডঃ সুনীতি কুমার এমন কিছু সংখ্যক শব্দ এবং ব্যাকরণগত উপাদানের অবস্থান লক্ষ্য করেছেন, যে-গুলো কেবল বাংলা ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঐ সকল শব্দ ও অন্যান্য ব্যাকরণগত উপাদানের প্রমাণ-সহায়তায় ডঃ চট্টোপাধ্যায় নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে চর্যাপদ বাংলাভাষারই আদিস্মৃতী,—ওড়িয়া, মৈথিল কিংবা ভোজপুরীর নয়।[৭]

চর্যা। 'বঙ্গালি' না 'রাঢ়ী'

চর্যাপদ'র ভাষা বাংলার কোন্ আঞ্চলিক ভাষার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, সে-বিষয়েও পণ্ডিতমহলে বিতর্ক রয়েছে। এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন; কারণ পূর্বেই দেখেছি, চর্যার বাংলা-ভাষা-স্বভাবের পরিচয়কে পর্যন্ত গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। এরূপ অবস্থায় এই ভাষায় কোন আঞ্চলিক উপভাষার নির্দিষ্ট লক্ষণ অঙ্কুরিত যে হতে পারে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু, ডঃ সুনীতিকুমার ঐ স্বল্প উপদানেরই ভাষাতাত্ত্বিক খুঁটিনাটি বিচার করে চর্যাকে পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা-নির্ভর বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু চর্যাকে বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের সম্পদ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে ভুসুকুপাদ বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। তা' ছাড়া, চর্যাপদে 'পঁউআ খাল' এর উল্লেখ আছে:—"বাজণাবপাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ" (৪৯নং চর্যা)। অধ্যাপক বসু মনে করেছেন আধুনিক মহানদী পদ্মারই পূর্বরূপ এই পঁউআ খাল। ভুসুকু একাধিক পদে নিজেকে 'বঙ্গালী' বলেছেন; বসু

৬। দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়। ৭। দ্রষ্টব্য ODBL এবং History of Bengal Vol. I. Ch. XII।

মহাশয়ের মতে ঐ শব্দ ভুসুকুর 'বাঙাল'-ত্বেরই পরিচায়ক। এ-সব বিতর্কের[৮] সদুত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন।[৮] তবে, চর্যা 'বঙ্গালী' অথবা 'রাঢ়ী' যা-ই হোক্, বাংলা-যে, তা'তে সংশয় নেই।

এবার আসে চর্যাপদ'র ধর্মচেতনার কথা। আগেই বলেছি, প্রাচীন বাংলার ধর্ম-নির্ভর সাহিত্যের মধ্যে চর্যা অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আর, চর্যাপদাবলী বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গুহ্য সাধন-সংকেতকেই আভাসিত করে থাকে লোক-জীবনাশ্রয়ী রূপকায়নের মাধ্যমে। সহজিয়া ধর্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। বর্তমান প্রসংগে সেই বিতর্কের বিচার অপরিহার্য নয়। সাহিত্যের স্বতন্ত্র স্বভাব গঠিত হয়ে থাকে স্রষ্টার বিশেষ মূল্যবোধের স্বকীয়তাকে আশ্রয় করে। এ-দিক থেকে চর্যাপদাবলীর সাহিত্য-স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য পদকর্তাদের ধর্ম-নির্ভর জীবন-মূল্যবোধের দ্বারাই চিহ্নিত হয়েছে। সেই মৌল-চেতনার পরিচায়নের জন্য বৌদ্ধ ধর্ম-কথার প্রাসংগিক অংশটুকুই এই উপলক্ষ্যে আলোচিত হবে।

চর্যার ধর্মচেতনা

বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি রহস্যময় সাধন পদ্ধতি মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-সাধনার বিবর্তিত রূপ বলে মনে করা যেতে পারে। হীনযান সাধনপন্থা থেকে মহাযানীরা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসেন। মোটামুটি ভাবে 'অর্হৎ'-ত্ব অর্জনই হীনযানী সাধনার চরম উদ্দেশ্য ছিল; আর 'অর্হৎ-ত্ব' অর্থে বোঝায় বুদ্ধ নির্দেশিত-পথে নির্বাণ-সিদ্ধি। আবার, নির্বাণ লাভের উপায় ও স্বভাব হচ্ছে ধ্যান এবং অন্যান্য নৈতিক আচার আচরণের নিষ্ঠাপূর্ণ চর্যার মাধ্যমে 'অস্তিত্ব'কে 'অনস্তিত্বে' বিলোপ করার শূন্যতাময় সাধনা।

হীনযান ও মহাযান

অপরপক্ষে মহাযানী সাধন পন্থার পরিণামী উদ্দেশ্য নির্বাণ নয়,—বুদ্ধত্ব-লাভ। মহাযানী দর্শন প্রত্যেক সত্তার মধ্যেই বুদ্ধত্ব লাভের সুপ্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছে; বোধিসত্ত্ব-ত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে মহাজ্ঞান আয়ত্ত করেই পরিণামে বুদ্ধত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। হীনযানীদের দৃষ্টিতে নির্বাণ একটি অনস্তিত্ব মূলক (Negative) শূন্যতাময় অবস্থা; অপরপক্ষে মহাযানী দর্শনে বুদ্ধত্বের

মহাযানী পন্থার পরিণামী উদ্দেশ্য

৮। বিতর্কের আলোচনায় দ্রষ্টব্য—বাঙালা সাহিত্য (১ম খণ্ড)—মণীন্দ্রমোহন বসু।

পরিকল্পনা ইতিবাচক (Positive)। বুদ্ধ-ত্ব অর্থ বোধিচিত্তের অধিকার লাভ; আর, মহাযানীদের অনুভব অনুযায়ী বোধিচিত্ত হচ্ছে শূন্যতা এবং করুণার একটি সমন্বিত যৌথরূপ। মহাযানী ধর্মমতের ব্যাপক আলোচনা আমাদের কাম্য নয়; কিন্তু ওপরের পরিচিতির সূত্র ধরে অনুমান করা যেতে পারে যে, হীনযানীদের বস্তুনিষ্ঠ (objective) নৈষ্ঠিকতা এবং সংস্কারগত (conventional) আচার-পরায়ণতার গণ্ডিকে অস্বীকার করে মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় ধর্মকে ব্যক্তিগত সাধনা, উপলব্ধি এবং সিদ্ধির সাপেক্ষ করে তুলেছিলেন। নির্বাণ-এর শূন্যবাদী ধর্মাদর্শ মহাযান পন্থার আশ্রয়ে আত্মলীন (Subjective) বর্ণাঢ্যতার সম্ভাবনা-সম্মুখীন হয়েছিল।

গোষ্ঠিসাপেক্ষ নীতি-সমাচরণের পরিবর্তে মহাযান ধর্মের এই ব্যক্তি-সাপেক্ষতা ও অ-নৈষ্ঠিকতার আদর্শ যুগপৎ হীনযানের মৌল বৌদ্ধ-নিয়মতন্ত্রকে শিথিল করেছিল। সংগে সংগে সমকাল-প্রচলিত অ-বৌদ্ধ ধর্মের নানা ধারা এসে তা'তে যুক্ত হতে লাগ্‌ল। ব্রাহ্মণ্য এবং অন্যান্য ধর্মের আচার-আচরণ, পূজা, মন্ত্র-তন্ত্রাদির ক্রম-প্রবেশের ফলে মহাযানী ধর্মপন্থা দিনে দিনে বিবর্তিত,—বিশ্লিষ্ট হতে লাগ্‌ল। ফলে, ক্রমশঃ জেগে উঠ্‌ল মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ইত্যাদি নানা যান-পন্থা। বজ্রযানীরা মনে করেন নির্বাণের সত্তা-মাত্রই তিনটি অবস্থায় স্থিত হতে পারে।

মহাযানের বিবর্তন ও বজ্রযান

(১) শূন্য, (২) বিজ্ঞান, (৩) মহাসুখ। সর্বশূন্যতার মহাজ্ঞানই এঁদের মতে নির্বাণ;—এই নির্বিকল্প জ্ঞানকে বজ্রযানীরা বলেছেন নিরাত্মা। নিরাত্মা হচ্ছেন 'দেবী' অর্থাৎ নারী; আর, বোধিচিত্ত 'দেব',—পুরুষ। বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মায় লগ্ন হয়ে নিরাত্মাতেই বিলীন হন, তখনই হয় মহাসুখ-এর উদ্ভব। নর-নারীর দেহগত মিলনের মাধ্যমে চিত্তের পরমানন্দ লাভের যে সম্ভাবনা ঘটে, বজ্রযানী সাধকেরা সেই ঐকান্তিক উপলব্ধিময় অবস্থাকে বলেছেন বোধিচিত্ত; এঁদের মতে বোধিচিত্তই হচ্ছে বজ্র; কারণ যোগ সাধনার ফলে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়, আর বোধিচিত্ত হয়ে ওঠে বজ্র-তুল্য কঠিন। বোধিচিত্তের এই বজ্ররূপ সাধনের পদ্ধতিই বজ্রযান।

আবার বজ্রযান-এর পরবর্তী পর্যায়ই হচ্ছে সহজযান। যোগ সাধনার প্রয়োজনে বজ্রযানী ব্যবস্থায় ছিল মন্ত্রতন্ত্র, বিবিধ দেব-দেবীর মূর্তি-বিন্যাস, মুদ্রা, পূজা, আচার-অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি। সহজযানীরা কিন্তু এ-সবের কিছুতেই আস্থা পোষণ করতেন না। গুরু-প্রদর্শিত পথে দেহসাধনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভের আকাংক্ষাই ছিল এঁদের মধ্যে প্রবল। চর্যাপদাবলীতে এই ব্যক্তিগত উপলব্ধিময় আত্মলীন সিদ্ধির আনন্দই সাহিত্য-রূপ লাভ করেছে।

সহজযান

চর্যার ধর্মচেতনা অনুভূতিপ্রধান ছিল বলেই, চর্যাকারদের ধর্মদৃষ্টি ছিল অন্য-বিমুখ, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। আগেই বলেছি, আলোচ্য যুগের বাংলায় বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয়ে আত্মব্যাপ্তি এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রবল সচেতনা যুগপৎ প্রচলিত হয়েছিল। ফলে, একদিকে চর্যার ধর্মমতের মধ্যে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক দেহবাদের ধারা যেমন অনেকটা পরিমাণে বিকশিত হয়ে উঠছিল, তেমনি আচার-অনুষ্ঠান প্রধান বেদ-ধর্মের অসারতার কথাও উল্লিখিত হয়েছে বারে বারে। চর্যাযুগের ধর্ম-সমন্বয়ের পরিচয় দিয়ে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন,—বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সহজ-সাধনার ক্ষেত্রে সাধারণ সাদৃশ্যের ফলে "বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গুহ্য সাধন পন্থার সংগে শক্তি বা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মোক্ষ ও গুহ্য সাধন-পন্থার পার্থক্য আর বিশেষ কিছু রহিল না, দুয়ের মিলনও খুব সহজ হইয়া উঠিল। এই মিলন পাল-পর্বের শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল।"[৯] চর্যার মিলন মূলক এই ধর্ম-স্বভাবের পরিচয় আলোচ্য যুগের বাংলা সাহিত্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। নাথ ধর্মের আদি গুরু রূপে কথিত মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ আসলে চর্যার লুইপাদ ছাড়া আর কেউ নন, ঐতিহাসিকেরা এমন অনুমান করেছেন। আবার মৎস্যেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্য কৌলমার্গীদের নিকটও গুরু রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।[১০]

চর্যার ধর্মচেতনায় সমন্বয়ের আদর্শ

কিন্তু আলোচ্যযুগের বাঙালি ধর্মচেতনার সমন্বয়-প্রধান এই মৌল স্বভাব, যে-কোন কারণেই হোক্, আমাদের অনায়াস-গোচর হয় নি। অপরপক্ষে

৯। বাঙালির ইতিহাস। ১০। দ্রষ্টব্য—ঐ।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অঙ্গীভূত পরধর্ম-বিরূপতার প্রাসঙ্গিক লক্ষণ সমূহকেই যেন অতিমূল্যে উদ্ভাসিত করে তোলা হয়েছে। চর্যাসাহিত্যেও দেখি, অনুভব বেদ্য ধর্ম-চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সিদ্ধাচার্যগণ আচার-আচরণীয়তা-সর্বস্ব বেদ-ধর্মের দুর্বলতার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। এই সকল তুলনামূলক প্রসংগ অবতারণার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্ম-প্রতিষ্ঠা; পর-নির্যাতন বা প্রত্যক্ষ পরমত-বিদ্বেষ নয়। যেমন, আচার্য লুইপাদ বলেছেন :—

চর্যায় তথাকথিত পরধর্ম বিদ্বেষ

"জাহের বান চিহ্নরূব ণ জানী
সো কইসে আগম বেএ বখানী॥
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা॥
লুই ভণই ভাইব কীষ্
জা লই অচ্ছম তাহের উহণ দিস্॥—২২নং চর্যা—

—যা'র বর্ণ-চিহ্ন-রূপ কিছুই জানা যায় না,—বেদ-আগম দ্বারা তা'র ব্যাখ্যা হবে কি করে? জলে প্রতিবিম্বিত-স্বরূপ চন্দ্রের মত এ মিছেও নয়, সত্যও নয়;—কী বলে আমি এ'র পরিচয় দেব? লুইপাদ বল্ছেন, কী-ই বা আর ভাব্ব,—যা' নিয়ে আছি, নিজেই তা'র দিশে জানি না।—

স্পষ্টই দেখ্ছি, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির অনির্বাচ্যতাকে প্রকাশ করতেই লুইপাদ এই পদটিতে তুলনার আশ্রয় নিয়েছেন। অর্থাৎ, অনুভূতি সর্বস্ব যে আনন্দে তিনি নিমগ্ন হয়ে আছেন, নিজেই তা'কে বুঝে উঠ্তে পারছেন না! বেদ-আগমাদি আচার-প্রধান ধর্মশাস্ত্রে এমন মন্ময় উপলব্ধির ব্যাখ্যান সম্ভব হবে কী করে? আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই লুইপাদ এখানে পর-ধর্মের তুলনা-চিত্র ব্যবহার করেছেন; স্পষ্ট কোন সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি এতে উগ্র হয়ে নেই-যে, নিঃসংশয়ে তা বলা চলে। চর্যার পরমত-বিদ্বেষের প্রমাণ হিসেবে আরো একাধিক পদ বা পদাংশের উল্লেখ করা হয়। তা'র একটি হচ্ছে,—

"নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাই সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥—১০নং চর্যা।

ঐ 'ব্রাহ্মণ-নাড়িয়া' অর্থাৎ নেড়ে কথাটি সম্বন্ধেই যত আপত্তি। মনে করা হয়, এ'টি ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সিদ্ধাচার্যগণের আক্রোশ ও বক্রোক্তির পরিচায়ক। কিন্তু কাব্য-ভাব,—বিশেষ করে চর্যার মত উপলব্ধিমূলক কবিতাবলীর ভাব একান্তরূপে একক শব্দাশ্রয়ী নয়। পরধর্মাবলম্বীর প্রতি বিষোদ্গারের চেয়ে কাহ্নপাদের এই পদটিতেও আন্তরসাধনা এবং সিদ্ধির আকাংক্ষাই ব্যাকুলভাবে ব্যক্ত হয়েছে;—পদের পরবর্তী অংশ অনুধাবন করলে এ'কথা বুঝ্‌তে কষ্ট হয় না। চর্যাপদে পরমতের সমালোচনার দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে সিদ্ধাচার্যরা করেছেন, তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-পথে তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল আত্মসংরক্ষণ ও আত্মব্যাপ্তিমূলক; কোন অবস্থাতেই পরঘাতী নয়।

চর্যাপদ'র মৌল ধর্ম-স্বভাব subjective

চর্যাপদ এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মবিষয়ক অন্যান্য কাব্য-কবিতার মৌল স্বভাব নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনুভব করেছেন যে ঐ সকল কাব্যের কবিগণ ধর্মের মন্ময় উপদান (Subjective side of religion)-এর প্রতিই জোর দিয়েছিলেন বেশি। প্রসংগক্রমে ডঃ দাশগুপ্ত ঔপনিষদিক ধর্মচেতনার সম্পূর্ণ আত্মলীন মন্ময় স্বভাবের উল্লেখ করেছেন; আবার ঐ একই স্বভাবকে তিনি লক্ষ্য করেছেন ভারতীয় যোগসাধকদের ধর্মদৃষ্টিতেও। চর্যাদি প্রাচীন বাংলার ধর্মপ্রধান কাব্যে এই যোগ-প্রভাবিত মন্ময়তার স্বভাবই অনুস্যূত হয়েছে বলে ডঃ দাশগুপ্তের ধারণা।[১১] তথ্য-প্রমাণ-নির্ভর এই সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে বলা চলে,—উপনিষদ্ ও চর্যাপদাবলীর ধর্ম ও দার্শনিক চেতনায় পরিমাণগত পার্থক্য (Quantitative difference) দূরপ্রসারী হ'লেও এদের মৌল-স্বভাব ছিল এক ও অভিন্ন। আর কেবল এই Subjective ধর্মচেতনা তথা ideological subjectivism-এর জোরেই উপনিষদের মতই চর্যাপদাবলীও ধর্মশাস্ত্র হয়েও হয়েছে সাহিত্য;—শাস্ত্রের চেয়ে কম পরিমাণে 'সাহিত্য' নয়। আবার চর্যার এই মন্ময় সাহিত্যিক স্বভাবই তার সংঘাতমূলক পরধর্মবিদ্বেষ প্রচেষ্টার পরিপন্থী হয়েছে।

১১। দ্রষ্টব্য:—Obscure Religious Cults of Bengal.

ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনগত মৌল পার্থক্যের সম্বন্ধে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আস্বাদন-পদ্ধতি সদা-সচেতন ছিল না। তাই নিছক ভক্তি-প্রণোদিত ধর্মকথাকে প্রায়ই ভক্তজন রসসিক্ত সাহিত্য বলে ভুল করেছেন। কিন্তু চর্যার সাহিত্যগুণ কোন অবস্থাতেই তার ধর্মচেতনার নিষেকে সঞ্জীবিত নয়। বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের পরম সৌভাগ্য,—এ'র প্রাচীনতম ভাষাগ্রন্থ অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প-কর্মও হ'য়ে উঠেছে। চর্যার এই সাহিত্য-সম্পদের পরিচায়ন উপলক্ষ্যে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের স্বভাব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'র প্রাসংগিক উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মহাগ্রন্থ রচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী একাধারে পাণ্ডিত্য, মনীষা, তত্ত্বদৃষ্টি, বিচারক্ষমতা এবং ইতিহাস-সচেতনতার এক অলভ্য-প্রায় নিদর্শনকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। আর এই অতুল্য সম্পদ-সমৃদ্ধির সমাবেশে কবিরাজ গোস্বামীর অসাধারণ নিষ্ঠা, ঐকান্তিকীভক্তি ও গভীর প্রেমানুভূতি সূত্ররূপে সদাসচেতন ছিল। বৈষ্ণব মহজেনেরা বহু শতাব্দী ধরে এই দুর্লভ জ্ঞানভাণ্ডারের লোকোত্তর ভক্তিরসকে সাহিত্যরস বলেও উপভোগ করে এসেছেন। তবু, কবিরাজ গোস্বামীর বিচার ও বিশ্লেষণ-প্রধান বস্তু-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি (objective attitude) সমগ্র গ্রন্থটিকে অভিনব দার্শনিক মহিমায় উদ্দীপ্ত করেছে ;—কিন্তু সার্থক সাহিত্য-পর্যায়ভুক্ত করতে পারেনি ততটা। Objective রচনা মাত্রই নিশ্চয়ই অ-সাহিত্য নয় ; কিন্তু বিশ্লেষণমূলক ধর্মালোচনা নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) তত্ত্ব-বিচারে একান্ত প্রবুদ্ধ হয়ে থাকলে তা সার্থক দর্শন-এরই জন্ম দেয়। আর সেই তত্ত্ব-বিষয়ই ব্যক্তি-সাপেক্ষ অনুভব-বেদ্যতার মধ্যে আশ্লিষ্ট (Synthesised) হয়ে সাহিত্যিক নির্মিতিকে সম্ভব করে তোলে। মনে রাখ্‌তে হবে, সাহিত্যের পক্ষে স্রষ্টার ব্যক্তি-সম্পর্ক প্রায় অপরিহার্য। চর্যাপদাবলীতে স্রষ্টার এই ব্যক্তিসম্পর্ক সুনিবিড় হয়ে উঠেছে বলেই তা আর কেবল 'সাহিত্য' হয়েই নেই,—হয়ে উঠেছে একান্ত মন্ময়-স্বভাব (Subjective) গীতি সাহিত্য ;—চর্যায় ধর্ম-তত্ত্বকথা ছন্দোবদ্ধ কবিতা হয়েই নেই ;—হয়েছে সুরমূর্ছনাময় সঙ্গীত।

চর্যাপদ ধর্মকথা হলেও সাহিত্য

প্রথম চর্যাপদটিতেই চর্যার এই ব্যক্তি-সম্পর্কাশ্রিত সাহিত্য-স্বভাব সুস্পষ্ট হতে পেরেছে বলে মনে করি। সহজিয়া সাধন পদ্ধতির বিশেষ স্বরূপ সম্বন্ধে

যথোচিত ইংগিত করেও ভণিতায় লুইপাদ লিখেছেন ;—"ভণই লুই আহ্মে ঝাণে দিঠা।"—১নং চর্যা। অর্থাৎ লুইপাদ বল্‌ছেন,—ঐ পদে তিনি যা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তা' কোন আচরণ-প্রধান তত্ত্বাশ্রয়ী ধর্মশাস্ত্র নয় ;—তাঁর নিভৃত-নিবিড় উপলব্ধিজাত সত্য। লুইপাদ এবং অন্যান্য শিল্পিগণ যেখানে এই উপলব্ধির আনন্দকে সাধারণীকৃত আবেদনময় করে তুল্‌তে পেরেছেন, সেখানেই চর্যাপদাবলীর যথার্থ সাহিত্য সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে।

চর্যাপদাবলীতে কবি-চেতনার ব্যক্তি-সম্পর্ক

সন্দেহ নেই, এই প্রসংগে চর্যার গূঢ় তত্ত্ব-ব্যঞ্জনার প্রশ্ন উঠ্‌বে। কিন্তু তত্ত্ব-বিষয়ও ব্যঞ্জনাময়তার মধ্যে রসরূপ লাভ করেছে,—এইটুকুই আমাদের বক্তব্য। আর এই ব্যঞ্জনাকে জীবনরস-সঞ্জীবিত করে তুল্‌তে একদিকে সহায়ক হয়েছে চর্যা-কবিগণের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অন্যদিকে তার বহিরঙ্গ পুষ্টি সাধন করেছে অলংকার-সমৃদ্ধ 'সন্ধ্যা ভাষা'। "সন্ধ্যাভাষা আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বোঝা যায়, খানিক বোঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্যভাবের কথাও আছে।"[১২] পূর্ব অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি, এই সন্ধ্যাভাষার পূর্বসূত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর শ্লেষকাব্য 'রামচরিত্রের' মধ্যে পূর্ণস্ফুট হয়ে আছে। বস্তুতঃ সন্ধ্যাকর নন্দীর ভাষাদর্শের অনুসৃতিই সন্ধ্যাভাষা নামে অভিহিত হয়েছে কিনা, এ-কথা ভেবে দেখ্‌বার মত। যাই হোক্, সংস্কৃত আলংকারিকদের দ্বারা নিন্দিত ঐ শ্লেষকাব্যের ভাষাদর্শই বাংলার লোক-ভাষায় সার্থক শৈল্পিক মুক্তি খুঁজে পেয়েছিল যে, তা'তে সংশয় নেই। কেবল চর্যাপদই নয়, সহজিয়া সাধনার গুহ্য ইংগিত বহুল অন্যান্য বহু রচনাও এই সন্ধ্যাভাষার মাধ্যমকেই আশ্রয় করেছিল।

সন্ধ্যাভাষা

সন্ধ্যাকর নন্দীর সংস্কৃত কাব্য-ভাষার মতই এ'ভাষারও অর্থগত সীমায়তি অনেক স্থানে অস্পষ্টতার সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ চর্যাপদাবলীর সাধনগত গুহ্যার্থ অবধারণের জন্য সংস্কৃত এবং তিব্বতী ভাষায় লিখিত টীকার 'পরেই বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু রামচরিত্রের ঐতিহাসিক তথ্যাদির অস্পষ্টতা যেখানে কাব্যের

চর্যার রহস্যময়তা

১২। বৌদ্ধ গান ও দোহা—মুখবন্ধ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পক্ষে দোষাবহ হয়েছিল, চর্যাপদাবলীতে কিন্তু সেই অস্পষ্টতাই এক ধর্মবিষয়ক রহস্যময়তা (mysticism)-কে জন্ম দিয়েছে। চর্যা বা অনুরূপ কাব্যে শ্লেষাত্মক ভাষার আবরণে যা'কে আবৃত করা হয়েছে, তা সহজিয়া সাধনার অধিকারি-সংবেদ্য গুহ্যার্থ। অনধিকারী সাধারণের তা বোঝবার কথা নয়। কিন্তু চর্যা-পদকর্তাগণ তাদেরও ফাঁকি দেননি। নিত্যদৃষ্ট জীবনের পুংখানুপুংখতাকে চিত্ররূপায়িত করে তা'র সংগে সন্নিবিষ্ট করেছেন গীতি-ঝংকার। ফলে, সাধারণ জীবন-রূপ অনির্বচনীয় অসাধারণের রূপ-ব্যঞ্জনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ধর্মকথা জীবন-অভিজ্ঞতার প্রবাহে পরিস্রুত হয়ে সাহিত্য হয়ে উঠেছে। আবার, আগেই বলেছি, চর্যাকারদের ধর্ম-স্বভাব যোগাদি আচার-আচরণীয়তাকে অস্বীকার না করলেও প্রধানতঃ ছিল মন্ময় অনুভূতি-প্রধান। ফলে, অনুভূতির অনির্বাচ্যতা ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ-রীতিকে আশ্রয় করে অপূর্ব রহস্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। চর্যাপদাবলীর এই রহস্য-সুন্দর স্বভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য-বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করেছেন :—There are many songs among the poetical works of Tagore, which keep us in a fix as to whether we should eulogise them as master pieces of art or the best expressions of religious experiences."।[১৩] সন্দেহ নেই, চর্যার অপূর্ণগঠিত ভাষারচনার চেষ্টাকে "master pieces of art" অথবা "best expressions of religious experiences" বলে দাবি করা চলে না। তবু, বাংলা সাহিত্যের উষা-লগ্নে ধর্মের উপলব্ধিময় উপাদান এবং জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সন্ধ্যা-ভাষার সূত্রে গ্রথিত করে চর্যাপদ-ই বাংলা mystic কাব্যের পথ-সূচনা করেছিল, এ-কথা বিস্মৃত হবার উপায় নেই।

অনেক কথার ভার জড় হয়েছে; এবারে আর একটি মাত্র উদ্ধৃতি দিয়ে এ-পর্যন্ত আলোচিত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইব :—

উচা উচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥

১৩। Obscure Religious Cults.

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক্ পুচ্ছিআ বিন্ধ নিঅমন বাণে।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণে ॥
উমত শবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥ — ২৮নং চর্যা

—উঁচু উঁচু পর্বত,—সেখানে শবরী বালিকা বাস করে; শবরীর পরিধানে ময়ূরের পাখা,—গলায় তার গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর,—পাগল শবর! দোহাই তোমার, গোল (ভুল) করো না। সহজ সুন্দরী নামে তোমার নিজেরই ঘরণী আমি। ওরে, নানা তরুবর মুকুলিত হয়েছে, ডাল তার গগন স্পর্শ করেছে; কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারিণী শবরী একা এ বনে ঘুরে ফিরছে। শবর ত্রিধাতুর খাট পেতেছে, তার 'পরে বিছিয়েছে শয্যা; শবর-ভুজঙ্গ নৈরামনী (নৈরাত্মা) স্ত্রীকে নিয়ে একত্র প্রেমরাত্রি ভোর করে দিয়েছে। কর্পূরের সঙ্গে হৃদয়-তাম্বুল সে খেয়েছে মহাসুখে,—নৈরামনী শূন্যকে নিয়ে মহাসুখে রাত্রি করেছে প্রভাত। গুরুবাক্য জিজ্ঞাসা করে আপন মনবানের সাহায্যে একটিমাত্র শর-সন্ধানে বিঁধো,—বিঁধে ফেলো পরম নির্বাণকে। উন্মত্ত শবর জ্ঞানানন্দে মগ্ন হয়ে গুরুতর রোষে গিরি-শিখরের সন্ধিতে প্রবেশ করেছে; কি করে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে!

চর্যাপদাবলীতে ভাব-রূপের হরিহরাত্মকতা

উদ্ধৃত পদে পরম নির্বাণ সম্বন্ধীয় যে তত্ত্ব-বাচ্য রয়েছে, তা কেবল ইংগিত-মাত্রে নিবদ্ধ। সেই গূঢ়ার্থকে রহস্যাবৃত রেখে সন্ধ্যাভাষা শিল্পীর প্রেম-মিলানাকাঙ্ক্ষাকেই সমুচ্ছ্বসিত করেছে। এই প্রেমাত্মকতাই চর্যার ধর্ম-নির্ভর কবিতাবলীকে ধর্ম-সচেতনতাহীন সর্বসাধারণের হৃদয়-সংবেদ্য করে তুলেছে। গৌড়ীয়

বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁরা 'দেবতাকে প্রিয়' এবং 'প্রিয়কে দেবতা' করতে পেরেছিলেন। চর্যাপদাবলীর প্রেম-বোধ যেখানে দেবতাকে,—পরমসাধ্যকে প্রিয়রূপ দিয়েছে, সেখানেই তা প্রেমানুভূতিমূলক সাহিত্যিক আবেদনের সর্বজনীনতায় হয়েছে সমৃদ্ধ। আর, চর্যাপদাবলীর এই রহস্যময় শিল্পায়নে মন্ময় উপলব্ধির সংগে সন্ধ্যাভাষার রাহস্যিক বহিরাবরণও যে বহুল পরিমাণে সক্রিয় হয়েছিল, এ'কথা আবার স্মরণ করি। চর্যার সাহিত্যিক উৎকর্ষের মূলে আছে ভাব ও রূপের হরিহরাত্মকতা।)

শুধু ভাব ও ভাষাই নয়, চর্যাপদাবলীর আলংকারিক মণ্ডন-সিদ্ধিও সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর এবং সর্বকালের বাংলা সাহিত্যের আদর্শ স্বরূপ হয়ে আছে। চর্যাপদকর্তাগণের ভাববাচ্য ছিল কিছুটা গুহ্য ধর্মাশ্রিত, কিছুটা আত্মলীন উপলব্ধিময়। অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ অথবা অনির্বাচ্যকে বাচন-ব্যঞ্জিত করতে গিয়ে এঁরা সর্বজন পরিচিত জীবনের সাধারণ প্রচ্ছদটিকেই আশ্রয় করেছেন বেশি। ডোম-ডোম্‌নির নিতান্ত স্বাভাবিক প্রেম-চর্যা, নৌকো বাওয়া, সাঁকো তৈরি, চ্যাঙাড়ি বোনা, তুলো ধুনা ইত্যাদি জীবন-চিত্রের মাধ্যমে গুহ্য কথাকে রূপায়িত করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। ফলে সাধারণ শ্লেষাত্মকতা ছাড়াও, কোথাও অনুপ্রাস, কোথাও যমক, কোথাও বা রূপক-উৎপ্রেক্ষাদি অর্থালংকারেরও সিদ্ধ-সার্থক প্রয়োগে চর্যাপদাবলী শিল্প-সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চর্যাপদাবলীর এই আলংকারিক ঐতিহ্যই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে বহুধা ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। ভারতচন্দ্রের আলংকারিক সিদ্ধির ঐতিহাসিক পূর্বসূত্র চর্যার কাব্য-স্বভাবের মূলদেশে প্রোথিত।

চর্যাপদের আলংকারিক উৎকর্ষ

অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন বসু একদা ৮নং চর্যাটির সংগে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'সোনারতরী' কবিতার ভাব-সাযুজ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। গোটা পদটি হচ্ছে নিম্নরূপ :—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ॥

খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়্হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা॥—৮নং চর্যা—

—আমার করুণা-নৌকা সোনায় ভর্তি রয়েছে; তাতে রূপো রাখ্‌বার ঠাঁই নেই। ওরে কম্বলিপাদ, গগনের (নির্বাণের) উদ্দেশে বেয়ে চলো তুমি; যে জন্ম গেছে, সে ফির্‌বে কি করে?

[নৌকো বাইতে গিয়ে] খুঁটি উপ্‌ড়ে ফেলো, কাছি মেলে দাও! সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করে, হে কম্বলিপাদ, তুমি বেয়ে যাও। পথে বেরিয়ে চারিদিকে চেয়ে এগিয়ো; কেড়ুয়াল ছাড়া কেউ কী বাইতে পারে! বাম-ডানে চেপে চেপে পথ বেয়ে গেলে ঐ পথেই মহাসুখের সংগে মিলে যাবে।—

উল্লিখিত রবীন্দ্র-কবিতার সংগে আলোচ্য কবিতার দূরান্বয় পাঠক-মাত্রেরই চোখে পড়বে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করতে বল্‌ব, লোক-জীবনের একটি সাধারণ চিত্র সমৃদ্ধ-রূপায়বের আলংকারিক মণ্ডনে কেমন বিস্ময়কর শিল্প-সুষমা আয়ত্ত করেছে। বস্তুতঃ চর্যাপদাবলী পড়লে এ-কথা মনে হবেই যে, ঐ সকল লোকজীবন-শিল্পী সমৃদ্ধতর কাব্য-কলাশাস্ত্র—(Poetics)—জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আর এ অনুমান খুব অসংগতও হয়ত নয়। চর্যার লোক-কবিগণ, আর যাই হোক্, অশিক্ষিত-পটু যে ছিলেন না তার প্রমাণ আছে। চর্যাপদ-কর্তাগণের অনেকেই একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত ছিলেন এমন প্রমাণ তিব্বতী উৎস থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া সরহপাদ স্বয়ং নাগার্জুনকেও নালন্দাতে এই রাহস্যিক ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৪] অতএব, সংস্কৃত-প্রাকৃত কাব্য-কলার আভিজাত্যের সংগে চর্যাকারগণ একেবারেই অপরিচিত যে ছিলেন না, সে কথা অনুমান করতে বাধা নেই। সেই সংগে এ'কথাও অনুভব করা চলে যে অন্তরঙ্গ উপাদানে চর্যা লোক-জীবনাশ্রয়ী হলেও বহিরঙ্গ রূপাবয়বে সে অভিজাত মণ্ডন-সিদ্ধিকেই আয়ত্ত

১৪। দ্রষ্টব্য History of Bengal vol. I—ch. XIII.

করেছে। মানস এবং দৈহিক স্বভাবে চর্যাপদাবলী বাঙালি চেতনার মিলনাত্মক যৌথ-বৈশিষ্ট্যকেই প্রকট করে তুলেছে।

চর্যার ছান্দসিক কারুকর্মেও সেই বাঙালি স্বভাব অনায়াস-স্পষ্ট হয়েছে। চর্যাপদাবলী শৌরসেনী প্রাকৃত-প্রভাবিত মাত্রা-প্রধান পাদাকুলক ছন্দে রচিত। পাদাকুলক ছন্দের প্রতিটি চরণ বিশেষ ভাবে ষোল মাত্রা যুক্ত; চর্যাপদাবলীতে প্রতিটি চরণকে সাধারণতঃ চার ভাগ করে চতুষ্পদী বা 'চৌপাই' জাতীয় ছন্দ রচনা করা হয়েছে। পাদাকুলক চতুষ্পদীর ছন্দে প্রতি চরণের প্রত্যেকটি পদ (ভাগ) চারমাত্রা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। চর্যার ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণের শেষ পদটি দীর্ঘমাত্রার দুটি অক্ষর (Syllable) রূপে প্রতিভাত হয়। কোন কোন স্থলে শেষ অক্ষরটি আবার পুরো দ্বিমাত্রিকও হয়নি। ডঃ সুনীতিকুমার অনুমান করেছেন, মাত্রাপ্রধান পাদাকুলক ছন্দের এই অক্ষর-(Syllable)-অভিমুখিতার ফলেই বাংলা ভাষায় অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দের উদ্ভব ঘটেছিল। ষোলটি পৃথক্ মাত্রার স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য আড়ষ্ট হয়ে ক্রমশঃ চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের উদ্ভব। পয়ারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পর্যায়ে পাদাকুলক ছন্দের ছান্দসিক বিভাগ অনেকটা নিম্নরূপ ছিল :—

চর্যার ছন্দ

× × × × | × × × × | × × × × | — — | [১৫]

জয়দেবের গীতগোবিন্দে অনুরূপ ছন্দোবিভাগ সাবলীল শৈল্পিক উৎকর্ষ লাভ করেছে। চর্যাপদে এই ছন্দ-কৃতি পূর্ণাংগ হতে পারে নি প্রায় কোথাও; তবু পাদাকুলক ছন্দের অক্ষর-(Syllable)-অভিমুখিতার অস্পষ্ট হলেও নিঃসংশয় অভিজ্ঞান প্রথম চর্যাটিতেই পাওয়া যেতে পারে :—

— — | × × × × | — × × | — —
কা আ | ত রু ব র | প ঞ্চ বি | ডা ল।

— × × | — — | × × — | — —
চ ঞ্চ ল | চী এ | প ই ঠো | কা ল॥

এখানে শেষ অক্ষরে সমাপ্তিক ঝোঁক-এর জন্য মাত্রা-দীর্ঘতা ঘটেছে ব'লে মনে করা হয়। কিন্তু এমন অনুমানও হয়ত অসংগত নয় যে, চর্যাপদের এই পর্যায়েই মাত্রাগত কড়াকড়ি শিথিল হতে আরম্ভ করেছিল।

১৫। × = ১ মাত্রা ;— = দুই মাত্রা বা এক দীর্ঘ মাত্রা

চর্যাপদাবলীর বিষয়, ভাব, ভাষা, অলংকার ও ছন্দোগত স্বভাব বিশ্লেষণের শেষে এবারে ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি নির্ণয় করা যেতে পারে।

চর্যাপদ আদি যুগ-সাহিত্যের নিশ্চিত স্বাক্ষর

চর্যাপদ এতাবৎ-আবিষ্কৃত বাংলার প্রাচীনতম ভাষা-গ্রন্থই নয়, এই অদ্বিতীয় গ্রন্থেই বাংলা সাহিত্যের মৌল-স্বভাব, তথা, সুচিহ্নিত বাঙালি জীবন-স্বভাব কাব্য-সত্তার সর্বাবয়বে মুকুলিত হয়ে উঠেছে। আর তাই, কেবল এই একখানি কাব্যের প্রমাণকে অবলম্বন করেই দাবি করা চলে যে, এই পর্যায়েই বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ-পরিক্রমা সুরু হয়েছিল। এবিষয়ে নানারূপ সংশয়ের অবতারণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু, ইতিহাসের সঞ্চয় বস্তুভার-পীড়িত নয়। প্রত্নতত্ত্ব নির্বিচারে তথ্য সমাহরণে সমুৎসুক; অথচ ইতিহাস দেশ-কাল-পাত্রের নির্মম বিচারক;—সমস্ত বস্তু-সঞ্চয় থেকে সে আহরণ করে,—রক্ষা করে কেবল ঐতিহ্যের স্বভাব-লক্ষণকে। এ পর্যন্ত আলোচনায় স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়া উচিত, বাংলা সাহিত্যের সেই মৌল স্বভাব চর্যাপদাবলীতেই স্পষ্ট দৃষ্ট হয়েছে। অপভ্রংশ-প্রধান চর্যাপদাবলীর পক্ষে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়েছে পূর্ণায়ত বাঙালি জীবনের বহুমুখী শিল্প-সাধনাকে সাঙ্গীভূত করতে পারার দুর্লভ সিদ্ধির দ্বারা। সে যুগের শিল্পসাধনার সকল উপাদান আমাদের কাছে এসে পৌছায়নি; তার জন্য আক্ষেপ করতে পারি; কিন্তু স্বল্পজ্ঞাত তথ্যের মধ্যেও ইতিহাসের যে সিদ্ধান্ত স্বয়ংস্ফূর্ত হয়েছে, তাকে অস্বীকার করতে পারি না।

অনেকে কৃষ্ণকীর্তন থেকে বাংলা সাহিত্যের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশলগ্নকে চিহ্নিত করতে চান; অন্ততঃ চর্যা থেকে কৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত টেনে নিতে চান বাংলা সাহিত্যের আদিযুগকে। এতে তথ্যভার-প্রীতির তুলনায় ঐতিহাসিক সচেতনতার দুর্বলতাই সূচিত হয়। সন্দেহ নেই, কৃষ্ণকীর্তনে বাংলা ভাষার নিঃসংশয়িত কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের বিষয়, ভাব, রূপকর্ম সব কিছুতেই চর্যার তুলনায় কোন অভিনবতর স্বাতন্ত্র্য নেই, আছে চর্যা-স্বভাবেরই পরিণতি। চর্যার কাল থেকে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য পায়ে পায়ে চলে কি ক'রে কৃষ্ণকীর্তনের পরিণতি মুখে এসে পৌচেছে, সে খবর জানি না বলেই যাত্রালগ্নের মর্মভেদী মঙ্গলশঙ্খধ্বনিকে কান চেপে অস্বীকার করতে পারি

আদি যুগ-সাহিত্যের ইতিহাস ও কৃষ্ণকীর্তন

না। অতএব, চর্যা থেকেই আমাদের বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের, সাহিত্যিক ঐতিহ্যের যাত্রা সুরু।

চর্যার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই যুগের পূর্ব-কথিত সাহিত্য-লক্ষণের প্রমাণ হিসেবে আরও কিছু কিছু রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু এ যুগের বৌদ্ধ-প্রভাবিত দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসেবে শূন্যপুরাণের উল্লেখ উচিত কি না, তা'তে সংশয় আছে। তৎকালে প্রচলিত তিনখানি পুথির পাঠ মিলিয়ে প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩১৪ বাংলায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। কিন্তু একখানি পুথির-ও নামাঙ্কিত পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায় নি বলে গ্রন্থখানির মূল নাম জানা যায় না। সম্পাদকই এ'র নূতন নামকরণ করেন 'শূন্যপুরাণ'। এতে 'শূন্যময় দেবতা' ধর্ম ঠাকুরের পূজাপদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। শূন্যপুরাণ মোটামুটি রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় রচিত। বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই রামাই পণ্ডিত আদি ধর্মপূজকরূপে উল্লিখিত হয়েছেন। শূন্যপুরাণের সম্পাদকের মতে ইনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা ধর্মপালদেবের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্রও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শূন্যপুরাণকে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রন্থখানির ভণিতা বিচার করে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে শূন্যপুরাণে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ, পঞ্চদশ-ষোড়শ, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনটি পর্যায়ে অন্ততঃ পাঁচজন কবির হস্তাবলেপ ঘটেছে। ডঃ সুকুমার সেন গ্রন্থখানির ভাষাতত্ত্ব বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন, এই ভাষা নানা জায়গায় ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার অনুরূপ। তা'ছাড়া শূন্যপুরাণের পুথিতে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামক একটি অংশ আছে, যা' নিঃসন্দেহে পুথিখানির, অন্ততঃ ঐ অংশের, অর্বাচীনতার পরিচয় বহন করে। ধর্ম-ভক্তগণের প্রতি হিন্দুগণ নানারূপ অত্যাচার ও পাপাচরণ করেছিলেন এবং নিরঞ্জন 'ধর্ম' যবন-রূপ ধারণ করে তাদের শাসন করেছিলেন। নিরঞ্জনের উষ্মা অংশে এই কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। স্বভাবতই বোঝা যায় এই অংশটি বাংলায় তুর্কী-আক্রমণ-যুগের পরবর্তী কালের রচনা। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সহদেব চক্রবর্তীর অনিল পুরাণেও এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া

শূন্যপুরাণের কাল-বিচার

গেছে। তাই ডঃ সুকুমার সেন এই অংশটি সহদেবেরই রচনা বলে অনুমান করেছেন। এই সকল নানা কারণে বর্তমান কালে শূন্যপুরাণের প্রাচীনতা সাধারণভাবে অস্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিচার অসম্পূর্ণ আছে। পণ্ডিতদের আলোচনায় শূন্যপুরাণের প্রক্ষেপ-বাহুল্য এবং বিভিন্ন রচনাংশের অর্বাচীনতা প্রমাণিত যদি হয়ও, তবু রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থ-কর্তৃত্ব এবং ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। আলোচ্য শূন্যপুরাণ গ্রন্থের একছত্রও রামাই পণ্ডিতের রচনার পরিচয় বহন করে কি না, আধুনিক কালে পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আবার ডঃ দীনেশচন্দ্র রামাই পণ্ডিতের অস্তিত্ব স্বীকার করে মন্তব্য করেছিলেন,—"যদিও রামাই পণ্ডিতের রচনার উপরে পরবর্তী অনেক লেখক কারুকার্য করিতে ছাড়েন নাই, তথাপি স্থানে স্থানে যে আদি কবির রচনা অবিকৃত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"[১৬] এই প্রসঙ্গে ডঃ সেন শূন্যপুরাণের একাধিক দুরূহ অংশের উল্লেখ করেছেন, যার অর্থোদ্ধার স্বয়ং শূন্যপুরাণের সম্পাদকও করে উঠতে পারেন নি। সন্দেহ নেই,—রচনার দুরূহতাই তার প্রাচীনতার নিঃসংশয় প্রমাণ হতে পারে না। আর, শূন্যপুরাণের অর্বাচীনতা সম্বন্ধে যাঁরা কৃত-নিশ্চয়, তাঁদের মতে এই সকল দুরূহতা অর্বাচীন গ্রন্থের প্রাচীনতা প্রতিপাদনেরই অপচেষ্টা মাত্র। এই সব বাদ-প্রতিবাদ পরিহার করেও ব'লা চলে,—শূন্যপুরাণের লিখনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে—ধর্মঠাকুরের অনুরূপ পূজাপদ্ধতি মূলতঃ রামাই পণ্ডিতের দ্বারাই পরিকল্পিত হয়েছিল; অর্বাচীন লেখকেরা পূর্বসূরীর পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন এ-বিষয়ে। আবার, এই রামাই পণ্ডিত যে একাদশ শতাব্দী অথবা বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ-সীমার মধ্যে কোন সময়ে আবির্ভূত হন নি,—একথাও নিঃসংশয়ে বলা চলে না। বরং অন্যান্য কারণেও আলোচ্য যুগে এই ধরণের গ্রন্থরচনার সম্ভাবনা কিছুটা ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

বর্তমান উপস্থাপনার অন্তর্নিহিত যুক্তি

শূন্যপুরাণ বিশেষ ভাবে ধর্মপূজাপদ্ধতি। আগেই বলেছি গ্রন্থখানির ৫১টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম পাঁচটি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এবং এই সকল সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাকি সব

১৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

কয়টি অধ্যায়ই বিভিন্ন এবং বিচিত্র রকমের ধর্মপূজার পদ্ধতি বিশ্লেষণে পূর্ণ। শূন্যপুরাণ এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে বর্ণিত ধর্ম-দেবতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে মতানৈক্যের শেষ নাই। ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি ধর্মঠাকুরকে বাংলাদেশে বৌদ্ধ-প্রভাবের সর্বশেষ প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র উভয়েই এই সিদ্ধান্ত নির্বিচারে সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকেও ধর্মঠাকুরের 'পরে দাবি উপস্থিত করা হয়েছে ; পণ্ডিতেরা বিভিন্ন আলোচনায় ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার সঙ্গে বিষ্ণু, যম, শিব, সূর্য ইত্যাদি দেবতার পরিকল্পনাগত সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেন ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে ঋগ্‌-বৈদিক সূর্যের সংযোগ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন।[১৭] এই সকল মত-বিভিন্নতাকে সন্নিবদ্ধ করে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন—"The Dharmacult being the result of a popular commingling of a host of heterogenous beliefs and practices, it will be incorrect to style it purely Buddhistic or indigenous either in origin or in nature, it is as much a hotch-potch in its origin as it is in its developed form and nature."[১৮]

গ্রন্থ-বিচার

বস্তুতঃ বিশদ আলোচনায় বোঝা যায়, বাংলার প্রাচীনতম লৌকিক ধর্মবিশ্বাস এবং আচারের মধ্যেই ধর্ম-সম্প্রদায় (cult) এর জন্ম। কালে কালে নানা প্রভাব এবং প্রতিপত্তির প্রাচুর্যে বিশেষভাবে বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মাচারের সাহচর্য ও নিয়ন্ত্রণেই এই সম্প্রদায় বর্তমানরূপ লাভ করেছে।[১৯] পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর ধর্মমতে মুসলমান-সমাজের প্রভাবও লক্ষিত হয়েছে।[২০] সে যাই হোক্, বাংলার ধর্মাচরণের প্রাচীনতম যুগে যে দেবতার অবস্থিতির পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাঁর কোন-না-কোন পূজা-পদ্ধতিও নিশ্চয়ই লোকসমাজে প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত ছিল।

১৭। দ্রষ্টব্য—রূপরামের ধর্মমঙ্গল ভূমিকা।

১৮। Obscure Religious Cults......... ।

১৯। গ্রন্থের অপরাংশে ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২০। Obscure Religious cults এবং বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথমখণ্ড দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে যুগে যুগে নিঃসংশয়ে এই পূজাপদ্ধতি পরিবর্তিত-ও হয়েছে। বাংলা ভাষার অভ্যুদয়-যুগে আর্য-বৌদ্ধ ধর্মের বিপর্যয় এবং হিন্দু-তান্ত্রিক চেতনার সমন্বয়ে এক নূতন লোক-ধর্মের সংস্কার যখন এদেশে গড়ে উঠেছিল, তখনই রাঢ়ের লোক-দেবতা ধর্ম ঠাকুরের পূজা-পদ্ধতিও নূতন রূপ গ্রহণ করেছিল। আর সেই নব-রূপায়িত পূজা-পদ্ধতির প্রথম কাঠামোটি অন্ততঃ বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন রামাই পণ্ডিত, এই অনুমান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে হয় না। এই যুক্তির অনুসরণেই শূন্যপুরাণ,—তথা ধর্মপূজাপদ্ধতি সম্বন্ধীয় আলোচনাকে বর্তমান যুগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যের এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত উপাদানের তথ্যগত বিচার বড় একটা অসম্পূর্ণ নেই,—কিন্তু সেই তথ্যকে অবলম্বন করে সাহিত্যের বিকাশ-পথের একটি মোটামুটি ধারা আজও সুচিহ্নিত হয় নি। শূন্যপুরাণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য এবং সিদ্ধান্তের সাহায্যে এখানে সেই পথ-সূচনার পরিচয় নিয়েই একটি সম্ভাব্য অনুমানের চেষ্টা করা গেল। বস্তুগত পটভূমিকায় ঐতিহাসিক তথ্যের ভাবমূল্যের সম্ভাব্য স্বরূপ আবিষ্কারই এই অংশের উদ্দেশ্য। নিছক আবিষ্কার হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শূন্য-পুরাণের মত গ্রন্থের ভাব কিংবা ভাষাবিষয়ক বিশেষ কোন মূল্য নেই।[২১] তবু এই শ্রেণীর সাহিত্যের ঐতিহ্যগত মূল আবিষ্কারের গবেষণাত্মক মূল্য এবং প্রয়োজন যে আছে, এই সত্যটুকু স্বীকৃত হলেই যথেষ্ট। আর, এই স্বীকৃতি-কামনার মধ্যেই শূন্যপুরাণের ঐতিহাসিক আলোচনা শেষ হতে পারে।

আলোচনার সার্থকতা

শূন্য পুরাণের পরে আলোচ্য যুগের লোক-ধর্ম-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে নাথ-সাহিত্যের উল্লেখও নিরাপদ নয়। এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রথম পরিচয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর থেকে আবিষ্কার করেন ডঃ জি, এ, গ্রীয়ার্সন।—সম্পাদক কাব্যের নাম দেন :—'The Song Of Manik Chandra'। রাজা মাণিকচন্দ্র, তাঁর পত্নী ময়নামতী এবং পুত্র গোপীচন্দ্রের জীবন-কথা বর্ণনাই

'নাথ সাহিত্য'

২১। ডঃ সুকুমার সেন শূন্যপুরাণের ভাঙা-পয়ার জাতীয় রচনার মধ্যে বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক সম্ভাবনার পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন,—তা সত্ত্বেও শূন্যপুরাণের কাব্যিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

কাব্য-কাহিনীর উপলক্ষ্য। আসলে গল্পের সূত্রে নাথ-ধর্ম-বিশ্বাসের মূল তথ্যাবলী আর সেই সঙ্গে নাথ ধর্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। মাণিকচাঁদ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। প্রথমে মনে করা হয়েছিল ইনি পালরাজ ধর্মপালদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই এই গ্রন্থের আবিষ্কারের ফলে অনেকেই উল্লসিত হয়েছিলেন। মনে করা হয়েছিল,—চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস-কথিত,—

"যোগীপাল, ভোগীপাল মহীপালের গীত"-এর একটি বুঝি এই গোপীচন্দ্রের গান।[২২] কিন্তু পরবর্তীকালে নিঃসংশয়ে জানা গেছে,—পাল রাজবংশের সঙ্গে গোপীচন্দ্র বা মাণিকচন্দ্রের কোন সম্পর্কই ছিল না। ডঃ গ্রীয়ার্সন মাণিকচন্দ্রকে চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে ডঃ দীনেশচন্দ্রের বিচারের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেন,—'বঙ্গাল'-রাজ গোপীচন্দ্র ছিলেন একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক।[২৩] গ্রীয়ার্সনের

কালবিচার ও বর্তমান উপস্থাপনের উদ্দেশ্য

আবিষ্কৃত পুথি প্রকাশের পর উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গীত, মাণিকচাঁদের গীত ইত্যাদি বিভিন্ন নামে একই কাহিনীর বিভিন্ন পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া প্রথমে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৩২৪ সালে) এবং অন্যান্যেরা 'গোরক্ষ-বিজয়' বা 'মীনচেতন' নামে নাথধর্ম-বিষয়ক আর একটি নূতন কাব্য-কাহিনীও আবিষ্কার এবং প্রকাশ করেছেন। ময়নামতীর গান এবং গোরক্ষবিজয়ে যে সকল নাথ-সিদ্ধাগণের উল্লেখ আছে, তাঁদের মধ্যে হাড়িপা, কানুপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ইত্যাদি সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেই এঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই কারণেই প্রথম যুগের পণ্ডিতগণ এই সকল রচনাকে বাংলা-সাহিত্যের আদিযুগের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য কাব্য দুটির যত পুথি এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার একখানিরও লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের পূর্বে নয়। প্রধানতঃ এই কারণেই ডঃ সুকুমার সেন নাথ-সাহিত্যের ইতিহাসকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২২। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী উক্ত শ্লোকাংশটির পাঠ পরিবর্তনও করেছিলেন—"মহীপাল যোগীপাল গোপীপাল গীত।"—ময়নামতীর গান—ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

ঐতিহাসিক তথ্য-বিচারের এই পদ্ধতি সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু পুথিগত নিদর্শনের অভাব থাকলেও পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে নিশ্চিত অনুমান করা চলে, - খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে, অন্ততঃ তুর্কী-আক্রমণের পূর্বে গোপী-চন্দ্রের গীত ও গোরক্ষ-বিজয় কাহিনী কেবল বাংলা দেশেই নয়, সর্বভারতেই প্রচলিত ছিল। "Stories of Gorakhnāth and Gopicānd, at least the skeleton of such stories, had been in all probability, current in Bengal (and not only in Bengal, but in many other parts of India) before the time of conquest of Bengal by the muslims in the thirteenth century"।[২৪] ঐ সকল কাহিনীর প্রাচীনতমকালের পুথি আবিষ্কৃত হতে না পারলেও এদের প্রাচীনতার ঐতিহ্য সুপ্রমাণিত। তথ্যের অভাব যেখানে অপরিহার্য, সেখানে আবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্কেত অবলম্বন করে বস্তুর ঐতিহাসিক মর্যাদা এবং স্থান নির্ণয় অধিকতর বৈজ্ঞানিক যদি না-ও হয়, তবু বর্তমানক্ষেত্রে অধিকতর প্রয়োজনীয় যে, তাতে সংশয় নেই। কেবল এই কারণেই নাথ-সাহিত্যা-বলীকে তাদের আবির্ভাবের এই সম্ভাব্য প্রাথমিক যুগে উপস্থাপিত করে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের পুথিতে নিহিত পূর্বসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। এতে ঘটনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেও সাহিত্যের ঐতিহ্যগত মূল্য-নির্ণয় সার্থক হবে বলে মনে করি।

নাথধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, "নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।"[২৫] কিন্তু নাথধর্মের স্বরূপ ও পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেছেন নাথ সম্প্রদায় মূলতঃ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-ধর্ম-সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। কেউ কেউ আবার এদের শৈব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। সংশয় নেই, অন্যান্য লৌকিক-ধর্মের মত কালে কালে এই ধর্মাচরণের আদর্শেও বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন হিন্দু-তান্ত্রিকতার প্রভাবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে মূলতঃ, নাথধর্ম সর্বভারতীয় সিদ্ধাচার্য-গণের ধর্মেরই একটি বিশেষ রূপ। এ সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন,—"The Nath Cult

নাথধর্ম-স্বরূপ

২৪। দ্রষ্টব্য—Obscure Religious Cults by Dr. Sasibhusan Das Gupta.

২৫। বাঙালির ইতিহাস।

seems to represent a particular phase of the Siddha Cult of India. This Siddha Cult is a very old religious cult of India with its main emphasis on a psychochemical process of Yoga, known as the Kāya-Sādhanā or the culture of body with a view to making it perfect and immutable and thereby attaining an immortal spiritual life"।[২৬] নাথ সিদ্ধাগণের প্রধান আদর্শ জীবন্‌-মুক্তির সাধনা। এই সাধকগণ অন্যান্য ধর্মাদর্শের ন্যায় দেহান্তে মুক্তির পরিকল্পনা করেন নি ;—অশুদ্ধ, মায়া-বিমুক্ত, ধ্বংস-রহিত পক্কদেহে তথা আধ্যাত্মিক দেহে মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করাই জীবন্‌-মুক্তির আদর্শ। যোগসাধন,—হঠযোগ সাধনই এই কায়সাধনের প্রধান পন্থা ছিল। গোরক্ষ-বিজয় গ্রন্থে গোরক্ষনাথ এই জীবন্‌-মুক্তাবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়ে থাকেন, এবং সাধন-পথ-বিচ্যুত মৃত্যু-পথ-গামী গুরু মীননাথকে কদলীর দেশ থেকে তিনি এই জীবন্‌-মুক্তির পথেই উদ্ধার করে আনেন। কায়-সাধনের মাধ্যমে অনুরূপ সার্থকতা লাভের পথেই গোবিন্দচন্দ্রকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন জননী ময়নামতী।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নাথাচার্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সকলেই আবির্ভূত হয়েছিলেন দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। ঐ সময়টি নাথধর্ম বিকাশের সর্বোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক যুগ। পরবর্তী কালে ক্রমশঃই এই ধর্ম সম্প্রদায়ের বিপর্যয় ঘটেছে, এবং অবশেষে 'যুগী' বা নাথ-উপাধিক তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজের মধ্যে এই ধর্মাবশেষ আশ্রয় লাভ করেছিল। মনে করা যেতে পারে,—নাথধর্মের এই শ্রেষ্ঠ যুগেই নাথ-সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটেছিল। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়ীপা, কানুপা, ময়নামতীর জীবদ্দশাতেই যদি তাঁদের নিয়ে আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত নাও হয়ে থাকে, তবু অব্যবহিত পরবর্তী কালেই ঐ সকল কাহিনী-কাব্যের কাঠামোটি অন্ততঃ সর্ব-ভারতীয় ভাষাতেই প্রচলন লাভ করেছিল, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ'কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন।[২৭] অন্যান্য যুক্তির মধ্যে ডঃ দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন,—সাধারণতঃ এই নাথ-কাহিনীগুলি গ্রাম্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক সমাদৃত এবং সংরক্ষিত

২৬। Obsure Religious Cults.

২৭। Obscure Religious Cults.

হ'তে দেখা যায়। অথচ কাহিনী দুটির বিষয়বস্তু অ-মুসলমানী ধর্ম-প্রভাবিত যে, তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ দাশগুপ্ত মনে করেছেন,—যে-সকল তথা-কথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু তুর্কী-আক্রমণের পরবর্তীকালে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন, তাদের হিন্দু-জীবনের ঐতিহ্য-রূপে ঐ সকল আখ্যায়িকা পরবর্তীকালেও সমাদৃত এবং সংরক্ষিত হয়েছিল।

ইতিহাসের ইঙ্গিত

তাছাড়া বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত

"যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্বলোকে আনন্দিত॥" ইত্যাদি অংশের

উদ্ধার করে অনেকে মনে করে থাকেন যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীতও নাথ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ঐগুলির তৎকালীন লোক-প্রিয়তাই প্রমাণ করে যে, নাথ-সাহিত্য চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে এদেশে সুপ্রচলিত ছিল। ঐ সকল গীতের কোনও পরিচয়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হতে পারে নি,—তাই অনাবিষ্কৃতের সম্বন্ধে কাল্পনিক গবেষণার কোন অর্থ নেই। কিন্তু নাথ-সাহিত্যাবলীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণও এই প্রসঙ্গে কিছুটা কার্যকরী হ'তে পারে বলে মনে করি।

ময়নামতীর গানের কাহিনীতে কথিত হয়েছে,—মানিকচন্দ্র রাজার পত্নী ময়নামতী ছিলেন নাথ-সিদ্ধা গোরক্ষনাথের শিষ্যা। উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জের প্রার্থনায় যমরাজ মাণিকচন্দ্রের অকাল-মৃত্যু বিহিত করেন। ক্রুদ্ধা ময়নামতী যোগ-শক্তির সাহায্যে যমরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠ্‌লে, গুরু গোরক্ষনাথের মধ্যস্থতায় ময়নামতী নিরস্ত হন;—স্থির হয়,—স্বামীর মৃত্যুর পরেও ময়নামতী পুত্রবতী হতে পারবেন। গোবিন্দচন্দ্র ময়নামতীর সেই পুত্র। এ-কথাও তখনই ঘোষিত হয়েছিল যে, গোবিন্দচন্দ্র হাড়ীপার শিষ্যত্ব স্বীকার করে যোগ-সিদ্ধ না হলে অষ্টাদশবর্ষে তার প্রাণহানি ঘটবে। সংসার ত্যাগ করে যোগী হবার জন্য ময়না গোবিন্দচন্দ্রকে নানাভাবে প্ররোচিত করতে থাকেন, কিন্তু বার বছর বয়সেই গোবিন্দচন্দ্র অদুনা এবং পদুনা নাম্নী দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন,—সঙ্গে ছিল তাদের 'শতনারী'। এদের নিয়ে গোবিন্দচন্দ্র তখন উপভোগমত্ত।—যৌবনোন্মাদ পত্নীগণের প্রেরণায় তিনি হাড়ীপা সম্বন্ধে

ময়নামতীর গান

মাতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গুরু গোরক্ষনাথ গোবিন্দচন্দ্রকে সন্ন্যাস জীবনে অশেষ দুঃখ ভোগের অভিশাপ দেন। যাই হোক, ময়নামতী অবিশ্বাস্য যৌগিক ক্ষমতা দেখিয়ে এবং বহু অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করে গোবিন্দচন্দ্রকে বশীভূত করেন। গুরু হাড়ীপার আদেশে ঝুলি-কাঁথা নিয়ে গোবিন্দচন্দ্র যোগিবেশ ধারণ করেন এবং দীর্ঘদিন গুরুপ্রদত্ত কষ্টসাধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে যোগসিদ্ধ অবস্থায় গৃহে ফিরে আসেন। পূর্বেই কথিত হয়েছে,—গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী সর্বভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার কারণ উদ্ধার করতে গিয়ে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মন্তব্য করেছিলেন,—"গোবিন্দচন্দ্রের মত একটি ভাগ্যবান যুবকের নবীন যৌবনে অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ার মত করুণ ঘটনা জগতে বড় বেশী ঘটে নাই—ভারতবর্ষে গোপীচাঁদের পূর্বে এবং পরে মাত্র এক একবার ঘটিয়াছিল।[২৮] গোবিন্দচন্দ্রের জীবন-কাহিনীর বেদনাবহ সংবেদনার কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই;—কিন্তু ঐ সমস্ত কাহিনীর মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত জীবনের যে আভাসিক পরিচয় পাওয়া যায়, তাই বিশেষ ভাবে লক্ষিতব্য। গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-সম্ভাবনা-ত্রস্তা বধূগণের আর্তির মধ্যে তাদের সম্ভাবিত বিরহ-কাতরতা অপেক্ষা যৌন-ভোগাশক্তির আকাঙ্ক্ষাই তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

সাহিত্যে জীবন-চিত্র

"যখন আছিনু আমি মা বাপর ঘরে।
তখন কেনে ধর্মি রাজা না গেলেন সন্ন্যাসী হইয়ে॥
এখন হইতু রূপর নারী তোর যোগ্যমান।
মোকে ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিমু পরাণ॥
তোমার আগে কাল যৌবন মোর পড়ুক গড়িয়া।
পাকিলে মাথার চুল যাবেন সন্ন্যাস হইয়া॥
এ রঙ্গ মালতীর ঘরে লইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়ে রঙ্গ-রূপ রাখিমু কত কাল॥
কতকাল রাখিমু যৌবন বান্ধিয়া ছান্দিয়া।
নিরবধি ঝোড়ে প্রাণ স্বামী বলিয়া॥"

২৮। ময়নামতীর গান—ভূমিকা।

বস্তুতঃ, সেই সময়কার নারীজীবনে ভোগাসক্তির একটি অসামাজিক অভিব্যক্তিই এই সকল সাহিত্যে লক্ষিত হয়ে থাকে। মাতার চরিত্রে গোবিন্দচন্দ্রের সন্দেহ-প্রকাশ-কালীন উক্তি এই সকল নৈতিক ব্যভিচারের চূড়ান্ত উদাহরণ। মনে করা যেতে পারে,—এই সকল কাহিনী গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক যুগ-জীবনেরই সাধারণ পরিচায়ক। আর বস্তুতঃ আলোচ্যযুগের সমাজ-জীবনও এই পরিচয়ই যে বহন করে,—ইতিহাস সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে একটি অংশ প্রণিধান-যোগ্য। গোবিন্দচন্দ্রের বৈবাহিক কাহিনীর বর্ণনাকালে উল্লেখ করা হয়েছে,—

"অদুনারে বিভা কৈল পদুনা পাইল দানে।" অন্যান্য লোভনীয় দান সামগ্রীর সঙ্গে শ্যালিকাকে দানরূপে লাভ করার প্রথা অভিনব বলেই মনে হয়।

সামাজিক অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত

ডঃ ভট্টশালী এই কাহিনীর স্বাভাবিকতার সমর্থনে জলপাইগুড়ি অঞ্চলে নববধূর সঙ্গে দাসী প্রদানের প্রথার উল্লেখ করেছেন। এ রকম প্রথা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কন্যার সঙ্গে দাসীর অনুগমন এবং শ্যালিকা দান একই প্রথার পরিচায়ক নয়। প্রসঙ্গান্তরে ডঃ গ্রীয়ার্সন যে সিদ্ধান্ত করেছেন,এই উপলক্ষ্যে তারই উদ্ধার করি—"The maid-servants may have been concubines, but not wives"[২৯]। আমাদের বক্তব্য,—পত্নীরূপে শ্যালিকার দান সম্ভবতঃ গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজ-জীবনেরই একটি আনুষ্ঠানিক চিত্র। এইরূপে অনুসন্ধান করলে—এই সকল পরবর্তীকালে রচিত এবং অনুলিখিত কাব্যের কাহিনী অংশে পূর্ববর্তী যুগের জীবন-পরিচয় আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। তাছাড়া, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত ময়নামতীর গান কিংবা গোরক্ষ-বিজয়ের পুথিগুলিতে কেবল কাহিনীর কাঠামো-গত ঐক্যই লক্ষিত হয় না, বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটির ব্যাপারেও একটা সাধারণ ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। এই ঐক্যের কারণহিসেবে প্রাচীন কাঠামোটুকুর ঐতিহ্যগত বহুল প্রতিষ্ঠার কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

পার্বতীদেবী কর্তৃক প্রলুব্ধ এবং শাপগ্রস্ত হয়ে আদি গুরু মীননাথ 'কদলীর' দেশে ব্যভিচারিণী নারী সম্প্রদায়ের প্রভাবে মোহগ্রস্ত ও ম্রিয়মান হন। শিষ্য

২৯। The song of Manik Chandra—Introduction.

গোরক্ষনাথ পরে নর্তকীর ছদ্মবেশে মৃদঙ্গের তালে তালে সাঙ্কেতিক ধ্বনি সৃষ্টি করে গুরুর জ্ঞানসঞ্চার এবং উদ্ধার সাধন করেন। মোটামুটি এইটুকুই গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে নাথ-বিশ্বাস-জাত যোগের মহিমা এবং নারী-ব্যভিচার-প্রধান সমাজচিত্রের গতানুগতিক বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।

গোরক্ষবিজয়

গোরক্ষ বিজয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"ইহা কাব্য নহে। বায়ুবিজয়-শাস্ত্র।"[৩০] অর্থাৎ কাব্যিক বা শিল্প-রচনাগত উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে গোরক্ষ বিজয়ে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রতিই ঝোঁক পড়েছে বেশি। ধর্মকথা যে শিল্প-কথা অনায়াসেই হয়ে ওঠে, চর্যাপদ তা'র উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আলোচ্য নাথধর্মের মধ্যেও ময়নামতী বা গোপীচাঁদের গান-এ ধর্মীয় বক্তব্য অনায়াসে কাব্য-রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে গোরক্ষ বিজয়ে ধর্মাদর্শের প্রতিষ্ঠাই আপেক্ষিক প্রাধান্য লাভ করেছে। তা হলেও গোটা গ্রন্থটির গাল্পিক আবেদন আগাগোড়াই একটা সজীব কৌতূহলের সৃজন ও রক্ষণে সমর্থ হয়েছে। তা ছাড়া কদলীর দেশে নর্তকীবেশে গোরক্ষ নাথের যন্ত্র-ধ্বনিমুখর তত্ত্বসংকেত কাব্যাংশকে বাগ্-বৈদগ্ধ্যময় উজ্জ্বলতা দান করেছে:—

গোরক্ষ বিজয়ের কাব্যত্ব

ঢিম ঢিম করিয়া মাদলে দিল সান,
কর্ণপথে যেন মত আবৃত হইল প্রাণ।
তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ঘাত,
সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই দুতে বাহে তাল,
ঝমকে ঝমকে শব্দ উঠে অতি ভাল।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলে করি ভর,
শূন্যেতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সর্ব নর।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে,
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।
হাতের ঠমকে নাচে গাও নাহি নড়ে,
আপনে ডুবাইলো ভরা, গুরু মোছন্দরে।

৩০। গোর্খবিজয়—বিশ্বভারতী:—ভূমিকা পঞ্চানন মণ্ডল।

সবশেষে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, গোরক্ষবিজয়ের জ্ঞান-প্রাচুর্যহীন কবিগণও লোক-কাব্য-রচনার একটি সিদ্ধ রূপাবয়বকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। গোরক্ষ বিজয়ের কাব্য-বিষয়ে স্পর্শ-কাতর আত্মলীনতার ছাপ নেই; এমন কি যৌন-চিত্রাদির বর্ণনায় রুচি ও চিন্তার রুক্ষ অমসৃণতাই ব্যক্ত হয়ে থাকে। চরম দৃষ্টান্ত হিসেবে নগ্নদেহা পার্বতী কর্তৃক গোরক্ষনাথের পরাভব সাধন-চেষ্টার উল্লেখ করা যেতে পারে। তা' সত্ত্বেও আলোচ্য কাব্য-দেহের রূপোজ্জ্বল অবয়ব-গঠন ও দীপ্তি সর্বকালের পাঠককে কৌতূহলাবিষ্ট করবে।

গোরক্ষ বিজয়ের সার্থক রূপাবয়ব

গোরক্ষ বিজয়ের যে সকল পুথি পাওয়া গেছে, তার সব কয়টিই যে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সে-কথা বলেছি। প্রাচীনতম পুথিটির লিপিকাল ১১৮৪ বঙ্গাব্দ। ঐ সকল পুথিতে বা পুথির বিভিন্ন অংশে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, ভীমদাস এবং শ্যামদাস সেনের ভণিতা পাওয়া গেছে।

গোপীচাঁদ বা ময়নামতীর গান-এর লেখকদের মধ্যে দুর্লভমল্লিক, ভবানীদাস এবং শুকুর মহম্মদের নাম সুপরিচিত। তা' ছাড়া নেপালে রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটক'-এর একখানি পুথিও পাওয়া গেছে।[৩১] আগেই বলেছি, গোপীচাঁদের গানের কাব্যাবেদন অপেক্ষাকৃত হৃদয়গ্রাহী। বাংলা, তথা ভারতবর্ষীয় ধর্মচেতনার মধ্যে বৈরাগ্যের প্রতি একটি সাধারণ শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। গোপীচাঁদের জীবনে সেই ত্যাগ-তিতিক্ষাময় সাধন-মহিমার সংগে যৌবনে বিবাগী হওয়ার কারুণ্য যুক্ত হয়ে ভারতীয় চেতনার কাছে এই কাব্যের আবেদনকে সহজ-সংবেদ্য করে তুলেছে। ফলে বাংলার এই কাব্যকাহিনী বৃহত্তর ভারতের নানা ভাষায় বিচিত্ররূপে ছড়িয়ে পড়েছে। ত্যাগ ও কারুণ্যের এই সমন্বয় বাংলা দেশেও কাব্যটির অতি-মূল্যায়নে সহায়ক হয়েছে। ফলে 'ময়নামতীর গান'কে বাংলা ভাষার মহাকাব্য-ধর্মী আদিম রচনার নিদর্শন বলেও উল্লেখ করা হয়ে থকে। কিন্তু পল্লীবাংলার অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোক-কবিদের কাছ থেকে পরিকল্পনার মহাকাব্যোচিত সংসক্তি এবং ব্যাপ্তির কোন কিছুই প্রত্যাশা করা উচিত নয়। তবু, আলোচ্য যুগের কাব্যধারায় এই আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য-কাঠামো একটি নূতনতর রূপ-বৈচিত্র্য যোজনা করেছে।

ময়নামতী বা গোপীচাঁদের গান

৩১। দ্রষ্টব্য :—বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড ২য় সং—ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত।

চর্যা কিংবা অন্যান্য গীতিধর্মী কবিতার পাশে গোরক্ষ বিজয় বা ময়নামতীর গানের কাহিনী-কাব্যের ধারাও বাংলা সাহিত্যের আদিযুগেই সংগ্রথিত হতে পেরেছিল,—সাহিত্য-ইতিহাসের পক্ষে এই তথ্য গৌরবজনক।

তা'ছাড়া, এই কাব্য-দুখানিতে সমকালীন লোক-জীবন-স্বভাবেরও একটি সাধারণ ছবি যে রূপায়িত হয়েছে, সে-কথাও আগেই বলেছি। ময়নামতীর গানের লেখকেরা সেই জীবন-রূপের সংগ্রন্থনে কবি-জনোচিত সংসক্তির পরিচয় দিতে না পারলেও, স্থানে স্থানে তাঁদের রচনা যেন সে যুগের লোক মুখ-কথাকে কাব্যমুখে হুবহু অনূদিত করে তুলেছে। রাজা গোপীচাঁদ যখন পত্নীদের প্ররোচনায় মাতাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে আহ্বান করেছিলেন, ময়নামতী তার জবাবে জানিয়েছিলেন :—

ময়নামতীর গানে লোক-জীবন-স্বভাব

"তোর বাপর খাওঁ না তোর রাজার বাপর খাওঁ।
তোমার হুকুমত কি পরীক্ষা দিবার যাওঁ॥"

গোপীচাঁদের মত পুত্রের জননীর রোষ-ক্ষিপ্ততার স্বাভাবিকতর,—জীবন্ততর প্রকাশ হয়ত অসম্ভব-প্রায়। আবার স্থানে স্থানে রচনার কারুণ্য অমসৃণ রুক্ষতার মধ্যে মর্মস্পর্শী হয়েছে। গোপীচাঁদের পতি-বিরহ-সম্ভাবিতা পত্নীর কাতরতা প্রকাশ করে কবি লিখেছেন :—

"তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙা চরণ বেড়িয়া লমু পলাইয়া যাবু কোথা॥"

একই ধরণের কাতরোক্তি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রায় সংস্কারানুগ (Conventional) হয়ে পড়েছিল। তবু, স্থান-কাল-পাত্রের বিশেষ পটভূমিতে এই নাথ-কবি-কথা স্বভাবতঃই অনায়াস স্পর্শকাতরতার সৃষ্টি করে।

পরিশেষে আবার বলি, কাহিনী-গ্রন্থন, চরিত্র-কল্পনা কিংবা জীবনসৃষ্টির অভিনবতার বিশেষ কোন কাব্যিক উৎকর্ষ এই সকল সাহিত্যে প্রত্যাশা করাই অন্যায়। তবু দুটি পরিচ্ছন্ন-রূপ কাহিনীর মাধ্যমে সেকালের জন-জীবনাবেদনকে উল্লেখ্য মুক্তি দিতে পেরেছে, এইটুকুই এই শ্রেণীর রচনার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

নাথ-সাহিত্যের ঐতিহাসিক কৃতি

তাছাড়া, সাহিত্য-ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় হবে,—চর্যা ও নাথ-সাহিত্যের লোক-জীবনের সাধর্ম্য এবং পরস্পর পরিপূরকতা। চর্যায় যা গীত, নাথ-সাহিত্যে সেই জীবনই কাহিনীরূপে শিল্পাভিব্যক্ত।

বাংলা সাহিত্যের আদি-পর্যায়ে লোক-ধর্ম-নির্ভর সাহিত্য-সাধনার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। আর, আদিযুগের বাংলা সাহিত্যে অভিজাত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সাধনার পরিচয় প্রত্যাশা করাই সংগত নয়। কারণ, আগেই বলেছি, জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যেতর ধর্মের পক্ষচ্ছায়া-তলেই আর্য ভারতীয় ভাষায় প্রাকৃতাদি লোক-ভাষার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি-লাভ সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির বিকাশ প্রায় কান্তভাবেই ঘটেছে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি, বাংলা দেশে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য ক্রমশঃ বাঙালি-জীবন-স্বভাব-চিহ্নিত হয়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু তা'হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ বিচারে এ'রা সংস্কৃত ভাষায় লেখা বাঙালির সাহিত্য। প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের মত-ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সংগে এই সকল রচনার ভাষাগত প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এ'রকম অবস্থায়, বাংলা স্বভাবাপন্ন সদুক্তি কর্ণামৃতের অজস্র সংস্কৃত পদ-কবিতা পাওয়া গেলেও নিছক বাংলা ভাষায় রচিত হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিষয়ক লেখা এযুগে সুলভ না হওয়াই স্বাভাবিক। তা'হলেও, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই ধরণের বাংলা রচনার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন আবিষ্কার করতে পারার দাবি করেছেন। মহারাষ্ট্রের চালুক্য বংশীয় রাজা তৃতীয় সোমেশ্বর ভূলোক মল্ল-র পৃষ্ঠপোষকতায় ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দে মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থ চিন্তামণি নামক বিশ্বকোষ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। তা'তে 'গীতবিনোদ' নামে একটি সংগীত-বিষয়ক আলোচনাংশে বিভিন্ন লোক-ভাষার সংগীতের নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। তারই কিছু শ্লোকাংশ বাংলা ভাষায় লেখা বলে ডঃ সুনীতি কুমার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। পদগুলো কৃষ্ণাবতার এবং গোপীলীলা বিষয়ক। তার একটি পদ নিম্নরূপ :—

ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত বাংলা সাহিত্য

মানসোল্লাসের শ্লোক

"জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিয়া কাতবীর্যা জিনে বাহু ফরসে খণ্ডিআ পরশরামু দেবু সে মোহার মঙ্গল করউ।"

—যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে বাহুস্পর্শে কার্তবীর্য খণ্ডিত করে জয় করেছিলেন,—সেই পরশুরামদেব আমার মঙ্গল করুন।"[৩২]

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান, পদ-ক'টি বেশ কিছুকাল আগেই লেখা হয়েছিল এবং কালে কালে গিয়ে পৌঁচেছিল মহারাষ্ট্রে। পরবর্তীকালে ডঃ সুকুমার সেন সংশয় করেছেন,—ঐ পদগুলোর ভাষা হয়ত মোটেই বাংলা নয়।[৩৩]

এ'ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বিষয়ক আরো কিছু বাংলা-স্বভাবযুক্ত অপভ্রংশ পদের পরিচয় ডঃ সুনীতিকুমার নির্দেশ করেছেন প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থে।[৩৪]

প্রাকৃত পৈঙ্গলের পদাংশ

এ'টি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রাকৃত ছন্দ-বিচারের উদ্দেশ্যে কোন অজ্ঞাতনামা লেখক রচনা করেছিলেন। বিশেষ করে প্রাকৃত পৈঙ্গলের একটি পদকে ডঃ সুকুমার সেন "মূলতঃ প্রাচীন বাংলা অথবা বাংলার ঠিক পূর্ববর্তী অপভ্রংশ" ভাষায় লিখিত বলে নির্দেশ করেছেন।[৩৫] পদটি কৃষ্ণের নৌকাবিলাস বিষয়ক :—

"আরেরে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোটি ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
তই ইথ নইহি সন্তার দেই জো চাহাহি সো লেহি॥"

এইসব অপূর্ণ এবং অকিঞ্চিৎকর রচনাংশ থেকে আলোচ্য শ্রেণীর সাহিত্যের কাব্যমূল্য নির্ণয় করা অসম্ভব। তা'হলেও এ-ধরণের প্রচেষ্টার ঐতিহ্যগত মূল্য কম নয়। আলোচ্য যুগের হিন্দু ধর্মে বিষ্ণু-সাধনার দু'টি পৃথক্ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি পৌরাণিক বিষ্ণুর প্রতি অনুরক্তির ধারা,—বিশেষভাবে মানসোল্লাসের দশাবতার স্তোত্রের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে 'প্রাকৃত' সমাজেও অভিজাতগণের এই দেবতার লৌকিক স্বীকৃতি ছিল। এই যুগেই রাধা-রমণ কৃষ্ণ-সাধনার দ্বিতীয় ধারাও হয়ত সূচিত হয়েছিল। তার লৌকিক পরিচয় পাই প্রাকৃত পৈঙ্গলের

ঐতিহাসিক মূল্য

শ্লোকাংশে। হয়ত এই লৌকিক রাধা-পরিকল্পনারই একটি সুপরিণত রূপ জয়দেব-কবির 'গীত-গোবিন্দে' লক্ষিত হয়ে থাকে। সাহিত্যে এবং ধর্মাদর্শের ক্ষেত্রে রাধার প্রথম আবির্ভাবের রহস্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।[৩৬] গাথা সপ্তশতীতে হালের একটি

৩২। ODBL দ্রষ্টব্য।
৩৩। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস। ৩৪। History of Bengal Vol I Ch XII
৩৫। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস।
৩৬। দ্রষ্টব্য—রাধার ক্রমবিকাশ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

শ্লোকে রাধার উল্লেখ আছে,—কিন্তু ঐ শ্লোকটির কাল নির্ণয় সম্ভব হয় নি। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন,—বাংলা দেশে "সেন-পর্বের কোনো সময়ে বোধ হয় অন্যতমা গোপিনী রাধা কল্পিতা হইয়া থাকিবেন।"[৩৭] এই রাধা পরিকল্পনার পেছনে ঐতিহাসিকেরা শাক্তধর্মের প্রভাব এবং অন্যান্য লোক-ধর্মের সাদৃশ্য অনুমান করেছেন। অন্য দিকে ডঃ নীহাররঞ্জন 'কৃষ্ণকীর্তনকে' মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসহজিয়া কাব্য বলে অভিহিত করেছেন। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকাংশের সহায়তায় বাংলা দেশে সহজিয়া আদর্শে রাধা-কৃষ্ণ লীলাসাধন-পদ্ধতির আদিম রূপের একটি সঙ্কেত হয়ত পাওয়া যায়,—এইখানেই এই শ্রেণীর রচনার ঐতিহাসিক মূল্য। ডঃ সুনীতিকুমার প্রমাণ-সিদ্ধ অনুমান করেছেন যে, আদিযুগের হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য আদর্শ-নির্ভর বাংলা সাহিত্যের সব কিছুই ছিল গীতি-ধর্মী।

আদিযুগের ধর্ম-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের পরিচয় উদ্ধার এখানেই শেষ হ'ল। কিন্তু এই যুগে ধর্ম-ব্যতিরিক্ত বিষয়ে রচিত সাহিত্যেরও আভাস পাওয়া যায়। শেকশুভোদয়ার উনবিংশ অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় রচিত একটি প্রেম বিষয়ক পদ পাওয়া গেছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পদটির বিচার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, পদটি তুর্কী-আক্রমণের পূর্ববর্তী যুগের রচনা,—পরবর্তী কালে ভাষান্তরিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় রচিত প্রেম-গীতির অন্য কোন পরিচয় এ যুগে পাওয়া না গেলেও প্রাকৃত পৈঙ্গলে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী থেকে প্রমাণিত হয়, এ যুগের প্রাকৃত বাঙালি তথা লোক-সাধারণ ভক্তি কিংবা হাস্যরসের সঙ্গে আদি রসের চর্চায়ও পরাঙ্‌মুখ ছিল না।

লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত

প্রেম-গীতি রচনায়ই নয়,—নিছক গাল-গল্পেও সেদিনকার বাঙালি যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল,—রূপকথা-কাহিনীর বিচার করে ডঃ দীনেশচন্দ্র তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই শ্রেণীর অদ্ভুত গল্পাবলীর অভ্যন্তরে বাংলার প্রাচীনতম যুগ-জীবন-ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ডঃ সেন মনে করেছেন,—বাংলার রূপকথা আর লৌকিক ব্রতকথা প্রাচীন বাঙালির গল্প-রস-প্রিয়তারই নিদর্শন। এ অনুমান হয়ত অসঙ্গত নয়,—

৩৭। বাঙালির ইতিহাস। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য—History of Bengal Vol I Ch XIII

কিন্তু আজ এই সকল রচনার প্রাচীন ঐতিহ্য আবিষ্কারের উপায় নেই,—লেখকদের পরিচয় উদ্ধারেরও কোন অবকাশ নেই,—"রূপকথার রচয়িতার কোন নামকরণ হয় নাই। সমস্ত লৌকিক সাহিত্যের ন্যায় এখানেও লেখক একটি সমগ্রজাতির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছেন,......।"৩৮

রূপকথা

ডঃ নীহাররঞ্জন বলেন,—"ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলি বাংলা দেশে আজও প্রচলিত, তাহাও বোধ হয় প্রাক্‌তুর্কী আমলের চল্‌তি প্রবাদ সংগ্রহ; কালে কালে তাহাদের ভাষা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে মাত্র।" পণ্ডিতেরা একথা সাধারণভাবে সকলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'ডাক' এবং খনার পরিচয় আবিষ্কার আজ আর সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রকারের অর্থহীন বিতর্কে কেবল সংশয়ই বাড়ে। এই সব ছোট ছোট প্রবাদ-প্রবচনাংশে আদিম যুগের বাঙালির আধিভৌতিক মঙ্গল-বুদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া যায়,—তারই ঐতিহ্যটুকু এ-সকল রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই প্রসঙ্গেই সামাজিক মঙ্গল-বোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন শুভঙ্করের আর্যাবলীর কথাও স্মরণ করার যোগ্য। এই আর্যাবলীর মধ্যে প্রাকৃত-শব্দ-প্রাচুর্যের ঐতিহাসিক সঙ্কেতও অবশ্য-লক্ষণীয়। লেখক এবং তাঁর মূল লেখা হারিয়ে গেছে, তবু আদিযুগের বাঙালির চিন্তা-সম্পদ আজও পর্যন্ত কিংবা তারও পরে চিরকাল বাঙালির আধিভৌতিক জীবন-সাধনার মাঙ্গলিক পথ নির্দেশ করছে,—করবে,—এইখানেই এই শ্রেণীর সাহিত্যের সার্থক মূল্য।

'ডাক' ও 'খনা'র বচন

আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা এখানেই শেষ হ'ল। এর পরে বাংলা সাহিত্যের যা কিছু পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কোনটিরই রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর আগে অনুমান করাও চলে না। ইতিমধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় তুর্কী আক্রমণ ও তার ফলশ্রুতি বাংলার প্রাচীন রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থ- এবং ধর্মনৈতিক পটভূমিকাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করেছে। ফলে, তখনকার সাহিত্যও রূপে এবং ভাবে এক অভিনবতার পরিচয় নিয়ে হয়েছে আবির্ভূত। সাহিত্যের এই অ-পূর্ব ভাব-রূপগত পরিচয়ই ইতিহাসের দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের

আদিযুগ-সমাপ্তি

৩৮। বাংলা সাহিত্যের কথা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আকর। তাই ত্রয়োদশ শতাব্দী-উত্তর সাহিত্যসাধনার সার্থক মূল্য-নির্দেশ সম্ভব হবে মধ্য যুগের যুগ-বৈশিষ্ট্যের পটভূমিকায়। অবশ্য তার আগে আদি যুগের সাহিত্যের একটা সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রয়োজন,—সেই মূল্য-বোধের পটভূমিতেই রচিত হয়েছে অনাগত যুগের মূলভিত্তি।

এ-পর্যন্ত অনুসৃত আলোচনা থেকে দেখা গেছে,—আদিযুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ছিল ধর্মপ্রধান। ধর্মেতর বিষয়ে সাহিত্য-রচনার আভাস-ইঙ্গিত যতটুকু পাওয়া গেছে তা পর্যাপ্ত নয়। তা'ছাড়া, ধর্ম-ব্যতিরিক্ত বিষয়ে সাহিত্য-কৃতির একটি ধারার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েও বল্‌তে পারা যায় যে, সে-যুগের সকল প্রকার জীবন ও শিল্প-কর্মের কেন্দ্রে ছিল নিরবচ্ছিন্ন ধর্মচেতনা। আর, এই ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে অভিজাত এবং লোকবাংলার জনসমাজ যুগপৎ ছিল অসংখ্য খণ্ড-বিচ্ছিন্ন। একমাত্র স্মার্ত হিন্দু সমাজের পরিকল্পনাতেই আলোচ্য যুগের বাংলায় কেবল ৪১টি বর্ণসঙ্কর জাতিরই উল্লেখ করা হয়েছে; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির শ্রেণি-পার্থক্যের ত কথাই নেই।[৩১] এই শ্রেণী ও জাতি-স্বাতন্ত্র্যের অজস্রতা সত্ত্বেও ধর্ম-সংঘাতের উল্লেখ্য প্রমাণ যে সে-যুগে ছিল না, একাধিক বার সে কথা বলেছি। তা'ছাড়া সীমাবদ্ধ ভাবে হলেও আন্তঃ-শ্রেণিক বিবাহ ও আহারাদির সামাজিক সম্পর্ক হেতু শ্রেণিগত বিভেদ মারাত্মক হয়ে উঠ্‌তে পারেনি।

ইতিহাসের ফলশ্রুতি

অপরপক্ষে এই বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীদের মধ্যে ধর্ম-নির্ভর এক ধরণের ঐতিহ্য-স্বাতন্ত্র্যের বোধ-ও অনেকটা দৃঢ়বদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত থেকে জানা যায়, ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, এমন কি, ভাষা-নির্ভর জাতীয়তা-বোধও সে যুগে সুগঠিত হতে পারে নি। বাংলা ভাষার তখন সবে জন্মলগ্ন হয়েছে আভাসিত। রাষ্ট্রিক এবং ভৌগোলিক দিক্ থেকেও বঙ্গ, সুহ্ম, রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট সম্পূর্ণ ঐক্য-সমন্বিত একক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূ'ত হয়ে ওঠে নি তখনো। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মাচার্যগণ এবং তাঁদের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্মগত ঐতিহ্য-স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজেদের সীমায়িত করে রেখেছিলেন। ফলে, এই আত্মশ্লাঘা ও স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির জয়গান মুখ্যতঃ উদ্গীত হয়েছে এ-যুগের সাহিত্য-কর্মেরও মধ্যে। চর্যাপদ-কর্তাগণ বেদাদি আনুষ্ঠানিক ধর্মের তুলনায় নিজেদের দেহাচার-প্রধান

এবং বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ-স্বভাব

৩১। দ্রষ্টব্য History of Bengal Vol. I, Ch XV.

অনুভব-বেদ্য ধর্মসাধনার জয়গান করেছেন; নাথপন্থীরা কায়াসাধনাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে কীর্তিত করেছেন; ধর্মসম্প্রদায়েরা (cult) ঘোষণা করেছেন নিজেদের ধর্মচর্যার অনন্যতুল্য উৎকর্ষ-কাহিনী।

আগেই বলেছি, এই আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মূলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি ছিল না কোথাও। একে-অন্যের চিত্তাকর্ষক উপাদানটুকু নিজ নিজ মতে ও পথে আহরণ করে স্বী-কৃত (Assimilate) করে নিয়েছে। ফলে এ-যুগের বাংলায় প্রত্যেক প্রকার ধর্মাচরণের মধ্যেই একটি স্বতন্ত্র হলেও বিমিশ্র ধর্মরূপ লক্ষ্য করা চলে। বাংলা তথা ভারতের ধর্মক্ষেত্রে এই বিমিশ্রতার স্বভাব কালে কালে সমন্বিত হয়ে ঘনপিনদ্ধ হয়ে চলেছে দীর্ঘদিন,—হয়ত চল্‌ছে আজও।

যাইহোক্, আদি যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্যেতর লোকধর্মের দ্বারাই সমধিক প্রভাবিত হয়েছিল। আর, এই সকল ধর্মের সাধারণ উপাদান ছিল আর্য-পূর্ব বাংলার মৌলিক ধর্ম-স্বভাব বলে কথিত তান্ত্রিক দেহাচার-পদ্ধতি। এই প্রসংগে স্মরণ করি, চর্যাপদাবলীর অন্তর্নিহিত ধর্ম-বোধ নিছক বৌদ্ধ নয়;—বৌদ্ধ সহজিয়া (তান্ত্রিক) ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। নাথ ধর্মেও রয়েছে দেহাশ্রিত যোগ সাধনার কথা। এমন কি ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রভাবিত যে-দুটি শ্লোকাংশ পাওয়া গেছে তা'তেও রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের দেহাশ্রিত প্রণয়-কলার ইঙ্গিত।

ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন, বাংলার আর্য-পূর্ব যুগের ধর্মাচরণে এই দেহ-নির্ভর অথচ আবেগ-স্বভাব সাধন-পদ্ধতি একান্ত হয়েছিল। জৈন, বৌদ্ধ অথবা হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য আর্য-ধর্ম বাংলা দেশে অনুপ্রবিষ্ট হবার পরেও এই ধর্মগত ঐতিহ্য বৃহত্তর আদিম জনতার মধ্যে কোন-না-কোন রূপে অক্ষুন্ন ছিলই। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যাদি আর্যধর্ম থেকে ঐ সকল লোকধর্ম অবশ্য অনেক উপাদান সংগ্রহ করে আয়ত্ত করেছিল। অপর পক্ষে, ঐ সকল লোকধর্মের স্থানীয় প্রভাবে আর্যধর্মসমষ্টিও বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হয়েছে। এইরূপে বিশুদ্ধ হীনযান অথবা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের স্থলে কখন যে সহজযান, বজ্রযান ইত্যাদি তান্ত্রিক ধর্ম-সম্প্রদায় একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করে বসেছিল, তার ইতিহাস আজ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। চর্যাপদে সহজ-সাধক সিদ্ধাচার্যগণ নিজেদের ডোম, চণ্ডাল, শবর ইত্যাদি অভিধায় পরিচায়িত

করেছেন। শবর বাংলাদেশের আদিমতম অধিবাসী জাতিগুলির একটি। আর্য-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি অন্ত্যজতম জাতিরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে, এ'রাও ছিল বাংলার আদিমতম আর্যেতর জাতির দুর্বল উত্তরসূরী। বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সহজিয়া ধর্মের উৎসভূমি ছিল ঐ আদিম জীবনেরই মর্মমূলে। কালে কালে আলোচ্য ধরণের ধর্মসাধনার সংগে ঐ আদিম জীবন-স্বভাবের ঐতিহ্য নিশ্চয়ই অঙ্গাঙ্গিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই, নাগার্জ্জুন-গুরু সরহপাদের মত পণ্ডিতও যখন এই ধর্মবিষয়ক সংগীত রচনা করেছেন, তখনও গুহ্য ধর্মকথার বাহ্য রূপাবয়ব অপরিহার্যভাবে সংগৃহীত হয়েছে ডোম্-ডোম্নী, চণ্ডাল-চণ্ডালিনী, শবর-শবরীর জীবন-পটভূমি থেকে। চর্যার সদ্য-অঙ্কুরিত বাংলা ভাষা-গীতির মধ্যে এইরূপে আর্য-বৌদ্ধ মনীষার সংগে জড়িয়ে পড়েছে লোক-বাংলার আবেগ-স্বভাব জীবন-ধর্ম। ফলে, একদিক থেকে চর্যার ধর্মগত ঐতিহ্য যেমন সমন্বয়মূলক (Synthetic), তেম্নি তার সাহিত্যিক স্বভাব, আগেই বলেছি, আত্মশ্লাঘাময় স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি প্রভাবে একান্ত মন্ময়,—Subjective। এই স্বতোবিচ্ছিন্ন, আত্মশ্লাঘাময়, পৃথক্-ঐতিহ্য-দম্ভী, দেহাতুর মন্ময় স্বভাবাপন্নতাই আদি যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আর এ'টি কেবল বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না,—আলোচ্য যুগের বাঙালির সাহিত্য মাত্রই ছিল এই স্বভাব-পুষ্ট। তখনকার দিনের অভিজাত ব্রাহ্মণ্য-চেতনা বাংলা দেশেও সংস্কৃত ভাষায় স্বীয় চিন্তা-ভাবনাকে অভিব্যক্ত করেছে। চর্যার অ-পুষ্ট বাংলা ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ দুর্বল এবং অস্পষ্ট ব্যক্ত আছে, বাংলা স্বভাবাপন্ন আলোচ্য যুগের সংস্কৃত কাব্য-কবিতায় তা স্পষ্টতম হয়ে উঠেছে। আর এই ধারার অনন্যতুল্য একক প্রতিভূ জয়দেব গোস্বামীর রচনায় সেই আদি যুগ-লক্ষণ পরিণত-তম মুক্তি পেয়েছে বলেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি আদি ও মধ্যযুগ-স্বভাবের অপরিহার্য সংযোগ-সেতু রূপে বিরাজিত রয়েছেন। অন্যতর উপাদানের অভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পথ যেখানে হঠাৎ অনালোকিত আচ্ছন্ন হয়েছে, মধ্যযুগ-জীবন-চেতনার আলোক যখন প্রথম রশ্মিপাতও করেনি, বাংলা সাহিত্য-স্বভাবের সেই প্রদোষ লগ্নের একমাত্র প্রাণ-বর্তিকারূপে জয়দেব গোস্বামী আদি ও মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণে অবশ্য স্মরণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদিযুগ-পরিণতি ও কবি জয়দেব

জয়দেব সংস্কৃত ভাষার কবি। একদা পণ্ডিতেরা অনুমান করেছিলেন, জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' মূলতঃ তৎকালীন বাংলার 'প্রাকৃত' ভাষাতেই লিখিত হয়েছিল; পরে এক বা একাধিক সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় তার রূপান্তর সাধন করেছেন। কিন্তু এ ধরণের সংশয় আজ অমূলক বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। গীত গোবিন্দের বিশ্রুত কীর্তি ছাড়াও জয়দেব-কবি-প্রতিভার বিচিত্রতর অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে সদুক্তি কর্ণামৃত এবং সুভাষিতাবলীতে। আর, শিখদের 'আদি-গ্রন্থে'র বিশ্লিষ্ট অপভ্রংশে লেখা দু'টি মাত্র পদ ছাড়া জয়দেবের নামে প্রচলিত অপর সকল রচনাই সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী। যুগ যুগ ধরে ভারতের নানা প্রান্তীয় রসিক-ঐতিহাসিক বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতির ঐতিহ্য-ধারাতেই জয়দেবীয় কবি কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখেছেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে জয়দেবের কাব্য-কলার আভিজাত্য এবং লোকোত্তর আবেদন-বৈশিষ্ট্য অন্ততঃ প্রতিপাদিত হতে পেরেছে। এ'রকম অবস্থায় অনভিজ্ঞাত 'প্রাকৃত'জ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেব-প্রসংগ অবতারণার সঙ্গতি বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে বাধা নেই।

আলোচনার কারণ

পূর্বকথা অনুসরণ করলে দেখব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিমার্গ বেয়েই গীতগোবিন্দ বাংলা ভাষা-সাহিত্য-প্রবাহের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী এবং অন্যান্য বৈষ্ণব কবি-কর্মের সংগে গীত-গোবিন্দ-রসও তদ্গত চিত্তে আস্বাদন করেছিলেন, স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী তার প্রমাণ দিয়েছেন :—

ভক্তিপ্রধান পূর্বসূত্র

"চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি · রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে · মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

অতএব, প্রেম-বিহ্বল মহাপ্রভুর আস্বাদন-মাহাত্ম্যে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির বাংলা-মৈথিল ভাষার পদাবলীর সংগে জয়দেবের দেবভাষাশ্রয়ী পদাবলীও বৈষ্ণব ভক্তির সমসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে,—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সজীব উৎকর্ষের প্রাণ-কেন্দ্র ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। আর, বৈষ্ণব ভক্তিময় ঐতিহ্য-প্রীতিই প্রথমে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক বাঙালির দৃষ্টি-গোচর করেছিল। বৈষ্ণব পদাবলী অধুনা-পূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ফলে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় সমার্থ-বাচক হয়ে পড়েছিল। সেই ভক্তি-প্রবল ঐতিহ্যের সূত্র বেয়েই জয়দেব-পদাবলী একদা বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের, তথা বাংলা সাহিত্যেরও অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্ম-নির্ভর হলেও, কেবল ধর্মগত ভক্তি-বিশ্বাসের দৃষ্টি-কোণ থেকে কোন কালের সাহিত্য-ইতিহাসের পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

অতএব, জয়দেব-পদাবলীকে মূলতঃ সংস্কৃত-সমুদ্ভব সাহিত্য জেনেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার ধর্ম-নিরপেক্ষ আবেদন নির্ধারণের নূতন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর, পূর্ববর্তী একাধিক অধ্যায়ে বলেছি, বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ-স্বভাবের পরিণততম বিকাশ-লক্ষণ জয়দেব-পদাবলীতে অভিব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্য-ধারায়ও সেই পরিণত ঐতিহ্যের সহজ অনুসৃতি ঘটেছে বলেই আমাদের ধারণা। প্রধানতঃ এই ঐতিহাসিক সম্পর্কের গ্রন্থি মোচনের জন্যই বর্তমান অধ্যায়ের অবতারণা।

আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রয়োজন

এদিক্ থেকে জয়দেব-পদাবলীকে অন্ততঃ কেবল ভাবের বিচারেই নয়, ভাষার দিক থেকেও আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভূত করতে কোন বাধা নেই বলে মনে করি। প্রথমতঃ স্মরণ রাখতে হবে, বাংলা সাহিত্যের এই আদিযুগে বাংলা ভাষার সম্ভাবনা সদ্য-অঙ্কুরিত হয়ে থাকলেও, সেই ভাষা কোন স্বতন্ত্র রূপ মূর্তি গ্রহণ করতে পারেনি। চর্যাপদের কয়েকটিমাত্র নিঃসংশয়িত বাংলা শব্দ-ধাতু-মূলের আশ্রয় হয়ে আছে আদ্যন্ত প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষার কাব্যিক অনুসৃতি। চর্যাপদাবলীতে বাংলা ভাষা-স্বভাব এতই অ-স্বচ্ছ ছিল

জয়দেব বাঙালির,—বাংলা সাহিত্যের কবি

যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশুদ্ধ অপভ্রংশে রচিত দোহাকোষ ও ও ডাকার্ণবের ভাষার সংগে চর্যার ভাষার কোন পার্থক্য খুঁজে পান না। আর, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও চর্যার বাংলা-ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক ভাষা-তাত্ত্বিক গবেষণার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এদিক্ থেকে কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা স্বয়ং-স্বতন্ত্রভাবে বাংলা-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই, পণ্ডিতেরা কেউ কেউ কৃষ্ণকীর্তন থেকেই বাংলা ভাষার আদিযুগ কল্পনা করতে চেয়েছেন; অন্ততঃ কৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত এই আদিযুগ-ধারাকে প্রসৃত করার দিকেই অনেকের ঝোঁক রয়েছে।

কিন্তু, প্রত্যেক সাহিত্যেরই এক একটি মৌল-চরিত্র থাকে; সেই চারিত্র-স্বাতন্ত্র্যই এক ভাষার সাহিত্যকে অন্য ভাষার সাহিত্য থেকে পৃথক্ করে থাকে। সেই চারিত্র লক্ষণের জন্ম-লগ্ন থেকেই বিশেষ সাহিত্যেরও যাত্রা-পথের আদি-সূচনা। পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি, চর্যাপদাবলীতেই বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সেই মৌল-স্বভাব স্পষ্ট-সংজ্ঞক হয়ে উঠেছিল; কৃষ্ণকীর্তনে সেই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যেরই পরবর্তী পর্যায় অভিব্যক্তি পেয়েছে। আর, বাংলা সাহিত্যের সেই স্বভাব-গুণ হচ্ছে,—আগেই বলেছি,—যুগপৎ আবেগধর্মী সমন্বয়-আকাংক্ষা ও সচেতন স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি। বাংলার অভিজাত-অনভিজাত সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে যে বিচিত্র ধর্মাচরণ ও জীবন-চেতনা দিকে দিকে অঙ্কুরিত বিকশিত হচ্ছিল, তার প্রত্যেকটি থেকেই কিছু-না কিছু আহরণ করে সে-যুগের ধর্ম-নির্ভর সাহিত্যাবলী আপন স্বতন্ত্র স্বভাবকে গড়ে তুলেছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ধর্ম-নির্ভর সাহিত্যের আলোচনা প্রসংগে এই সত্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছি। চর্যাপদাবলীতে এই সাহিত্য-লক্ষণ স্বতোভাস্বর।

ভাষার বিচারেও,—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতিপন্ন করেছেন,—বাংলা ভাষার আদিযুগ-লক্ষণ চর্যাপদাবলীতেই নিঃসংশয় অভিব্যক্তি পেয়েছে।

জয়দেবের ভাষা বাংলা-স্বভাবিত

কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় চর্যা-ভাষারই পরিচ্ছন্নতর পরিণত-পর্যায় বিকশিত হয়েছে। অতএব, চর্যাপদাবলীতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিযুগ যুগপৎ জন্মলাভ করেছে, তাতে সংশয় নেই। কিন্তু সেই সদ্যো-সঞ্জাত ভাষা-সাহিত্য নবজাত মানবকের মতই মাতৃক্রোড় আশ্রয় করে রয়েছে। চর্যাপদে বাংলা সাহিত্য-

শিশুর সেই ধাত্রীত্ব করেছে প্রাকৃত-অপভ্রংশের কাঠামো ; জয়দেব-পদাবলীতে তথাকথিত সংস্কৃত ভাষা আসলে নবজাত বাংলা ভাষা-সাহিত্যেরই মাতৃরূপা। নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেছেন, "সংস্কৃত ছন্দে রচিত বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি ছাড়িয়া দিলে, যে রাগমূলক পদাবলী গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে রচিত হইলেও, এই ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গি যতটা প্রাকৃত বা দেশি ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী, ততটা সংস্কৃতের নহে"।[১] ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যাদির সাহায্যে অনুমান করা চলে,—গীত-গোবিন্দের সংস্কৃত ভাষা কেবল প্রাকৃত-প্রধানই নয়, মূলতঃ প্রাকৃত-সম্ভব। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,—"The Buddhist Sanskrit of early centuries after Christ, which is the result of an attempt to make Prākṛt look like Sanskrit, was no longer cultivated by the Buddhists, for they as much as the Brāhmaṇs took to writing correct or grammatical Sanskrit. But the radition of a loose Sanskritized Vernacular or (Vernacularised Sanskrit), as a later development of Buddhist Sanskrit continued in Bengal down to post-muhammodan times,......... ।[২]

ডঃ সুনীতিকুমার অবশ্য গীতগোবিন্দের প্রাকৃত লক্ষণান্বিত পদগুলো মূলতঃ প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হওয়ার সম্ভাব্যতাতেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু, পণ্ডিতেরা অধুনা যখন গীতগোবিন্দের গীত-ভাষার সংস্কৃত-মূলকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়, তখনও উদ্ধৃত তথ্যের সাহায্যে অনুমান করতে বাধা নেই যে, শিথিলবন্ধ ঐ সংস্কৃতায়িত লোকভাষা (Sanskritized Vernacular)-এর পূর্বৈতিহ্যই জয়দেব পদাবলীর অভিনব ভাষা-কর্মের প্রেরণা যুগিয়েছিল। এই প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে যে,—আগমাদি তন্ত্রশাস্ত্রের ভাষাতেও Sanskritized Vernacular-এর পরিচয় বহুল। গীত-গোবিন্দের গীতপদাবলীর একটিও সমকালীন সংস্কৃত সুভাষিত-সংগ্রহ সদুক্তিকর্ণামৃত কিংবা সুভাষিতাবলীতে গৃহীত হয় নি, অথচ গীতগোবিন্দেরই বর্ণনাত্মক সংস্কৃত শ্লোকগুলো তা'তে স্থান পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে

১। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ (ভূমিকা)—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
২। History of Bengal Vol—I. Ch—XII

অনুমান করা যেতে পারে,—ঐ সকল জয়দেব-পদাবলী আসলে "দেশীয় ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির অনুকরণে রচিত ধ্রুবপদ সমন্বিত গান"।[৩]

অতএব, ভাষাগত বিচারে জয়দেব-পদাবলী যে-পরিমাণে সংস্কৃত, ততোধিক পরিমাণে সদ্যোজাত বঙ্গভাষা-সাহিত্যের ধাত্রীরূপা, একথা মনে করতে বাধা নেই। আর, কেবল এই কারণেও বাংলা ভাষার সাহিত্য-ইতিহাসে জয়দেব-পদাবলীর অনুপ্রবেশ অনধিকার প্রবেশ নয়। এবারে দেখ্‌ব, জয়দেব-পদাবলীর রূপাবয়বে বাংলা ভাষার কাব্য-স্বভাব কেবল বিধৃত-ই হয়নি, মুক্তি পেয়েছে অনাগত যুগ-সম্ভাবনার পথে।

গীতগোবিন্দের রূপাবয়বে বাংলা কাব্য-রূপের পূর্ব-সম্ভাবনা চর্যাপদের চেয়েও স্পষ্টতর রূপে ব্যক্ত হয়েছে। সংস্কৃত কবিতার ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস বারিত না হলেও পদান্তমিল (rhyme) স্বাভাবিক নয়; আবার প্রাকৃত অপভ্রংশ ছন্দের একটি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই অন্ত্যমিল। পরবর্তীকালের বাংলা পয়ারাদি ছন্দেও এই অন্ত্যমিল অপরিহার্য। গীতগোবিন্দের গীতাংশকেই প্রধানতঃ প্রাকৃত-স্বভাবাপন্ন মনে করা হয়; ঐটুকুই আসলে 'মধুর-কান্ত পদাবলী।' তাছাড়া বারটি সর্গে বিভক্ত গীতগোবিন্দের প্রত্যেক সর্গেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দে লেখা এক বা একাধিক শ্লোক রচিত হয়েছে। তা'তে যে কেবল অন্ত্যমিলই অনুপস্থিত, তা নয়; ছন্দ এবং শব্দপ্রয়োগগত লক্ষণেও ঐ সকল শ্লোক অবিমিশ্র সংস্কৃত। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি শ্লোক উদ্ধার করি:—

গীতগোবিন্দ ও বাংলা কাব্য-রূপের সম্ভাবনা

বিহরতি বনে রাধা সাধারণ প্রণয়ে হরৌ
বিগলিত নিজোৎকর্ষাদীর্ষাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রত মণ্ডলী—
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্॥

এরই পাশে গীতাংশের বিখ্যাত পদটিও পড়ি:—

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং॥

৩। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ (ভূমিকা)।

কেবল শব্দ প্রয়োগগত পার্থক্যই নয়, ওপরের দু'টি শ্লোকের ছন্দো-প্রয়োগগত মৌল পার্থক্যও অনায়াসে বোধগম্য হয়ে থাকে। গীতগোবিন্দের গীতাবলীর ছন্দ মাত্রাপ্রধান হলেও তা প্রাকৃত-অপভ্রংশ স্বভাব-যুক্ত, সংস্কৃতের সঙ্গে তার পার্থক্য আমূল। এই পদাবলীর বহুস্থানে অপভ্রংশ ষোল-মাত্রিক পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তা'র বিন্যাস-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন জয়দেবের পাদাকুলক মাত্রা-ছন্দের বিশ্লিষ্টতার মধ্যেই বাংলা অক্ষরছন্দ পয়ারের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটিমাত্র চরণের উল্লেখ করা যেতে পারে :—

× × ×   × × × × | × × × × | — —
বি হ র তি | হ রি হ র | স র স ব | স ন্তে

পাদাকুলক ছন্দের প্রতি চরণ, আগের অধ্যায়ে বলেছি, ষোল মাত্রাবিশিষ্ট হয়ে থাকে ;—চার মাত্রা যুক্ত চারটি পদের সমষ্টি। ওপরের চরণটি আসলে চৌদ্দ অক্ষরের সমষ্টি ; শেষ পদের অক্ষর-দু'টিকেই দীর্ঘ-মাত্রাযুক্ত করে ষোল মাত্রা রচনা করা হয়েছে। উচ্চারণ-গত শিথিলতার ফলে এই ষোল মাত্রা অনায়াসে চৌদ্দ অক্ষরে পর্যবসিত হতে পারে। আর অনুরূপ সম্ভাবনার পরিণতিতেই ক্রমশঃ ষোল মাত্রার 'পাদাকুলক'-এর পরিবর্তে বাংলা ভাষায় চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার গড়ে উঠেছে। গীতগোবিন্দের গীতাংশে এ-ধরণের পদ অজস্র রয়েছে :—

গীতগোবিন্দের ছন্দ

× × × × | — × ×   × × × |
হ রি প রি | র ম্ভ ন   ব লি ত বি | কা রা

× × × × | — × ×   × × × ×
কু চ ক ল | সো প রি   ত র লি ত   হা রা

× × × × × × × × × × × ×
বি চ লি ত দ ল ক ল লি তা ন ন চ ন্দ্রা

× × × × — × × × × × × | — —
ত দ ধ র পা নঁ র ভ স কৃ ত | ত ন্দ্রা

— × ×   — × ×   × × × × | — —
চ ঞ্চ ল   কু ণ্ড ল   ল লি ত ক | পো লা

× × × × × × × × | × × × ×
মু খ রি ত | ব স ন জ | ঘ ন গ তি | লো লা

× × × ×	— × ×	— × ×	× × —
দ য়ি ত বি	লো কি ত	ল জ্জি ত	হ সি তা
× × × ×	— × ×	× × × ×	× × —
ব হু বি ধ	কূ জি তা	র তি র স	র সি তা

এই ছন্দ রচনায় মাত্রাগত হ্রস্ব-দীর্ঘতার কড়াকড়ি লুপ্ত হয়েছে-যে, তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। মাত্রার প্রতি অবধানতার অনুরূপ অভাববোধই ১৪ অক্ষরের ষোলমাত্রিক জয়দেবীয় পাদাকুলকছন্দকে পয়ার রূপ দান করেছে। এই সংগে অন্ত্যমিল পয়ার-ধর্মকে আরো কত নিবিষ্ট করে তুলেছে, তা লক্ষ্য করবার মত।

তা'ছাড়া, বিভিন্ন ধরণের অর্থবিন্যাসের দিক্ থেকেও জয়দেব-পদাবলী যে বাংলা-ধর্মী, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সে-কথা ব্যক্ত করেছেন :—"সংস্কৃত কবিতা সাধারণতঃ পাদচতুষ্টয় সমন্বিত এক একটি stanzaয় পর্যবসিত ; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। এই শ্লোকগুলি কখনো সম্বদ্ধ, কখনো অসম্বদ্ধ ; কিন্তু এক একটি শ্লোক প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবের জ্ঞাপক। পদাবলীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলিকে ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। গানের মত পৃথক্‌রূপে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক হইলেও এগুলিকে সমষ্টিভাবেই ধরিতে হইবে এবং অন্তে নিবিষ্ট refrain বা ধ্রুবপদই ইহার ভাবপরম্পরার যোগসূত্র। পদাবলীর এই ধরণটি দেশীয় গানের প্রথাই অবলম্বন করিয়াছে।"[৩] উদ্ধৃত পদাবলীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি সহজেই অনুভূত হতে পারবে। ধ্রুবপদ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় নি বলেই অত কটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পদের উদ্ধৃতির পরেও ভাবগত অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে যেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও জয়দেব-পদাবলীর এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই অনুসৃত হয়েছে।

তা ছাড়া, গীতগোবিন্দের কাহিনী সংস্থাপনের নাট্যলক্ষণটুকুও লক্ষ্য করবার মত। অধিকাংশ ভাগই রাধা, কৃষ্ণ অথবা সখীর সংলাপ-মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে; মাঝে মাঝে বর্ণনা-শ্লোকের দ্বারা সেই সংলাপমূলক ঘটনাবলীকে সংগ্রথিত করা হয়েছে। এই কলা-কৃতি কৃষ্ণকীর্তনের মত "গীতনাট্য শ্রেণীর গীতকাব্য"

গীতগোবিন্দের নাট্য-কাব্যিক রূপাবয়ব

৩। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ (ভূমিকা)

যদি না-ও হয় তবু তারই পূর্বরূপ যে তা'তে পণ্ডিতেরা সংশয় করেন নি। গীতগোবিন্দ-কাহিনী বাংলার নিজস্ব নাট্যস্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্যকেই আভাসিত করছে কি না, এই উপলক্ষ্যে সে কথাও ভেবে দেখবার মত। অন্ততঃ এই কাঠামোরই ক্রমাগ্রসৃতি পরবর্তী বাংলা কাব্য-কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে যে, তাতে সংশয় নেই।

অতএব, ভাষা ও কবি-কর্মের রূপাবয়বের বিচারে জয়দেব পদাবলীতে বাংলা কাব্যের রূপ-লক্ষণই চর্যার চেয়েও স্পষ্টতর হয়েছে, তা'তে সন্দেহ নেই। কেবল তাই নয়, জয়দেব-পদাবলীর এই গঠনভঙ্গিই পরবর্তী বাংলা কবিতা,—বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ-সংগঠনের পূর্বৈতিহ্য রচনা করেছিল-যে, তা'তেও সন্দেহ নেই। এ-দিক থেকে বাংলা কবিতার রূপ-ধর্মের বিকাশের ইতিহাসে জয়দেব-পদাবলীকে নিঃসংশয়ে আদিযুগ-পরিণতির সূচক বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে রূপ কেবল উপলক্ষ্য ;—মূল লক্ষ্য ভাব। সার্থক ভাবৈতিহ্যকে বহন করার বলিষ্ঠ-উপযুক্ত আধার হিসেবেই সাহিত্যে রূপকর্মের সার্থকতা। জয়দেব-পদাবলীর মধ্যে আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের সেই ভাব-স্বভাবও সু-ব্যক্ত হয়েছে ; প্রধানতঃ এই কারণেই জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ-পথিকৃৎ-এর মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

গীতগোবিন্দের ভাব-স্বভাব

গীতগোবিন্দ ছাড়াও জয়দেব আরো সংস্কৃত কবিতা যে লিখেছিলেন, তা'র প্রমাণ রয়েছে বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে। গীতগোবিন্দের বিভিন্ন সর্গের প্রারম্ভিক শ্লোকগুলোর মত ঐ সব রচনাও ভাবে এবং রূপ-স্বভাবে প্রধানতঃ সংস্কৃত। ঐ সকল শ্লোকাবলী অনুধাবন করলে স্পষ্টই বোঝা যায়,—জয়দেবের কবি-চেতনা ছিল স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মধ্যে পরিপুষ্ট। কবির ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে স্বল্প-জ্ঞাত তথ্যও এই অনুমান সমর্থন করে। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামের ভোজদেব ও বামাদেবীর পুত্র ছিলেন জয়দেব। কবি-পত্নীর নাম পদ্মাবতী ছিল বলে অনুমিত হয়। অজয়-তীরবর্তী 'জয়দেব-কেঁদুলি' আজ একটি পূত বৈষ্ণবতীর্থ রূপে গড়ে উঠেছে। তা হলেও, গীতগোবিন্দ-গাথা-মুখর কেঁদুলিতে জয়দেবীয় ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে আছেন কুশেশ্বর শিব, আর শিবমন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে

জয়দেবের ধর্মচেতনা

ভুবনেশ্বরী যন্ত্র। বীরভূমের ভক্ত কবি বনমালী দাসও স্বীকার করেছেন :— জয়দেব কবি 'শিবের মণ্ডপে'ই 'হেসে কেঁদে নেচে গেয়ে' কালাতিবাহন করেছিলেন।[৫] জনশ্রুতি রয়েছে, শিবমন্দিরের অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত পাষাণযন্ত্রে ভুবনেশ্বরী-মন্ত্র জপ করে জয়দেব সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 'সদুক্তি কর্ণামৃতে'র 'দেবপ্রবাহে' জয়দেব-রচিত একটি 'মহাদেব'-বিষয়ক শ্লোকও সন্নিবেশিত হয়েছে :—

"ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎ কৈতবাদম্বু বিভ্র—
ল্লালাটাক্ষিচ্ছলেন জ্বলনমহিপতি শ্বাসলক্ষ্যাৎসমীরম্।
বিস্তীর্ণাধরবক্ত্রোদর কুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈ—
র্বিশ্বং শশ্বদ্বিতন্বন্বিত র ভবতঃ সম্পদং চন্দ্রমৌলিঃ॥

অবশ্য এ-সব দেখে জয়দেবকে একান্তভাবে শৈব বলে দাবি করা চলে না। বরং গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্র এবং সদুক্তি কর্ণামৃতে ধৃত 'কল্কি', 'গোবর্ধন দ্বার' ইত্যাদি বিষয়ক শ্লোকাদি থেকে মনে হয় জয়দেব ছিলেন স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য-সমাজের পঞ্চোপাসক হিন্দু। আর সেই সংগে এ-কথাও বলা চলে যে, "জয়দেব পরবর্তীকালের রামাওতী, গৌড়ীয়, বল্লভাচারী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধরণের বৈষ্ণব ছিলেন না।"[৬]

কিন্তু তা হলেও দেখব, জয়দেবের বিবিধ-বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে তাঁর প্রতিভাকে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছে গীতগোবিন্দ,—আগেই বলেছি,—বিশেষভাবে গীতগোবিন্দের অন্তর্ভূত পদাবলী। সুভাষিতাবলী কিংবা সদুক্তি কর্ণামৃতে ধৃত জয়দেব-রচনাবলীর কাব্যিক উৎকর্ষ অস্বীকার করা চলে না; তা' হলেও জয়দেব আজ জয়দেব কেবল তাঁর গীতগোবিন্দ-পদাবলীর কল্যাণে। আর, গীতগোবিন্দের সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করেও বলব, জয়দেব-পদাবলীর রস-সৌন্দর্যের উৎস বাঙালি-স্বভাবের সঙ্গে একান্ত সহৃদয়তারই ফলে সঞ্জীবিত।

জয়দেব পদাবলী বাঙালি জীবন-রস সঞ্জীবিত

প্রথমেই বলেছি, নিখিল বঙ্গে জয়দেবের প্রতিষ্ঠার পেছনে বৈষ্ণবভক্তির প্রভাব অপরিসীম। স্বয়ং চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত হতে পারার মহৎ

৫। দ্রষ্টব্য :—জয়দেব চরিত্র।
৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—দ্রষ্টব্য ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৫১ বাং।

গৌরব জয়দেব-পদাবলীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবজনের নিত্য পঠিতব্য,—নিত্য পূজ্য পুণ্যগাথায় পরিণত করেছিল। চৈতন্যোত্তর কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বৃন্দাবনে বিশেষভাবে কেন্দ্রিত হয়েছিল, এবং সেখ ন থেকে বৃহত্তর ভারতের নানা অংশেও হয়েছিল ক্রমশঃ ব্যাপ্ত। জয়দেব-পদাবলীর সর্বভারতীয় প্রসার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতির দ্বারা সহায়িত হয়েছিল, এমন অনুমান করতে বাধা নেই। বৈষ্ণবেরা প্রধানতঃ এই পদাবলী থেকে লোকোত্তর 'কেবলা-রতি-রস'ই আস্বাদন করেছেন এবং গীতগোবিন্দের সাহিত্যিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় একদা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ধর্ম-নিষ্ঠা বহুল সহায়তা করেছিল।

গীতগোবিন্দে বৈষ্ণবতা

কিন্তু, এর দ্বারা গীতগোবিন্দের ধর্ম-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক মর্যাদা অ-প্রতীত হয় না। বরং সুদূর কাশ্মীর অঞ্চল থেকেও গীতগোবিন্দের পুথি আবিষ্কৃত হতে পেরেছে দেখে এই কথাই মনে হয় যে, জয়দেব-কবিতাবলীর সম্প্রদায়বোধ-নিরপেক্ষ এক সর্বমানব-সাধারণ শৈল্পিক আবেদন ছিল। আর সেই আবেদনের মূলে ছিল জয়দেব-পদাবলীর বিচিত্রকে-ঐক্যে-বদ্ধ-করা সমন্বয়ী জীবন-দৃষ্টি। আমাদের ধারণা, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় জয়দেবের রচিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আভিজাত্যধর্মী রচনা যে জয়দেব-পদাবলীর তুলনায় সর্বভারতীয় মর্যাদা পায় নি, তার প্রধান কারণ ঐ সকল শ্লোক-কবিতায় কবি-জীবন-দৃষ্টির আপক্ষিক সীমায়তি।

গীতগোবিন্দের ধর্মনিরপেক্ষ জীবনাবেদন

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে জয়দেব আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায়। সর্বভারতে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাহিত্যিক অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত ভাষা তখন মৃতপ্রায়। দ্বাদশ শতাব্দীর পরে সাহিত্যে ব্যাপক সংস্কৃত চর্চার প্রয়াস বাংলাদেশে খুব উল্লেখ্য নয়। শুধু তাই নয়, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারও এদেশে একবার বিশ্লিষ্ট হয়ে আলোচ্য যুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাংক্ষায় তৎপর হয়েছিল। নিত্যনূতন ব্যবহার-ও-স্মৃতিশাস্ত্র গড়ে উঠ্‌ছিল সেন-রাজ আমলে ;—স্বয়ং বল্লালসেন ও তাঁর গুরু এই স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য-ধারার উজ্জীবনে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আর, তার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৃহত্তর

জয়দেবের আভিজাত জীবন পটভূমি

বাঙালির জীবন-ক্ষেত্র থেকে ক্রমশঃ সরে আসছিল আভিজাত্যময় বিভেদ-প্রধান সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি, আলোচ্য যুগের হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজ নানা জাতিতে অজস্রধা বিভক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পান-ভোজন-বিবাহাদির সংস্কারও এই সময়ে ক্রমেই কঠিন, সংকীর্ণ, গণ্ডিবদ্ধ হয়ে উঠ্‌ছিল।[৭] অতএব, স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার সেদিন রাজধর্মের আভিজাত্যময় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেও, বৃহত্তর বাঙালি জীবনের প্রীতির আসন থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

জয়দেব-সমকালীন লোকজীবন

অন্যদিকে সেকালের লোকধর্ম এবং লোকধর্মাশ্রিত জীবনবোধ ছিল প্রধানতঃ আবেগপ্রধান; ব্যক্তিগত উপলব্ধির তীব্রতায় বিহ্বল। চর্যা-পদাবলীর আলোচনায় এবং অন্য প্রসংগেও পূর্বের অধ্যায়ে দেখা গেছে যে,—অভিজাত ব্রাহ্মণ্যধর্মে আচার-আচরণের কঠোরতা যত বেড়েছে, লোকজীবন ততই ভাবাবেগ-প্রধান সহজিয়া ধর্মের সহজ চর্যায় তন্ময় হয়েছে। বৌদ্ধ অথবা নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়, বাংলার লোকধর্ম এবং লোকজীবনের সকল পর্যায়েই যাগের চেয়ে যোগ, আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে হৃদয়ানুকূল্য, ইন্দ্রিয় নিরোধের চেয়ে ইন্দ্রিয়-নিয়মনের উচ্ছ্বাসময় আকাংক্ষাই প্রধান হয়েছিল। আর, প্রধানতঃ মানব-স্বভাবের সহজে-অনুকূল ছিল বলেই এই ধরণের জীবনাচরণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জয়দেব-পদাবলী ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির আভিজাত্যময় জীবন-কল্পনার স্বর্ণসূত্রে লোকজীবনাশ্রিত হৃদয়ানুকূল্য-প্রধান এই মানব-স্বভাবকে এক সংগে গ্রথিত করেছে; 'হরিস্মরণাকাংক্ষা'র লোকোত্তর আকৃতির সংগে পরিণয়-বদ্ধ করেছে 'বিলাসকলা-কুতূহলে'র লোকায়ত জীবন-বাসনাকে। তাই, বাঙালির সাহিত্যের ইতিহাসে 'মধুরকান্ত' পদাবলীকার জয়দেব অভিজাত-অনভিজাত জীবন-স্বভাবের সুষমাময় মালাকার,—খণ্ড-বিচ্ছিন্ন বাঙালি জীবনের অখণ্ড-রূপকার জীবন-শিল্পী।

সদুক্তি কর্ণামৃতাদিতে ধৃত একাধিক শ্লোকে জয়দেবের ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পরিচয় পেয়েছি। গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রেও দেখেছি সেই

৭। দ্রষ্টব্য :—History of Bengal Vol. I. Ch XIII.

অভিজাত ব্রাহ্মণ-কবিকেই। কিন্তু জয়দেব-পদাবলীর প্রধান উপজীব্য কেবল হরি-কথা নয়, 'রাধামাধবকেলি'-কথা। এখানেই জয়দেবের অভিজাত ভাবনা প্রেমানুকূল্যপ্রধান লোক-সংস্কারের অভিমুখী। ভক্তেরা 'রাধ্' ধাতু এবং রাধা শব্দের উৎস খুঁজেছেন বেদাদির প্রাচীনতম ঐতিহ্যেরও মধ্যে।

জয়দেবে রাধাকথা এবং

তাহলেও, ঐতিহাসিক মনে করেছেন,—"...it (the word Rādhā) Came to symbolise the Sakti of Vishnu only when a realistic creed had been fully developed by the Bhāgabatas."[৮]

আর পূর্ব অধ্যায়েই বলেছি, এই রাধা-পরিকল্পনার উৎস হিসেবে সেন-যুগের বাংলাদেশের পরিকল্পনাই ঐতিহাসিকেরা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা 'গাথা সপ্তশতী'তে একটিমাত্র গাথায় রাধার উল্লেখ পাওয়া গেছে:—

"মুহ মারুএণ তং কণ্হ রাহিআএ অবণেন্তো।
এদাণঁং বল্লবীণং অণ্ণাণং বি গোরঅং হরসি।"

এই শ্লোকের সংস্কৃত অনুবাদে বলা হয়েছে:—

রাধাবাদের ঐতিহাসিক মূল

"মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়াঃ অপনয়ন্।
এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামাপি গৌরবং হরসি॥"

—হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার মুখমণ্ডলস্থ গোখুরধূলি অপনোদন করবার ছলে (তার মুখ চুম্বন করে) অন্যা গোপীগণের গৌরব হরণ করেছ।—

পদটির রচনাকাল নিশ্চিত করে বলা চলে না। তবু, রাধিকা-কাহিনীর একটি প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে এটিও প্রাকৃত-অপভ্রংশ মাধ্যমকেই অনুসরণ করেছে। তান্ত্রিক অথবা সহজিয়াদি বাংলার লৌকিক সাধনার মধ্যেই যে শক্তিবাদ এক বিশেষ রূপ অর্জন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আর নর-নারীর দেহমনোগত সম্পর্কের আবেগোষ্ণতাকে আশ্রয় করেই এই ধরণের ধর্ম ও সাহিত্য-চর্যা বাংলাদেশে একদা অবারিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারকে ঐতিহাসিক Krishna Cult এবং Rādhā Cult-এ পৃথক ভাবে বিভক্ত করেছেন। কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায় (Krishna

৮। দ্রষ্টব্য:—History of Bengal Vol. I. Ch. XIII. (পাদ টীকা)।

Cult) সপ্তম শতাব্দীর বাংলা দেশেই নিঃসংশয় আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ-সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভব সেন আমলের আগে নয়।[১] এই রাধাকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব-মূলে বাংলার নর-নারী-নির্ভর লোকধর্ম সাধনার ঐতিহ্য যে একান্ত হয়েছিল, রাধাতত্ত্বের 'পরকীয়া'-স্বভাব ও দেহমনো-বিলাসময় কাহিনীর চৈতন্য-পূর্ব মৌল কল্পনা থেকে এ কথা নিশ্চিত অনুভব করা চলে। মানবের সহজ স্বভাব-প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে আবেগাকুল জীবনাচরণের ঐতিহ্যের মধ্যে জাত রাধা-কথাকে অভিজাত মনন-চিন্তার প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে জয়দেব-কবি তাতে স্মরণীয় শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। এখানেই তিনি বাংলা সাহিত্য-স্বভাবের সার্থক পথিকৃৎ।

কৃষ্ণ-Cult ও রাধা-কৃষ্ণ-Cult এর সমন্বয় সাধক কবি জয়দেব

পূর্ববর্তী আলোচনায় বলেছি; ইতিহাসের প্রাচীনতম পর্যায় থেকেই বাঙালির মৌল-স্বভাব আবেগ-উচ্ছ্বসিত; বাঙালির ভাষা-সাহিত্য অতি ও উচ্চকথনে স্ফীত। বাংলা ভাষার জন্ম-লগ্নে একদিকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কৃতি যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণে গড়ছিল নিত্যনূতন স্মৃতির নিগড়; তখনই বাঙালির আবেগ-স্বভাব জীবন মুক্তি পেয়েছে লোক-সমাজের সহজিয়া আচরণের মাধ্যমে। এ'তে করে নৈতিক সংযম-শৃংখলা শিথিল এবং ব্যাহত হয়েছে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও ব্যক্তি-অনুকূল বাঙালি ভাবপ্রবণতার একমাত্র অভিব্যক্তিও ঘটেছিল ঐ পথেই। জীবনের সেই নগ্ন-হলেও জীবন্ত, রুক্ষ-অমসৃণ হলেও স্বাভাবিক যুগ-জীবন-স্বভাবকে সমাজের নিচের তলা থেকে তুলে এনে জয়দেব-কবি নিজ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার ও স্পর্শকাতর রুচিবোধের দ্বারা একটি শালীন অভিব্যক্তি দিয়েছেন। অথচ, এখানেও তিনি ছিলেন সচেতন জীবন-শিল্পী। একটি প্রাণসম্ভাবনাময় কাহিনীকে অনভিজাত সমাজ-পর্যায় থেকে তুলে অভিজাত গণ্ডির সংকীর্ণতার মধ্যে তিনি আবদ্ধ করেননি। বাংলা স্বভাব-বিশিষ্ট এমন এক সংস্কৃত রূপায়বের মধ্যে তাকে তুলে ধরেছেন, যা'তে করে তা নিখিল বাঙালির বোধগম্যই হয়নি,—হয়েছে একান্ত হৃদয়ানুকূল। একদিকে তৎসম শব্দে সমৃদ্ধ শব্দ ও অর্থালংকারের প্রাচুর্য নিছক শৃঙ্গার-

১। দ্রষ্টব্য :—History of Bengal Vol. I. Ch. XIII.

মূলক পরকীয়া-কথাকে শালীন, ভব্য, শ্রুতিসুখকর মার্জিত রূপ দিয়েছে। অপরদিক থেকে সেই গ্রাম্য রাধা-কথাকে জয়দেবের হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য চেতনার উদার বলিষ্ঠতা যুক্ত করেছে দশাবতার-মহিম হরি-কথার পৌরাণিক ঐতিহ্যের সংগে। জয়দেব-পদাবলী ভাবে ও ভাষায়, রুচি ও চিন্তায়, কাহিনী ও ঐতিহ্যে একাধারে অভিজাত-অনভিজাত বাঙালি জীবন-ধর্মের মহাসংগম রচনা করেছে। এই সংগমতীর্থে পুণ্য স্নান করেই বাংলা সাহিত্য নবযুগ সম্ভাবনার পথে হয়েছে অগ্রসর।

জয়দেব ও সমকালীন কবিকুল

তাঁর সমকালীন কবি-শ্রেষ্ঠদের তুলনায় জয়দেব গীতগোবিন্দে পরোক্ষতঃ নিজ প্রতিভার উৎকর্ষ দাবি করেছেন। কলাকৌশলগত সূক্ষ্ম বিচারে এ-কথা সত্য কি না, সে সিদ্ধান্ত আলংকারিক পণ্ডিতেরা করবেন। কিন্তু কালের হাতে শ্রেষ্ঠত্বের যে অবিসংবাদী স্বাক্ষর জয়দেবের পদাবলী পেয়েছে, তার প্রধানতম কারণ তাঁর কবি-মনের নবনবোন্মেষশালিনী দূরদৃষ্টি। ধোয়ী 'পবন দূত' কাব্যে কালিদাসের মেঘদূতের অনুসরণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু আপন কাব্য-স্বভাবে কালিদাস ত অননুকরণীয়! এদিক থেকে যুগোচিত নূতন প্রয়োজনবোধকে স্বীকার করে নিয়ে নূতন পথরচনার সম্ভাবনা কল্পনাও করতে পারেন নি, ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন, উমাপতিধর,—এঁরা কেউই। মৃতপ্রায় ভাষায় প্রাচীন ভাবের উদ্বর্তন মাত্র করেছেন তাঁরা। জয়দেব নূতন ভাব-ভাষায় নবজীবনাকৃতিকে দিয়েছেন প্রথম গতি ও মুক্তি।

সংস্কৃতি সমন্বয়ের বাঙালি কবি জয়দেব

বারে বারে বলেছি, দু'টি অভিজাত-অনভিজাত সমান্তরাল ধারায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালির যে সংস্কৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পৃথক্ মাধ্যমে পৃথক্‌ভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাকেই একত্র-সংবদ্ধ করে নবজন্ম নিল বাংলা ভাষার সাহিত্য ;—নিখিল বাঙালি চেতনার আত্মমুক্তির একমাত্র আশ্রয়রূপে। চর্যাপদে সেই সংবদ্ধতার একটি রূপ আভাসিত হয়েছে, গীতগোবিন্দে সেই প্রচেষ্টারই স্পষ্টতম স্বাক্ষর। মধ্যযুগে দেখ্‌ব, আর্যব্রাহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণ্যেতর ঐতিহ্যকে একত্র আত্মসাৎ করে অভিনবতর সামগ্রিক ভাবরূপে-আবির্ভূত হয়েছে বাঙালির সাহিত্য। আর বাঙালির এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বাস্তব জীবন্মূর্তি হিসেবেই চৈতন্যদেব কেবল বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যেরই নয়, মধ্যযুগের

বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যেরও একক ও অনন্য পথস্রষ্টা। চৈতন্য-দেবে যে জীবনবোধের মহাপরিণতি, জয়দেবে তারই প্রথম অঙ্কুরোদ্গম। এই কারণেই জয়দেব চৈতন্যদেবের কাছে পূর্বাচার্যের মর্যাদা পেয়েছেন। আর, চৈতন্যের হাতে বাংলা সাহিত্যপথের যে মুক্তি, গীতগোবিন্দ-পদাবলীতে তার পূর্বসূচনা বলেই, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পথের প্রথম একক উল্লেখ্য নির্মাতা কবি জয়দেব গোস্বামী।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

কাল নিরবধি। কিন্তু কাল স্থাণু নয় ;—নিয়ত চলমান। অনাদিকালের আদিম উৎস হতে অনন্তের অভিমুখে চলেছে তার নিত্য-সচল প্রবাহ। অতীত থেকে অনাগতে প্রসৃত এই চলমানতার ধারা ;—অতীতকে আশ্রয় করেই বর্তমানের স্বভাব হয় বিকশিত ; আবার বর্তমানের পাথেয় নিয়েই অঙ্কুরিত হয় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। নিরবধি কাল নির্বিশেষ ; কিন্তু দেশ এবং পাত্রের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে তা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ত্রিবিধ পর্যায়ে বিন্যস্ত,—বিশেষিত হয়ে ওঠে। তখনই নির্বিশেষ কালের বক্ষে বিশেষিত যুগ-লক্ষণ ক্রমে অভিব্যক্ত হয় ; অনন্ত কাল সান্ত স্বভাবে বিধৃত হয় বিভিন্ন যুগ-লক্ষণ-চিহ্নের প্রয়োগে। বাংলা সাহিত্যেও বাঙালি চেতনার ক্রম-বিকাশের স্বভাব-লক্ষণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন যুগ-ধর্ম অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।—আদিযুগ-পরিণামের পাথেয় স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-প্রবাহে রচনা করেছে মধ্যযুগের সম্ভাবনা ; মধ্যযুগ-পরিণতির সন্ধি লগ্নে মুকুলিত হতে আরম্ভ করেছে আধুনিক সাহিত্যের শৈশব-লক্ষণ। কাল-স্বভাবের এই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই সদ্য-কথিত আদিযুগ-লক্ষণের পরিণাম মুখে সহজে জন্ম নিয়েছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। আর আগেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ-সূচনার ঐতিহাসিক লগ্নকে অপরিহার্য ভাবে যুক্ত করা হয়ে থাকে বঙ্গে মুসলমান আক্রমণের প্রাথমিক মুহূর্তের সংগে।

যুগ ধর্মের বিবর্তন

আপাতঃ দৃষ্টিতে এ-বিষয়ে সংশয়ের কারণ ঘটে। যে-কোন জাতির সাহিত্য তার জাতীয় জীবন-কৃতিরই উৎস-সঞ্জাত। আর, প্রাণধর্মের মৌল উত্তাপ থেকেই জীবন চিরকাল গতি ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। এদিক থেকে সাহিত্যের বিকাশ জাতির হৃৎপদ্মের বিকাশের সংগে তুলনীয়। কিন্তু তুর্কী আক্রমণ আলোচ্য যুগের বাঙালি জীবনের পক্ষে ছিল একটি বহিরাঘাত মাত্র। অতএব, জাতির অন্তঃ-স্বভাবের অভিব্যক্তি যে সাহিত্য, তার বিবর্তনের

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

সংগে এই বহিরাক্রমণের ইতিহাসকে জড়িত করতে পারার সংগতি-সূত্র খুঁজে পাওয়া প্রথম চেষ্টায় দুষ্কর হয়।

এক্ষেত্রে স্মরণ করতে হয়, জীবনের বিকাশ-ধর্ম স্বতস্ফূর্ত হলেও নিরঙ্কুশ নয়। জীব-বিজ্ঞানের মৌল নীতি থেকেই বুঝি,—জীবনের বিকাশ ও পরিণতির সংগে অপরিহার্য সম্বন্ধে বদ্ধ রয়েছে জীবকোষের পচনশীলতা। পচনশীল পুরাতনের গ্রন্থি ও সীমায়তিকে অতিক্রম করেই পরিণত ও পুষ্টতর নূতন জন্মগ্রহণ করে। এই প্রসংগে জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার সংগে তার পরিণতি-ধর্মের অপরিহার্য সংঘাত ঘটে। আর, এই সংঘাতের ফল সর্বদাই সুখাবহ নয়। নৈসর্গিক কারণে কিংবা পচন ও রক্ষণ,—তথা হরণ-পূরণের গতানুগতিক আবর্তে জীবনের মূলে প্রাণের তাপ মাঝে মাঝে শীতল হয়ে আসে। তখন গতি ও শক্তির ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে ; জীবনে হরণের ভাগটাই বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে বলে পচনের চেয়ে পুষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। জীবনের গতি হয় মন্থর ; কোন জাতির নির্দিষ্ট জীবনাধারে বিধৃত নিরবধি কালের বিশেষিত স্বভাব বিবর্ণ হয়ে পড়ে। এই বিবর্ণ পাণ্ডুরতার মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন এবং জাতিকে তখন রক্ষা করতে পারে একমাত্র বিপ্লবের আঘাত। বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নীরক্ত পাণ্ডুরতার মধ্যে তুর্কী আক্রমণ বিপ্লবের সেই ঘর্ষণোত্তাপকে প্রজ্বলিত করেছিল ; শীতল বাঙালি শোণিত-ধারাকে করেছিল উষ্ণ-প্রখর। আদিযুগ-বিপর্যয়ের শেষে মধ্যযুগ-জন্মের পদ্ধতি-মূলে, তাই, তুর্কী আক্রমণ সার্থক বিপ্লব-প্রেরণারূপেই স্মরণীয়।

এবং তুর্কী আক্রমণ

অতীত থেকে অনাগতে স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারা বেয়েই চলেছে জীবনের নিয়ত প্রসার। কিন্তু স্বাভাবিক গতির ধর্ম যেখানে রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখনই স্থাণুত্ব থেকে জীবনকে রক্ষা করে থাকে বিপ্লবের অস্বাভাবিক আঘাত। পূর্বের আলোচনা থেকেই বুঝেছি, জীবনের বিবর্তনের মূলে রয়েছে সংঘাত ও সংঘাত-অতিক্রমণের যুগপৎ প্রয়াস। অতএব, নিছক জীবধর্মের প্রভাবে জীবনের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আঘাতের দোলা লাগে। কিন্তু সকল আঘাতই সার্থক বিবর্তন বা বিপ্লবের উপাদান নয়। যে-সংঘাতের পদ্ধতি বেয়ে জীবন ব্যাপকতর প্রাণধর্মের সংগে অন্বিত হয়, জীবনী-শক্তির

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

পক্ষে সেই আঘাতই সার্থক। আর আগেই বলেছি, অভ্যাসের অন্ধতায়,—গতানুগতিকতার সহজ শিথিলতায় শীতল-নীরক্ত জীবনী-শক্তিকে সংঘর্ষ-তপ্ত করে তোলাই বৈপ্লবিক আঘাতের ধর্ম। এই আঘাত আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক বলেই দুর্মদ এবং নির্মম। জীবনের মৃত্তিকা-তলে দুর্বলজড়তার মর্মমূলে সে দুঃসহ যন্ত্রণার দাহ সঞ্চার করে। সেই আগ্নেয় তাপে জাতির নাড়িতে রক্তস্রোত যদি আবার উষ্ণ-চঞ্চল হয়ে ওঠে,—জরাজীর্ণতাকে জীর্ণবস্ত্রের মতই অনায়াসে পরিত্যাগ করে অনাগত ব্যাপ্তি ও পুষ্টি-পরিণতির পথে জাতি যদি পুনরায় প্রধাবিত হতে পারে,—তবেই সে আঘাত বিপ্লবাগ্নি-সঞ্চারী। তা না হলে, জাতির ভাগ্যে সার হয় কেবল জ্বালা আর দাহ;—সেই দগ্ধতার মধ্যে জীর্ণতার প্রাচুর্য মৃত্যু-সম্ভাবনাকে আরো অপরিহার্য করে তোলে।

অতএব দেখছি,—বিপ্লবের প্রথম অংশ আঘাত এবং অগ্নিদাহ; জ্বালা ও ক্ষয়। কিন্তু বিপ্লবের পরিণামে রয়েছে নিশ্চিত উজ্জীবন,—প্রাণের উষ্ণ উত্তাপ; গতি ও শক্তির অনির্বাণ মুক্তি ও প্রসার। তুর্কী আক্রমণ মধ্যযুগের বাঙালি জীবনে অপ্রত্যাশিত আঘাতের অগ্নিজ্বালা সঞ্চার করেছিল অজ্ঞাতে; আর সেই দাহ-মুক্তির বৈপ্লবিক সাধনায় অগ্নিস্নাত বাঙালি সংস্কৃতি সিদ্ধকাম পূত-নবীন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই নব-জীবন-উজ্জীবন মধ্যযুগ-লক্ষণ নামে হয়েছে শ্রদ্ধা-চিহ্নিত।

এবং বাঙালি চেতনার বিপ্লব-প্রয়াস

বাংলাদেশে প্রথম তুর্কী আক্রমণের আনুমানিক কাল ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ।[১] উত্তর ভারতে মুসলমান রাজতন্ত্রের সূচনা ঘটেছিল আরো প্রায় দুই শতক আগে। ক্রমশঃ তুর্কী আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ধারা পূর্ব ভারতে বিহার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশেষে মুহম্মদ-বিন্-বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি রাজ্যলিপ্সা নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম আক্রমণ করেন লক্ষ্মণ সেনের বার্ধক্যের আবাস ও রাজধানী নবদ্বীপ। দুর্বল অক্ষম রাজা অতর্কিত আক্রমণে অভিভূত হয়ে রাজপুরীর পশ্চাৎ-দ্বার দিয়ে পলায়ন করেছিলেন। এ-বিষয়ে আরো কলঙ্কজনক লোকশ্রুতি রয়েছে; বখ্‌তিয়ার নাকি মাত্র সতেরো (মতান্তরে আঠারো) জন অশ্বারোহী নিয়ে নদীয়া-বিজয়

বিপ্লব-সূচনার ঐতিহাসিক ভিত্তি

১। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

সম্পন্ন করেছিলেন, আর বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন রাণীর বেশে হয়েছিলেন পলাতক। বাঙালি-স্বাদেশিকতার ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কলঙ্ক-কথা একান্ত মর্মপীড়িত করেছিল। কিন্তু এ-কালের ঐতিহাসিকেরা বহুল পরিমাণে সেই জাতীয় লজ্জার অপনোদন করেছেন।[২] তা'ছাড়া এ'কথাও সত্য যে, রাঢ়-বরেন্দ্রের আঞ্চলিক সীমার মধ্যেই দীর্ঘদিন তুর্কী-প্রতাপ সীমাবদ্ধ হয়েছিল; এবং পলাতক রাজা লক্ষ্মণসেনও পূর্ববঙ্গে জীবনের শেষ কয়-বছর নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে রাজত্ব করে গেছেন। তা'হলেও, ঐতিহাসিকেরা অস্বীকার করতে পারেননি যে, বিদেশি আক্রমণকারীরা যেখানেই গেছেন, সেখানেই অনায়াসে রাজ্য জয় করেছেন;—বাংলাদেশের কোন অঞ্চলেই বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংঘবদ্ধ বিরোধিতা গড়ে ওঠেনি। বাঙালি স্বভাবের মজ্জাগত এই নিঃসংঘ স্বাতন্ত্র্য-বিলাসের নির্জীবতাই আহত, উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল তুর্কী আক্রমণের আঘাত-মাধ্যমে। এখানেই বিপ্লবের সূত্রপাত।

আদিযুগ-বিপর্যয়

পূর্বের দুই অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি,—বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে বাঙালি জীবন-স্বভাবে ভাবাবেগবহুল স্বাতন্ত্র্য-বিলাসের পরিচয়। প্রধানতঃ সে যুগের জীবন ছিল ধর্মাচরণ-নির্ভর। আর, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সেকালের বাঙালি নানা শ্রেণী, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীতে বহুধা বিভক্ত হয়েছিল। তা'হলেও তখনকার বাংলাদেশে সম্প্রদায়-বিদ্বেষ বা পরস্পর-বিরোধের তীব্রতা ছিল না-যে, তা'তে সংশয় নেই। তবু, প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ই স্ব-স্ব গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষ বিষয়ে আবেগাতিশায়ী অতিমূল্য-বোধ নিয়ে পৃথক্ গণ্ডির স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে একান্ত-বদ্ধ হয়েছিল। এই ধরণের স্বতো-স্বতন্ত্র জাতি ও সম্প্রদায়-বিভাগের একটি চরম নিদর্শন উদাহৃত হয়েছে তৎকালীন স্মার্ত-পৌরাণিক হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথার মধ্যে।[৩] তা'ছাড়া, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী কালে এসে কেবল বাংলার লোকধর্মই নয়, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত ধর্মাচরণের মধ্যেও নর-নারীর দেহাচার-নির্ভর 'সহজিয়া'-পদ্ধতি কোন-না-কোনরূপে অবশ্যই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে

২। দ্রষ্টব্য ঐ; History of Bengal Vol II Ch I; বাঙালির ইতিহাস—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

৩। দ্রষ্টব্য—পঞ্চম অধ্যায়।

পড়েছিল। এমন কি জয়দেব-গোস্বামীর গীতগোবিন্দের মধ্যেও পৌরাণিক মহিমাময় "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" রাধা-'বিলাস-কলা-কুতূহলের' ঐতিহ্যের সংগে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। বস্তুতঃ জয়দেব গোস্বামীর কাব্য-মূলে বৈষ্ণব আধ্যাত্মিকতার ছাপ কতটুকু ছিল সে-কথা আজ নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমভাবাধিবাসনের ঐতিহ্যে মণ্ডিত করে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ভক্ত-দার্শনিকের চেতনা তা'তে নবতর মূল্য আরোপ করেছে। আর সেই মূল্যায়নের মধ্যেই জয়দেব-পদাবলীকে আস্বাদন করে আজ আমরা অভ্যস্ত। ভক্ত-পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন, জয়দেব-পদাবলীতে "প্রাকৃত প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি রূপে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন লীলা মানবোচিত ভাব ও ভাষায় উজ্জ্বল ও গীতিময় শব্দচিত্র পরম্পরায় সর্বসাধারণের অধিগম্য হইয়াছে।[৪] আর, ঐতিহাসিক নিঃসংশয়ে বল্‌বেন, লক্ষ্মণ সেন-রাজ-সভার 'নাগরী'-স্বভাবের প্রভাব জয়দেব পদাবলীর 'প্রাকৃত প্রেমলীলা' এবং "মানবোচিত ভাব-ভাষা"কে শৃংগার-রসোজ্জ্বল করে তুল্‌তে বহুলাংশে সহায়ক হয়েছিল।

এবং বিপ্লবের প্রয়োজন

সে যাই হোক্, আমাদের বক্তব্য, দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলার অভিজাত-অনভিজাত সকল পর্যায়েই নর-নারীর নৈতিক সম্বন্ধও যে সুসংযত পদ্ধতি-নিবদ্ধ ছিল না, তা'তে সংশয় নেই। অথচ, সেই অসংযমকে সমর্থন করা হত নানারূপ উচ্ছ্বাস-আবেগে প্রমত্ত 'সহজিয়া' ধর্মভাবুকতার দ্বারা। তুর্কী-আক্রমণ-সমকালীন বাংলায় নৈতিক বলিষ্ঠতা ও সজীব প্রাণবত্তার যে অভাব ওপরে লক্ষ্য করেছি, তা'র প্রধান জনয়িতা হিসেবে সেকালের এই ধর্মাচারকেই ঐতিহাসিক দায়ি করেছেন বিশেষভাবে ;—"………it is difficult to avoid the conclusion that religious influences were responsible to a large extent for the two great evils which were sapping the strength and vitality of the society : the disintigrating and pernicious system of rigid caste divisions with its elaborate code of purity and untouchability ; and the low standard of morality that governed the relations between men and women."[৫]

৪। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—ভূমিকা।
৫। History of Bengal Vol. I Ch. XV.

অতএব, "শেষ অবধি বিদেশি শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না, তার কারণ এই নয় যে বাঙালির বীরত্ব তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান শক্তির বিজয় লাভের প্রধানতম কারণ হচ্ছে দেশে সংঘ-শক্তির অভাব।"[৬]—ডঃ সুকুমার সেনের এই মন্তব্য শুনে অতঃপর বিস্মিত হবার আর কোন কারণ থাকে না। কিন্তু এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত থেকেই সেকালের বাঙালির জাতীয় পাণ্ডুরতার দৌর্বল্যটুকুকেও স্বীকার করে নিতে হয়। বস্তুতঃ কোন দেশ-কালের ইতিহাসেই একক বীর্য ও সাহসের সম্পূর্ণ অভাব বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। জাতির জীবনের শক্তি ও বলিষ্ঠতার কেন্দ্র তার সংঘ-সংগঠন ও একতা-বিন্যাসের মধ্যে। জাতীয় প্রাণবত্তার ঐটুকু সর্ব-নিম্ন মান। অতএব, সংঘশক্তি ও ঐক্য-চেতনার পুনরুজ্জীবন যে বাঙালি প্রাণোত্তাপের চিরায়তির জন্যও সেদিন অপরিহার্য হয়েছিল, তা'তে সংশয় নেই। তুর্কী আক্রমণ বহুধা-বিচ্ছিন্ন বাঙালি সংঘহীনতার 'পরে ইতিহাসের চরম আঘাত। এই আঘাতের ফলে বাঙালি হঠাৎ সম্পূর্ণ বিলুপ্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল, মৃত্যু-বিভীষিকাময় সেই কাল-পরিবেশে নূতন সংগঠনের নব-জীবন-মন্ত্র পেয়েছিল আবার; আবার নূতন মতে ও পথে দেখা দিয়েছিল বাঙালির জীবন-উজ্জীবন, বাংলা সাহিত্যের নবীন সঞ্জীবন।

আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে বাঙালি সত্যই বিপর্যস্ত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল। অবশ্য তার কারণও ছিল স্বয়ম্প্রকাশ। সেদিন বাঙালির প্রস্তুতির অভাবই কেবল প্রধান ছিল না। আক্রমণজনিত আঘাতের আকার-প্রকারও ছিল যেমন অপ্রত্যাশিত, তেম্‌নি কল্পনাতীত ও দুঃসহ। বাংলার আদিম কৌম-সমাজ-জীবনের পূর্ণ বিলুপ্তি ও আর্য রাজতন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পরিচয় খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে স্পষ্ট-চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বঙ্গের গুপ্তরাজ্য-ভুক্তির সংগে-সংগেই এদেশে ব্যাপক শাসন-শৃংখলা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য যে স্থাপিত হতে পেরেছিল, তার বহুল পরিচয় পাওয়া গেছে।[৭] সে যুগের বাংলায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ব্যাপক হ'লেও বৃহত্তর জনতা ছিল ভূসম্পত্তি-নির্ভর কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজে নিবদ্ধ।

১
বৈপ্লবিক বিধ্বংস

৬। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি।
৭। দ্রষ্টব্য :—History of Bengal Vol. I—যথাক্রমে Ch. X এবং Ch. XVI,

আর গুপ্ত যুগ থেকেই ভূম্যধিকার ও কৃষিজ সম্পদের স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে অর্থনৈতিক পদ্ধতি সুবিন্যস্ত হয়েছিল। সেই সংগে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতিতেও শৃংখলা এবং নিয়ম-বিন্যাস হয়ে উঠেছিল সুগঠিত। সন্দেহ নেই, গুপ্তযুগের পরে এদেশে ছোট-বড় স্বতন্ত্র রাজবংশের অধিকার বারে বারে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু আমলে রাষ্ট্রশাসন ও অর্থনীতিগত সমাজ-বিন্যাসের মূল কাঠামো বড় একটা পরিবর্তিত হয়নি। রাজার ধর্ম, বংশলতা, এবং ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজ সংগঠনকে প্রায়ই একটি ঐতিহ্যগত স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা হয়েছে। সেই ঐতিহ্য ছিল শ্রদ্ধেয়,—অপরিবর্তনীয়। এই কারণেই দেখি, বাংলা দেশে গুপ্ত শাসনের অবসান এবং একাধিক স্বতন্ত্র রাজবংশের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ঘটলেও সর্বদাই 'গুপ্তরাজত্বের ঐতিহ্য বহুল পরিমাণে রক্ষিত হয়েছিল।'[৮] আবার দীর্ঘস্থায়ি পাল রাজত্বের সময়ে রাজ্যশাসন, সামাজিক বিন্যাস এবং অর্থনৈতিক সংস্থানের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তবু, গুপ্তযুগ থেকে তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। সেন-রাজত্বের সময়ে পাল শাসনের রাষ্ট্র ও অর্থনীতিগত ঐতিহ্যই প্রায়শঃ অনুসৃত হয়েছে। লক্ষ্য করা উচিত, এই সময়ে রাজবংশের পরিবর্তনই কেবল ঘটেনি, রাজ-ধর্মও পরিবর্তিত হয়েছে বারে বারে। তা'হলেও বৃহত্তর সমাজের ভারসাম্য তা'তে আহত হয়নি। ঐতিহাসিকের ভাষায়;—"………the religious profession of the ruler did not influence the policy of the state, which was based on time-honoured precepts and conventions."[৯]। কেবল ধর্মক্ষেত্রেই নয়,—জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়েই যুগ-প্রাচীন সংস্কার-ঐতিহ্যের এই সশ্রদ্ধ অনুসরণ সমগ্র হিন্দু রাজত্বের সময়ে বাঙালি চেতনার মধ্যে একটি নির্বিরোধ নিশ্চিন্ততার সৃষ্টি করেছিল। তা'ছাড়া, বাংলাদেশ সমগ্র ভারতের মধ্যে তখনও ছিল যেন প্রকৃতির ধনভাণ্ডার। ফলে, সমাজ-জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে আধিভৌতিক অভ্যুদয় অনায়াস-লভ্য হয়ে পড়েছিল। আর, অনেকটা এই কারণেও, হিন্দু যুগের বাঙালির পক্ষে স্বাতন্ত্র্য-বিলাসী ভাব-ব্যাকুলতাপূর্ণ ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

৮। দ্রষ্টব্য :—History of Bengal Vol. I. Ch. X. ৯। ঐ।

তুর্কী আক্রমণ এই চিরাভ্যস্ত আয়াস-বিলাসের বনিয়াদের 'পরে প্রথম থেকেই অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত করেছিল। বাঙালির যুগ-প্রাচীন জীবনযাত্রাপদ্ধতির পক্ষে সে কেবল কল্পনাতীত-ই ছিল না, হয়েছিল বিভীষিকাময়। এই-ভয়ঙ্করতার বাঙালি-জীবন-নিরপেক্ষ একটি চিত্র পাওয়া যায় সমকালীন বৌদ্ধ ইতিহাসে। বাংলাদেশের অব্যবহিত পূর্বে ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মগধের ওদণ্ডপুর (বৌদ্ধ) বিহার তুর্কী আক্রমণাহত হয়েছিল। বৌদ্ধ পুরাকথা থেকে জানা যায়, কাশ্মীরী পণ্ডিত-শ্রমণ শাক্য শ্রীভদ্র তারপরে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে মগধ ভ্রমণে আসেন। তিনি ওদণ্ডপুর এবং বিক্রমশীলা-বিহার দুটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দেখেছিলেন। তা'ছাড়া মগধে তুর্কী আক্রমণকারীদের অত্যাচারের তীব্রতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে তিনি বগুড়া জেলার জগদ্দল বিহারে পালিয়ে আসেন।[১০]

তুর্কী আক্রমণের অভিচার

বাঙালির ইতিহাসেও মুসলমান আক্রমণের একই ঐতিহ্য পুনরাবর্ত্তিত হয়েছিল:—১২০৩ থেকে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুই বছরে বঙ্গের প্রথম আক্রমণকারী তুর্কী সুলতান মুহম্মদ-বিন-বখ্‌তিয়ার নবগঠিত রাজ্যে 'শান্তিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা' প্রবর্ত্তনে ব্রতী হয়েছিলেন। এবং মুস্‌লিম বিজেতাদের চিরাচরিত প্রথামত বিগ্রহ-মন্দির বিধ্বস্ত করে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন নূতন মস্‌জিদ্। মাদ্রাসা ও ইস্‌লামিক শিক্ষার মহাবিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করে,—'বিধর্মী'দের ধর্মান্তরিত করে তিনি তাঁর ধর্মীয় উদ্দীপনাকে চরিতার্থ করেন। তা'হলেও তিনি রক্তপিপাসু ছিলেন না;—অকারণে প্রজাদের 'পরে উৎপীড়ন কিংবা ব্যাপক বিধ্বংসে তাঁর কোন আনন্দ বা উৎসাহ ছিল না।—[১১]

কিন্তু, শাসিতদের পক্ষে এ'তে কোন সান্ত্বনা ছিল না। বিদেশি, 'বিধর্মী' তুর্কীদের শাসনসীমা থেকে দীর্ঘকাল তারা পালিয়েই ফিরেছে;—পালিয়েছে,—প্রাণের ভয়ে, মানের ভয়ে, ধর্মসংস্কারের ও বিলুপ্তির ভয়ে। এই পলায়নপরতার সুযোগেই আদি-যুগের বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির বহু উপাদান বঙ্গের

এবং বাঙালি সংস্কৃতির শূন্যময় যুগ

১০। History of Bengal Vol. II Ch. I.

১১। দ্রষ্টব্য ঐ।

বাইরে পূর্ব অথবা উত্তর প্রত্যন্তের দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে সঞ্চিত হয়েছিল। বস্তুতঃ, বখ্‌তিয়ারের জীবনান্তের পরে ইস্‌লামি শাসনের প্রথম পর্যায়ের নির্মমতা ও বিশৃংখলার প্রাবল্য হেতু এই পলায়ন-প্রবণতা আরো নির্বারিত হয়েছিল। স্বয়ং বখ্‌তিয়ার খাঁ রাজ্যলিপ্সু শত্রু-হস্তে নিহত হয়েছিলেন। আবার তাঁর আততায়ী আলি মর্দানকেও প্রাণ দিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। তারপরে প্রায় সার্ধশতাব্দী ধরে বাংলার মাটিতে রাজ্যলিপ্সা, জিঘাংসা, যুদ্ধ, হত্যা, আততায়ীর হস্তে মৃত্যু,—নারকীয়তার যেন আর সীমা ছিল না। সংগে সংগে বৃহত্তর প্রজাসাধারণের জীবনেও উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ধর্মহানির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর উৎকট হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে কোন কোন শাসকের ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে অবস্থার আপেক্ষিক উন্নতি হয়ত ঘটেছে; কিন্তু, ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস্‌ শাহী সুশাসন প্রবর্তনের আগে বাঙালির জাতীয় জীবন এক নিরন্ধ্র বিনষ্টির ঐতিহ্যে ভরপুর হয়েছিল। স্বভাবতঃই জীবনের এই বিপর্যয় লগ্নে কোন সৃজন-কর্ম সম্ভব হয়নি। নিছক গতানুগতিক ধারায় কোন-কিছু রচিত যদি হয়েও থাকে, তবু সর্বাত্মক বিধ্বংসের হাত থেকে তা' রক্ষা পায় নি। প্রধানতঃ এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল সৃজনহীন ঊষরতায় শূন্য হয়ে আছে।

১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে সামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহ বাংলার সুলতান পদে আসীন হন। তিনিই দীর্ঘকালের জন্য বঙ্গভূমিকে দিল্লীর বাদশাহীর কবল থেকে মুক্ত করে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। সামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭ খ্রীঃ) আপন ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার প্রভাবে বৃহত্তর বঙ্গের আশা ও স্বপ্নের সংগে নিজেকে একাত্ম করে তুলেছিলেন; তাঁর উত্তরাধিকারীরাও সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, পুষ্টও করেছিলেন। ফলে, ইলিয়াস শাহী সুলতান বংশ সেকালের বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে উঠেছিল—("represented Bengal's hopes and aspirations and had almost become a national institution."[১২])। দুইবারে ইলিয়াস শাহী রাজত্ব বাংলাদেশে ১৩৪২ থেকে ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৪৪২

তুর্কী শাসনের সুসংস্থান

১২। History of Bengal Vol. II. Ch VII.

থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল। মাঝখানে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র হিন্দু রাজা গণেশ এবং তাঁর মুসলমান পুত্র-পৌত্রাদির অধিকারভুক্ত হয়েছিল ১৪১০ থেকে ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়েও বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্যের পুষ্টি যে ঘটেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা রামায়ণের আদিকবি কৃত্তিবাসও রাজা গণেশের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হয়েছিলেন, তা'তে এখন আর সংশয়ের কারণ বড় একটা নেই। আবার ইলিয়াস শাহী বংশের অবসানের সংগে সংগেই অভ্যুদিত হয় হুসেনশাহী রাজবংশ (১৪৯৩ খ্রীঃ)। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং আলাউদ্দিন হুসেনশাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)। বদান্যতা, উদারতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক সহৃদয়তা নিয়ে ভারতীয় মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি একমাত্র সম্রাট আকবরের সংগেই তুলনীয় বলে কীর্তিত হয়েছেন। কিন্তু সর্বাত্মক বঙ্গ-সংস্কৃতির মহৎ পোষ্টা হিসেবে তিনি মুসলমান শাসকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে ছিলেন অনন্যতুল্য।

এবং বাংলার বৈপ্লবিক চেতনার সৃজনশীলতা

অতএব, চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা সাহিত্যের পুনর্মুক্তি ক্রমবিকশিত হয়ে ষোড়শ শতকে পূর্ণদীপ্ত হয়ে উঠেছিল দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা বিধানের জন্য এই রাজতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতার পটভূমিকে অতিমূল্য দেওয়া সংগত হবে না। সন্দেহ নেই, ইলিয়াস শাহী যুগ ও তৎপরবর্তী কালের শাসনব্যবস্থার ফলে বৃহত্তর বাংলার সমাজ-জীবনে পূর্ণাংগব ভারসাম্য ক্রমশঃ ফিরে এসেছিল; আর ঐটুকু না হলে মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারার জন্ম-সূচনাও অসম্ভব হ'ত। কিন্তু হিন্দু যুগ থেকে ইস্‌লামিক যুগের রাজনীতি-অর্থনীতিগত বিপর্যয় ও পুনঃসংস্থানকেই আমরা বিপ্লব নামে আখ্যাত করিনি। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপর্যয় উপলক্ষ্যে আদিযুগের যে সাহিত্যকর্ম লয়প্রাপ্ত হয়েছিল, তারই পুনরুত্থান মাত্র ঘটতে পারত। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আদিযুগীয় সৃজন-কর্মের পুনরভ্যুত্থান মাত্রই সূচনা করে না; আমূল নবীন জীবন-চেতনা ও মূল্যবোধের দ্বারা পরিস্রুত হয়ে প্রাচীন শিল্প-স্বভাবের নবরূপে পুনরুজ্জীবনের নিঃসংশয় বার্তাই ঘোষণা করে। আগেও বলেছি, আবার বলি,—বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করব এই জীবন-চেতনার পরিণতি ও মূল্যবোধের নবতম

পুনরভিব্যক্তির মধ্যে। বাঙালির জীবন-ধর্মের এই প্রাণস্পন্দিত পরিবর্তন ধারা সূচিত হয়েছে জাতীয়-চেতনার দুর্লক্ষ্য মর্মমূলে। অতএব, মধ্যযুগীয় সাহিত্য কর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করতে হবে বাঙালির সেই অন্তঃস্বভাবের গোপন গভীরে।

আদি মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ও মিলনমূলক নবজীবন-বোধ

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রচিত বাংলা সাহিত্যের কুলপঞ্জী অনুসন্ধান করলেই সমকালীন বাঙালি মানসের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য স্বতঃপ্রকাশিত হতে পারবে। এযুগের সাহিত্য প্রধানতঃ তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বদ্ধ,—(১) অনুবাদ সাহিত্য, (২) বৈষ্ণবপদ-সাহিত্য, এবং (৩) মঙ্গল কাব্য-সাহিত্য। এই তিন শ্রেণীর রচনার ভাব-স্বভাব বিচার করলে দেখ্‌ব,—একালের সাহিত্যের সর্বস্তরে একটি ঐকান্তিক মিলনাকাঙ্ক্ষা অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে লক্ষ্য করে এসেছি, বাংলার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আভিজাত এবং অনভিজাত সমাজের মধ্যে বিরোধ না থাক্‌লেও স্বাতন্ত্র্যজনিত বিভেদ ছিল বহুল এবং দূরপ্রসারী। বিশেষ করে সেন আমলে নবসংগঠিত স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য-চেতনার মধ্যে আভিজাত্যের তীব্রতা জাতিভেদের অজস্রতার জন্ম বহুলাংশে দায়ী। কবি জয়দেব এই বিভেদ-বন্ধনের গণ্ডী অতিক্রম করে সহজ স্বভাবের বশে সর্বজনীন বাঙালি জীবনের সান্নিধ্যে এসেছিলেন বলেই তিনি বাঙালির সাহিত্যে নবীন ঐতিহ্যের স্রষ্টারূপে চিরবন্দিত। কিন্তু, আভিজাত্য-বোধের কঠোরতা সে যুগে সুকঠিন ছিল বলেই জয়দেব-প্রতিভার লোক-জীবনাতীত অলৌকিক মহিমাই তীব্রতমভাবে জাতীয় মর্ম স্পর্শ করেছিল। মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্যচেতনা আভিজাত্যের সেই সংকীর্ণ আসন থেকে নেমে এসে জন-জীবনের বৃহত্তর মিলনভূমিতে সংযোজিত হতে পেরেছিল। কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণগান বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে এই ঐতিহাসিক সত্যেরই ঘোষণা করেছে।

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাসের কাব্য-পরিচয় সম্বন্ধে আজও সংশয় রয়েছে, কিন্তু তাঁর আত্মবিবরণীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা প্রায় নিঃসন্দেহ। এই আত্মবিবরণী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য পাণ্ডিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন কবি কৃত্তিবাস; এবিষয়ে তাঁর অভিমান-বুদ্ধি ছিল সুপ্রকট। তা'হলেও কৃত্তিবাস বাংলার

'লোক'-ভাষাতে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ রচনার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। আর নিজেই তিনি এমন অপ্রত্যাশিত-পূর্ব অনুষ্ঠানের কারণ বর্ণনা করেছেন:—

"মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥
সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥"

একই যুগে ভারতীয়-লোকভাষায় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন মালাধর বসু। তিনিও তাঁর অনুবাদ কর্মের উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন:—

মালাধর বসু

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে কহি পাঁচালী রচিয়া॥"

বাংলার ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের পক্ষে 'লোক বোঝানো' অথবা 'লোক নিস্তারণের' এই অতি-আগ্রহটুকু লক্ষ্য করবার মত। স্বাতন্ত্র্য ও একাকিত্বকে একদা যাঁরা সম্মানজনক বলে বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সূচনায় এসে মিলনের জন্য, লোক-সান্নিধ্যের জন্য হয়েছেন উদ্‌গ্রীব। শুধু তাই নয়, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে লোক-গ্রাহ্য করে তোলার সাধনায় হয়েছেন ব্রতী।

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের মধ্যে এই মিলনাকাঙ্ক্ষার আরো একটি নূতন ধারা সূচিত হয়েছে। বাংলার লোক-সমাজে আবহমানকাল থেকে যে-সকল লোকদেবতা পূজিত হয়ে আসছিলেন, তাঁদেরই শালীন-ভব্য পরিচ্ছদে ভূষিত করে তোলা হয়েছে এই মঙ্গলকাব্যসমূহে। তুর্কী আক্রমণ-পূর্ব বাংলা দেশেই জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের শালীনরূপ ক্রমবিলুপ্ত হয়ে দেশাচার-প্রধান সহজিয়া ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তুর্কী আক্রমণের আঘাতে সেই চিহ্নটুকুও বিধ্বস্ত হয়। অন্যদিকে অভিজাত হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রাজকীয় পক্ষপুটচ্যুত হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। পূর্ববংগের দুর্গমতম অঞ্চলে কিছুদিন

আত্মরক্ষণ সম্ভব হলেও অচিরে সেখানে মুসলমানী রাজশক্তির আঘাত ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠে। অথচ, পলায়নেরও একটা সীমা আছে। সেই সীমাকে অতিক্রম করার অর্থ সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ সাধন। তুর্কী আঘাতের পরিণামে বাংলার মৌল সমাজধর্মও এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছিল, যেখানে হয় প্রতিরোধ, নয় পূর্ণবিলয়ের মধ্যে একটিকে তা'র বেছে নিতেই হত। বাঙালি সেদিন বিদেশীয়তার প্রমত্ত-গতি রোধ করে আত্মরক্ষায় দৃঢ়পরিকর হয়েছিল। ফলে অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনভিজাত বৃহত্তর বঙ্গের জন-সংস্কৃতির সান্নিধ্য কামনা করেছে;—উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাঙালি সাধারণের মধ্যে পারস্পরিক মিলন-সংহতির আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। ফলে, একদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে পণ্ডিতের লোকজীবনের সন্নিকটস্থ করেছেন; অন্যদিকে লোক-সংস্কার ও লোকধর্মের আবহমান ধারাকে স্বীকার করে নিয়েছেন নবজাগ্রত স্মার্ত-পৌরাণিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে। এরই ফলে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশাদি অর্বাচীনপুরাণ কিংবা নানা পুরাণের অর্বাচীনতর অংশে প্রাচীন লোক দেবদেবী পৌরাণিক মহিমায় প্রতিষ্ঠা এবং স্বীকৃতিলাভ করেছেন। অনুমান করা হয়, আদিম লোক-সমাজে এই সকল দেবতাদের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক পাঁচালীগানের ধারা পুরাপ্রচলিত ছিল। সেই পাঁচালী কাব্যকেই পরিবর্ধিত,—সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে পরিমার্জিত ও সুবিন্যস্ত করে পূর্ণায়ত মঙ্গলকাব্যধারার সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব, আদিযুগের স্বাতন্ত্র্য-বিলাসী বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে এখানেও সেই সম্মিলন ও পূর্ণায়তির কামনা।

আলোচ্য যুগের বৈষ্ণব কবিতাবলীর মধ্যে এই দ্বি-ধারায় প্রবাহিত জাতীয় মিলনাকাঙ্ক্ষা যেন সংগমবদ্ধ হয়েছে। জয়দেব গোস্বামীর গীত গোবিন্দেই দেখেছি হিন্দু উচ্চ-কোটির পূজিত পৌরাণিক বিষ্ণুর সংগে (সহজিয়া?) লোকদেবতা 'রাধাবল্লভ কৃষ্ণের একাত্মতা বিধানের ফলে ধর্ম-সংস্কৃতিগত এক অপূর্ব ভাব-সম্মিলনের সৃষ্টি হয়েছিল। মৈথিল রাজ-সভার পৌরাণিক স্মার্ত-পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ও বাংলার গ্রামীণ কবি বড়ু চণ্ডীদাস একাধারে সেই জীবনধর্মের সমন্বয়-ঐতিহ্যকেই প্রমূর্ত করে তুলেছেন নিজ নিজ রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সংগীতাবলীতে। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীর

বৈষ্ণব কবিতাবলী ও বৈপ্লবিক মিলনাকাঙ্ক্ষার মুক্তি

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) রূপকল্পনা ও ভাবাভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আমূল; তাঁদের সৃজন-পরিবেশের মৌল বিভিন্নতাও এই প্রসংগে অবশ্য স্মরণীয়। তবু, পৌরাণিক হিন্দু ঐতিহ্যের সংগে বাঙালি লোক-জীবনাতির স্বচ্ছন্দ-সুন্দর মিলন-রচনার অবচেতন আকাঙ্ক্ষা এঁদের শিল্প-সাধনাকে সমসূত্রে বিধৃত করেছে। আর আমাদের বক্তব্য, তুর্কী আক্রমণোত্তর জাতীয় প্রতিক্রিয়াময় এই অবচেতন মিলনাকৃতির মধ্যেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষার সংগে অন্বিত হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাল-সীমায় রচিত পূর্বোল্লিখিত সাহিত্যপঞ্জীতে মধ্যযুগের বাঙালি মানসের এই অবচেতন বৈপ্লবিক স্বভাবকেই প্রত্যক্ষ করেছি এ-পর্যন্ত।

কিন্তু প্রচেষ্টার এই পরোক্ষতার মধ্যে বিপ্লবের পরিণামী সার্থকতা সম্ভব নয়। বিপ্লবের আগুন সাধকের নাভিকুণ্ডের আগুনের মত,—আপন সাধনার ঐকান্তিকতায় তাকে জাগ্রত করতে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রচেষ্টার মধ্যে মিলনের যে আকাঙ্ক্ষাটুকু মাত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল,—তা'কে আত্মস্থ করে এমন কোন শক্তি তখনও জেগে ওঠেনি, যে একটি সার্বিক জীবনাদর্শ বা সর্বজনীন জীবন-সাধনার সাধারণ পটভূমিকায় বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাবলীকে ঐক্যবদ্ধ সংহতি দান করতে পারে। প্রচেষ্টা যতই মহৎ এবং বৃহৎ হোক,—একটি সর্বাত্মক আদর্শের মধ্যে বিধৃত হতে না পারলে তা'র সার্থকতা অসম্ভব। বাংলার জাতীয় জীবনের এই বৃহৎ প্রচেষ্টাকে আপন জীবন-সাধনার মধ্যে ধারণ করে, তা'কে ঐক্যবদ্ধ পরিণাম দান করবার জন্যেই যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬ খ্রীঃ)। তুর্কী আক্রমণের আঘাতে জাতীয় প্রাণচেতনায় মিলন-শক্তির সূচনা সংঘটিত হয়েছিল;—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে তাই লাভ করল সুপরিবদ্ধ সুষ্ঠু পরিণাম। এই কারণেই বংলাসাহিত্যের মধ্যযুগকে চৈতন্য-জীবনাঙ্ক-চিহ্নিত করে আমরা পূর্ববর্ণিত আদি-মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যকে 'চৈতন্য-পূর্বযুগের বাংলাসাহিত্য' এবং পরবর্তী পরিণামী যুগকে 'চৈতন্যোত্তর যুগ' রূপে অভিহিত করতে চেয়েছি। কিন্তু চৈতন্যোত্তর বাংলাসাহিত্যের পরিচয় উদ্ধার করবার আগে এই ধরণের যুগ-নামাঙ্কনের যথার্থতা বিচার প্রয়োজন। কারণ মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের পূর্ণায়ত স্বভাব নির্ণয়ে পণ্ডিতেরা আজও দ্বিধাহীন নন।

এই সর্বাত্মক মিলনাকাঙ্ক্ষার পরিণাম চৈতন্য-জীবন

এবিষয়ে প্রথমেই ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের অভিমত স্মরণ যোগ্য—"খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে পাঠান সুলতান হুসেনশাহ বাঙালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। একই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের দেব-চরিত্র বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সাহিত্যের অপর শাখাগুলিকেও অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও এই দুই পুরুষসিংহ ও নরদেবতার নামে কোনও বিশেষ সময়ের বাঙালা সাহিত্যকে চিহ্নিত করা সমীচীন কিনা বিবেচ্য।…রাজনৈতিক অথবা ধর্মজগতে রাজশক্তি অথবা দেবোপম চরিত্রের যত প্রভাবই থাকুক না কেন, সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে উহা নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ এবং অন্য কারণ-পরম্পরা-সাপেক্ষ[১৩]।" ডঃ দাশগুপ্তের এই মন্তব্যের বিচার-সহতা অবশ্য স্বীকার্য। সাধারণভাবে সাহিত্য একটি সমগ্র জাতীয় মানসের অখণ্ড যুগ-চেতনার বাণীরূপ। অতএব, কোনও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে,—সে ব্যক্তিত্ব যতই প্রচণ্ড কিংবা প্রতিভাধর হোক্,—সার্বিক সাহিত্যকে সীমায়িত করা সঙ্গত নয়। এই মনোভাবই হয়ত মধ্যযুগ-নামাঙ্কনে ডঃ দীনেশচন্দ্রের দুর্লভ সত্য-দৃষ্টিকেও দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্যকে তিনি "শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপে প্রথম যুগ"-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার একই সময়ের বৈষ্ণবেতর বিষয়ের সাহিত্যসাধনাকে চিহ্নিত করেছেন "কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপে দ্বিতীয় যুগ" নামে।[১৪] মনে হয়, একই সময়ে বাংলাদেশে যেন পৃথক দুটি যুগ-চেতনা প্রবাহিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনার ফলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভাবগত অখণ্ডতাকে অস্বীকার করা হয়। অথচ, ডঃ সেন আলোচ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির সংসক্ত ঐক্যবদ্ধ পরিণামে ছিলেন একান্ত বিশ্বাসী। মনে হয়, চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের অতিলৌকিক মহিমায় একান্ত নিষ্ঠাবান্ হয়েও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই লোকোত্তর জীবন-প্রভাবকে অন্য-নিরপেক্ষ সর্বাত্মক প্রাধান্য দিতে গিয়ে ডঃ সেন যেন এই দেশের যুগ-সংস্কার প্রভাবেই কুণ্ঠিত হয়েছিলেন।

চৈতন্য-যুগনামাঙ্কনের ঔচিত্য বিচার

কিন্তু এ-বিষয়ে অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গিরও অবকাশ রয়েছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখব, সেখানে একাধিক ব্যক্তির নামে সাহিত্যের যুগ-পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছে। অথচ, এ-ধরণের প্রচেষ্টা

১৩। প্রাচীন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস। ১৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

অবৈজ্ঞানিক বলে বিবেচিত হয় নি; বরং যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হয়েছে। যে-বিশেষ অর্থ-ব্যঞ্জনার সংগে ঐ সকল সাহিত্যিক যুগকে ব্যক্তি-নামাঙ্কিত করা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইংরেজি সাহিত্যে 'এলিজাবেথীয়' কিংবা 'ভিক্টোরীয়' যুগ দুটির উল্লেখ করা চলে। কোন বিশেষ অর্থে সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ কিংবা ভিক্টোরিয়া তাঁদের যুগে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি,—তাঁদের ব্যক্তিগত সাধনার সিদ্ধির দ্বারা সাহিত্যিক যুগ-সূচনার ত প্রশ্নই ওঠে না। তা'হলেও সাহিত্যিক যুগ-বিকাশকে তাঁদের নামাঙ্কিত করা হয়েছে। কারণ আলোচ্য যুগধর্ম যে সার্বিক জাতীয়-জীবন-চেতনার বাণীমূর্তি, ঐ সম্রাজ্ঞী দুজনের রাজত্বকালেই তা সম্ভাবিত হয়েছিল। য়ুরোপ,—বিশেষ করে ইংলণ্ডের জীবনযাত্রা রাজতন্ত্র প্রধান। এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডের যে জীবন-বাণীকে বহন করে ঐযুগের সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেছিল,- বিশেষ-ভাবে শিল্পবিপ্লবের সামাজিক পটভূমিকাতেই সেই জীবন-চেতনার অভ্যুদয় ঘটে। আবার রাজশক্তির বিশেষ অভিব্যক্তির ফলেই শিল্পবিপ্লবের সংঘটনও হয়েছিল সম্ভব। এই উপলক্ষ্যে বিদেশের রাজনীতি-ইতিহাস-সাহিত্যের আলোচনার কোন অর্থ নেই। তবু একথা অবশ্য স্মরণীয় যে, ইংলণ্ডের কাছে রাজা বা রাণী কেবল ব্যক্তিমাত্রই নন, তিনি সর্বাত্মক জীবনের নির্বিশেষ প্রতিভূ। এই হিসেবেই ঐ সকল রাজশক্তির নামে বিশেষ বিশেষ জীবন-পর্যায়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এলিজাবেথীয় যুগের পটভূমিকায় 'এলিজাবেথ' ব্যক্তি নন,—একটি 'ভাব' মাত্র,—সেই সর্বাত্মক জীবনের 'ভাব' ব্যতিরেকে সে যুগের সাহিত্য স্বষ্টির ভিত্তি দাঁড়াতে পারত না।

আমাদের দেশে আধুনিক-পূর্ব কালের সমষ্টিগত জীবন-চেতনা রাষ্ট্র-প্রধান ছিল না,—ছিল ধর্ম এবং সমাজ প্রধান। অতএব, সে যুগে সমস্ত জাতীয়-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ,- নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র 'ধার্মিক' এবং 'সামাজিক' ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল,—রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোন শক্তির পক্ষে নয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের বিচারের যৌক্তিকতা অবশ্য স্মরণীয়। আগেই দেখেছি, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে নবাব হুসেন শাহের রাজচ্ছত্রের ছায়াতলে বাংলার বাণী-সাধনা বিশেষ আশ্রয় লাভ করেছিল।

রাষ্ট্রশক্তির নামে যুগ-পরিচয় উদ্ধারের সার্থকতা বিচার।

শুধু তাই নয়,—আলোচ্য সময়ে সাধারণভাবে রাজশক্তির বিশেষ সংস্থিতির ফলেই সেকালের সাহিত্যসাধনা সম্ভব হয়েছিল। আবার ষোড়শ শতকের শেষ, সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে বৃহত্তর ভারতের অর্থ-রাজনীতিগত সমৃদ্ধির সান্নিধ্য লাভ করে। এই উপলক্ষ্যে অন্ততঃ নাগরিক বাঙালির জীবনে বিচিত্রমুখী ব্যাপ্তির অবকাশ নির্বারিত হয়েছিল। জীবনের এই বৈচিত্র্য-ব্যাপ্তিময় সমুজ্জ্বলতাকে ঐতিহাসিক মধ্যযুগের সাহিত্যিক অভ্যুদয়ের কারণ রূপেও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।[১৫] কিন্তু সেখানেও দেখ্‌ব, আকবরের আমলের পরে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে ভারত-শাসন-পদ্ধতির সাংগীভূত হয়। ফলে, অর্থনৈতিক অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা-প্রাচুর্য দেখা দিলেও বাংলার সমাজ জীবনে দুর্নৈতিকতা ও বিভেদও দেখা দিয়েছিল তখনই। আর তাই, সমাজ-ধর্ম-নির্ভর সাহিত্যেরও অবনতি ঘট্‌তে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই। ডঃ যদুনাথও মধ্যযুগ-চেতনার প্রাণ-প্রেরণারূপে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব মূল্যবোধের উল্লেখ করেছেন বিশেষ-ভাবে।[১৬] চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরেই এ দেশে মোগল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। অন্যদিকে, এই প্রতিষ্ঠাই সর্বভারতীয় পাণ্ডিত্যের সান্নিধ্যে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব গোস্বামীদের দার্শনিক বিচারের পটভূমিকাকে ব্যাপ্ত করেছিল, সংশয় নেই। কিন্তু তার প্রভাব সাহিত্যক্ষেত্রে সীমাহীন ছিল না। ডঃ যদুনাথই স্বীকার করেছেন, মোগল শাসন এ দেশের সাহিত্যচর্যাকে ফারসী ভাষাভিমুখী করেছিল; এর বৈষ্ণব ঐতিহ্য সেদিন সংরক্ষিত হতে পেরেছিল জাতীয় প্রাণ-চেতনার দ্বারাই।[১৭]

অতএব, রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আনুকূল্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পথে অনেকটা পরিমাণে সহায়ক হয়ে থাকলেও,—কখনোই তা আলোচ্য যুগের সাহিত্য-সাধনার একটি মৌলিক বা প্রধান প্রেরণা-রূপে গণ্য হতে পারে না। আর সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক সহায়তার পরিমাণ সীমাবদ্ধ ছিল বলেই মধ্যযুগের সাহিত্যিক বিকাশকে কোন রাজশক্তির নামাঙ্কিত করা সম্ভব নয়,—সঙ্গতও নয়।

যাই হোক, মধ্যযুগের বাংলা দেশে রাজশক্তির এক নিম্নতম পরিমাণ আনুকূল্যের অভাব ঘট্‌লে এ যুগে সাহিত্য রচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব হত, সে কথা

১৫। দ্রষ্টব্য History of Bengal Vol II Ch XII। ১৬। ঐ। ১৭। ঐ

প্রথমেই স্বীকার করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছি যে, (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এক বিশেষ জীবন-মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই উদ্ভূত হয়েছিল; আর সেই মিলনাত্মক মূল্যবোধের উৎস ছিল জাতীয় চেতনার মর্মমূলে। আমাদের ধারণা, চৈতন্য-জীবন বাঙালির হৃৎপদ্মের সেই শতদল-রূপী পূর্ণ-বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে শতধা-বিচ্ছিন্ন বাংলার বহু-চেষ্টিত মিলন-চর্যা সার্থক পরিণাম লাভ করেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ, অবতার কিংবা রাধাকৃষ্ণ-লীলারস-ঘন পরিপূর্ণ দেবমূর্তি, বৈষ্ণব সাধকের ভাষায় 'রাধা ভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ'। ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের এই পরিচয় যতই মহিমাময় বলে মনে হোক্ না কেন, সাহিত্যের ঐতিহাসিকের পক্ষে তাঁর এই পরিচয়ই সর্বপ্রধান পরিচয় হওয়া উচিত নয়। যে নব জাগ্রত জাতীয় চৈতন্যের উৎসমুখে সমগ্র মধ্যযুগীয় প্রাণ-প্রবাহ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করেছিল, – এই যুগের মিলনানন্দময় সাহিত্যিক অভ্যুদয় যে-বিকাশের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি,—চৈতন্যদেব ছিলেন সেই নবোদ্ভূত সার্বিক জাতীয় চৈতন্যের অধিদেবতা। সাহিত্যের ইতিহাসে এইখানেই চৈতন্য-জীবনের 'নর-লীলার' একমাত্র 'দৈবী মহিমা'। ব্যক্তি রূপে, অবতার রূপে, কিংবা মহাপুরুষ রূপে নয়, যে সর্বাত্মক জীবনবোধ এবং বিশ্বাসের ভিত্তির 'পরে সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্য দাঁড়িয়ে আছে, – সেই বোধ এবং বিশ্বাসের সার্থক ভাব-মূর্তি রূপেই চৈতন্যদেব মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের ধারক।)

চৈতন্যদেব মধ্যযুগীয় জীবনবোধ এবং বিশ্বাসের ভাব-মূর্তি

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব সাধকগণের ভক্তি এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চৈতন্য-দেবের চারপাশে অতিলৌকিক ভাব এবং গোষ্ঠিগত বিশ্বাসের মায়াবরণ গড়ে তুলেছে। সেই তত্ত্বগত বিশ্বাসই বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে বাংলা চৈতন্য-চরিত গ্রন্থ-সমূহে। তা' হলেও, সেই অতিলৌকিক বিশ্বাস ও ভক্তির আবরণ ভেদ করে 'মানুষ' শ্রীচৈতন্যকে তাঁর মানবিক জীবনাবেদনের মধ্যে আবিষ্কার করা কঠিন নয়। ব্যক্তিগত নিষ্ঠা এবং গোষ্ঠিগত ভক্তি-বিশ্বাসের প্রভাবে শ্রীচৈতন্য-জীবনের লোকোত্তর ঘটনাবলীর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিভিন্ন জীবনী-গ্রন্থে বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর লোকায়ত মৌলিক স্বরূপটির ইঙ্গিত প্রায় সকল গ্রন্থেই একইভাবে

উদাহৃত হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের নবদ্বীপের বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'চৈতন্য-ভাগবতের' স্রষ্টা বৃন্দাবনদাস ভক্তি-মার্গ-বিমুখ 'পাষণ্ডী'দের এক বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে নবদ্বীপের নবোদিত পাণ্ডিত্য-শক্তির নিষ্ঠাহীন আত্ম-শ্লাঘার প্রাচুর্যকেই ভক্ত-কবি ধিক্কার দিয়েছেন। অথচ, বিশেষভাবে ব্যাকরণ-শাস্ত্র-পারঙ্গম বিদগ্ধ-পণ্ডিত নিমাইর মধ্যেও সেই পণ্ডিত-ধর্ম সমধিক বিকাশ লাভ করেছিল। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়,—প্রাচীন পৌরাণিক হিন্দু-চেতনা নবীন স্মার্ত-বুদ্ধিকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের আত্মরক্ষামূলক এক নূতন গণ্ডি রচনায় তৎপর হয়েছিল। চৈতন্য-পূর্ব যুগের নবদ্বীপ ছিল সেই নব-জাগ্রত ব্রাহ্মণ্য-চেতনার মিলন-তীর্থ। এই গণ্ডি-বদ্ধতার আত্মপ্লাবী স্রোতে চৈতন্য মহাপ্রভুও প্রথম জীবনে দেহ-মন-প্রাণ ভাসিয়েছিলেন। আবার, এই বুদ্ধিজীবি সংকীর্ণতাময় পটভূমিরই পাশে অদ্বৈতপ্রভুর মত পরিণত-চেতন 'ভক্ত' যুগ-হৃদয়-সঞ্জাত মিলন-কামনাকে প্রেম-ধর্মের স্পর্শ দিয়ে লালন করেছিলেন শ্রেষ্ঠতর শক্তির আবির্ভাব-প্রত্যাশায়। বৃন্দাবন-দাসের বর্ণিত চৈতন্য-আবির্ভাব বিষয়ক কাহিনী অলৌকিক বলেই অবিশ্বাস্য। কিন্তু, এই অলৌকিক কাহিনীর অন্তর্বর্তী ঐতিহ্য-সত্যটুকুকে আবিষ্কার করতে না পারলে ঐতিহাসিকের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে,—একটি সমগ্র যুগের মধ্যে মানব-মিলনের যে মহাবাণী নীহারিকা-রূপে জাগ্রত হয়ে পরিপূর্ণ আত্ম-মুক্তির জন্য বৃহত্তর শক্তির আশ্রয় কামনা করে ফিরছিল,—সেই তীব্র যুগাকাঙ্ক্ষার প্রত্যক্ষ পরিণামরূপেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। অদ্বৈতাদিকৃত চৈতন্যাহ্বান কাহিনীর লৌকিক, ঐতিহাসিক মূল্য এইখানেই। আর, এই মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্যযুগীয় বঙ্গ-সংস্কৃতির ভাব-বিগ্রহ রূপে কল্পনা করেছি।

লোকায়ত জীবনের পরিভাষায় চৈতন্য-জীবন-বাণীকে ত্রিধা বিভক্ত করা যেতে পারে:—(১) সর্বজীবে অ-হেতুক প্রেম, (২) 'কাম-গন্ধহীন',—তথা আত্মরতি-বিযুক্ত তদাত্ম প্রেম-সাধনার মাধ্যমে 'সর্বজীবে'র ঐক্য বিধান, এবং (৩) সর্বোপরি-মানব-মহিমার সর্ব-নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষ জোর দিয়েই প্রতিপন্ন করেছেন, 'নরলীলা'ই শ্রেষ্ঠ লীলা।—বলাবাহুল্য,—এই প্রচেষ্টা শ্রীচৈতন্য-জীবনেরই শিক্ষাসম্ভূত। আর

চৈতন্য জীবন-বাণী

শ্রীচৈতন্যদেব যেখানে তাঁর জীবন-সাধনার ঐকান্তিকতা দিয়ে এই শিক্ষাকে সাধারণ বিশ্বাসে পরিণত করেছেন,— সেখানেই তিনি কেবল মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতিরই নয়,—সমগ্র মধ্যযুগীয় জীবন-প্রবাহের মূল সুরটিকেই প্রথম ঝঙ্কৃত করে তুলেছেন। এইখানেই তিনি মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবন-চেতনার স্রষ্টা। নিতান্ত সাধারণ দৃষ্টিতেও— সভ্যতা-সংস্কৃতি মাত্রেরই বিকাশের একটি সর্বদেশ-সাধারণ ধারা নির্দেশ করা যেতে পারে।—সে ধারা একান্ত দেববাদ-প্রাধান্য থেকে দেববাদ-প্রধান মানবতাবাদের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ পূর্ণমানবতা-বোধের পথে অগ্রসর হয়েছে। পৃথিবীর শিল্প-সাহিত্য প্রবাহের বিকাশ অন্ততঃ ঘটেছে এই বিশেষ ধারাকেই অবলম্বন ক'রে। এই জীবন-প্রবাহকে মৌল চেতনার বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য অনুসারে যদি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা সম্ভব হয়, তাহলে বলা যায়,—সর্বাত্মক দেববাদ আদিযুগের সাধারণ ধর্ম।—মধ্যযুগের সাধারণ ধর্ম দেববাদ-নির্ভর হলেও মানবতার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি।—আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণ,—অনন্য-নির্ভর মানবজীবন-বোধের প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য করলে দেখ্‌ব,—পূর্ববর্তী আলোচনায় পরিচায়িত বাংলা সাহিত্যে পারিপার্শ্বিক জীবনের পরিচয় অপ্রচুর না হ'লেও তা অবিমিশ্র মানবিক জীবন-বোধ-সঞ্জাত নয়,—Subjective অধ্যাত্ম-বিলাস-সম্ভূত। এক কথায় সেযুগে বাংলা সাহিত্য ছিল সাধারণভাবে দেব-বাদ প্রধান। পূর্ববর্তী আলোচনায় এ কথাও লক্ষ্য করেছি যে, এই উন্মার্গগামী দেব-বাদ-প্রাধান্যের প্রভাবে বাস্তব বুদ্ধি এবং কর্মপ্রচেষ্টার শৈথিল্য ঘটেছিল বলেই তুর্কী আক্রমণের বিপর্যয়জাতিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলেছিল। এই অভিভূতি থেকে আত্মবিমুক্তির পর স্বভাবতই জাতীয় প্রচেষ্টা অধিকতর বাস্তব-বুদ্ধি এবং মানবিকতা বোধের দ্বারা পরিপুষ্ট হ'তে চেয়েছিল; এই পরিপুষ্টির সার্থকতা প্রতিপন্ন হ'ল শ্রীচৈতন্য-জীবন-শিক্ষায় নর-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতিতে।

চৈতন্য-জীবন-বাণী ; নরবাদের প্রতিষ্ঠা

স্মরণ রাখা উচিত,—চৈতন্য-জীবনী-গ্রন্থাবলীই বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম মানব-জীবন-নির্ভর কাব্য। বলা হয়ে থাকে,—চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থাবলীতে মহাপ্রভুর মানবত্ব অপেক্ষা দেবত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রতিই বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখ্‌ব,—বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগেও মানবিকতার

মধ্যযুগ-চেতনার বৈশিষ্ট্য, দেববাদ-নির্ভর নর-বাদ

'পরে দেবত্ব-আরোপ করার আকাজ্ক্ষা থেকে আজও আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারিনি। মহাত্মা গান্ধী কিংবা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত প্রধানতঃ রাজনীতি-নির্ভর ব্যক্তিত্বের 'পরেও দেবত্বারোপের (Deification) চেষ্টা আজও দুর্লক্ষ্য নয়। প্রাচীনকালের পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্মগুরু এবং সমাজ-সংস্কারক সন্ন্যাসিদের সম্বন্ধে ত কথাই নেই। অতএব, মধ্যযুগে অনুরূপ প্রচেষ্টার অস্তিত্ব লক্ষ্য করে সন্ত্রস্ত হ'বার কারণ নেই। আধুনিক যুগেও আমরা নর-শ্রেষ্ঠদের ওপর দেবত্বারোপ করে থাকি। তা'হলেও, মধ্যধুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের বিশেষ পার্থক্য আছে,—আধুনিক কালে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণ মানব-জীবন-পরিচয়ই যেখানে সমধিকরূপে প্রকটিত হয়ে থাকে, সেখানে মধ্যযুগীয় সাহিত্য বিশেষভাবে 'নরচন্দ্রমা'রই কথা। আর এই 'নরচন্দ্রমার' 'পরেই মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসবশে দেবত্বা-রোপের চেষ্টা করা হয়েছে। এই অর্থেই মধ্যযুগীয় সাহিত্য দেব-বাদ-নির্ভর মানবতার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই এ-সত্য স্পষ্ট প্রতিভাত হবে। জীবনীকারের চোখে চৈতন্য-দেব 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ', নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের অবতার, অদ্বৈতপ্রভু সাক্ষাৎ মহাদেব। কিন্তু বৈষ্ণব-ভক্তের কল্পনাও অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীতে অবতারত্ব আরোপ করে নি। সীতা-জীবনীতে সীতা দেবী নারী-চন্দ্রমা। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রাধা-কৃষ্ণের দৈবী লীলা আস্বাদনে এই নরবাদের সংযোজনা ঘটেছে, তথা 'নরলীলা'র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পবাবলীতে।

কিন্তু, চৈতন্য-জীবনাদর্শ-জাত এই 'নর-বাদের' প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণব সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রেই একান্ত সীমাবদ্ধ থাকে নি,—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যোত্তর অ-বৈষ্ণব সাহিত্যেও অল্প-বিস্তর পরিমাণে বৈষ্ণব-প্রভাব, তথা চৈতন্য-প্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত,—ঐ সকল গ্রন্থে বার-কয় হরিধ্বনি, চৈতন্য-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, অথবা হরি-সংকীর্তনের উল্লেখের মধ্যেই চৈতন্য-প্রভাবের পরিচয় অভিব্যক্ত হয় নি; -ভাবে-ভাষায়, চেষ্টায়-সাধনায় ঐ সকল সাহিত্য যেখানে দেবত্ব-নির্ভর নর-চন্দ্রমারই বিজয়গাথা রচনা করেছে,—সেখানেই নিহিত রয়েছে চৈতন্য-প্রভাবের মূল স্বরূপটি।

চৈতন্যোত্তর বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের কাহিনী এই 'নরচন্দ্রমা'র কথাকেই একচ্ছত্র প্রাধান্য দিয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা,—মনসামঙ্গলের চন্দ্রধর-বেহুলা, ধর্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী-লাউসেন —এই 'নরচন্দ্রমার'ই প্রতীক। শুধু চারিত্রিক বিচারেই নয়, সাধারণ ভাবেও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব, অনুবাদ এবং মঙ্গল ইত্যাদি সকল শ্রেণীর সাহিত্যেরই মানবিক আবেদন যে সমধিক,—পণ্ডিত মহলে এই সত্য মোটামুটি স্বীকৃত হয়ে থাকে। আমাদের বক্তব্য,—মধ্যযুগীয় সাহিত্যের এই মানবিক আবেদনই চৈতন্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে,—চৈতন্য-পূর্ববর্তী মধ্যযুগের শিল্পী কী অনুবাদ, কী মঙ্গল-সাহিত্য, সর্বত্রই একটি কঠিন মনুষ্যত্বের দৈবী-মহিমা কীর্তনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, চৈতন্যোত্তর যুগের সাহিত্যিক পরিকল্পনায় সেই কাঠিন্যের 'পরেই চৈতন্যানুগ কোমল প্রেমাবলেপ রচনা করা হয়েছে। চৈতন্যোত্তর রামায়ণের রাম, মহাভারত এবং ভাগবত গ্রন্থাদির কৃষ্ণ; মঙ্গল-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা,—ইত্যাদি সকল চরিত্রের মধ্যেই কঠিন দার্ঢ্যের সঙ্গে শ্যামল-কোমলতার সমন্বয় ঘন-নিবদ্ধ হয়ে আছে। এই প্রেম-ঘন চরিত্র এবং কাহিনী কল্পনার মধ্যেই বস্তুতঃ চৈতন্য-প্রভাবের স্বরূপ লক্ষ্য করা উচিত।

মধ্যযুগীয় জীবন-চেতনায় চৈতন্য-জীবনের দান

পূর্বেই বলেছি, চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত 'নরবাদ' প্রেমবাদের ভিত্তির 'পরে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ ধারণা,—এই প্রেমবাদ বিশেষ ধরণের তত্ত্ববুদ্ধি-সঞ্জাত, আর বিশেষভাবে তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের পটভূমিকাতেই পরিপুষ্ট। এই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যের গণ্ডীর বাইরে চৈতন্য-প্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকৃতিতে বাধা ঘটে। সত্য বটে, চৈতন্যোত্তর যুগে বিশেষভাবে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের ভক্তি এবং পাণ্ডিত্যপ্রভাবে চৈতন্য-মতবাদ বিশেষ সম্প্রদায়গত বিশ্বাসের আশ্রয়রূপে প্রকাশলাভ করেছে। কিন্তু সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরেও চৈতন্য-জীবন-বাণীর একটি সর্বাত্মক প্রভাব ও মর্যাদা বিদ্যমান ছিল,—মধ্যযুগীয় বাংলা দেশের বৃহত্তর সমাজ-জীবন এবং সেই জীবন-সম্ভব সাহিত্য-সাধনায় তারই প্রভাব অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রভাব ছিল সাধারণভাবে মিলনধর্মী। চৈতন্য-ধর্মে যাই থাক্, চৈতন্য-জীবনে 'প্রেম'

চৈতন্য-প্রবর্তিত নরবাদ সর্বাত্মক প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

সর্বাত্মক মিলনের প্রতিশব্দ। আ-দ্বিজ-চণ্ডালই নয়, যবন পর্যন্ত সর্বমানবে প্রেম বিতরণে এই সর্বাত্মক মিলন-বোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। এই মিলন-ধর্মের স্বরূপ আরো প্রকট হয়েছে মানবতার সাধারণ স্বীকৃতিতে। 'হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ',-এই জীবন-বাণীই মানবতার শ্রেষ্ঠ বিজয়-গাথা। এখানে 'হরিভক্তি' শব্দের কোন সম্প্রদায়গত ব্যাখ্যা যে নিরর্থক,—তার ঐতিহাসিক প্রমাণের মত সাহিত্যিক প্রমাণও অল্প নয়। অধুনা শতাধিক মুসলমান কবি-রচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর পরিচয় পাওয়া গেছে[১৮]। এঁরা সকলেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে 'হরিভক্তি'র বিশেষ স্বরূপটিকে আয়ত্ত করে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা-গীতি রচনায় বৃত হয়েছিলেন,—এমন সিদ্ধান্ত কিছুতেই সমর্থন করা চলেনা। বস্তুতঃ চৈতন্য-প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসাস্বাদন-পদ্ধতির মধ্যে জীবনের সর্বাত্মক প্রেমাস্বাদনের মূল মন্ত্রটি সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এই সঞ্জীবনী শক্তির স্পর্শেই ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি-শ্রেষ্ঠ মধুসূদন কিংবা বিংশ শতাব্দীর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও কোন প্রকার বিশেষ সম্প্রদায়গত ভক্তি-বিশ্বাসের সাধন-ঐতিহ্য ছাড়াও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে সার্থক প্রেম-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ জীবনের এই সর্বাত্মক প্রেম-বাণী আ-চণ্ডালে বিতরণ করবার মহামন্ত্রই মিলন-বুভুক্ষু মধ্যযুগের আপামর জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। আর এই জন্যই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে চৈতন্যোত্তর মধ্যযুগের সকল সাহিত্যেই এই বাণী প্রাণের সঞ্চার করেছিল।

এই প্রসঙ্গে চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের সৃজন-পরিবেশ এবং আস্বাদন-বৈশিষ্ট্যেরও আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলেছি, চৈতন্য-পূর্ববর্তী

সর্বাত্মক প্রেম-পুষ্ট সাহিত্যিক পরিবেশ এবং

এবং চৈতন্য-সম-সাময়িক বঙ্গদেশে নবীন স্মার্তবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নব-অভ্যুদয়ের একটি প্রচেষ্টা প্রথমাবধিই আরম্ভ হয়েছিল। স্বয়ং চৈতন্যও প্রথম জীবনে এই স্মার্ত সিদ্ধান্তের পোষণ করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় একালের ব্রাহ্মণ্য চেতনা নিঃসন্দেহে অধিকতর ব্যাপক এবং সর্বাভিমুখী ছিল। কিন্তু, নিয়ম শৃঙ্খলার

১৮। দ্রষ্টব্য—অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি।'

নামে স্মার্ত রীতি-পদ্ধতির অতি-প্রয়োগে জীবনের স্বচ্ছ প্রকাশকে তা আড়ষ্ট করে তুলছিল। নিখিল বাঙালিকে হিন্দু ধর্মের গণ্ডিতে গ্রহণ করেও ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি সমাজ-নীতির নামে শ্রেণী ও জাতি বিভাগের বিচ্ছিন্নতাকে অবারিত করে তুলেছিল। অথচ, চৈতন্য-জীবনধর্ম সর্বাবস্থায় ছিল শ্রেণি-গোষ্ঠি-সম্প্রদায়-বন্ধনের অতীত; সর্বাভিমুখী প্রেম-মিলনাকাঙ্ক্ষায় সমৃদ্ধ। সহজেই স্মার্ত-পৌরাণিক শক্তির সংগে চৈতন্য-জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ বিরোধের অবকাশ ঘটেছিল। অনেকটা এই কারণেও মহাপ্রভু নবদ্বীপের মাতৃভূমি পরিহার করে নীলাচলে স্বেচ্ছাবৃত প্রবাস গ্রহণ করেছিলেন কিনা, সে খবর আজ কে বলবে?

যাই হোক্, সমাজের বহিরবয়বে স্মার্ত শৃঙ্খলার বিন্যাস-পদ্ধতি আপাত-স্বীকৃত হলেও, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সর্বাত্মক জীবন-চেতনা স্বতো-বিমুক্ত প্রেম-মিলন-মূলক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ছিল, মধ্যযুগের কাব্যাদিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সমাজের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা উপলক্ষ্যে 'নবশাখ'-দিগেরও উল্লেখ আছে। আর সন্দেহ নেই,—মুকুন্দরামের সমাজ-বিভাগ অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে স্মার্ত-সিদ্ধান্তেরই অনুকরণ করেছে। তাহলেও, সমাজব্যবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে জাতি কিংবা সম্প্রদায় ভেদের কড়াকড়ি যে ছিল না,—সেকথা বুঝতে কষ্ট হয় না। লক্ষ্য করা উচিত,—এ যুগের সাহিত্য তথা জীবনযাত্রাও ধর্মগত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি-নির্ভর নয়, উচ্চ-নিচ শ্রেণি-নির্ভরও নয়,—বিশেষভাবে গ্রাম্য সমাজ-নির্ভর। সেই সমাজে ব্রাহ্মণের মত চণ্ডাল, এমন কি মুসলমানেরও একটা নির্দিষ্ট আসন ছিল; সে আসন তার সমাজগত দাবির 'পরে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের সমাজ-পরিবেশে জমিদারের মত দীনতম প্রজারও একটি মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য ছিল—আর সেটি তা'র গ্রামীণ অস্তিত্বের গর্বের'পরে গড়ে উঠেছিল। তাই, কেবল সামাজিক আচার-আচরণেই নয়, সাহিত্য-আস্বাদনের সময়েও আপামর গ্রামীণ জনসাধারণ

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সর্বজনীন আবেদনের স্বরূপ

তাদের সামাজিকত্বের দাবি এবং গ্রাম্য ঐতিহ্যের গর্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সামাজিক সঙ্গীতের আসরে। সার্থক কাব্য-রস সৃষ্টির প্রচেষ্টায় জাতীয় কবিকেও এদের দাবি ও ঐতিহ্য-বোধের সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে হয়েছে। ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত,

অনুবাদ, লৌকিক-সাহিত্য নির্বিশেষে সকল সাহিত্যই জাতি-ধর্ম-শ্রেণি-সীমা-বিমুক্ত আপামর বাঙালি সাধারণের সহৃদয় হৃদয়ের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে তবেই রসোত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে। এইখানেই, এই গোষ্ঠি-সম্প্রদায়-শ্রেণি-নিরপেক্ষ সর্বজনীনতার মধ্যেই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কালগত বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস,—ধর্ম-নির্ভর সাহিত্যের পক্ষে এই অপূর্ব ধর্ম-নিরপেক্ষতা সম্ভব হয়েছিল চৈতন্য-প্রবর্তিত সর্বজনীন প্রেমবাদ-পুষ্ট নরবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে;—আর এই কারণেই আলোচ্য যুগ-সাহিত্যকে চৈতন্য নামাঙ্কিত করে তা'র অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বিকাশের চেষ্টা করেছি।

এ সম্বন্ধে দীর্ঘতর আলোচনার অবকাশ নেই,—প্রয়োজনও হয়ত আর নেই বড় একটা। পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে এই যুগ-গত বৈশিষ্ট্যের স্পষ্টতর বিশ্লেষণের প্রয়াসী হব। এবারে কেবলমাত্র প্রাথমিক অবধারণার জন্য আলোচ্যযুগের পথ-পরিচয়টুকু উদ্ধার করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

মধ্যযুগের প্রাথমিক গ্রন্থ পরিচয়

ঐতিহাসিক বিচারে ত্রয়োদশ-শতাব্দীর সূচনাতেই তুর্কী আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল,—আর চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে। এই হিসাবে সাধারণভাবে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালে বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগ বা চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগ পরিকল্পিত হতে পারে। আবার সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই চৈতন্য-প্রভাবের শৈথিল্য সূচিত হ'লেও, অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের সমাপ্তি ঘটেছিল। এই কারণে ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী কাল পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের পরিক্রমা-কালকে চৈতন্যোত্তর যুগ নামে চিহ্নিত করেছি। এই পরিকল্পনাকে নিম্নরূপে চিত্রিত করা চলে :—

আদিমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

(আনুমানিক ১২০০ খ্রীঃ—১৫০০ খ্রীঃ)

(ক) অনুবাদ সাহিত্য

১। কৃত্তিবাসের রামায়ণ (?)

২। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়

(খ) বৈষ্ণব পদসাহিত্য

১। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন

২। বিদ্যাপতির পদাবলী[১৯]

৩। পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস (?)

(গ) মঙ্গল সাহিত্য

১। কানাহরি দত্তের পদ্মাপুরাণ (?)

২। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (?)

৩। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসাবিজয়

৪। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল

৫। ময়ূর ভট্টের ধর্মমঙ্গল (?)

৬। মাণিকরামের চণ্ডীমঙ্গল (?)

(?) আলোচ্য কবি এবং কাব্যের আবির্ভাবকাল এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে।

১৯। ইনি বাঙালি কবি না হ'লেও এঁর অ-বাংলা ভাষায় লিখিত পদসমষ্টি বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

(ক) বৈষ্ণব পদসাহিত্য

চৈতন্য সমসাময়িক কবি-গোষ্ঠী

১। মুরারি গুপ্ত
২। নরহরি সরকার
৩। বাসুঘোষ
৪। রামানন্দ বসু ইত্যাদি*

চৈতন্যোত্তর যুগের কবি-গোষ্ঠী

৫। জ্ঞানদাস
৬। গোবিন্দদাস কবিরাজ
৭। দীন চণ্ডীদাস
৮। লোচন দাস
৯। বলরাম দাস ইত্যাদি*।

(খ) জীবনী সাহিত্য

১। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত
২। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল
৩। লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গল
৪। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত
৫। গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চা (?)
৬। ঈশাননাগের অদ্বৈত প্রকাশ ইত্যাদি*

(গ) অনুবাদ সাহিত্য

রামায়ণ

১। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ
২। চন্দ্রাবতী
৩। ভবানীদাসের অধ্যাত্ম রামায়ণ
৪। রঘুনন্দনের রাম রসায়ন ইত্যাদি*

মহাভারত

১। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত
২। শ্রীকর নন্দীর মহাভারত
৩। সঞ্জয় মহাভারত
৪। কাশীরামদাসের মহাভারত ইত্যাদি*

ভাগবত ও অন্যান্য কৃষ্ণকথা

১। মাধবাচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল
২। দ্বিজ রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়
৩। কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল
৪। কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস ইত্যাদি*

(ঘ) মঙ্গল সাহিত্য

মনসা মঙ্গল

১। বিজয়
২। বংশীদাস
৩। কেতকাদাস ক্ষমানন্দ ইত্যাদি*

চণ্ডীমঙ্গল

১। বলরাম কবিকঙ্কন (?)
২। দ্বিজমাধব
৩। মুকুন্দরাম ইত্যাদি*

ধর্মমঙ্গল

১। খেলারাম
২। রূপরাম
৩। ঘনরাম ইত্যাদি*

শিবায়ন

১। রতিদেবের মৃগলব্ধ
২। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র
৩। রামেশ্বর ভট্টাচার্য ইত্যাদি*

দুর্গামঙ্গল

১। ভবানীপ্রসাদ
২। রামশঙ্করদেবের অভয়া-মঙ্গল ইত্যাদি*

কালিকামঙ্গল

১। বলরাম কবিশেখর
২। ভারতচন্দ্র
৩। রামপ্রসাদ ইত্যাদি*

(ঙ) লোকসঙ্গীত ও মুসলমান কবি সম্প্রদায়

১। দৌলৎকাজীর লোর চন্দ্রাণী
২। আলওলের পদ্মাবৎ ইত্যাদি*

(চ) শাক্ত গীতি

১। রামপ্রসাদ
২। কমলাকান্ত ইত্যাদি*

---

*আলোচ্য লেখক ও গ্রন্থপঞ্জীর কোনটিই সম্পূর্ণ নয়,— প্রথম প্রবেশকের স্মরণ-সহায়তার জন্য শ্রেষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তা'র নামমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। (?) আলোচ্য কবি এবং কাব্যের আবির্ভাব কাল ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

আদি-মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য

(১) কৃত্তিবাসের রামায়ণ

আদি-মধ্যযুগ-স্বভাব ও অনুবাদ সাহিত্য

পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি, মোটামুটি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়ে রচিত বাংলা সাহিত্যকে আমরা আদি-মধ্যযুগের লক্ষণাবহ বলে মনে করি। অবশ্য এর মধ্যে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাংলাভাষায় রচনার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। যাই হোক, বিশেষ করে আলোচ্যকালের অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যেই পূর্বকথিত আদি-মধ্যযুগ-স্বভাব সর্বাধিক অভি-ব্যক্তি পেয়েছে। তুর্কী আক্রমণ ও পরবর্তীকালের সর্বময় বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতার ফলেও যেন এ-যুগের বাঙালি চেতনা অধিকতর পরিমাণে বিষয়নিষ্ঠ (objective) হয়ে উঠেছিল। আদিযুগের বাঙালি সমাজের মত আত্মলীন (subjective) স্বাতন্ত্র্য-বিলাস স্বভাবত-ই এযুগে অসম্ভব হয়েছিল। কাব্যের আধারেও তাই আবেগের চেয়ে সংযম, মন্ময়তার চেয়ে বাস্তবাভিমুখিতা বেশি মাত্রায় পরিস্ফুট হয়েছিল। আলোচ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যে এই তদাত্মতাপূর্ণ (objective) কাহিনীকাব্যের প্রথম সার্থক অভিব্যক্তি।

অনুবাদ সাহিত্যের ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

সাহিত্যের নিছক গঠমানতার ব্যাপারেও এই অনুবাদ-প্রচেষ্টার সফলতা ছিল দূর-প্রসারী। যে-কোন ভাষা-সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য অন্যতর ভাষার সাহিত্যাদি থেকে অনুবাদ অপরিহার্য। যে ভাষার অনুবাদ সাহিত্য যত সমৃদ্ধ, সেই ভাষা তত বলিষ্ঠ, এ কথা বলতে বাধা নেই। বিশেষ করে নবসৃজ্যমান ভাষার পক্ষে শ্রেষ্ঠতর ভাষা-সাহিত্য থেকে অনুবাদ আত্মোন্নতি সাধনের একটি অপরিহার্য উপাদান। এ-ধরণের অনুবাদের মাধ্যমে নূতন ভাষা কেবল বলিষ্ঠ শব্দভাণ্ডার অথবা দক্ষ প্রকাশ-ভঙ্গিকেই আয়ত্ত করে না, শ্রেষ্ঠতর ভাব-কল্পনার সংগেও হয় পরিণয়াবদ্ধ।

চর্যাপদের দুর্বল বাংলা ভাষা অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যাপক ধারণ-ও-বহন-ক্ষমতা আয়ত্ত করেই অনেকটা পুষ্ট হয়ে উঠেছিল, এমন অনুমান হয়ত অসংগত নয়। তা ছাড়া, এই অনুবাদ সাহিত্যকে আশ্রয় করেই অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যে বৃহত্তর বাঙালি জীবনের সান্নিধ্য-নিবিষ্ট হয়েছিল, সে কথা বলেছি। অতএব, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মিলনাত্মক জীবন-বাণীর একটি শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা এই অনুবাদ সাহিত্য।

প্রাচীনতম অনুবাদ-সাহিত্যিক কৃত্তিবাস অজ্ঞাত-পরিচয়

আর, কৃত্তিবাসের প্রতিভাকে আশ্রয় করেই আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনুবাদ-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ করেছিল। কৃত্তিবাসের এই দুর্লভ কবি-কীর্তি নিখিল বাংলায় আজও বিঘোষিত হয়ে থাকে। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সৃষ্টির কোন পরিচয় আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মবিবরণীর আকারে কবির ব্যক্তি-পরিচয় যতটুকু পাওয়া গেছে, কবি-প্রতিভার ঐতিহাসিক বিচারের পক্ষে তা'ও যথেষ্ট নয়। বাজার-প্রচলিত মুদ্রিত বাংলা পদ্য রামায়ণের প্রায় সব কয়খানিই কৃত্তিবাসের ভণিতায় প্রকাশিত। বিভিন্ন রকমের ভাব-ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্বলিত এই সব গ্রন্থাবলী থেকে মূল কৃত্তিবাসী রচনার পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। সর্বপ্রথম ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এক প্রবন্ধ রচনা করে প্রমাণ করেন যে বাজার-প্রচলিত রামায়ণ গ্রন্থের কোন একছত্রও প্রকৃতপক্ষে কৃত্তিবাসের রচনা নয়। পরবর্তীকালে তিনিই বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রবর্তনায় প্রক্ষেপারণ্য থেকে কৃত্তিবাসের মূল রচনার উদ্ধারে ব্রতী হন। ফলে, ১৩০৭ এবং ১৩১০ বঙ্গাব্দে যথাক্রমে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা এবং উত্তরাকাণ্ড পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ 'কাণ্ড' দুটির প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে ঢাকা থেকে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত্তিবাসী রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য সংস্করণ সম্পাদনায় ব্রতী হন। কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ হবার আগেই ডঃ ভট্টশালী কাল-কবলিত হন। তাছাড়া, ডঃ ভট্টশালীর চেষ্টাও, ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের "Composete Text"[১] মাত্র গড়ে তুলতে পেরেছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অকৃত্রিম পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা আজও সফল হয়নি।

১। দ্রষ্টব্য—বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথমখণ্ড ২য় সং।

এখানেও শেষ নয়। স্বয়ং কবির অস্তিত্ব এবং ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকেরা বহুকাল নিঃসংশয় হতে পারেন নি। সর্বপ্রথম ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি একখানি প্রাচীন পুথিতে কৃত্তিবাসের একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মপরিচয় আবিষ্কার করেন। পুথিখানির লিপিকাল নাকি ছিল ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ অংশটির অনুলিপি ৺ভক্তিনিধি ডঃ দীনেশচন্দ্রকে লিখে পাঠান। তিনি সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে আত্মবিবরণীটি মুদ্রিত করেন। অথচ, পরবর্তীকালে বহু অনুসন্ধানের ফলেও মূল পুথিখানি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। ফলে, ঐ পুথির অস্তিত্ব এবং আত্ম-বিবরণীর প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলের একটি বিশেষ অংশে অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১২৪০ বাংলা সালে লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি পুথিতে প্রায় একই ধরণের আত্ম-বিবরণীর পরিচয় আবিষ্কার করেন।[২] প্রথম প্রকাশিত আত্ম-বিবরণী থেকে এই বিবরণীর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন পূর্ববর্তী কাহিনীর অনেকাংশে ইচ্ছাকৃত প্রক্ষেপ বিদ্যমান।[৩] যাই হোক্, পরবর্তী বিবরণী ঐতিহাসিক বিচারে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে, আমরা তাই উদ্ধার করছি,—

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীর পরিচয়

"পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা ॥
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার ॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজ্যা বুলে ॥
গঙ্গাতীরে দাণ্ডায়্যা ব্রাহ্মণ চতুর্দিকে চাই।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথাই ॥
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুক্কুরের ধ্বনি ॥

২। দ্রষ্টব্য 'ভারতবর্ষ' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯। ৩। বাঙালাসাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২য় সং।

কুক্কুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চাহে।
আকাশবাণী হয়্যা তথা ব্রাহ্মণ যে রহে॥
মালী জাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চেতে থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন জগতে যে ফুলিয়া বাখানি।
দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্যা বহেন গঙ্গা-সোণি॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি।
ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়এ সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য গোবিন্দ তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে শীলে মুরারি ভূষিত।
সাতপুত্র হৈল ঁার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ঠাকুরাল ধর্মচরিত্র গুণে মহাগুণী॥
মদন-আলাপে ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুস্থির ভাগ্যবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি-প্রসাদে।
মুরারির পুত্র বাড়এ সম্পদে॥
মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে আনন্দ লয়্যা আইল কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় ষড় রাত্রি উপবাস॥
সহোদর শান্তিমাধব সর্বলোকে ঘুষি।
স্রিকর [৪] ভাই তার নিত্য উপবাসী॥

৪। সম্ভাব্য পাঠান্তর শ্রীকর—পূর্ববর্তী বিবরণী।

বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিনী হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী॥

*   *   *   *[৫]

আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (?) মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভে থাকি পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতামহ আমা কৈল কোলে
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
বারান্তর উত্তরে[৬] গেলাম বড় গঙ্গার পার॥
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা পাইলাম আমি বিদ্যার প্রচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
নানা ছন্দে নানা ভাষা বিদ্যার প্রসর॥
আকাশবাণী হৈল সাক্ষাৎ সরস্বতী।
তাহার প্রসাদে কণ্ঠে বৈসেন ভারথি॥
বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মিকি চ্যবন।
হেনগুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার প্রসন[৭]॥

৫। পরিত্যক্ত অংশে মুখটি বংশ এবং বংশীয়গণের উদার প্রশস্তি আছে। (?) পূর্ববর্তী বিবরণে পাঠ ছিল 'পূর্ণ',- এ নিয়ে কাল বিচারে অনেক বিতর্কের অবকাশ ঘটে। ৬। ডঃ সুকুমার সেন "বরেন্দ্র উত্তর" অর্থ করেছেন। ৭। 'প্রসন < প্রসন্ন'—ডঃ সুকুমার সেন—ঐ।

ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উগ্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
সাতশ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দিয়ানে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধায়া আইল দূত হাতে সুবর্ণ লাটি॥
কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার।
সোনারূপার ঘর দেখি মনে চমৎকার॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাশে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্বরায় বসি আছে গন্ধর্ব অবতার।
রাজ-সভা-পূজিত তেঁই গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজ পাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরনী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব-অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়াছে রাজার সমুখে॥

চারিদিগে নাটগীত সর্বলোকে হাসে।
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে॥
আঙ্গিনায় পাতিআছে রাঙ্গামাজুরি।
তথির উপর পাতিয়াছে পাটনেত তুলি॥
পাটের চাঁন্দয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘমাসের খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাড়াইনু গিয়া আমি রাজাবিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বরে।
রাজার নিকটে আমি চলিলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঞি দাণ্ডাইলাম চারিহাত আন্তর।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে আমার মুখে শ্লোকে সরে॥
নানাছন্দে শ্লোক আমি পড়িয়ে সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমাপানে চায়॥
নানামতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদারখাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্রে বলে গোসাঞি করিলে সম্মান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্রমিত্র সভে বলে পুন দ্বিজরাজে।
যত খুজ তত দিতে পারে মহারাজে॥
কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার॥

আকৃতি প্রকৃতি আমি যত অষ্থিতি।
পাটপাছড়া পাইনু আমি চন্দনে ভূষিতি ॥
ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই।
যথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহী ॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে[৮] ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ারে।
অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোকে আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
মহারাজ আজ্ঞায় বাল্মীক মহামুনি।
রামায়ণ কবিত্ব তিহো করিলা আপুনি ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি কর্‍্যা যত দেবগণ।
বাল্মীক মুখে সবে শুনেন রামায়ণ ॥
পৃথিবী জিনিতে সবে চড়ে ইন্দ্রের কান্ধে।
দিগদিগান্তর জিনিতে কেহো সেতু বান্ধে ॥
কোন রাজা জীএ ষাটি হাজার বৎসর।
কোন রাজা মরণ জিনে সিদ্ধ কলেবর ॥
রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচিল বাল্মীক মুনি বরে ॥

৮। পূর্ববর্তী বিবরণীতে এ'র পরে আছে,—"সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥"
এই অংশটি কৃত্তিবাস সম্বন্ধীয় বিতর্কের আর একটি প্রধান উপাদান।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, কবি কৃত্তিবাস নিজ জীবন-পরিচয় দিতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থারও খুঁটিনাটি নিখুঁত চিত্র উদ্ধার করেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় ইতিহাসের মূল জিজ্ঞাসাটির উত্তর দেবার প্রাথমিক প্রয়োজন সম্বন্ধেই তিনি অবহিত হন নি। সুদীর্ঘ বংশলতা ও সেই বংশের আদি নিবাস,—অথবা সমসাময়িক জীবন-পরিবেশের আদ্যন্ত বর্ণনা করেছেন কবি কৃত্তিবাস। নিজের জন্মমাস এবং তিথি নক্ষত্র সম্বন্ধেও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য উদ্ধার করেছেন। অথচ মূল জন্ম শকাব্দটির উল্লেখ করতেই তিনি ভুলেছিলেন। আবার পৃষ্ঠপোষক গুণগ্রাহী রাজার সভাবর্ণন প্রসঙ্গে তাঁর ডান-বাঁয়ের ব্যক্তিবর্গকে পর্যন্ত যথাস্থানে নাম সহ উল্লেখ করেছেন, অথচ মূল গৌড়েশ্বরের নামটিই উল্লেখ করবার কথা তাঁর খেয়াল ছিল না। সত্যিই এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার।[১] এই অদ্ভুত ঘটনা কৃত্তিবাসের কালবিচারের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যথাস্থানে উল্লেখ করেছি, হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির উদ্ধৃত কৃত্তিবাসী-আত্ম-বিবরণীর অনুলিপিতে তাঁর জন্মকালের উল্লেখ ছিল,—

আত্মবিবরণীর তথ্যগত অপূর্ণতা

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী 'পূর্ণ' মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।"

—'পূর্ণ' শব্দটিকে মাসান্তের সূচক মনে করে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন,—১৩৫৪ শকের (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) ২৯শে মাঘ (মাঘী সংক্রান্তি) শ্রীপঞ্চমী দিন কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আত্ম-বিবরণীর অন্যান্য অংশের বিচারে এই তারিখটির সমীচীনতা সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হয়।—

১। কৃত্তিবাস যে 'গৌড়েশ্বরের' সভায় সমাদৃত হয়েছিলেন তার পরিবেশ এবং পাত্রমিত্রাদির বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সেই 'গৌড়েশ্বর' হিন্দু ছিলেন। তুর্কী বিজয়োত্তর বাংলাদেশে যে একমাত্র হিন্দু রাজা 'গৌড়েশ্বরের' মর্যাদা অধিকার

কৃত্তিবাসের আবির্ভাব-কাল বিচার

১। অধুনা শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে প্রাচীন বাংলা কাব্যে সঠিক সাল নির্দেশ অথবা পৃষ্ঠপোষকের স্পষ্ট নামোল্লেখ না করার একটি সাধারণ ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল।—রাজা গণেশের আমল।

করেছিলেন, তিনি রাজা গণেশ। রাজা গণেশ ১৪১৪-১৪১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত গৌড়েশ্বরের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পূর্ব কথিত কালের যাথার্থ্য স্বীকার করে নিলে,—কবির পক্ষে রাজা গণেশের সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না।

২। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা যে দনুজ (বেদানুজ?)[১০] রাজার 'পাত্র' ছিলেন—তিনি যদি পূর্ববঙ্গের সেন রাজবংশীয় দনুজমাধব হয়ে থাকেন, তবে তিনি আনুমানিক ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কালে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ, বাংলার নবাব মহিসুদ্দিন তুঘ্রল-খাঁর বিদ্রোহ দমনে দিল্লীর সুলতান গিয়াস্উদ্দিন বল্বনকে এই 'দনুজ' নোবহর দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। অতএব ৪ পুরুষে ১০০ বছর অনুমান করলেও কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল পূর্বোল্লিখিত সময়ের আগে হওয়া উচিত।

৩। অনেক প্রাচীন বাংলা পুথিতে 'পুণ্য শব্দটি 'পুন্ন' রূপে লিখিত হতে দেখা যায়। হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির আবিষ্কৃত কৃত্তিবাসী বিবরণীতে এই 'পুন্ন' শব্দটিই লিপিকর প্রমাদে 'পূর্ণ' রূপ ধারণ করতে বাধা ছিল না।

এই সব যুক্তির দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে আচার্য যোগেশচন্দ্র আবার গণনা করে সিদ্ধান্ত করেন,—১৩২০ শকের (১৩৯৮-৯৯ খ্রীঃ) ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বকথিত পারিপার্শ্বিক প্রমাণ-ক'টিও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। এই হেতু ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি অনেকে সাধারণভাবে এই কালগত সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

কিন্তু ৺বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ৺যোগেশচন্দ্রের প্রথম সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে কৃত্তিবাস তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কিন্তু কংসনারায়ণের রাজত্বকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হওয়াই সম্ভব। অতএব, কৃত্তিবাসের পূর্বকথিত আবির্ভাবকাল এবং গ্রন্থ রচনাকালের মধ্যে সময়ের পার্থক্য

বিভিন্ন মত-পার্থক্য

১০। বেদানুজ—'যে দনুজ' শব্দের লিপিকার-কৃত প্রমাদের ফল বলে অনুমিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য :—রাজা গণেশের আমল—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে। তাই ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই বিচারের অসঙ্গতি প্রদর্শন করেন।[১১]

অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু আবার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃত্তিবাসের গ্রন্থ রচনার কাল অনুমান করেছেন।[১২] তাঁর মতে কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা চট্টগ্রামাধিপ কোনো এক দনুজমর্দনের রাজসভায় ১৪১৭-১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'পাত্র' রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যাপক বসুর মতে, কৃত্তিবাস তাহিরপুরাধিপতি কংসনারায়ণের রাজসভায়ও কবি-কীর্তির স্বীকৃতি লাভ করেন নি; আত্মবিবরণীতে লিখিত 'গৌড়েশ্বর' কোন 'রাজা'-উপাধিক জমিদার হওয়াই সম্ভব। অধ্যাপক বসুর ধারণা,—গৌড়েশ্বর-রাজসভার বর্ণনাংশ কষ্টকল্পনা এবং কৃত্রিমতা-দুষ্ট। কিন্তু, এই দূর-প্রসারী কল্পনাকে স্বীকার করে নিলে আত্মবিবরণীর আর কোন দামই প্রায় থাকে না।

ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত আবার কংসনারায়ণের রাজসভাতেই কবির অভ্যুদয় কল্পনা করেছেন;—তাঁর মতে নরসিংহ ওঝা ছিলেন দনুজমর্দন উপাধিক রাজা গণেশের পাত্র।[১৩]

ডঃ সুকুমার সেন এ বিষয়ে নিছক মতবাদ নয়,—বিচার উপস্থাপনেরও প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে নরসিংহই রাজা গণেশের পাত্র ছিলেন এবং সাধারণভাবে মুখুটি বংশের অন্যান্য প্রধানগণের মত কৃত্তিবাসও গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের বংশধরগণের নিকট স্বকীয় গুণের জন্য অভিনন্দিত হয়েছিলেন,—তাছাড়া, কোন বিশেষ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রাতপ-তলে কৃত্তিবাস কাব্য-রচনা করেন নি। এ-সিদ্ধান্তের সমর্থনে ডঃ সেন ডঃ ভট্টশালী কর্তৃক প্রকাশিত পরবর্তী আত্মবিবরণীর উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করেছেন। অবশেষে কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরা-কাণ্ডের একটি পুথির লিপি-সমাপ্তিকাল ১৫০২ শকের ২৫শে মাঘ দেখে ডঃ সেন মন্তব্য করেছেন,—কৃত্তিবাসের গ্রন্থ ঐ সময়ের পূর্বে-যে রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ডঃ সুকুমার সেনের বিচার

এত করেও তর্কের শেষ হয় নি। কৃত্তিবাস চৈতন্য-পূর্ব না, চৈতন্যোত্তর কালের কবি, তা' নিয়েও তর্কজাল সৃষ্ট হয়েছে। অনেকে বলেন গ্রন্থটি

১১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (আদিকাণ্ড)—ভূমিকা। ১২। বাঙালা সাহিত্য—২য় খণ্ড। ১৩। প্রাচীন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস।

চৈতন্য-পরযুগের রচনা। কারণ, চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত পুণ্যগ্রন্থাবলীর কোন তালিকাতেই এই কাব্যের উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ, চৈতন্য-পূর্ব যুগে রচিত হয়ে থাকলে, এমন একটি উৎকৃষ্ট কাব্য বিষয়ে মহাপ্রভুর অনবহিত থাক্‌বার কথা নয়। বলা বাহুল্য, এ সকল তর্ক যুক্তি-সিদ্ধ নয়; কষ্টকল্পনা-সৃষ্ট সংশয় জাল মাত্র।

কৃত্তিবাস ও চৈতন্যদেব

তা' হলেও নানা ধরণের সার্থক-নিরর্থক বিচিত্রমুখী জিজ্ঞাসার অভিঘাতে কৃত্তিবাস-বিষয়ক অনুসন্ধান ক্রমশঃই দৃঢ় ভিত্তির 'পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে আজ আর কবি-ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের কোন কারণই নেই; এবং বিশেষ করে আত্ম-বিবরণীর বর্ণনাশ্রয়ে কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধেও মোটামুটি একটি ধারণা গড়ে তোলা অসম্ভব নয়

কৃত্তিবাসের অস্তিত্ব বিষয়ে ইতিহাসের প্রমাণ

(১) প্রথমতঃ কৃত্তিবাস-প্রদত্ত তার বংশপরিচয় ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা সম্পন্ন ধ্রুবানন্দের বংশাবলী (পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ)র[১৪] দ্বারা মোটামুটি সমর্থিত হয়েছে। অন্যান্য প্রামাণ্য কুলগ্রন্থাদিতেও কৃত্তিবাসের বংশ এবং পূর্বপুরুষাদির সম্বন্ধে একই রূপ পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে। একটি কুলগ্রন্থ থেকে জানা গেছে, কৃত্তিবাসের তিনজন শ্বশুরের একজন ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশের বৃদ্ধ প্রপিতামহ উৎসাহের ভাই শঙ্কর।[১৫] অতএব, নিজ বংশের বাইরেও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সংগে কৃত্তিবাসের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে পেরেছে; এদিক থেকে কৃত্তিবাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ নেই।

(২) ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, অন্যান্য কুলগ্রন্থ, এমন কি কণাদ তর্কবাগীশের কাল এবং কৃত্তিবাসের সংগে তাঁর সম্পর্কের তুলনা করলেও মনে হয়, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের একেবারে প্রারম্ভেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১৬]

(৩) বৈষ্ণবগ্রন্থের মধ্যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কৃত্তিবাসের উল্লেখ পাওয়া গেছে :—

১৪। History of Bengal Vol. I Ch XV, App. I। ১৫। কৃত্তিবাস পণ্ডিত—অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৬। দ্রষ্টব্য—ঐ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ (আদিকাণ্ড)—ভূমিকা —ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

"চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তাবতার।
অনন্ত কবীন্দ্রে গায় মহিমা যাহার॥
রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥"

পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, জয়ানন্দের চৈতন্যচরিত বর্ণনার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু তা হলেও, কৃত্তিবাস নামক রামায়ণকার কবির বাল্মীকিতুল্য মর্যাদার খবর যে জয়ানন্দ রেখে-ছিলেন, সে কথা অস্বীকার করবার কারণ নেই। আবার, জয়ানন্দ চৈতন্য-দেবের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব, কৃত্তিবাস-কবি চৈতন্য-পূর্ব যুগে আবির্ভূত হয়ে, চৈতন্য তিরোভাব-পূর্ব সময়েই বাল্মীকি-তুল্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে মনে করা অসংগত নয়।

(৪) অতএব, কৃত্তিবাসের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব এবং চৈতন্য-পূর্ব কবি-কীর্তির মর্যাদা স্বীকারে সংশয়ের কোন সংগত কারণ থাকা উচিত নয়। এবারে কবির জীবৎকালের নির্দিষ্ট কুঞ্চিকা রচনার জন্য আত্ম-বিবরণীর 'পরেই নির্ভর করতে হয়। ডঃ ভট্টশালী স্বতন্ত্রভাবে কৃত্তিবাসী আত্ম-বিবরণী আবিষ্কার করার পর এর মৌলিকতা সম্বন্ধে সংশয় করার অবকাশ ক্ষীণ হয়েছে। অথচ, আগেই বলেছি, ৺হারাধন দত্তের প্রকাশিত বিবরণীর সংগে এই বিবরণীর সাদৃশ্য বহুদূর-প্রসারী। তা ছাড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন প্রাচীন পুথিতে এই আত্ম-বিবরণীর নানা অংশ নানা খণ্ডে উদ্ধৃত হয়েছে। অতএব আত্ম-বিবরণীটি মূলতঃ কৃত্তিবাসেরই রচনা যে, এ-কথা মেনে না নেবার কারণ নেই। আবার, আত্মবিবরণীর 'গৌড়েশ্বর' প্রসংগের ঐতিহাসিকতাও যে কষ্টকল্পনা ছাড়া অস্বীকার করা চলে না, সে-কথা আগেই বলেছি। অন্য দিক থেকে কুলজী গ্রন্থাদির আভাসিত কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কালের সংগে রাজা গণেশের রাজত্বকালের সামঞ্জস্য রয়েছে। অতএব, কৃত্তিবাস যে গণেশের রাজসভাতেই সম্বর্ধিত হয়েছিলেন তা'তে সন্দেহ নেই। এদিক্ থেকে বহু পণ্ডিতের সমর্থিত ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী রবিবারকেই কৃত্তিবাসের জন্মদিন বলে মেনে নিতে হয়।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের নিঃসংশয় কাল

(৫) অধুনা তরুণ গবেষক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী (মাঘ মাস), রবিবার শ্রীপঞ্চমী দিনকে কৃত্তিবাসের জন্মদিন বলে সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছেন।[১৭] এ বিষয়ে আরো প্রমাণ-বিচারের অপেক্ষা রেখে, আপাততঃ ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দকেই কৃত্তিবাসের জন্ম-সন বলে মেনে নেওয়া নিরাপদ মনে করি।

(৬) কৃত্তিবাসের জীবৎকাল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সময় নির্দেশ করা চলে না। ফুলিয়ার মেল বন্ধনে কৃত্তিবাসের খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের উল্লেখ আছে। অথচ কবির নাম নেই। এ'র থেকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন কৃত্তিবাস ঐ মেল বন্ধনের (১৪৮০ খ্রীঃ) আগে তিরোহিত হয়েছিলেন। 'ঘটক কেশরী' নামক একটি কুলগ্রন্থের নজির উদ্ধার করে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন কৃত্তিবাস অন্ততঃ সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[১৮]

কৃত্তিবাসের জীবন-সীমা

কৃত্তিবাসের কাব্য সম্বন্ধে আজও নিঃসংশয়ে প্রায় কোন কথাই বলা চলে না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের খুব প্রাচীন পুথি প্রায় একখানিও আবিষ্কৃত হয় নি ; অর্বাচীন পুথিগুলিরও প্রায় সর্বত্রই প্রক্ষেপের বাহুল্য রয়েছে। সব দেখে শুনে কৃত্তিবাসী রচনার মৌল পরিচয় আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধেই সংশয় জাগে। ডঃ সুকুমার সেন দ্বিধাহীন ভাবেই মন্তব্য করেছেন :—"যাঁহারা অনধিক দুইশত বৎসরের পুরাতন পুথি দেখিয়া কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলরূপ উদ্ধারের আশা করেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় অসমসাহসিকতারই নামান্তর"।[১৯] তবু এ বিষয়ে সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকের কৌতূহলের অন্ত নেই। প্রধানতঃ সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই অনুমান-কল্পনার মহাসমুদ্রে আরো দুয়েকটি বিন্দু যোজনার চেষ্টা করছি। এ বিষয়ে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সম্পাদিত গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণই সমধিক যুক্তিযুক্ত।—বস্তুতঃ আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে যা কিছু গবেষণা হয়েছে, তার মধ্যে এইটিই সমধিক উল্লেখযোগ্য। ডঃ ভট্টশালী তাঁর সম্পাদিত রামায়ণের আদিকাণ্ডের ভূমিকায় কৃত্তিবাসী রচনার

কৃত্তিবাসের কবি-কর্ম

১৭। দ্রষ্টব্য :—রাজা গণেশের আমল।

১৮। দ্রষ্টব্য :—'কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কাল নির্ণয়',—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

১৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ২য় সং।

স্বরূপ উদ্ঘাটনের বিশদ চেষ্টা করেছেন। তাতে বাজার-প্রচলিত রামায়ণ-গুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়েছে :—কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিষয়বস্তু এবং তা'র উপস্থাপনাপদ্ধতি বিশেষভাবে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ করেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির ভাষাভঙ্গি আলোচনা করলেও মনে হয়,—কৃত্তিবাসের রচনা ছিল বাল্মীকির কাব্যের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদ। এ'সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত আছে[২০]—কিন্তু মতবৈচিত্র্যের অবতারণা করে অকারণ জটিলতাবৃদ্ধি করে লাভ নেই। শুধু সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য কৃত্তিবাসী রচনার এই "Composite Text"টি থেকে প্রাপ্ত পরিচয় অবলম্বনে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক বিচারের চেষ্টা করব। ডঃ ভট্টশালী সম্পাদিত 'আদিকাণ্ড' কৃত্তিবাসী রচনার একটা সাধারণ কাঠামোর ইঙ্গিতও যদি বহন করে থাকে,—তবে বলতে হয়,—কৃত্তিবাস ছিলেন বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের সার্থক প্রতিভূ। পরবর্তীকালের বাংলা রামায়ণের অনুধাবন করলে দেখি,—কাহিনী-বাহুল্য, ভাবাবেগ-প্রধান গার্হস্থ্যজীবন-সৌন্দর্যের কোমল অভি-ব্যক্তি, সর্বোপরি চরিত্র চিত্রণে, কাহিনী পরিকল্পনায় ও উপস্থাপন পদ্ধতিতে একটি সকরুণ ভাব-তন্ময়তাই বাংলা রামায়ণগুলিকে বাল্মীকির রচনার ঐতিহ্য থেকে পৃথক্ সুষমায় মণ্ডিত করেছে।[২১] বলাবাহুল্য,—রস পরিণামের এই নূতন বৈশিষ্ট্য পণ্ডিতগণের কল্পিত গ্রন্থাদর্শগত পার্থক্যের জন্যই সর্বাংশে সূচিত হয় নি,—বাংলার চৈতন্য-সংস্কৃতি-প্রভাবিত মধ্যযুগীয় সমাজ-চেতনা এবং জীবন-বোধের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল বহুল পরিমাণে। কিন্তু কৃত্তিবাস সেই জীবন-বোধের অধিকার লাভ করেন নি। তাঁর সমসময়ে বিভেদ-বিপর্যয়-বিক্ষোভের শেষে নবীন জীবন-নীহারিকা গড়ে উঠছিল মাত্র,—তাই স্বীয় সৃষ্টির অন্তর্নিহিত করে নেবার মত কোন স্পষ্ট জীবন-বাণী ছিল না কৃত্তিবাসের হাতে। কেবলমাত্র ছিল একটি সার্বিক আকাঙ্ক্ষা,—বৃহত্তর জীবনাদর্শের মিলন-পটভূমি রচনার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। নিষ্ঠাবান্ সারস্বত-সাধকের ন্যায় কৃত্তিবাস তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই যুগাকাঙ্ক্ষাকে বাণী-মুখে সঞ্জীবিত করেছেন। স্বয়ং কবি-মুখনিঃসৃত বাণীর পুনরুদ্ধার করি এই প্রসঙ্গে—

২০। Bengali Ramayanas by Dr. D. C. Sen ;—বাঙালা সাহিত্য ;—অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ২১। দ্রষ্টব্য : অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ।

"মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাসগুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥'—এই প্রতিশ্রুতি কবি নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেছেন,—লোক-বুদ্ধির পুষ্টি সাধনের জন্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে দৃঢ়-পিনদ্ধ ভাব-ভাষার মধ্য দিয়ে অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ্য সাধনার সার্থক ফল-রূপে লোক-সমাজকে উপহার দিয়েছেন।

সাহিত্য ইতিহাসে কৃত্তিবাসের স্থান

কিন্তু আবার বলি, কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এই মূল্য নির্ধারণও সম্পূর্ণরূপে অনুমান নির্ভর।[২২] ঐতিহাসিক বিচারের ভিত্তিভূমি থেকে নিঃসন্দেহে একটি মাত্র কথা বলা চলে,—কৃত্তিবাস মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা-রূপ অবিনশ্বর 'ঐতিহ্য',—এইখানেই অজ্ঞাত-কাল-পরিচয়, রচনা-প্রামাণিকতা-হীন, নামমাত্র-সর্বস্ব কৃত্তিবাসের একমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য। কালের চক্র-তলে কবির সৃষ্টি, তাঁর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব এবং কাল-পরিচয়, সমস্ত কিছু হারিয়ে গেছে,—কিন্তু একদিন জাতীয় রস-চেতনার উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি যে মধুচক্র রচনা করেছিলেন,—রূপহীন হয়েও তা' অপরূপ রসে-গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে। সেই অপরূপ ঐতিহ্যকেই স্মরণ করে, তারই চারপাশে কালে কালে গড়ে উঠেছে বাংলার যে জাতীয় কাব্যগুচ্ছ,—সেখানে বিভিন্ন এবং বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টার সমন্বয় করেছে কৃত্তিবাসের নামময় অক্ষয় কীর্তি—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কৃত্তিবাস সত্যই 'কীর্তি-বাস'।

২২। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই অনুমান করতে হয়েছে,—ডঃ ভট্টশালী সম্পাদিত গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রচনার মৌলিক রূপটির একটি কাঠামো অন্ততঃ তুলে ধরেছে।

নবম অধ্যায়

আদি-মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য

(২) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

আদি-মধ্যযুগের অপর অনুবাদ-গ্রন্থ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ। কবি স্বয়ং একাধিকবার একাধিক উপলক্ষ্যে তাঁর গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন :—

মালাধরের ভাগবতানুবাদ

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাচালী-রচিয়া॥"
"ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে॥" ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ-প্রভাবিত আদি-মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের এই লৌকিক প্রবণতার ঐতিহাসিক স্বভাব বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। কিন্তু তার আগে মালাধর বসুর ভাগবতানুসরণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ অধিকতর প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবত কেবলমাত্র কৃষ্ণ-লীলা কিংবা কৃষ্ণ-জীবনী গ্রন্থই নয়, 'পরমসত্য-সাধনা'র বৃহত্তর পটভূমিতে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সর্বময় মূল আদর্শটিকেই এই গ্রন্থে কৃষ্ণ-জীবন-কথার সূত্রাকারে উপস্থিত করা হয়েছে। স্বভাবতই গ্রন্থ-কাহিনী বহু-বিস্তৃত এবং পল্লবিত হয়েছে। কিন্তু মালাধর তাঁর রচনার মধ্যে কেবলমাত্র মূলগ্রন্থের দশম-একাদশ স্কন্ধেরই অনুবাদ করেছেন। বৃহত্তর ব্রাহ্মণ্য-তত্ত্বের সূত্র-বিশ্লেষণের চেয়ে কৃষ্ণ-জীবন-স্বরূপের একটি বিশেষ পরিচয় উদ্ধারের দিকেই কবি-দৃষ্টি একান্ত নিবদ্ধ হয়েছে।

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে ভাগবত-লীলার স্বরূপ

চৈতন্য-পূর্ববর্তী বঙ্গদেশে কৃষ্ণ-লীলাস্বাদনের দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল,—(১) শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-সম্পদের উপলব্ধি এবং (২) শ্রীভগবানের মাধুর্যময় সত্তার রসোপভোগ। এ-দু'য়ের মধ্যে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-সমাজে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর রূপেই সর্বাধিক পূজিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের পন্থা চৈতন্যোত্তর যুগে 'মহাপ্রভু'র জীবন-সাধনার প্রভাবেই সর্বজনীন 'দার্শনিক' রূপ পেয়েছিল। কিন্তু আলোচ্য চৈতন্য-পূর্ব যুগে রাধাকৃষ্ণ-লীলারস উপভোগের পন্থা সাধারণ

শৃঙ্গাররস-বিলাসের ঊর্ধ্বতর লোকে বড একটা উত্তীর্ণ হতে পারে নি। সে যাই হোক্, মালাধরের গ্রন্থ বিচার করলেই তাঁর পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-চেতনার বিশুদ্ধতা, কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনায় 'ঈশ্বর'-নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি যুগাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা-বিধানে সদাজাগ্রত রস-বোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যুগচেতনার এই স্বরূপটির বিকাশে কবির জীবন-পরিবেশ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থে[১] কবির গ্রন্থ-রচনার কাল-জ্ঞাপক একটি পয়ার পাওয়া যায় :—

"তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।

চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন॥—এই পয়ারটি প্রামাণ্য হলে, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বাংলা সাহিত্যের সন-তারিখ-যুক্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কাল-জ্ঞাপক শ্লোকটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে—কারণ কোন নির্ভরযোগ্য পুথিতেই এই শ্লোকটির অস্তিত্ব নেই। তবু, সন্দেহ যাঁরা করেন, তাঁরাও এর প্রামাণিকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি;—আর ডঃ সুকুমার সেন ত সিদ্ধান্তই করেছেন,—"এই তারিখ প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ নাই[২]।" কবির নির্দিষ্ট এই কালপরিচয় স্বীকার করে নিলে দেখা যায় গ্রন্থখানির রচনাকাল দুইজন পাঠান সুলতান—রুকনুদ্দিন বারবক্‌শাহ (১৪৬০—১৪৭৪ খ্রীঃ) এবং সাম্‌সুদ্দীন ইউসুফ্ শাহ (১৪৭৪—১৪৮১ খ্রীঃ)-এর রাজত্বকালে বিস্তৃত হয়েছিল। অথচ, কবি মালাধর উল্লেখ করেছেন,—

কবির ব্যক্তিপরিচয়, রচনাকাল-বিচার ও গৌড়েশ্বর-পরিচয়

"গুণ নাই, অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান।

গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান।"

আগাগোড়া গ্রন্থের ভণিতায় কবি এই 'গুণরাজখান' উপাধি ব্যবহার করেছেন। এবার জিজ্ঞাস্য হবে, কবির উপাধিদাতা এই বিদ্যোৎসাহী 'গৌড়েশ্বর' সুলতানটি কে? অনেকের ধারণা—গ্রন্থরচনা শেষ হওয়ার পরেই অনুরূপ উপাধিলাভ সম্ভব। আর তাই, সাম্‌সুদ্দিন ইউসুফ শাহই কবিকে সংবর্ধিত করেন বলে মনে করা উচিত। ডঃ সুকুমার সেন এবং

১। রাধানাথ দত্তের সংস্করণ। ২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ২য় সং।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করেন—যেহেতু কবি গ্রন্থের প্রথম থেকেই ভণিতায় নিয়মিতভাবে উপাধিটি ব্যবহার করেছেন,—সেইহেতু মনে করা উচিত যে, গ্রন্থ রচনার পূর্বেই কবি উপাধিলাভ করেছিলেন;—অতএব কবির উপাধিদাতা ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। এই বিতর্কমূলক আলোচনা পরিহার করলে মালাধরের ব্যক্তিপরিচয় সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য সর্বজন-স্বীকৃত। তিনি ছিলেন বর্ধমান জেলার কুলীন-গ্রামবাসী ভগীরথ বসু ও ইন্দুমতী বসুর সন্তান। আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন সৎ কায়স্থ আনিয়েছিলেন, মালাধরের পূর্বপুরুষ দশরথ বসু তাঁদের অন্যতম;—বল্লালসেন এই বংশকে কৌলীন্য-ভূষিত করেন।

মালাধরের এই ব্যক্তি-পরিচয় সর্বজন-স্বীকৃত হলেও, তাঁর কাব্য-পরিচয় সন্দেহ-কণ্টকাবৃত। মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' একাধিক শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করে বঙ্গদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল,—আর প্রক্ষেপ-প্রাচুর্যে পীড়িত হয়ে কাব্যখানিকে এই জনপ্রিয়তার মূল্য যোগাতে হচ্ছে। ফলে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুথিতে রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক উৎকৃষ্ট পদসমূহ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে,—আর অধিক সংখ্যক পুথিই দানলীলা, নৌকালীলাদির[৩] বর্ণনায় পূর্ণ। মালাধরের মূল-রচনায় রাধা-কথার অস্তিত্ব স্বীকার করা দুষ্কর। কারণ বাংলাদেশে 'রাধা-ভাবের' অস্তিত্ব যতই প্রাচীন হোক্ না কেন,—শ্রীমদ্ভাগবতে 'রাধা' নামের উল্লেখ নেই। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার উপলক্ষ্যে সেখানে কৃষ্ণের বিশেষ কৃপা-পুষ্টা একটি গোপিকার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রয়েছে। অনুমিত হয়ে থাকে,—এই 'নামহীন' গোপিকাটিই পরবর্তীকালে লৌকিক রাধার ঐতিহ্যের সংগে যুক্ত হয়ে তাকে পৌরাণিক মহিমাদানে সহায়তা করেছেন। আর, পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—বাংলার বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে রাধা-প্রেম সর্বজনীন বিশেষ স্বীকৃতি পায় চৈতন্যোত্তর যুগে। তা'ছাড়া, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির নিষ্ঠাপূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়েই কবি মালাধর ভাগবত অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর কাব্য সাধারণভাবে মূলানুসারী হয়েছিল, এই অনুমানই অধিকতর সঙ্গত। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে সংস্করণটি প্রকাশ

কাব্যপরিচয়

৩। পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য

করেছেন,—তার মূল পুথিখানিতে একবারের বেশি 'রাধা' নামের ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায় না,—আর সেই একটি ব্যবহারকেও প্রক্ষিপ্ত ঘোষণা করে স্বয়ং সম্পাদক যুক্তি উদ্ধার করেছেন। এই উপলক্ষ্যে ডঃ সুকুমার সেনের বিচারও বিশেষ স্মরণীয়.—"শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের অনেক পুথিতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড এই দুই অপৌরাণিক লীলা আছে, মুদ্রিত সংস্করণে নাই। এই দুই লীলা মূলে থাকা বিচিত্র নয়, কেন না কাহিনী দুইটি বাংলাদেশে পূর্বাপর প্রচলিত আছে. তবে যেহেতু কাব্যকর্তা বলিয়াছেন যে তিনি ভাগবত ভাঙিয়া পাঁচালী করিয়াছেন, সেইহেতু মনে হয়, ইহা মূলে ছিল না, পরে অন্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।"[৪]

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ বিজয় যে বিশেষভাবে ভাগবতানুসারী সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে কবি ভাগবত কাহিনীর অনুসরণ করেছিলেন, তার আলোচনার ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন,—"কবি মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থের 'বিজয়' কথাটি কেহ 'মৃত্যু' এবং কেহ 'যাত্রা' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতের শেষ স্কন্ধে (১২শ স্কন্ধ) শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। মালাধর বসু ১০ম-১১শ স্কন্ধদ্বয় মাত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় অসুর-বিজয়ী ও ঐশ্বর্যভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণের 'বিজয় যাত্রা' অর্থে 'বিজয়' শব্দটি গ্রহণ করা বোধ হয় অধিক সংগত।"[৫] ডঃ দাশগুপ্তের এই মন্তব্যের সমীচীনতা আদ্যন্ত গ্রন্থখানি অনুধাবন করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। বিজয় শব্দটি কবি মলাধর কোন বিশেষ অর্থে গ্রন্থনামের সংগে যুক্ত করেছিলেন কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু,—সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে কৃষ্ণের বীর্যময় সত্তার পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যেই কবি-চেতনা যে একাগ্র হয়েছিল, তার নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে আদ্যন্ত রচনার অভ্যন্তরে। কাব্যের প্রথমাংশেই সূত্রাকারে কৃষ্ণলীলার যে পর্যায় বিন্যস্ত বর্ণনা রয়েছে,[৬]—তাতে কৃষ্ণের বীর্যবান্ 'ঈশ্বর'-সত্তার একটি তীব্র-প্রতিফলিত পরিচয় হৃদয়ে মুদ্রিত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট। কৃষ্ণের বীরত্ব-কাহিনীর বর্ণনা-ক্রম রচনাকালেও কাব্যিক

গ্রন্থের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য

৪। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১মখণ্ড, ২য় সং। ৫। প্রাচীন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস।
৬। দ্রষ্টব্য—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং

সংগতি-বোধ অপেক্ষা শক্তি-প্রাচুর্যের আবেদন-তীব্রতা সৃষ্টির প্রতিই কবি বেশি ঝোঁক দিয়েছেন। এবং এই একই কারণে পরিহার করেছেন কৃষ্ণ-লীলার কবিত্ব-সমৃদ্ধ রসঘন বহু অংশ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিমত্তা প্রকটনের এই চেষ্টার মধ্যে যুগগত প্রয়োজনের প্রতি কবি চেতনার জাগ্রত-দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। স্মরণ রাখা প্রয়োজন,—শ্রীকৃষ্ণবিজয় তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলার প্রাথমিক পর্যায়ের জীবন-চেতনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করেছি,—তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলার জাতীয় জীবনে একটি সর্বাত্মক ভীতি প্রকট হয়ে উঠেছিল;—এই ভীতি-প্রাবল্যের জন্যই নিখিল বাঙালি-জাতি সেদিন পলায়নোন্মুখ হয়েছিল। এই পলায়ন পর্যায়ের শেষে আত্মরক্ষা-তৎপর জাতির সার্বিক আকাঙ্ক্ষাকে আশ্রয় করে, অথবা সেই আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়রূপেই গড়ে উঠেছিল আদি-মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য। মালাধরের অনুবাদ-গ্রন্থ যে সেই সর্বাত্মক জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে কল্পিত হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, 'লৌকিক' প্রয়োজন সম্বন্ধে কবির অতি-সচেতনতা। এই প্রসংগে মালাধরের পৌনঃপৌনিক স্বীকৃতি এবং আদ্যন্ত গ্রন্থের কাহিনী ও উপস্থাপনা-পদ্ধতি লক্ষ্য করে মনে হয় যে, শক্তি-দীন ভীতি-ত্রস্ত জাতির সর্বাত্মক জড়তার প্রতি অবহিত কবি ঐশ্বর্যশক্তি-ঘন কৃষ্ণ-জীবন-কথাকে সঞ্জীবনী মন্ত্ররূপে মুমূর্ষু জাতির কর্ণে অভিসিঞ্চিত করেছিলেন;—হয়ত সংজ্ঞান কিংবা অসংজ্ঞান প্রচেষ্টায়। এই প্রচেষ্টার মধ্যে কবি পরমেশ্বর-শ্রীকৃষ্ণকে বাঙালি জীবনের দ্বারপ্রান্তে এনে উপস্থিত করেছেন। এখানে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ সখাগণের সংগে বসে 'ভাত' খান—মথুরার দিকে দিকে জেগে ওঠে "গুয়া, জলপাই কামরাঙ্গা" গাছ—দ্বারে দ্বারে শোভা পায় নারিকেল বৃক্ষের সারি। লক্ষ্য করা উচিত,—যুগচেতনাশ্রিত কবি এক দিকে যেমন শক্তি-দীন মানুষের জীবন-শীর্ষে 'অমানুষী' শক্তির উজ্জ্বল শিখা প্রজ্বলিত করেছেন, অন্যদিকে সেই দীপবর্তিকাটিকে আচারে আচরণে করে তুলেছেন বাঙালির স্থবিরজীবনের আত্মার সামগ্রী। শক্তির এই প্রচণ্ড অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে জড়হৃদয় জাগরণের পথ খুঁজে পেয়েছে,—তার সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ করে আপন সামর্থ্য সম্বন্ধে হয়েছে নিঃসন্দেহ। এইখানেই মালাধরের অনুবাদ-কাব্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মূল্য।

কবিকৃতির এই ঐতিহাসিক মর্যাদা পররর্তীকালে সার্থক স্বীকৃতি পেয়েছে জাতীয় যুগ-জীবন-স্রষ্টা মহাপ্রভুর সশ্রদ্ধ উল্লেখের মধ্যে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা থেকে জানা যায়, মহাপ্রভু মালাধরের স্বগ্রামবাসিগণের পুরস্কৃতি প্রসঙ্গে—

"কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডুরি লইয়া॥[৭]
গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহা প্রেমময়॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইলাম তার বংশের হাথ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥"

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও চৈতন্যদেব

পূর্বে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে, গুণরাজখান বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবর্ণনাত্মক কাব্যই রচনা করেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর সদা-প্রেমতদ্গত চিত্তের অন্তর্দৃষ্টি এই ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যে পূর্ণ কাব্য থেকে প্রেমাত্মক একটি মাত্র ছত্রেরও সার্থক মর্যাদা আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ঘটনা মহাপ্রভুর মহিমারই পরিচায়ক বলে মনে করি। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব ভক্তগণ মহাপ্রভুর মহিমাময় বদান্যতার অনুসরণ করে মালাধরের কাব্যকে অপূর্ব খ্যাতি-মাহাত্ম্যে বিভূষিত করেছেন। এঁদের মতে মালাধরের কাব্যেই চৈতন্যধর্মের মূল সুরটি প্রেরণারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু একটি মাত্র ছত্রকে উপলক্ষ্য করে একখানি গ্রন্থের অতবড় মূল্যায়ন ঐতিহাসিক বিচারে সংগত মনে হয় না। অপরপক্ষে, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র উল্লেখ করেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গ্রন্থের সম্পাদনা প্রসঙ্গে তিনি যতগুলি পুথি দেখেছেন,—তার কোনটিতেই আলোচ্য শ্লোকাংশে "নন্দেরনন্দন" পাঠ নেই,—সর্বত্রই পাঠ আছে—

"বসুদেব-সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ [৮]।"

সে ক্ষেত্রে ভক্তগণের যুক্তির ভিত্তি আরো শিথিল হয়ে আসে। বৃন্দাবনচারী 'নন্দদুলাল' কৃষ্ণই প্রেমময়,—মথুরায় 'বসুদেব-সুত' রূপে আত্মপ্রকাশ করার

৭। নীলাচলে জগন্নাথের রথযাত্রাকালে ব্যবহৃত 'পট্ট ডুরি'।

৮। দ্রষ্টব্য—অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থের ভূমিকা।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেমিকত্ব বিলুপ্ত এবং 'ঐশ্বর্য' প্রকট হয়েছে। এই বিচারের পরে একমাত্র 'প্রাণনাথ' শব্দটির অতবড় মাহাত্ম্য কীর্তন সমুচিত মনে হয় না।

তা'হলেও, চৈতন্যদেব-কৃত প্রশংসাবাণীর ঐতিহাসিক সার্থকতা এখানে না হলেও অন্যত্র স্পষ্ট বিদ্যমান। পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—মধ্যযুগীয় যে জীবন-চেতনার প্রাণ-কেন্দ্ররূপে আমরা চৈতন্যদেবকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছি, সেই জীবন-চেতনা সর্বপ্রথম পরিণামমুখী হয়েছিল মালাধরের সাধনার মধ্যে। এই পরোক্ষ সাধর্ম্যের মধ্যেই পূর্বোদ্ধৃত চৈতন্য-প্রশংসার সাহিত্যিক সার্থকতা। তাছাড়া এ-কথাও বলেছি যে,—ভাগবতের অনুবাদ রচনায় মালাধরের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা অবশ্য স্বীকার্য। কবির এই ঐকান্তিক নিষ্ঠাই কুলীনগ্রামে একটি অপূর্ব বৈষ্ণব-পরিবেশ গড়ে তুলেছিল, যার ফলে যবন হরিদাসের সাধনপীঠ রূপে পরবর্তীকালে কুলীনগ্রাম সার্থক বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়েছে। মালাধরের কাব্য এবং জীবন-সাধনার মধ্য দিয়ে চৈতন্য যুগের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল,—এই কারণেই তিনি বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের যুগস্রষ্টা না হ'লেও যুগসন্ধি-সংযোগকারী যুগন্ধর মহাকবি।

মালাধরের 'বৈষ্ণবতা' ও তার প্রভাব

দশম অধ্যায়

আদি-মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্য

চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বাংলাদেশে মধ্যযুগের উষালগ্নকে আলোকিত করে বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের মধুময় অভ্যুদয়। আর রবীন্দ্রোত্তর কালে আজও নানা যুগান্তসীমা পেরিয়ে গ্রাম এবং নগর বাংলায় যুগপৎ প্রাণ-প্রেরণা রূপে উৎসারিত হচ্ছে তার প্রেম-রসধারা। বৈষ্ণব ভাবুকতার বিশেষ সীমা অতিক্রম করে বাঙালি জীবনের সকল অনুভূতির মর্মে ছড়িয়ে পড়েছে তার ললিত মধুরিমা। বৈষ্ণব পদাবলী সবকালীন, সর্বজনীন বাংলা সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্য; আর কবি চণ্ডীদাস সেই চিরন্তন ঐতিহ্যধারার 'আদিগঙ্গা হরিদ্বার'। অথচ, এই চণ্ডীদাসই আজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সংশয়-কণ্টকও। সংশয় কেবল কবির রচনা অথবা আবির্ভাব কাল সম্বন্ধেই নয়, তাঁর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব-পরিচয় সম্বন্ধেও।

চণ্ডীদাস ইতিহাসের অনপনেয় সমস্যা

আধুনিক বাঙালি চণ্ডীদাসেরও আগে তাঁর কাব্যকেই চিনেছিল,—ভাল-ও বেসেছিল বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। চণ্ডীদাস নামক এক কবির রাধাকৃষ্ণ-লীলাগানে পাষাণ হৃদয়েও ভাবের বন্যা উদ্বেল হয়ে ওঠে,—এইটুকু জেনেই বাঙালি সেদিন অভিভূত হয়েছিল;—চণ্ডীদাস পদাবলী পড়ে, গেয়ে অশ্রুর প্রবাহকে দিয়েছিল উচ্ছ্বসিত-অবারিত মুক্তি। অনেক দিনের প্রীতি-কারুণ্যের চরিতার্থতার শেষে কাব্যের সংগে কবির সম্বন্ধেও বাঙালি পাঠক উৎসুক হয়েছিল। তখনই সুরু হয় প্রাথমিক সন্ধান। তার থেকে অনুমিত হয়,—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের কোন সময়ে মধু-বর্ষী চণ্ডীদাস প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে,—আর বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রাম নবজাত কবি-শিশুকে প্রথম ধারণ করেছিল আপন মৃণ্ময় বক্ষে। রামমণি, রামতারা বা রামী নামের এক রজকিনীর প্রেম-রসে তন্ময় হয়েই রাধা-কৃষ্ণের লোকোত্তর লীলানন্দকে কবি আস্বাদন

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এবং

করেছিলেন। রামীর অপূর্ব প্রণয়ের অলৌকিক মধুরিমাকে তিলে তিলে আহরণ করে নিজ প্রাণরসের নিষেকে গড়েছিলেন শ্রীরাধার প্রেমময়ী তিলোত্তমা মূর্তি। বহিরঙ্গ জীবনে চণ্ডীদাস-কবি ছিলেন বাশুলী দেবীর পূজক। নান্নুরে চণ্ডীদাস-রামীর পূজা-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ সেই বাশুলী মূর্তি আজও লুপ্ত হয় নি।

কিন্তু এসব কাহিনী চণ্ডীদাস বিষয়ক লোক-শ্রুতি মাত্র, ইতিহাস নয়। পরবর্তীকালে বাঁকুড়ার অধিবাসীরাও চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার দাবি করেছেন। তাঁদের মতে,—বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে ছিল কবির পুণ্য জন্মভূমি। ছাতনা গ্রামেও বাশুলী মন্দিরের অস্তিত্ব রয়েছে। তা ছাড়া উৎসাহী পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে প্রাচীন পুথির সাক্ষ্য উদ্ধার করেছেন।

বিভিন্ন বিতর্ক

অন্যদিকে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবেরা অনেকে চণ্ডীদাস-রামীর 'অবৈধ' (?) সম্পর্কের কাহিনীর যথার্থতা অস্বীকার করেছেন। এঁদের মতে, সহজিয়া সাধকগণের দলবৃদ্ধির চেষ্টায় জয়দেব, বিদ্যাপতি এমন কি কৃষ্ণদাস-কবিরাজের মত 'মহাজনে'রও পরকীয়া সঙ্গ-সাধনার কাহিনী প্রচার করেছে, চণ্ডীদাস-রামীর প্রেমকাহিনীও সেই "নব-রসিক"-বাদের কপোল-কল্পনা মাত্র।

এই ধরণের বিতর্কের প্রাচুর্য থাকলেও, চণ্ডীদাসের ব্যক্তি-পরিচয়ের স্বল্পতা তার কাব্য-রসাস্বাদনে কখনো বাধার সৃষ্টি করে নি। এ-বিষয়ে বিশুদ্ধ সমস্যার আকারে প্রথম সংশয় দেখা দেয় বঙ্গাব্দের ১৩১৬ সনে। ঐ বছর বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের কাকিল্যাগ্রামে এক গোয়াল ঘর থেকে স্বর্গীয় বসন্তরঞ্জন রায় আদ্যন্তখণ্ডিত একখানি রাধা কৃষ্ণ-লীলার পুথি আবিষ্কার করেন। পুথিখানির প্রায় আগাগোড়াই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত। অথচ ভাব, ভাষা, উপস্থাপনাভঙ্গি, এমন কি শালীন রুচিবোধেও পুরাপরিচিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর সংগে এই পুথির তফাৎ আমূল। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে সাহিত্যপরিষৎ থেকে ৺ বসন্তরঞ্জনের সম্পাদনাতেই পুথিখানি প্রকাশিত হয়। পুথিখানির আদি এবং অন্ত খণ্ডিত ছিল; অথচ বাংলা পুথির ঐ দুই স্থলের কোন একটিতেই গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকর্তার পরিচয় ইত্যাদিসূচক 'পুষ্পিকা' নিহিত

কৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস সমস্যা

থাকৃত। অতএব, গ্রন্থকর্তার নির্ভর-যোগ্য পরিচয় এবং গ্রন্থের মূল নাম কোনটিই আমাদের হস্তগত হয় নি। কাব্যের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পাদক এ'র নূতন নামকরণ করেন,—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কার, প্রকাশ এবং আলোচনার ব্যাপ্তির সংগে সংগে চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সংগে চণ্ডীদাস-পদাবলীর পরিকল্পনা, বিন্যাস, এমন কি রুচিগত বিভেদ এত দূর-প্রসারী যে, দুটিই একজনের মানস-প্রসূত বলে মেনে নেওয়া দুষ্কর হয়। অতএব, জিজ্ঞাস্য, চণ্ডীদাস কয়জন ছিলেন। এই প্রাথমিক জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করেই চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব। কিন্তু এই সমস্যার বিভিন্ন উপাদান বিচারের আগে কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের স্বতন্ত্রতার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য বিশদ-ভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

কৃষ্ণকীর্তনের কাব্য কাহিনী নানা 'খণ্ডে' বিভক্ত। সর্বপ্রথম 'জন্মখণ্ডে' উল্লিখিত হয়েছে,—কংসাসুরের পাপ-ভারে পীড়িতা পৃথিবীর আর্তি বিমোচনের জন্য ভগবান নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর 'কাহ্নায়ির সম্ভোগ কারণে', 'সাগরের ঘরে পদুমা উদরে' স্বয়ং লক্ষ্মী রাধারূপে জন্ম নিয়েছিলেন। পরবর্তী অংশে দেখ্‌ব জন্মখণ্ডের এই প্রাথমিক ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ছাড়া কাব্যের আর কোথাও কবির আধ্যাত্মিক সচেতনা উল্লেখ্য স্পষ্টতা লাভ করেনি।

কৃষ্ণকীর্তন কাহিনী :— জন্মখণ্ড

'তাম্বুলখণ্ডে' গ্রন্থকাহিনীর সূত্র নূতন করে সূচিত হয়েছে। নপুংসক 'আইহন' (আয়ানঘোষ)-এর "নারী" রাধার চারিত্রিক বিশুদ্ধতার তত্ত্বাবধান করবার জন্য 'বড়াই'কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। 'বড়াই' রাধার মাতার 'পিসী'। একদা পসরা নিয়ে রাধা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর সন্ধানের জন্য বড়াই বৃন্দাবনে গোচারণ-রত কৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণের নিকট পরিচয় প্রদান প্রসংগে বড়াই রাধার বিস্তৃত রূপ-বর্ণনা করেন। ফলে কৃষ্ণের কামপ্রকোপ ঘটে। তখন বড়াই'র উপদেশ অনুসারে তিনি রাধার নিকট মিলনাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিতসূচক 'তাম্বুল' প্রেরণ করেন। রাধার বয়স তখন "এগার বরিষে তার বার নাহি পুরে"। এই অসঙ্গত ইঙ্গিতে তিনি অতীব ক্ষিপ্ত হয়ে তাম্বুল ছুঁড়ে ফেলে বড়াইকে প্রহার করেন। তাম্বুলখণ্ড এখানে শেষ হয়েছে।

তাম্বুল খণ্ড

গ্রন্থের তৃতীয় এবং চতুর্থ 'দানখণ্ড' এবং 'নৌকাখণ্ডে' কৃষ্ণ যথাক্রমে পথের 'দানী' এবং নদীর 'পারানি' সেজে বড়াই-কর্তৃক কৌশলে আনীতা রাধার'পরে বলাৎকার করেন।

'দান' ও 'নৌকা' খণ্ড

'ভারখণ্ডে' রাধা 'জ্ঞাত-যৌবনা' হয়ে উঠেছেন;—কৃষ্ণের সংগ-সুখ লুব্ধ করেছে তাকে। তাই রাধা এবারে কৌতুকোচ্ছলা। কামনাতুর কৃষ্ণের আর্তির উত্তরে রাধা বলেন,—'ভারী' সেজে কৃষ্ণ যদি মথুরার হাটে তার দধি-সরের পসরা বয়ে দেন, তবেই তিনি কৃষ্ণ-সংগে মিলিত হবেন। এই আশ্বাসের প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ 'ভারী' বেশে রাধার ভার বহন করেন। প্রত্যাবর্তন-পথে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কৃষ্ণ রাধাকে পীড়াপীড়ি করেন। এই প্রসংগে উভয়ের বাদনুবাদের মধ্যে 'ভারখণ্ড' অসম্পূর্ণ রয়েছে,—এখানে পুথিটি খণ্ডিত।

ভারখণ্ড

তারপরে 'ছত্রখণ্ড'। মথুরার তপ্তপথে রাধার মাথায় ছত্র-ধারণ করলে তার 'সুরত'-বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, এই প্রতিশ্রুতির উত্তরে কৃষ্ণ রাধার ছত্র-ধারী হন। কিন্তু এখানেও পুথিখণ্ডিত।

ছত্রখণ্ড

'বৃন্দাবনখণ্ডে' কৃষ্ণ অনুপম উদ্যান সৃষ্টি করে তা'র মধ্যে রাধার মিলন-কামনায় অপেক্ষা করে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্তা রাধা এবার প্রণয়কলায় অধিকতর পারদর্শিনী হয়ে উঠেছেন। অতএব, বড়াই যখন তা'কে কৃষ্ণের আহ্বান জ্ঞাপন করে, তখন নির্দয় শাশুড়ীর শাসন-পাশ থেকে তা'কে মুক্ত করে কৃষ্ণ-সংগে মিলিত করবার কৌশল-পদ্ধতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি বড়াইকে নির্দেশ করেন। নির্দেশিত কৌশলে বড়াই রাধা ও অন্যান্য গোপ-বধূগণের শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে সকলের সংগে পসরা সাজিয়ে হাটে চলেন। পথে বৃন্দাবনের পুষ্পকুঞ্জে রাধা-কৃষ্ণের মিলন-চিত্রণের মধ্যে বৃন্দাবনখণ্ড সমাপ্ত হয়।

বৃন্দাবন খণ্ড

'যমুনাখণ্ডে' কৃষ্ণকর্তৃক কালীয়দমন, জলকেলি, গোপীগণের বস্ত্রহরণ ইত্যাদি নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 'বস্ত্রহরণখণ্ডে' সর্বশেষে কৃষ্ণ রাধার হার অপহরণ করেন। ফলে রুষ্টা রাধা কৃষ্ণ-জননী যশোদার কাছে কৃষ্ণ-কৃত বলাৎকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জ্ঞাপন করেন।

যমুনা খণ্ড

'বাণখণ্ডে' প্রতিবিধিৎসু কৃষ্ণ রাধাকে মদন-বাণে বিদ্ধ করেন। বাণাঘাতে রাধা মোহ-মুগ্ধা হয়ে পড়েন। অবশেষে কৃষ্ণ তাকে পুনঃসঞ্জীবিত করেই অন্তর্হিত হন। কিন্তু যৌবনোন্মাদিনী মদন-শরবিদ্ধা রাধার হৃদয়ে কৃষ্ণ-সংগলিপ্সা তখন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ব্যাকুল আর্তিবশে রাধা বড়াইর সংগে উন্মাদিনীর মত কৃষ্ণকে খুঁজে ফিরেন,— অবশেষে রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলনে বাণখণ্ড সমাপ্ত হয়।

বাণখণ্ড

'বংশীখণ্ডে' কৃষ্ণ অপূর্ব এক বংশী নির্মাণ করেন।— বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রাণস্পর্শী স্বর ধ্বনিত হয়ে রাধার প্রাণকে আলোড়িত করে,— তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে করে তোলে বিক্ষুব্ধ। অথচ, সেই প্রাণান্তকর অবস্থায়ও কৃষ্ণকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বাঁশির স্বরে হৃদয়-মন আকুল করেও দূর থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ান। অবশেষে বড়াইর পরামর্শে রাধা নিদ্রিত কৃষ্ণের মোহন বাঁশি হরণ করেন। পরে বহু বাদানুবাদের পর উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি প্রত্যর্পণ করেন।

বংশীখণ্ড

'বিরহখণ্ডে' রাধা-হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তির মধ্যেই অপূর্ণ গ্রন্থখানির সমাপ্তি ঘটেছে,— শেষাংশে গ্রন্থখানি খণ্ডিত। বহু অন্বেষণে রাধা কৃষ্ণকে আবিষ্কার করে তা'র সংগে মিলিত হন। মিলন-তৃপ্তা অবসন্না রাধা কৃষ্ণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করে শয্যাশ্রয় করেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কৃষ্ণ নিদ্রিতা অবস্থাতেই তাকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। জেগে ওঠার সঙ্গে রাধার বিরহ সন্তপ্ত হৃদয়ও জেগে ওঠে,—এই বেদনার্ততার মধ্যেই খণ্ডিত গ্রন্থের সমাপ্তি।

বিরহখণ্ড

কাব্য-কাহিনীর এই প্রাথমিক আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে, কৃষ্ণকীর্তন রূপেতেই নয়,—স্বরূপেতেও পদাবলী সাহিত্য থেকে আমূল ভিন্ন। এই কারণে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থখানির স্থান এবং মর্যাদা নির্ণয় বিষয়ে পণ্ডিত ভক্তদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কাব্য-সাধনার সার্বিক প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র কারণ তাঁর অলৌকিক প্রতিভাই নয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে চণ্ডীদাস-কবি-প্রতিভার এক নবমূল্যায়ন সূচিত হয়েছিল। চৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর মহাজন-কাব্যাস্বাদনের প্রসংগে লিখেছেন—

কৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য

"বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥" (চৈঃ চঃ)

এ ছাড়াও,—বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনগণ নানাভাবে জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির যশোগাথা রচনা করেছেন;—কারণ তাঁদের কাব্য মহাপ্রভু কর্তৃক আস্বাদিত হওয়ার পরম মর্যাদা লাভ করেছিল।

"জয়দেব চণ্ডী- দাস দয়াময়
মণ্ডিত সকলগুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ন
গাওত জগত জনে।" (নরহরি দাস)

"জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডী- দাস রসশেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম॥" (বৈষ্ণবদাস)

"জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥" (চৈঃ মঃ জয়ানন্দ)

অতএব, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসংগে চণ্ডীদাস-সমস্যা বিচারে দু'টি জিজ্ঞাসা প্রধান হয়ে ওঠে,—(১) পদ-কর্তা চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা চণ্ডীদাস কী একই ব্যক্তি?—আগেই বলেছি, দুটি রচনার ভাবাদর্শ ও পরিকল্পনাগত মৌল পার্থক্য অতিদূর প্রসারী। এ অবস্থায় দুটি গ্রন্থের স্রষ্টারূপে একই ব্যক্তির পরিকল্পনা সম্ভব মনে হয় না। এবারে প্রশ্ন,—(২) পদকর্তা চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি চণ্ডীদাস যদি পৃথক্ ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তবে এই দুই কবির মধ্যে কার সৃষ্টি চৈতন্যদেবের রসাস্বাদনের সহায়ক হয়েছিল? কিন্তু প্রশ্ন দু'টির সার্থক উত্তর সন্ধানের আগে সমগ্রচণ্ডীদাস-সমস্যার প্রাণকেন্দ্র রূপ শ্রীকৃষ্ণকর্তনের বিস্তৃততর পরিচয় আবিষ্কার প্রয়োজন।

চণ্ডীদাস সমস্যার জিজ্ঞাসা

কৃষ্ণকীর্তনের ভণিতাংশ আগাগোড়া বিচার করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, বাশুলী-সাধক অনন্তবড়ু চণ্ডীদাস নামক কবি আদ্যন্ত সুপরিকল্পিত পালায় বিভক্ত করে এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাব্যখানি রচনা করেন। কিন্তু কবির আবির্ভাবকাল, তাঁর

কৃষ্ণকীর্তনের কবি কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস

বিস্তৃততর ব্যক্তি-পরিচয় কিংবা রামী-সম্বন্ধীয় কোন কাহিনী গ্রন্থখানির কোথাও নেই। পুথির আদ্যন্ত-হীনতা যে এই অপরিচয়ের অন্যতম কারণ, সে কথা পূর্বে বলেছি। তা'ছাড়া, ঐ একখানি ব্যতীত অনুরূপ বিভিন্ন 'খণ্ডে' বিভক্ত পুথি আর পাওয়া যায় নি[১]। সে যাই হোক্, বিস্তৃততর পরিচয়ের অভাব সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি অনন্তবড়ু চণ্ডীদাসই কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ বাশুলী-পূজক চণ্ডীদাস।

কোন প্রকারের প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এই বিখ্যাত কবির কাল-নির্ণয় উপলক্ষ্যে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ,—বিশেষভাবে গ্রন্থখানির আভ্যন্তর প্রমাণের 'পরে পণ্ডিতগণ নির্ভর করেছেন।—এই প্রসংগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি এবং ভাষাতত্ত্বের বহুল আলোচনা ও বিচার হয়েছে। প্রথমতঃ কৃষ্ণকীর্তনের আলোচ্য পুথিতে তিন প্রকার হস্তলিপি পাওয়া গেছে,—প্রথম লিপিটি বেশ প্রাচীন, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মতর হস্তে সেই লিপির অনুসরণ এবং তৃতীয় লিপিটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। প্রথম এবং তৃতীয় প্রকারের হস্তলিপি আবার গ্রন্থের একই পাতায় পাওয়া গেছে। অতএব, স্পষ্টই বোঝা যায়,—প্রথমোক্ত প্রাচীন এবং তৃতীয়োক্ত অর্বাচীন লিপি দুইটিই একই কালে প্রচলিত ছিল। ৺যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অনুমান করেছেন,—প্রথম লিপিটি কোন রাজমুন্সীর[২] হস্তাক্ষর এবং তৃতীয় হস্তলিপিটি সেকালের প্রচলিত লিপি-লিখন-নিপুণ অপর কোন ব্যক্তির লিখিত। সে যাই হোক্, কৃষ্ণকীর্তনের পুথির লিপিকাল-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই পুথি "১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত" হয়েছিল। শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাকের ধারণা,—পুথিখানির লিপিকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ৺যোগেশচন্দ্র রায় কৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কারক্ষেত্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বহু পুথির লিপি-বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন,—কৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নয়। তাঁর মতে কেন্দ্রীয় প্রদেশের তুলনায় প্রত্যন্তপ্রদেশের লিপি এবং ভাষায় প্রাচীনতার

কাল-বিচার ও কৃষ্ণ-কীর্তনের লিপি

১। অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক আবিষ্কৃত তাল সম্বন্ধীয় পুথিতে কৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে পুথিগত অন্যান্য পরিচয় অপূর্ণ।

২। রাজ-মুন্সীগণ লিপি-প্রয়োগে সাধারণতঃ রক্ষণশীল ছিলেন।

'ছাপ' সর্বদাই বেশি হয়। আর এইজন্যই কৃষ্ণকীর্তনের রক্ষণশীল লিপি-পদ্ধতিকে অতি প্রাচীন বলে মনে করা চলে না। ডঃ স্কুমার সেনের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষ্ণকীর্তনের আলোচ্য পুথির লিপিকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নয়।[৩]

অন্যদিকে ঐ একই পুথির ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিচার করে ডঃ স্নীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "Origin and Development of Bengali Language" নামক গবেষণা-গ্রন্থে আলোচ্য কাব্যের ভাষাকে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার (আঃ ১২০০—১৫০০ খ্রীঃ) একমাত্র আদর্শ নিদর্শন রূপে গ্রহণ করেছেন। ডঃ স্কুমার সেন যদিও পুথিখানির লিপি-কালকে সপ্তদশ শতাব্দীর এবং স্বয়ং কবি বড়ু চণ্ডীদাস ও তাঁর কাব্যকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন,[৪] তবু তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক বিচারগ্রন্থ 'ভাষার ইতিবৃত্তে'র শেষ সংস্করণেও কৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষাকেই আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের আবিষ্কৃত পুথির লিপিকাল যতই অর্বাচীন হোক, মূল গ্রন্থখানি যে চৈতন্য-পূর্বকালের রচনা, সাধারণভাবে এ কথা মনে করা চলে। অবশ্য এ সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণাজাত সন্দেহ-সংশয়ের পরিচয় উল্লেখযোগ্য। ডঃ স্কুমার সেন বহুবিস্তৃত পটভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ করে অনুমান করতে চেয়েছেন, বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-সমসাময়িকও হয়ে থাকতে পারেন।[৫] অপরপক্ষে ৺যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কৃষ্ণকীর্তনে নানাবিধ প্রক্ষেপের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন।[৬] কিন্তু এই সব সিদ্ধান্ত বিচারসহ যদি হয়-ও, তবু তা' অনুমান-নির্ভর। তর্কের ক্ষেত্রে এই সব অনুমান-বিচারের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিলেও, আলোচ্য পুথিখানির আশ্রয়স্বরূপ মূল কাব্যের সামগ্রিকতা এবং কবি-কীর্তির প্রাচীনতার প্রমাণ খণ্ডিত হয় না।

কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাবিচার

পূর্ববর্তী বিচার এবং সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যাবে, বড়ু চণ্ডীদাস কেবল কিংবদন্তী-খ্যাত চণ্ডীদাসই নন, তিনি চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবিও। অতএব, তাঁর রচিত কৃষ্ণকীর্তন কাব্য চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত হওয়ার

৩। বাঙালাসাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড; ২য় সংস্করণ। ৪। ঐ।
৫। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড; ২য় সংস্করণ।
৬। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

ঐতিহাসিক দাবি রাখে,—এ'সত্য অবশ্য-স্বীকার্য। কিন্তু এ বিষয়ে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের বিশেষ আপত্তি আছে। পূর্বেই বলেছি, কৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী, পরিকল্পনা, উপস্থাপনা সব কিছুই পদাবলী সাহিত্যের সংস্কারানুগ (conventional) পদ্ধতি থেকে বিশেষভাবে পৃথক্। তা'ছাড়া, রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই কবির ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি আধুনিক বিদগ্ধজনের দৃষ্টিতে গ্রাম্যতা-দুষ্ট এবং রুচিহীন বলেই প্রতিভাত হয়েছে। রসানুশীলনের এই বিদগ্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আধুনিক বৈষ্ণব ভক্তগণ তথাকথিত এই "অশ্লীল" কাব্যখানিকে শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত হবার গৌরব-মর্যাদা দিতে একান্ত কুণ্ঠিত হয়েছেন। তাঁদের মতে গ্রন্থখানিতে অশ্লীল রুচিহীনতার গতানুগতিক পৌনঃপৌনিকতা ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রতি খণ্ডেই রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে একই ধরণের বাদানুবাদ, অর্থহীন নীতিবাক্য ও শাস্ত্র-কথার উদ্ধার, এবং রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের যথার্থ কিংবা কৃত্রিম প্রতিরোধ-চেষ্টা, কৃষ্ণ-কৃত যথার্থ কিংবা কৃত্রিম বলাৎকার ইত্যাদি রুচিহীন যৌন মিলনে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণে এই উন্নাসিকতা সর্বাংশেই সমর্থনীয় নয়। কৃষ্ণকীর্তনের শিল্পধর্ম পদাবলী-সাহিত্যানুগ না হলেও, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-রসাস্বাদনের অনুরূপ প্রয়াস বাংলাদেশে অভিনব ছিল না। বরং কৃষ্ণকীর্তনের সমসাময়িক কালের পূর্বে এবং পরেও এই বিশেষ ধরণের রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-কথার আস্বাদন বাংলা দেশে সুপ্রচলিত ছিল। আগে একাধিকবার বলেছি,—চৈতন্য-পূর্ববর্তী বঙ্গদেশে কৃষ্ণলীলাস্বাদনের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য শক্তির নিকট শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের মহিমাই বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু সমাজ এবং জীবনের লৌকিক স্তরে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যময় লীলারসাস্বাদনের প্রতি আকর্ষণ ছিল সমধিক। বিশেষ ভাবে আদিযুগের সহজিয়া সাধন-পদ্ধতির মধ্যেও যে এর মূল নিহিত ছিল,—সে কথাও বলেছি। এই লোকাচার-পুষ্ট রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়মূলক লৌকিক কাব্যধারাকে অন্যান্যদের মধ্যে[৭] সার্থকতম অভিজাত-রূপ দান করেন কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দে। পূর্বেই বলেছি, গীতগোবিন্দের প্রচলিত রস-সংস্কার একান্তভাবে কবি জয়দেবের

কৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব আস্বাদন পদ্ধতির দ্বন্দ্ব

৭। দ্রষ্টব্য—সদুক্তিকর্ণামৃত।

কল্পনা-মূলোদ্ভূত বলে দাবি করা চলে না; বৃন্দাবনবাসী চৈতন্যোত্তর গোস্বামিগণের নিষ্ঠাপূত, বিদগ্ধ আলংকারিক পদ্ধতির প্রয়োগেই জয়দেব-পদাবলী তার বর্তমান রস-মূল্যের অধিকারী হয়েছে। চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির মত চৈতন্য-পূর্বযুগের অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের কাব্য-বিষয়েও সাধারণ ভাবে একই মন্তব্য করা যেতে পারে। বস্তুতঃ, পণ্ডিতমহলে এমন অনুমানও করা হয়েছে যে, অধুনা একান্তভাবে বৈষ্ণব আস্বাদন-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর বর্তমান স্তর-বিন্যাসও মূলতঃ কবি-কৃত নয়,--পরবর্তীকালের বৈষ্ণব রসাস্বাদনের প্রক্রম-প্রভাবিত। অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদসমষ্টিকে সংস্কারানুরাগ (conventional) বৈষ্ণব-আস্বাদন-পদ্ধতির অনুসারে সজ্জিত করা হয়েছে। আর এই পূর্ব-কল্পিত আদর্শের অনুসরণে পদ-সজ্জা করার ফলে কবির মূল পরিকল্পনার স্বরূপ একাধিক স্থানে হয়েছে বিকৃত।[৮] অতএব, বোঝা গেল,—চৈতন্য-পূর্ব যুগের রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সাহিত্য কোন অনন্যতুল্য কল্পনা-বৈশিষ্ট্য অথবা বিশেষ রূপ-প্রকাশের জন্যই বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নি,—,এ সম্বন্ধে অন্যান্য কারণের প্রভাব সমধিক। আর, সে কারণসমূহ বৈষ্ণব প্রেমাস্বাদন-পদ্ধতির স্বরূপে নিহিত।

আধুনিক কালে কোন কোন দুঃসাহসী সমালোচক বৈষ্ণব সাহিত্যের আধ্যাত্মিক পটভূমিকাটুকুকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চেয়েছেন,—রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ-সাহিত্যকে আস্বাদন করতে চেয়েছেন অনন্য-প্রভাবিত উৎকৃষ্ট প্রেম-কাব্যরূপে। এই অসমসাহসিক চেষ্টার সংগে যুক্ত না হয়েও স্বীকার করতে বাধা নেই যে, বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যেরও একটা অনধ্যাত্ম মানবিক সংবেদনা রয়েছে। বস্তুতঃ, এই মানবিক সংবেদনার মধ্যেই বৈষ্ণবপদাবলীর সাহিত্যিক আবেদন বিশেষ ভাবে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈষ্ণবকবিতা'য় এই সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। আবার, একথা অবশ্য-স্বীকার্য

বৈষ্ণব কবিতার সাহিত্যিক আবেদন ও মানবিকতা

যে, পৃথিবীর মানবিক আবেদন-সম্পন্ন সাহিত্য,—তথা সার্থকনামা সাহিত্য-মাত্রের অধিকাংশেরই মৌলিক রস-সংবেদনা নিহিত রয়েছে নারী-পুরুষের রহস্যময় সম্পর্কের মধ্যে। এই সম্পর্ক সর্বাংশেই যৌন-চেতনা-প্রভাবিত নয়

৮। কীর্তিলতার ভূমিকা—৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সত্য, তবু এর অন্তর্নিহিত যৌন অংশকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করাও চলে না। এই নিতান্ত জৈবিক আকর্ষণকে অবলম্বন করেই যুগ-যুগ ধরে নারী-পুরুষের পরস্পর-বিলম্বী ভাব-সৌন্দর্য গড়ে উঠেছে। আমাদের ধারণা,—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস,—প্রাক্-চৈতন্য যুগের লীলা-রস-চারণগণ সকলেই এই ভাব-সৌন্দর্যেরই সাধক ছিলেন।

এই দৃষ্টি-ভঙ্গি অনুসারেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষ ভাবে 'রতিসুখ-সার' অভিসারের ললিত-মধুর সংগীত-নির্ঝর। বস্তুতঃ বাংলার সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থায় যে জীবনবোধের ইঙ্গিত-পরিচয় আভাসিত হয়েছিল, জয়দেবের কাব্য অভিজাত রুচি ও চেতনার মাধ্যমে, তাকেই একটি আদর্শ শিল্প-পরিণাম দিয়েছে। জয়দেবের কাব্যে নর-নারীর প্রেম-স্বরূপের ব্যাখ্যা প্রসংগে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অংশ বিশেষের বিচার সাধারণ ভাবে উদ্ধার করা যেতে পারে,—যদিও কাব্যদুটি সম্পূর্ণ সমধর্মী নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম-জীবনের রচনা-বিশেষের[১] যৌন আবেদনের প্রাধান্য ও তথাকথিত রুচিহীনতার আলোচনায় এক কালের সমালোচনাসাহিত্য যথার্থই রুচি-বিকারগ্রস্ত হয়েছিল। সে ঘটনা আজ ইতিহাসের সামগ্রী হয়েছে। কিন্তু এ কালের কোন রস-বোদ্ধা পাঠককে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় না যে, ঐ সকল রচনাবলীতে প্রেম-বর্ণনা রূপ-নির্ভর হ'য়ে থাক্‌লেও সে-রূপ একেবারেই বস্তুগ্রাহ্য নয়,—সর্বাংশে ভাবময়। অন্তরের ভাবময় প্রেমের প্রত্যক্ষানুভূতি কামনা করে কবিকে সেদিন অরূপের রূপ-পরিকল্পনা করতে হয়েছিল,—অপরূপের পরিণামী পরিচয় আবিষ্কারের জন্য। অন্যতর দৃষ্টান্তে দেখি, হিন্দুর সাধনা পরমাত্মার সন্ধানে প্রথমতঃ মৃণ্ময়ীর মধ্যেই চিণ্ময়ীর অস্তিত্ব অনুধাবনের চেষ্টায় ব্রতী হয়ে থাকে। কিন্তু চিণ্ময়ীর সন্ধান একবার আবিষ্কৃত হ'লে মৃণ্ময়ী-স্থূলতা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি, দেহ-সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে শৃঙ্গার যখন রস-রূপ লাভ করে, তখন সে জৈবিক স্থূলতা-বর্জিত এক অপূর্ব ভাবানন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লৌকিক জীবনে সীমাবদ্ধ অনুরূপ শৃঙ্গারোল্লাসকে একদা জয়দেব-কবি শৃঙ্গাররসে পরিণতি দান করেছিলেন,—এইখানেই তাঁর সাহিত্যিক মহিমা। রাধা-কৃষ্ণের রতি-সুখ বর্ণনায় যেখানেই

চৈতন্য পূর্ববর্তী সার্থক প্রেম-কাব্য জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বৈষ্ণব আস্বাদন-পদ্ধতির সমন্বয়

১। কড়ি ও কোমল, চিত্রাঙ্গদা ইত্যাদি।

যৌন-আবেগ প্রকট হতে চেয়েছে,—সেখানেই জয়দেব উত্তেজনার 'পরে শান্তিবাণী উচ্চারণ করেছেন ;—স্মরণ করেছেন আলোচ্য চিত্র মাত্রই মানবিক দেহ-বিলাস-কাহিনী নয়,—কবি-কল্পিত রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-রস-নির্যাস,—দৈবলীলা। আধুনিক যুগের পরিভাষায় বলা চলে, বস্তুগ্রাহ্য জীবনের ইন্দ্রিয়ানুগ কামনা-বিলাস নয়, জয়দেবের কাব্য ভাবময় প্রেম-সংগীত।

মানবিক প্রেমের দেহাতীত এই রস-পরিণাম কেবল জয়দেবের কাব্যকেই নয়,—প্রেম-কাব্য-মাত্রকেই তথা প্রেম-মাত্রকেই মহাপ্রভুর নিকট আস্বাদনীয় করে তুলেছিল। বস্তুতঃ, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব দার্শনিকতার পরিভাষা-সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক বিচার পরিহার করলে, তার অধিভৌতিক মৌল আবেদন এখানেই নহিত আছে।

চৈতন্য-প্রেমাস্বাদনের বাস্তব স্বরূপ

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম॥"

এই সংজ্ঞার মধ্যেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'কাম' এবং 'প্রেম' তথা শৃঙ্গার এবং শৃঙ্গার রস, দৈহিক আকর্ষণ এবং দেহাতীত প্রেম-রস-পরিণামের আলোচ্য পার্থক্যের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন বলে বিশ্বাস করি।

চৈতন্যদেবের জীবন-সাধনা ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্রীয় বিচার-বিন্যাসের মাধ্যমে এই প্রেমানুভূতিই লোকোত্তর ভাব-তন্ময়তায় রূপান্তরিত হয়েছিল। আর, প্রেমের এই অতিলৌকিক অনুভূতি-আস্বাদনের আনন্দই অভিব্যক্তি লাভ করেছে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিগণের পদসাহিত্যে। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব যুগের সিদ্ধকাম কবিরা বাস্তব জগতের প্রেম-সাধনার মধ্য দিয়ে বস্তুর অতীত ভাব-চেতনাময় লোকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। আর, বাঙালির সাহিত্য-ক্ষেত্রে লৌকিক দেহ-সাধনাকে অতিলৌকিক প্রেমরূপদানের সার্থক পথিকৃৎ জয়দেব, এইখানেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেবের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা।

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমাস্বাদনের অলৌকিকতা

দ্বিতীয় বার জয়দেব-সাহিত্য-স্বরূপের এই দীর্ঘ বিশ্লেষণের কারণ,—আমাদের ধারণা,—জয়দেবের কাব্যের মতই বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন লৌকিক দেহাভিচারকে একটি অভিজাত সমৃদ্ধির ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা

করেছে। অপরিণত বাংলা ভাষার প্রকাশ-দীনতা এবং শিল্পীর জীবন-পরিবেশের বৈচিত্র্যহীনতা-হেতু বড়ুচণ্ডীদাসের সাধনার স্বল্প-সার্থকতা জয়দেবের অপূর্ব সিদ্ধির সঙ্গে কিছুতেই তুলনীয় নয়,—তবু এঁদের প্রচেষ্টার সাধর্ম্য অবশ্য-স্বীকার্য।

কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষাকৃত অসার্থক হলেও জয়দেবীয় পদ্ধতির সমগোত্রীয়

অন্যতর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি,—ডঃ নীহাররঞ্জন কৃষ্ণকীর্তনকে বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার উৎকৃষ্ট কাব্যিক নিদর্শনরূপে অভিহিত করেছেন। ডঃ রায়ের এই বিচার সত্য যদি হয়ও,—তবু, এ'কথাও অবশ্য-স্বীকার্য যে, সহজিয়া রস-চেতনা কৃষ্ণকীর্তনে অভিনবতর পরিণাম লাভ করেছে। সত্য বটে, কৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীটি সম্পূর্ণরূপেই লৌকিক। কিন্তু, এ'তথ্য অধিকতর সত্য যে, কবি বড়ুচণ্ডীদাস বহু শাস্ত্র এবং সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শে পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর এই বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় গ্রন্থে-উদ্ধৃত শ্লোকাবলী, নায়ক-নায়িকার পরিকল্পনা, প্রেমের স্তরবিন্যাস, নায়িকার অলংকার-সিদ্ধ রূপ-বর্ণনা, এবং স্থানে স্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবানুবাদের মধ্যে স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষ করে কাব্যের প্রথমে জন্মখণ্ডে অবিমিশ্র লৌকিক কাহিনীকে পৌরাণিক ঐতিহ্যের সংগে যুক্ত করবার চেষ্টা অবশ্য-লক্ষিতব্য। তা'ছাড়া, অন্যান্য 'খণ্ডে'ও রাধাকৃষ্ণের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অসার্থকভাবে হলেও, ভাগবত পটভূমিকার অবতারণা করে কবি পরকীয়া-মিলনকে নৈতিক সমর্থন দেবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরো লক্ষ্য করা উচিত যে, এই পরকীয়া-প্রীতিকে কবি সহজিয়া আধারে তুলে ধরেন নি। রাধাকে লক্ষ্মীর সংগে যুক্ত করে 'স্বকীয়াত্বে'র একটি আবরণ রচনার চেষ্টা করেছেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, —অনভিজাত লোক-জীবন-কাহিনীকে অভিজাত পৌরাণিক রূপান্বিত করে তোলার সচেতন প্রয়াস কবি-হৃদয়ে অনুস্যূত হয়েছিল। আমাদের ধারণা, —লৌকিক জীবন-চিত্রের এই অভিজাত-রূপায়ন-চিন্তার প্রথম সার্থক ফল জয়দেবে পরিলক্ষিত হয়েছে,—এই চেতনারই সার্থকতর পরিণাম পদাবলী-সাহিত্য। বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য,—এই প্রচেষ্টায় তিনি সার্থক হন নি। কিন্তু এ অসার্থকতা কবি-প্রতিভারও ব্যর্থতার পরিচায়ক নয়,—বরং তাঁর বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কৃষ্ণকীর্তনের অনন্যতুল্য স্বকীয়তার ভিত্তি রচিত হয়েছে বলে মনে করি।

কৃষ্ণকীর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য,—এটি অভিজাত-চেতনা-প্রসূত আভিজাত্যগর্বী কাব্য নয়,—লোক-জীবনের একনিষ্ঠ সাধনা এবং উপলব্ধি-সম্ভূত সার্থক 'লোক-কাব্য'। পূর্ববর্তী আলোচনায় বড়ু-চণ্ডীদাসের পাণ্ডিত্য এবং বৈদগ্ধ্যের উল্লেখ করেছি—কিন্তু এ' কথাও বলেছি যে, তাঁর লোক-জীবন-প্রীতি পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য-প্রভাবে বিনষ্ট হয় নি। কবির বিদগ্ধ চিন্তা অ-মিশ্র লোক-জীবন-স্বভাবের 'পরে পৌরাণিক ঐতিহ্যের শালীন আবরণ টানতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবনরস-তন্ময় শিল্পি-মন জনজীবনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর বাস্তব-চিত্র অঙ্কিত করে সে পথে অপরিহার্য বাধা সৃষ্টি করেছে। কৃষ্ণকীর্তনকাব্যে লৌকিক ভাব-চিন্তার 'পরে আভিজাত্যারোপ-চেষ্টার ব্যর্থতা বড়ুচণ্ডীদাসের প্রতিভার দুর্বলতার পরিচায়ক নয়,—তাঁর অবিমিশ্র লোক-জীবন-তন্ময়তার ফল। তাই, তাঁর কাব্যে তথাকথিত রুচিহীনতা, অশ্লীলতা কিছুই আরোপিত নয়,—স্বাভাবিক জীবন-চিত্রায়ণ-জনিত। আর কেবল এই কারণেই, পূর্ব-সংস্কার-মুক্ত বোদ্ধা-হৃদয় মাত্রকেই তা' বিরক্ত করে না,—করে আকৃষ্ট। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে,-কৃষ্ণকীর্তন সমসাময়িক লৌকিক সমাজ-জীবনের বাস্তব আলেখ্য। যে তথাকথিত রুচি-হীনতা এবং অশ্লীলতার জন্য কাব্যখানিকে দায়ী করা হয়ে থাকে,—তা ছিল সে যুগের বিশেষ সমাজ-জীবনের একটি অপরিত্যাজ্য অঙ্গ,—কৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ সেই সামাজিক জীবন-পরিচয়ের সাক্ষ্য। কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভাষায়, শ্রীকৃষ্ণ "গোপ-পল্লীতে প্রতিপালিত হইয়া অমার্জিত চরিত্রের সবলকায় কিশোর। এই গোপ-পল্লী সেই যমুনা-তীরের বিদগ্ধ ভাবাপন্ন আভীর-পল্লী নয়,—এ যেন বাংলার ভাগীরথী-তীরের অশিক্ষিত গোপপল্লী[১০]।"

চণ্ডীদাসে পৌরাণিক চেতনার ব্যর্থতা এবং তজ্জাৎ কবি-চেতনার সার্থকতা

কৃষ্ণকীর্তনে বাংলার অশিক্ষিত এই গোপপল্লীর,—অনভিজাত গ্রামীণ জীবনধর্মের বেদনার্ত ছবিটিই রূপায়িত হয়েছে। রাধা-জীবন সেকালের সামাজিক দুর্নীতি-পীড়িত ট্রাজেডির জীবন্ত-বাস্তব বিগ্রহ। গ্রামীণ বাংলার সর্বস্তরে বালিকাবিবাহ সেদিন একটি অপরিহার্য সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। ফলে, সদ্য-জাগ্রত-

কৃষ্ণকীর্তন লোক-জীবনের Tragedy

১০। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য।

যৌবন পুরুষের লালসা 'অজ্ঞাত-যৌবনা' নব-বিবাহিতার অপ্রাপ্ত-চেতনাকে অকথ্য নির্যাতনে অকাল-বোধিত করার মত্ততায় অধীর হয়ে উঠ্‌ত। অথচ, নানা অ-নৈসর্গিক প্রভাবে বালিকার নারীত্ব যখন অকালে উৎক্ষিপ্ত হত, ততদিনে পুরুষের পৌরুষ প্রায়ই দুর্নৈতিক অপচয়ে আস্‌ত স্তিমিত হয়ে। নির্যাতিতা নারীর ভাগ্যে তখন অতৃপ্ত বুভুক্ষা, অন্ধ আক্রোশ আর অসহায় আর্তি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকৃত না। সমকালীন সামাজিক নারীত্বের সেই ঐতিহাসিক আর্তনাদকে কৃষ্ণকীর্তন মুখর করেছে রাধা-বিরহ খণ্ডে :—

"যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহি লোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥
বড়ায়ি গো,
কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড অভাগিনী॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো
আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতে কাজ তাক মোঞঁ বিকসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥......"

কেবল ভাব-ভাষা-ছন্দেই নয়, বাগ্‌ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যেও এধরণের পদাবলী একটি নিভৃত-গভীর গ্রামীণ আন্তরিকতার সুরকেই যেন মূর্ত করে তোলে। বিশুদ্ধ জীবন-রস-মাধুর্যের প্রভাবে তা সর্বদেশ-কালের জীবন-পিপাসু হৃদয়কে অনায়াসে স্পর্শ করে।

কৃষ্ণকীর্তনে জীবনবোধের অ-পূর্বতা

কিন্তু এ-ত কেবল রাধা-জীবনের পরিণামী চিত্র-কথা। লক্ষ্য করলে দেখ্‌ব, একেবারে প্রথমাবধি প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি দিন-ক্ষণটির পুংখানুপুংখ চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে একটি জীবন-কোরককে ধীর-সংযত শিল্পীর মতই মুক্ত বিকশিত করেছেন

কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। আর, সেই সামাজিক নারীত্বের বিকশিত জীবন-শতদলকেই অভিহিত করেছেন রাধা নামে। বস্তুতঃ আদ্যন্ত রাধা চরিত্রটি মধ্যযুগীয় লোক-জীবন-ট্রাজেডির একটি অনবদ্য রস-মূর্তি। কেবল বহিরঙ্গ জটিলতার উষর কাঠিন্যই নয়, সেকালের স্থূল সমাজ-জীবনাচারের অন্তরাল-বর্তী প্রেম-ভাবের ফল্গু-ধারাটিকেও কবি আবিষ্কার করেছেন আশ্চর্য সহৃদয়তার সংগে। তুলনা না করে সেই ভাবানুভূতির অ-তুল্যতা নির্দেশ করা যাবে না।

শ্যাম-নামের ভাবাবেশে পদাবলীর কবি চণ্ডীদাসের রাধা বিবশ-হৃদয় হয়েছিলেন—

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"[১১]

Subjective প্রেমানুভূতির এমন নিষ্ঠাপূর্ণ (sincere) স্বাভাবিক অভিব্যক্তি কল্পনাতীত-প্রায়। তবু, ব্যক্তিগত অনুভূতির এই মন্ময়তা দুর্লভ হলেও হয়ত একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু স্থূল গ্রাম্য ভাবের দ্যোতনার জন্য 'গ্রাম্য' ভাষার 'অশ্লীল' অ-পূর্ব কাব্যের কবিও যখন রাধা-জীবনে দয়িতের বংশী-নাদের মহিমা-কীর্তন করেন,—তখন অভিভূত না হয়ে উপায় থাকে না,—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞাঁ তা'র পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ পরাণী॥

১১। এই পদটি চণ্ডীদাসের মৌলিক সৃষ্টি নয়,—সংস্কৃত কবিতাবিশেষের অনুবাদ মাত্র, অনুরূপ বিতর্ক উত্থাপিত হয়ে থাকে।—কিন্তু বর্তমান প্রসংগে সে বিতর্ক অর্থহীন।

আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

—রুচিমান বিদগ্ধ চিত্তের সূক্ষ্ম ভাবানুশীল নয়,—ব্যক্তিগত অনুভূতির বিস্ময়কর নিবিড়তা নয়,—জীবনের ভাবে এবং ভাষায় বড়ুচণ্ডীদাস একখানি অবিমিশ্র বাস্তব-জীবন-কাব্য রচনা করেছেন এখানে।

বড়ুচণ্ডীদাসের এই গভীর জীবন-সংবেদনা একদিকে তাঁর কাব্যকে আভিজাত্য-গর্বী সূক্ষ্ম রুচি-বিলাসের বিনষ্টি থেকে রক্ষা করেছে।—অন্য দিকে গতানুগতিক জীবনধারার ক্লেদাক্ততার মধ্যেই শিল্পের সমাধি রচনা না করে,—তা'কে মুক্তি দিয়েছে বৃহত্তর ভাব-কল্পনার উন্নত নভো-লোকে। ফলে কাব্য শেষে বংশী এবং বিরহখণ্ডের পরিণামী আবেদন প্রায়ই দেহসম্পর্ক-পরিচ্ছিন্ন মানস-আবেগের প্রাবল্যে বৈষ্ণব কবিতার সমধর্মী হয়ে উঠেছে অনেকটা। উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত কয়টি ছাড়াও কৃষ্ণকীর্তনের অন্ততঃ একটি পদ নিঃসন্দেহে এই মন্তব্যের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করেছে,—

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য-বিচারে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত

প্রথম প্রহর নিশি   সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিহে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে   সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥……ইত্যাদি

বহু-বিখ্যাত এই বৈষ্ণব-পদটির আদিরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে কৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহখণ্ডে :—

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী   সপণ সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআ কদম তলে   সে কাহ্ন করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥" ইত্যাদি পদের মধ্যে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে,- প্রথম কয় খণ্ডের তথাকথিত রুচিহীনতার বাইরে কৃষ্ণকীর্তনের এই পরিণামী আবেদনকে পদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে আপত্তি ঘটেনি কোথাও। এর পরে তর্কের অবকাশ যতই রচিত হোক,— কৃষ্ণকীর্তনের যেখানে শেষ, পদাবলী সাহিত্যের সেখানে আরম্ভ,- ইতিহাসের এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

একাদশ অধ্যায়

আদি-মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্য

'চণ্ডীদাস-সমস্যা'

আগেই বলেছি, চণ্ডীদাস-সমস্যা বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের বহু বিতর্কিত এক অতি জটিল প্রসংগ। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালির ঐতিহাসিক সচেতনতার অভাব থেকেই এই সমস্যার উদ্ভব। পূর্বে বলেছি, কবি চণ্ডীদাস ছিলেন মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবন-বোধের মহত্তম উদ্গাতাদের একজন। তা'ছাড়া সেকালের ভক্তি আবেগাকুল বাঙালির কাছে চণ্ডীদাস প্রিয়তর হয়েছিলেন মহাপ্রভু কর্তৃক আস্বাদিত হওয়ার কাহিনী-প্রভাবে। চণ্ডীদাস-পদাবলী নিয়ত রস-নিষেকে নিত্যকালের বাঙালি চিত্তকে মুগ্ধ-মথিত করেছে; চৈতন্যদেবের ঐতিহ্য-সংযোগে ভক্তি-বিহ্বল বাঙালি মানসকে সেই সংগে করেছে আবিষ্টও। এই মোহাবেশের দ্বারা দীর্ঘদিন বাঙালি চণ্ডীদাস-রস-সাগরে ডুবে ছিল। ফলে, কবির ব্যক্তি-পরিচয় আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা মনেও জাগে নি বড় একটা। শুধু তাই নয়. বহু খ্যাত-অখ্যাত-নামা পদকর্তা চণ্ডীদাসের কবি-কীর্তির পুণ্য-সলিলে আত্মবিসর্জন করেছিলেন;—নিজেদের রচিত ভাল-মন্দ পদের সংগে জুড়ে দিয়েছিলেন চণ্ডীদাসের ভণিতা। একদিকে দীর্ঘকালের অনবধানতা কবির পরিচয়-সূত্রকে লুপ্ত করেছে। অন্যদিকে অতি-ভক্ত কবিদের চণ্ডীদাস-নামানুষঙ্গ-কামনা কবির মূল রচনাবলীর পরিচয়কে করেছে আচ্ছন্ন। তারও সংগে যুক্ত হয়েছে লিপিকার ও গায়েনদের ভণিতা প্রয়োগের অসাবধানতা। সব কিছু মিলে চণ্ডীদাস-পরিচয় আবিষ্কারের সকল পথই হয়েছে নিরন্ধ্র সংশয়াচ্ছন্ন।

চণ্ডীদাস সমস্যার কারণ—

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যাস্বাদনের পদ্ধতি ব্যক্তিগত পঠনাশ্রয়ী ছিল না। পুথি সে যুগে খুব কমই লিখিত হ'ত। 'গায়েন' নামক একশ্রেণীর পেশাদার গায়কের দল শ্রেষ্ঠ কবিদের বিভিন্ন বিষয়ক রচনা থেকে যথেচ্ছ অংশ আহরণ করে একটি আনুপূর্বিক কাহিনীযুক্ত পালাগান গড়ে তুলতেন। সমাজের আপামর জনসাধারণের

ও পরিবেশ-প্রভাব

সমষ্টিগত সম্মিলনে 'আসরে' সেই সংগীত গীত হ'ত। নানা শিল্পীর পদ-সমন্বয়ে বিমিশ্র পালার মধ্যে বিভিন্ন পদ-শেষের ভণিতা থেকে রচয়িতার নামটি মাত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হ'ত। অথচ 'গায়েনরা' প্রায়ই ভণিতার যাথাযাথ্য রক্ষা করেন নি; সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ আছে। এই অশিক্ষিত সংগীত-ব্যবসায়িগণের নিকট ঐতিহাসিক শুচিতা রক্ষার প্রচেষ্টা অর্থহীন ছিল—'গীত'-পালাকে সর্বজন-চিত্ত-হর করে গড়ে তোলাই ছিল এ'দের উদ্দেশ্য। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে বহু অজ্ঞাত-অখ্যাত লেখকের সৃষ্টির সঙ্গেও এ'রা শ্রেষ্ঠ কবির ভণিতা যুক্ত করে দিয়েছেন। অনেক সময় বহু অক্ষম কবি-যশপ্রার্থী নিজ রচনার অমরতা কামনা করে তা'র সঙ্গে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ভণিতা জুড়ে দিয়েছেন। কখনো বা 'লিপিকর-প্রমাদ'-হেতু ভণিতা-বিভ্রাট ঘটেছে। অথচ সে যুগের শ্রোতা-সাধারণের রস-পিপাসা ছিল বিচার-বিমুখ,—ভক্তি-সর্বস্ব। ফলে, যখনই কোন পদের ভণিতায় জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির নাম উচ্চারিত হয়েছে, তখনই তারা ভক্তি-তদ্গত চিত্তে মাথা নত করেছেন। বিচার করে দেখেননি,—অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন বোধ করেননি,—উল্লিখিত কবির পক্ষে ঐরূপ কবিতা রচনা সম্ভব কি না;—কিংবা ভণিতা যাঁর, সত্যই পদটি তাঁরই সৃষ্ট কি না। তবু, এই অ-বৈজ্ঞানিক,—অনৈতিহাসিক পরিবেশের মধ্যেও ইতিহাসের যতটুকু তথ্য রক্ষিত হতে পেরেছিল, মোগল-যুগের বিনষ্টি ও য়ুরোপীয় অধিকারের প্রতিষ্ঠা-সমকালীন বিপর্যয় ও আত্মবিস্মৃতির মধ্যে তারও সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছিল। মধ্যযুগান্তকারী স্বতো-বিনষ্টির প্রভাবে শিক্ষিত বুদ্ধিমান বাঙালি-সাধারণ জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়ে অনবহিত, শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সমাজের নিম্নস্তরবর্তী অশিক্ষিত, অজ্ঞ জন-সাধারণের 'পরে জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব হয়েছিল ন্যস্ত। বলাবাহুল্য, তাদের পক্ষে সে দায়িত্ব পালন একেবারেই সম্ভব হয়নি। স্রষ্টার পরিচয়ই যে কেবল হারিয়েছিল, তাই নয়,—অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টিও হয়েছিল লয়প্রাপ্ত।

এই আত্মবিস্মৃতির যুগান্ত-শেষে নব-প্রবুদ্ধ বাঙালির মনীষা যখন পুরাতন ঐতিহ্যের আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিল, তখন প্রতিপদেই সমস্যা-জটিলতা ঐতিহাসিক চেষ্টার অগ্রগমনে বাধা দিয়েছে।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সংশয়-জিজ্ঞাসার প্রথম সূচনা হয়, ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় যখন সাহিত্য পরিষৎ থেকে চণ্ডীদাস পদাবলী প্রথম প্রকাশ করেন। ঐ পদাবলী সংগ্রহের সময় চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত এমন বহুপদ পদাবলী-সম্পাদকের চোখে পড়েছিল, বর্ণনার অনুক্রম অথবা রসগত উৎকর্ষের বিচারে যা' বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাসের রচনা বলে স্বীকার করা চলে না। কিন্তু ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার শুরু হলেও, সে যুগে চণ্ডীদাস বিষয়ে অনুসন্ধান-গবেষণা স্তব্ধ হয়েছিল। অধিকাংশ সমালোচক-ঐতিহাসিকের দৃষ্টি তখনও ছিল ভক্তি-তন্ময়গত। তাই চোখের সামনে জেগে-ওঠা সমস্যার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পারে নি। আগেই বলেছি, কৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের ফলে এই ভক্তি-বিহ্বল পলায়নপরতা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল।

সমস্যার বিকাশ

এর আগে চণ্ডীদাস-ভণিতায় যত পদ পাওয়া গিয়েছিল তাদের ভাব-বিষয়ে একটি সাধারণ সাধর্ম্য ছিল ; পার্থক্য ছিল রস-মানের উৎকর্ষ অপকর্ষ-গত। অতএব, একই কাহিনী-বিষয়ের কোন পর্যায়ে যে-কবি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন, অন্য পর্যায়ে কখনো তাঁরই রচিত পদ হয়েছে অতি নিকৃষ্ট ;—এমন অনুমান অসংগত মনে হয়নি। কিন্তু, কৃষ্ণকীর্তনের সর্ব-বিষয়ক আমূল পার্থক্য হেতু নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা এ-কাব্যকে পদাবলীর পর্যায়ভুক্ত করতেও অনিচ্ছুক হয়েছিলেন,—একথা বলেছি। অতএব, চণ্ডীদাস-বিষয়ক ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসাকে আর এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হল। ফলে, দেখা দিল দুরপনেয় চণ্ডীদাস সমস্যা।

এই সমস্যার মূল জিজ্ঞাস্য কয়টিকে নিম্নরূপে ভাগ করা চলে :—

১। পদাবলীসাহিত্য এবং কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস কী একই ব্যক্তি ?

সমস্যার জিজ্ঞাসা

২। যদি তা' না হ'য়ে থাকেন, তবে চণ্ডীদাস কয়জন ;—দুই না ততোধিক ?—এই সব-কয়জন চণ্ডীদাসই কি একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন ? তা না হলে এঁদের কার আবির্ভাব-কাল কখন ?

৩। সর্বোপরি জিজ্ঞাস্য,—এইসব চণ্ডীদাস-কবিদের মধ্যে কার সৃষ্টি চৈতন্য-দেবের শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি লাভের মর্যাদা পেয়েছিল ?

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখেছি,—কৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ুচণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব যুগে আবির্ভূত হয়ে কাব্য-রচনা করেছিলেন যে, পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। অথচ পদকর্তা চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত করে এখনও বলা সম্ভব হয়নি। তাই, কৃষ্ণকীর্তন কাব্যই যদি মহাপ্রভু-কর্তৃক আস্বাদিত হওয়ার গৌরবে ভূষিত হয়ে পড়ে,—এই দুঃসম্ভাবনার চিন্তায় উদ্বাস্ত সেকালের কোন কোন ভক্ত-মনীষি উভয়কুল রক্ষার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। তাঁদের মতে কৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী-সাহিত্য একই চণ্ডীদাসের রচনা। এই অভিমতের মূলীভূত মনোভাব ভক্ত-ঐতিহাসিক দীনেশ-চন্দ্রের কণ্ঠে অকপট অভিব্যক্তি পেয়েছে,—"চণ্ডীদাসকে আমরা এ পর্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছি,—কৃষ্ণকীর্তনে সেই ধারণা কতকটা ক্ষুন্ন হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে উচ্চগ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্তন যে তাহার অনেক নিম্নে! এ পাড়াগেঁয়ে কৃষক-কবির লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য কোথায়? এ' যে গ্রাম্য ব্যভিচারী প্রেমের শীলতাশূন্য আবর্জনা, এখানে সে ব্যোম-স্পর্শী পবিত্রতা কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা যে পবিত্রতা ও যূথিকা-শুভ্র নির্মলতা বুঝি, এখানে তাহা নাই। এযে একান্ত স্থূল, একান্ত বিষদৃশ চিত্রপট; আঁধারে ছিল—ভাল ছিল। চণ্ডীদাসকে যে এই কীর্তন হেয়, অশ্রদ্ধেয় করিয়া দিল। তাঁহার পদাবলীর সংগে এক পংক্তিতে কৃষ্ণকীর্তন রাখা যায় না। তাহা হইলে যে ব্রহ্মচণ্ডাল দোষ হয়।[১]" স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটুকু মূলতঃ ভক্তি এবং আবেগ, বিচার নয়। অতএব, এই মনোভাব-প্রভাবিত সিদ্ধান্তও বিচার-সহ নয়।

প্রাথমিক উত্তর

দীনেশচন্দ্রের বক্তব্য,—অপরিণত বয়সের চাপল্যে চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তনের মত একখানি 'অতি অশ্লীল' কাব্য রচনা করেছিলেন। পরে শিল্পি-স্বভাবের ক্রম-বিবর্তনের ফলে পরিণত বয়সে তিনিই অপূর্ব প্রেম-ভাব-সমৃদ্ধ পদ সাহিত্য রচনা করেন। দীনেশচন্দ্রের মতে কৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের ফলেই জয়দেব এবং পদাবলী সাহিত্যের মধ্যবর্তী রুচি-বিবর্তনের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত স্পষ্ট হতে পেরেছে। "যদি কৃষ্ণকীর্তন না পাইতাম, তবে বুঝিতাম না, গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণধামালির পরেই হঠাৎ

যৌক্তিকতার ত্রুটি

১। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

চণ্ডীদাসের (পদাবলীর) অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল[২]।" কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্তন কাব্যে পুরাণ-ইতিহাসের বহুল উদ্ধৃতি এবং আলংকারিক রস-প্রক্রমের পূর্বাপর অনুসৃতি কবির গভীর শক্তিকেই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করে। এমন অবস্থায়, কেবল তথাকথিত রুচি-দীনতার জন্য এ-কাব্যকে 'বালভাষিত' বলে স্বীকার করা চলে না। আবার রুচি ও প্রকাশ-ভঙ্গির স্থূলতাই যদি প্রাচীনতার লক্ষণ হয়, তাহলে চণ্ডীদাসকে জয়দেবেরও পূর্বে স্থাপিত করতে হয় কারণ, চিন্তা ও প্রকাশের স্থূলতা কৃষ্ণকীর্তনে অধিকতর। অতএব, বোঝা গেল,—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং ঐ যুগের অন্যান্য মনীষিগণের সমর্থন সত্ত্বেও এই বিচার গ্রহণীয় নয়[৩],—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই।

এবারে প্রশ্ন,—রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-কাব্যের রচয়িতা কয়জন চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন! ভণিতা বিচার করলে দেখা যায়,—বিভিন্ন বৈষ্ণব পদের শেষে চণ্ডীদাস নামের সঙ্গে— বড়ু, দ্বিজ, দীন, দীনক্ষীণ, আদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষণ দ্বারা একজন করে স্বতন্ত্র চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে,—এমন কথা মনে করবার সংগত কারণ নেই।

একাধিক চণ্ডীদাস ও

কারণ, কৃষ্ণকীর্তনের পুথিতেও চণ্ডীদাস ভণিতা একাধিক বিশেষণে বিশেষিত হতে দেখা গেছে। অন্যদিকে চণ্ডীদাস নামের সংগে 'আদি'-শব্দ যোজনা করে যে অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্যটুকুও সন্দেহজনক। পণ্ডিতেরা মনে করে থাকেন, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের কোন চণ্ডীদাস-যশঃ-প্রার্থী সর্বজনশ্রদ্ধেয় চণ্ডী-কবির সংগে একাত্মতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই 'জাল বিরুদ'-এর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অতএব বোঝা যাচ্ছে,—চণ্ডীদাস নামের সজে যুক্ত বিশেষণগুলির সাহায্যে চণ্ডীদাস নামধেয় বৈষ্ণব কবিগণের সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির সহায়তায় দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনা করেন। ঐ কাব্য-সংগ্রহের দীর্ঘ ভূমিকায় অধ্যাপক বসু এই সমস্যার উপর নূতন আলোক-সম্পাৎ করেন। রাধা-কৃষ্ণ-লীলার পদাবলী-সম্মত কাহিনীযুক্ত এই

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ৩। দ্রষ্টব্য—কৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা।

পুথিখানি আদ্যন্ত সুপরিকল্পিত পালার আকারে লিখিত। আবার প্রতিপদের শেষে চণ্ডীদাসের ভণিতা রয়েছে। অতএব, মনে করা যেতে পারে,—এই পুথিখানি কোন বিশেষ চণ্ডী-কবির রচিত আদ্যন্ত পালাকাব্যের হুবহু অনুলিপি না হলেও তার কাঠামোর 'পরে প্রতিষ্ঠিত। এবারে আলোচ্য পুথির কাব্যাদর্শের বিচার করে অধ্যাপক ৺বসু প্রতিপন্ন করেন, দীন চণ্ডীদাসের কাব্য পর-চৈতন্য বৈষ্ণব আদর্শানুসারী। এই প্রসংগে চৈতন্য-পূর্ব যুগের কাব্যাদর্শের প্রতিভূস্বরূপ কৃষ্ণকীর্তন কাব্যেরও সাধারণ আলোচনা এবং বিচার করা হয়েছে। অধ্যাপক বসুর পক্ষের যুক্তি কয়টিকে মোটামুটি নিম্নরূপে উদ্ধার করা যেতে পারে:—

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

১। কৃষ্ণকীর্তনে রাধা লক্ষ্মীর 'অবতার' কিংবা লক্ষ্মীস্বরূপিনী। কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালের আদর্শানুযায়ী লক্ষ্মী, সত্যভামা, রুক্মিণী ইত্যাদি কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীগণের চেয়ে রাধা শ্রেষ্ঠা:— তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তিরূপা পরকীয়া।

২। কৃষ্ণকীর্তনে রাধারই অপর নাম চন্দ্রাবলী;—কিন্তু পর চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে রাধা এবং চন্দ্রাবলী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্যোত্তর ভাবাদর্শের পার্থক্য

৩। কৃষ্ণকীর্তনে 'বড়াই' রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-সাধিকা;—চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যে 'বড়াই' স্থানচ্যুতা হয়েছেন। ললিতা বিশাখাদি সখীগণ সেখানে রাধার নিত্য সহচরী।

৪। কৃষ্ণকীর্তনের রাধা সংস্কৃতকাব্যাদর্শসম্মত নায়িকা।—'অজ্ঞাত-যৌবনা মুগ্ধাবস্থা' থেকে প্রগল্‌ভাবস্থার পরিণাম পর্যন্ত সাধারণ অলংকার শাস্ত্রের অনুসারে তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তী যুগের রাধা প্রথমাবধিই কৃষ্ণেসমর্পিতপ্রাণা,—কৃষ্ণ-প্রেমৈকসর্বস্বা। আরো পরবর্তীকালে, রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'-প্রভাবিত বৈষ্ণব আলংকারিক আদর্শানুগা।

বিচার করে দেখা গেছে,—দীন চণ্ডীদাস-পদাবলীতে চৈতন্য-পরবর্তীকালের উদ্ধৃত বৈশিষ্ট্যের সব কয়টিই উপস্থিত রয়েছে। তাই নয়, চৈতন্যোত্তর

যুগের গোস্বামি-মহাজনগণের কারো কারো সংস্কৃত পদানুবাদ দীনচণ্ডীদাস-পদাবলীর পুথিতে পাওয়া গেছে।[৪] তা' ছাড়া চৈতন্যোত্তর যুগে পরিকল্পিত দ্বাদশ গোপাল, এমন কি রূপগোস্বামীর সংস্কৃত নাটকে উক্ত মধুমঙ্গলের উল্লেখ পর্যন্ত দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর পুথিতে পাওয়া গেছে। অতএব, আলোচ্য গ্রন্থখানি যে চৈতন্যোত্তর যুগের রচনা, তাতে সন্দেহ নেই।

এ পর্যন্ত বিচার থেকে বোঝা গেছে,—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ঐতিহাসিক প্রমাণ-সিদ্ধ চণ্ডীদাস-কবি দু'জনের মধ্যে কৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন চৈতন্য-পূর্ববর্তী। আর, পদাবলী-রচয়িতা দীনচণ্ডীদাস ছিলেন চৈতন্য-পরবর্তী। অন্য কোনো চণ্ডীদাস-কবির প্রমাণ-নির্ভর অস্তিত্বের অভাবে

দুই চণ্ডীদাস তত্ত্ব

অধ্যাপক ৺বসু সিদ্ধান্ত করেন,—চৈতন্যদেব কৃষ্ণকীর্তন কাব্যই আস্বাদন করেছিলেন। অথচ, এ বিষয়ে ভক্ত বৈষ্ণবদের রুচিগত আপত্তি যে রয়েছে, সে কথা পূর্বে বলেছি।

অন্যদিকে, শ্রীমদ্ভাগবতের 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকায় 'কাব্য' শব্দের 'পরমবিচিত্র' স্বরূপের ব্যাখ্যা করে শ্রীসনাতন গোস্বামী উদাহরণ হিসেবে "দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রকারাদি"র প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক ৺বসু সেই প্রসঙ্গ উদ্ধার করে প্রতিপন্ন করেন,—চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবগোষ্ঠীর রাধাকৃষ্ণ-লীলারসাস্বাদন-পদ্ধতির সহধর্মী না হলেও,—দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদির কাব্য-রসাস্বাদনে চৈতন্যদেব কেন, গোস্বামিগণেরও কোনো আপত্তি ছিল না। তা ছাড়া চৈতন্যদেব যে সপার্ষদ দানলীলাদির অভিনয় করেছিলেন, তারও ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। এ সম্বন্ধে ভক্তগণের পক্ষ থেকে আরো যে সকল তর্ক উত্থাপিত হয়েছিল,—আবেগ-প্রাধান্য হেতু তার অধিকাংশই যুক্তির পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারে নি। তাই, বর্তমান প্রসংগে তা আলোচ্য নয়।

কিন্তু এখানেই বিচারের শেষ হয় না। অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসুর সিদ্ধান্ত অনুসারে চৈতন্য-পূর্ব যুগের কাব্য কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত হয়েছিল এবং দীনচণ্ডীদাস-পদাবলী চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত

৪। 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম'—ইত্যাদি বিখ্যাত পদটি রূপগোস্বামীর অনুরূপ সংস্কৃত পদের হুবহু অনুবাদ বলে মনে করা হয়। বস্তুত: পদ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য অপূর্ব,—কিন্তু কোন্‌টি মূল রচনা এবং কোন্‌টি অনুবাদ—এ সম্বন্ধে মতভিন্নতা রয়েছে।

হয়েছিল। একথা স্বীকার করে নিলেও দেখি,—চণ্ডীদাসের যে বিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর পদগুলিকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস-সমস্যার উদ্ভব,—সেই সব পদেরই বিচার বাকী থাকে। দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী বস্তুতঃ দ্বিতীয় এবং তৃতীয়, কখনো বা তারও চেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পদ-সমষ্টি। প্রথম শ্রেণীর কাব্যগুণ-সম্পন্ন পদমাত্র-ই এই কাব্যে দুর্লভ। অতএব, কেবলমাত্র আদ্যন্ত-যুক্ত পুথির অভাবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে ইতিহাসের বিচার থেকে বহির্ভূত করা চলে না। এ বিষয়ে ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বিশেষ যুক্তি বিচারের উদ্ধার করেছিলেন[৫]। তাঁর বিচার অনুসরণ করলে দেখব, প্রথম শ্রেণীর ভাব-কল্পনা-সমৃদ্ধ ঐ সকল চণ্ডীদাস-পদাবলীর মধ্যে শিল্পগত অন্তঃস্বভাবের একত্ব আবিষ্কার একেবারে অসম্ভব নয়। আর এই ধরণের পদাবলীর অধিকাংশ স্থলেই ভণিতায় চণ্ডীদাস নাম সর্বপ্রকার উপাধি বর্জিত। অতএব, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্যতুল্য বৈষ্ণব পদকর্তা এক নিরুপাধিক চণ্ডীদাসের পরিচয় নির্ণয়ের প্রশ্ন থেকেই যায়।

দীনচণ্ডীদাসের কাব্য ও প্রথম শ্রেণীর চণ্ডীদাস-পদাবলী

আধুনিক কালের গবেষণা এই জিজ্ঞাসারও একটি উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। বীরভূম রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রাম থেকে চণ্ডীদাস-পদাবলীর একখানি পুথি আবিষ্কার করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুথিখানির বিশেষ আলোচনা করেছেন।[৬] পুথিখানি বস্তুতঃ অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত দীনচণ্ডীদাস পদাবলীরই বিস্তৃততর সংস্করণ। ৺বসুর সম্পাদিত পুথির পদসমষ্টি ছাড়াও এই পুথিতে ৩৭৭টি অতিরিক্ত পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অন্ততঃ ৫০।৬০টি পদ কাব্য-বিচারে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বলে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন। পুথিখানিতে ভণিতা-সমস্যা সমাধানেরও একটি সংকেত পাওয়া গেছে বলে মনে হয়। আলোচ্য পুথিখানির ৩১০নং পদ থেকে ১২০২ সংখ্যক পদ পর্যন্ত অংশের ভণিতায় ৮৮ বার 'দীন' চণ্ডীদাস,

নবাবিষ্কৃত বনপাশ পুথি ও চণ্ডীদাস সমস্যার শেষকথা

৫। দ্রষ্টব্য—'পদকল্পতরু'—ভূমিকা।

৬। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—'বাংলা সাহিত্যের কথা'।

৭ বার 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস, ১৩ বার 'দীনক্ষীণ' চণ্ডীদাস এবং অবশিষ্ট কয়বার নিছক চণ্ডীদাস নাম ব্যবহৃত হয়েছে;—বড়ুচণ্ডীদাস শব্দটি একবারও উল্লিখিত হয় নি। আলোচ্য পুথির লিপিকরের ঐতিহাসিক নিষ্ঠা এবং পুথির মূলানুগতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'তে পারলে মনে করা যেতে পারে,—চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি সদ্য-আলোচিত পদকর্তা চণ্ডীদাসই 'দীন', 'দীনক্ষণ', কিংবা 'দ্বিজ' বিশেষণে নিজেকে বিশেষিত করেছিলেন এবং ঐ সব কয়টি 'বিরুদ'ই একই ব্যক্তির পরিচয়-সূচক। কেবল বড়ু চণ্ডীদাস নামেই একজন পৃথক কবি ছিলেন,—কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বলে আধুনিক গবেষকের নিকট তিনি পরিচিত হয়েছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও উল্লেখ করেছেন, নূতন আবিষ্কৃত পদগুলি ছাড়াও ঐ একই পুথির সংকেত থেকে বোঝা যায়, আলোচ্য কাব্যের নানা স্থানের ৬৫০টি পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন,—নূতন কিছুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া গেছে,—বাকী পদগুলো আবিষ্কৃত হলে বিখ্যাত চণ্ডীদাস-পদাবলীর সব কয়টি পদই তার মধ্যে হয়ত পাওয়া যেতে পারবে। তাঁর মতে,—"যদি সম্পূর্ণ পুথির আবিষ্কারের পরেও প্রথম শ্রেণীর পদগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে সমস্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করিতে হইবে।"[৭] আলোচ্য গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদের আধিক্য বিষয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন, চণ্ডীদাস-কবি বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন রসের অবতারণা করেছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সর্বরসে সমান ব্যুৎপন্ন না হওয়াই সম্ভব। অতএব, "যে-কবি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় এত অপটু ও দ্বিধা-কম্পিত-হস্ত, তিনিই রাসলীলা, মাথুর, বিরহ ও আক্ষেপানুরাগের পদে অনেক উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিলেন।"[৮] স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে,—ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ মতবাদের সমর্থনে সুচিন্তিত যুক্তির অবতারণা করেছেন—তা'হলেও সমস্ত সমস্যাটি অনুমানের পর্যায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। সমালোচক স্বয়ং স্বীকার করেছেন,—"সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান এখনও অনাবিষ্কৃত উপকরণগুলির সংগ্রহের উপর নির্ভর করে।"[৯] বলা বাহুল্য ইতিহাসের সে 'সমাধান' আলোচ্য মতবাদের বিরুদ্ধে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

৭। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—'বাংলা সাহিত্যের কথা'।
৮। ঐ। ৯। ঐ।

অন্যদিকে ডঃ সুকুমার সেন দীনচণ্ডীদাসের পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কবি না হওয়াই সম্ভব বলে অনুমান করেছেন।[১০] স্বভাবতই মনে হয়, শ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাসকে হয়ত তিনি পৃথক্ ঐতিহ্যভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু অনুমান-নির্ভর এ সকল বিচারের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেও বলা যেতে পারে,—দীন চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাসের অভিন্নত্ব আজও ঐতিহাসিক ভিত্তির 'পরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেবল এই কারণেও চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পৃথক বিচারের মর্যাদা দাবি করে; আর সে বিচার এ-পর্যন্ত আলোচিত চণ্ডীদাস সমস্যার গণ্ডি-বহির্ভূত।

চণ্ডীদাস পদাবলীর পরিচয় চণ্ডীদাস-সমস্যার গণ্ডি-বহির্ভূত

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)।

দ্বাদশ অধ্যায়

আদি-মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদসাহিত্য

চণ্ডীদাসের পদাবলী (?)

এ' পর্যন্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে, চণ্ডীদাস পদাবলীর পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সংশয়-কণ্টকিত। অন্ততঃ চণ্ডীদাস-সমস্যা বিষয়ক আবিষ্কার বা বিচারের সাহায্যে এ' সম্বন্ধে তথ্য নির্ধারণ আজও সম্ভব হয়নি। ফলে, প্রধানতঃ চণ্ডীদাসের যে পদ-সমষ্টির ঐতিহাসিক মূল্য নির্দেশের জন্যই চণ্ডীদাস-সমস্যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল,—বাংলাসাহিত্যের সেই পরম সম্পদ প্রথম শ্রেণীর পদাবলী ইতিহাসের আলোচনা-গণ্ডির বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ, এ' ছাড়া উপায়ও হয়ত কিছু ছিল না। ইতিহাস যার মর্যাদা সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ-চিহ্ন রক্ষা করে নি,—ঐতিহাসিক তার মূল্য রচনা করবেন কোথায়? কিন্তু এ সম্বন্ধে বিপরীত যুক্তিও মনে আসে। প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-ঐতিহ্য যা-কিছু কাল-জয়ী হয়ে আছে,—তা'র মধ্যে চণ্ডীদাস-পদাবলী অন্যতম। ইতিহাস দ্বিধাহীন কণ্ঠেই এ-সত্য ঘোষণা করেছে। এ' সম্বন্ধে বিস্তৃততর পরিচয় আবিষ্কার যদি সম্ভব না হয়, তবে তা ঐতিহাসিকেরই ত্রুটি-সূচক। কিন্তু সেই ত্রুটির সুযোগ নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তথ্যের অস্বীকৃতি কেবল অসংগতই নয়, অপরাধও।—এই-রূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে দ্বিধা-সংকুচিত চিত্তে চণ্ডীদাস-পদাবলীর সাধারণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

চণ্ডীদাসের পদাবলী বিচারের ঐতিহাসিক সার্থকতা।

প্রথমেই বলি,—বর্তমান আলোচনা ঐতিহাসিক নয়,—সাহিত্যিক। —ইতিহাসের পাঠক এই আলোচনা থেকে একটিমাত্র তথ্যেরই স্বীকৃতি খুঁজে পাবেন যে, চণ্ডীদাস-পদাবলীর পর্যায়ে এমন কতগুলো পদ রয়েছে, যা'কে কোন কাল-শ্রেণি ভুক্ত করা আজও সম্ভব হয়নি। —সাহিত্য-রস-রসিক এই আলোচনায় খুঁজে পাবেন এক অপূর্ব কাব্য-চমৎকৃতি—ঐতিহাসিক চণ্ডীদাস-গোষ্ঠীর রচনায় যা অলভ্য। বর্তমান আলোচনার পেছনে যুক্তি আমাদের এইটুকু

চণ্ডীদাসের পদাবলী বিচারের সাহিত্যিক মান

মাত্রই। কিন্তু, বর্তমান প্রসংগে আলোচিতব্য পদাবলীর সংগ্রহ-মান নিয়ে আবার হয়ত তর্ক দেখা দেবে। প্রথমেই বলি, এই বিচারে রচয়িতার ব্যক্তি-পরিচয়ের চেয়ে রচনার ভাব ও রূপগত ঐক্যের প্রতি জোর দেওয়া হবে বেশি।—রচয়িতার পরিচয় আবিষ্কার যে সম্ভব নয়,—সে ত বারে বারেই দেখা গেছে। কিন্তু রচনার ভাব এবং রূপগত ঐক্য বল্‌তেই বা কি বুঝ্‌ব! পূর্বের আলোচনায় একাধিক বার নাম-মাত্র-পরিচয় চণ্ডীদাসের 'প্রথম শ্রেণীর' পদাবলীর উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেই প্রথম শ্রেণীর পদ-চয়নেও সমস্যার অন্ত নেই। সাধারণ ভাবে চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রাপ্ত কিছু-সংখ্যক পদ অনেকের নিকটই উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়। কিন্তু এই উৎকৃষ্ট পদ সমষ্টির মধ্যে কোন্‌গুলি প্রথম শ্রেণীর, কোন্‌গুলি বা দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর সে বিষয়ে সর্বজনীন মতৈক্যের কথা কল্পনা করাও অন্যায়। তা'ছাড়া, এই ধরণের সব কয়টি পদই যে একই কবির রচনা,—সে অনুমানেরও সংগত নির্ভর নেই। এক বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর কিছু সংখ্যক পদ যিনি লিখেছেন, তাঁ'র পক্ষে প্রসংগান্তরে নিকৃষ্টতর পদ-রচনাও অসম্ভব নয়। এ ধরণের সংশয়-তর্কের শেষ হবে না। কিন্তু ভিন্নতর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখব,—বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য আস্বাদনের একটি লেখক-নিরপেক্ষ ক্রমও রয়েছে। আর ঐ বিশেষ প্রক্রমের অনুসরণ করেই আসলে পদাবলী-সাহিত্যের সর্বাধিক রস বিকাশ সম্ভাবিত হয়েছিল।....

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-রস-বোদ্ধাগণের প্রভাবে বৈষ্ণবপদাবলী আস্বাদনের একটি আলংকারিক পূর্ব-সংস্কার (convention) গড়ে উঠেছিল। আর সেই রস-সংস্কারের (aesthetic convention) সংগঠনে শ্রীরূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শ ও নির্দেশ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়েছিল। পরবর্তী-কালে কীর্তনিয়াদের সাহায্যে এই সংস্কার ক্রম-সংহত হয়ে সর্বাত্মক নিয়মে পর্যবসিত হয়। ফলে, পদ কিংবা পালা রচনায় মূল পদকর্তার রূপ-সজ্জা কীর্তনিয়াগণের রুচি এবং উপস্থাপনা-পদ্ধতির প্রভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, এমন কি জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের মত চৈতন্যোত্তর কবিরও বিভিন্ন পদ পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ ইত্যাদি যে সকল রস-পর্যায়ে সজ্জিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে, তার সবকয়টিতেই কবির মূল উপস্থাপনা-পদ্ধতির মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। কীর্তনিয়াগণের অনুসৃত রস-প্রক্রমকে অনুসরণ করেই

বৈষ্ণব পদ-আস্বাদনের রস-প্রক্রম

পদগুলি বর্তমান রূপ-বিন্যাসে সজ্জিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও সংস্কারের বশেই আজ এই সকল পদের অন্যরূপ উদ্ভব-ইতিহাস, কিংবা উপাস্থাপনা-প্রক্রমের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। রস-গ্রহণের এই পদ্ধতি, তথা অনুরূপ রস-বাসনার অন্তরালে মূল কবির রচনার আকৃতি-প্রকৃতিই কেবল পরিবর্তিত হয় নি,—বিশেষ কৌতূহলের অভাবে স্বয়ং কবির অস্তিত্বও লুপ্ত হয়েছে। এই জন্যই দেখি,—চণ্ডীদাস-পদাবলীর পুনরাবিষ্কার মুহূর্তে কবির ব্যক্তি-পরিচয়ের চেয়ে কাব্যের ভক্তি-সংস্কার-মুগ্ধ রসাস্বাদনই প্রাধান্য পেয়েছে। চণ্ডীদাস কে,—কোথায় তাঁর বাড়ি, এসব তথ্য না জেনেও বাঙালি সাহিত্য-রসিক সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত-চিত্ত হ'তে পেরেছে এইটুকুমাত্র জেনে যে, চণ্ডীদাস বিশেষ ভাবে পূর্বরাগ এবং আক্ষেপানুরাগের কবি। এদিক্ থেকে ইতিহাস-নির্ভর প্রত্যক্ষ বিচার যখন সম্ভব নয়,—তখন কাব্যের রস-ঐতিহ্যগত বিচার-মানকে অনুসরণ করা অসংগত মনে হয় না। পূর্বোক্ত পূর্বরাগ এবং আক্ষেপানুরাগাদি বিষয়ক বহুশ্রুত, বহুলগীত পদাবলী আলংকারিকের উপস্থাপনা-পদ্ধতির গুণে এক আশ্চর্য রূপ-ভাবগত ঐক্য নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। পদগুলির সব কয়টি যদি এক কবির রচনা নাও হয়, তবু বিশেষ রূপ-সজ্জার ফলে এদের মধ্যে যে রস-পরিণামগত ঐক্য গড়ে উঠেছে, তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল সাহিত্যিক রসানুভূতির দিক থেকে কয়েকটি বিখ্যাত পদে এই ভাবৈক্যের স্বরূপ আলোচনা করেই ক্ষান্ত হব।

চণ্ডীদাস-পদাবলী নামে যে পদগুলি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির চিত্ত হরণ করে আসছে, তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত 'বৈষ্ণবতা' নয়,—ঐকান্তিক ভাব-গভীরতা। চণ্ডীদাস দীর্ঘদিন ধরে আপামর বাঙালিচিত্তের নিকট বৈষ্ণব-পদকর্তা মহাজনরূপে পূজিত হয়ে আসছেন,—বৈষ্ণব ভক্তি-বিশ্বাসই চণ্ডীদাস-পদাবলী আস্বাদনের একমাত্র আধাররূপে পরিকল্পিত হয়ে আসছে। এ-অবস্থায় বর্তমান মন্তব্য প্রথমে আকস্মিক, এমন কি বিস্ময়করও মনে হতে পারে। সন্দেহ নেই, চণ্ডীদাস-কাব্যের রাধাকৃষ্ণ-লীলারস-তন্ময়তা সংশয়াতীত। কিন্তু বর্তমান প্রসংগে প্রথমেই স্মরণ করি,—যে বিশেষ 'বৈষ্ণব' পূর্বসংস্কারের (Conventions) মধ্যে পদাবলীর রস আস্বাদন করে আমরা অভ্যস্ত, চণ্ডীদাস-কাব্যের পক্ষে সর্বত্রই তা অকৃত্রিম সৃষ্টি নয়। অথচ, জয়দেব-

বিদ্যাপতির মত চৈতন্য-পূর্ব কবিগণও স্পষ্ট আলংকারিক সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অবশ্য, তা যে সর্বাংশেই বৈষ্ণব আলংকারিক সংস্কার, এ-কথা জোর করে বলা চলেনা। অন্যদিকে, জ্ঞানদাস,—বিশেষ করে গোবিন্দদাস কবি-রাজের রচনায় বৈষ্ণব-আলংকারিক পূর্ব-সংস্কারের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু আমাদের ধারণা, চণ্ডীদাসের পদাবলী নামে সুপরিচিত জনপ্রিয় কবিতাবলীতে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব নির্বিশেষে কোন প্রকার কাব্যিক পূর্বসংস্কারের পরিচয়ই খুঁজে পাওয়া কষ্টকর।[১] এই কারণেই মনে হয়, চৈতন্য-পূর্বযুগে যখন বৈষ্ণব-সংস্কার সংহত নিয়মের মধ্যে দৃঢ়-পিনদ্ধ হয়ে ওঠেনি,—তখনই চণ্ডীদাস-পদাবলী প্রথম রূপ-পরিগ্রহ করেছিল কী?

চণ্ডীদাস পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য,—'বৈষ্ণবতা' নয়, 'ভাব গভীরতা'

চণ্ডীদাস পদাবলীর ভূমিকায় ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন,- "চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমে একেবারে মজিয়া গিয়াছিলেন। যোগীর ন্যায় মানসনেত্রে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। যাহা দেখিতেন, তাহাই গাইতেন। কল্পনার কথা নয় যে, সাজাইয়া গুছাইয়া তোমার মনে চমক লাগাইতে হইবে। চণ্ডীদাস কৃত্রিমতা জানিতেন না। খাঁটি জিনিষ যেমন পাইলেন, আনিলেন, লোকে লউক আর না লউক, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাই তাঁহার কবিতা সরল ও অলংকারবিহীন। বর্ণনীয় বিষয় হইতে মনকে দূরে না আনিলে ত আর উপমা খোঁজা হয় না। সুতরাং বিষয়ে তন্ময়তা জন্মিলে উপমা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য থাকে না।[২]" এই মন্তব্যের মধ্যে যে চণ্ডীদাসের প্রতিভা-বিচার করা হয়েছে,—তাঁর পরিচয় আবিষ্কার সম্ভব নয়। তবু, চণ্ডীদাস-পদাবলী নামে বিখ্যাত পদগুলোর মধ্যে পরোক্ষ-ভাবে কবি-প্রতিভার এই পরিচিতিই যে প্রকাশিত হয়, বিদগ্ধ পাঠক-মাত্রই এ-বিষয়ে প্রায় একমত।

অবশ্য, এই উপলক্ষ্যে কাব্যধর্ম সম্বন্ধে ৺মুখোপাধ্যায়ের মতবাদ বিচার্য। পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য থেকে স্বত-ই মনে হয়, বিচারকের মতে কাব্যে অলংকরণ-মাত্রই কৃত্রিমতা অথবা 'বর্ণনীয় বিষয়ে তন্ময়তা'র অভাব-জনিত। কিন্তু সাধারণভাবে

১। চণ্ডীদাসের ভণিতায় সহজিয়া ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গীতও পাওয়া গেছে,—কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সেগুলি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত।

২। চণ্ডীদাসের পদাবলী—৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত,—ভূমিকা।

এ মন্তব্য স্বীকার্য নয়। মণ্ডনকলা কাব্য-কলার অঙ্গ বিশেষ, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিহার্য অঙ্গ। আর, অলংকার যেখানে কাব্যকলার সম্পদ হয়ে ওঠে,—সেখানে তা কবি-চিত্তের ভাব-তন্ময়তা প্রসূত। অলংকার-সৃষ্টির সময়ে এই তন্ময়তার অভাব ঘটলেই কাব্যের পক্ষে তা' কৃত্রিম হয়ে পড়ে। আবার, এই কৃত্রিমতার ফলে কবিতার কাব্যত্ব বিনষ্টি লাভ করে। গোবিন্দদাস কবিরাজ যেখানে উৎকৃষ্ট 'কাব্য' রচনা করেছেন, সেখানেও তা' বিশেষভাবে অলংকার-সমৃদ্ধ, আর সেই অলংকার-সমৃদ্ধির পশ্চাতে কবির বৈষ্ণব-বিশ্বাসের সক্রিয় পরিচয়ও সুস্পষ্ট। কবির কাব্য-প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁর বাচনভঙ্গি এবং বৈষ্ণব বিশ্বাস আত্মার আত্মীয়তা লাভ করেছিল। অপর পক্ষে, মণ্ডনকলা যে কাব্যের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিহার্য, সে কথাও আগেই উল্লেখ করেছি। কারণ অন্তরের গভীরতম অনুভূতিই কাব্যের বিষয়। আর অনুভূতি মাত্রই সাধারণভাবে অনির্বাচ্য,—কাব্যিক অনুভূতি ত বটেই। এই অনির্বাচ্য অনুভূতিকে বচন-মাধ্যমে ব্যঞ্জিত করার জন্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়,—সাধারণভাবে এই কৌশলের সার্থক প্রয়োগই শিল্পশৈলীর ধর্ম। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধ্বনি এবং অর্থগত কৌশলের ফলেই সাধারণ-ভাবে আলংকারিক মণ্ডনকলার সৃষ্টি। অতএব, অনির্বাচ্য অনুভূতিকে বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনাদানের জন্য এই আলংকারিক মণ্ডনকলার প্রয়োজন যে অপরিহার্য হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। মণ্ডনকলার প্রতি অতিরিক্ত প্রবণতাহেতু অনুভূতি-শৈথিল্য যদি ঘটে, তবে তা' কৃত্রিমতার আকর হয়ে পড়ে। তাই কাব্য-রচনার পেছনে একই সঙ্গে কবির দ্বৈত-সত্তা সক্রিয় হয়ে থাকে। এক তাঁর দ্রষ্টা সত্তা,—যে সর্বদাই অনুভূতির গভীরতম অনুধ্যানে নিযুক্ত। আর এক, কবির স্রষ্টাসত্তা,—যা' ব্যক্তিগত ধ্যানের সামগ্রীকে সর্বজনের আত্মার সামগ্রী রূপে অনুভব-গম্য করে তোলার সাধনায় ব্যস্ত। কবির এই দ্বৈত-সত্তার সর্বাত্মক পূর্ণতা এবং মিলনেই সার্থক কাব্য সৃষ্টি সম্ভব। কাব্য-তত্ত্বের এই দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য,—এই তথ্যটিরই প্রতিপাদন যে,—চণ্ডীদাস যত বড় দ্রষ্টা ছিলেন, তত বড় স্রষ্টা ছিলেন না। চণ্ডীদাসের কাব্যের সার্থকতা তাঁর অনন্ত-নির্ভর ভাবুকতার জন্য,—শৈল্পিকতার জন্য নয়।

কবি হিসাবে চণ্ডীদাস সর্বজন-মনোহর, শৈল্পিক কৃতির জন্য নয়, ভাব-গভীরতার জন্য

এ-পর্যন্ত আলোচনায় কেবল একটি কথাই বলতে চেয়েছি, চণ্ডীদাস-

পদাবলীতে কোন প্রকার আলংকারিক মণ্ডন-রীতি অথবা কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নৈষ্ঠিক নীতি-পদ্ধতি শিল্পি-চেতনাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এই অর্থেই আমরা চণ্ডীদাসকে সর্ব-সংস্কারমুক্ত বলে অভিহিত করেছি। বস্তুতঃ, সকল প্রকার বাহ্য-প্রভাব বিষয়ে একান্ত আত্মলীন মন্ময়তাই চণ্ডীদাস-পদাবলীর অনন্যতুল্য স্বভাবকে পরিস্ফুট করেছে। নিতান্ত বাস্তব দৈনন্দিন জীবনেও দেখি, কোন বিশেষ ভাবনার তদাত্মতার ফলে মানুষ নিজ পরিবেশ, এমন কি নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে মনে মনে,—আপন মনেই কথা বলে ওঠে। অনেক সময় এই মনের কথা বলে-ওঠা-বিষয়ে মানুষ নিজেই সচেতন থাকে না, কখনো বা নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে জেগে ওঠে। চণ্ডীদাসের গান এই রকমের অসংজ্ঞান মনের আত্মকথা। এই কারণেই তা' এমন নিরাবরণ, নিরাভরণ,—সর্বজন-হৃদয়-দ্রাবী। আবার, গভীরতম অনুভূতির সত্যতা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। সাধারণ দার্শনিক বিচারেও দেখব,—লোকায়ত চেতনার মধ্যেই অনুভূতি ব্যক্তিত্বের দ্বারা খণ্ডিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই সীমাকে অতিক্রম করতে পারলে ভাবের খণ্ডতা বিদূরিত হয়ে সামগ্রিকতা ও সার্বিকতার সৃষ্টি হয়। এই সার্বিক ও সামগ্রিক স্বরূপে ভাব-মাত্রই বিশ্বজনীন। সাধারণভাবে অনুভূতির গভীরতা এত তীব্র হয় না, যা'তে ব্যক্তির চেতনাকে ব্যক্তিত্ব-পরিচ্ছিন্ন করা চলে।—কিন্তু যদি কখনো তা' সম্ভব হয়, তখন অপরের কথাকেও আমার কথা,—সকলের কথা বলে মনে হয়;—নিতান্ত গদ্য-কথাও কাব্যত্ব প্রাপ্ত হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলী অনুরূপ কাব্য।

চণ্ডীদাসের কাব্য সত্যানুভূতির অনাবৃত প্রকাশ

দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য হয়ত আরো স্পষ্ট হবে। কোন স্বভাবতঃ সংগীত-রস-বিমুখ পরমাত্মীয়কে একনিষ্ঠ সাধকের কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীত শুনে তদ্‌গত ভাষায় বল্‌তে শুনেছি,—'কথাগুলো যেন সুরের মধ্যদিয়ে বুকের মাঝখানে কেটে কেটে বসে গেছে।'—অতি সাধারণ ভাষায় নিতান্ত সত্যানুভূতির অনাবৃত প্রকাশ! শুনে তখন ভারি ভাল লেগেছিল,—সদ্য-গীত রবীন্দ্রসংগীতের মতই 'কাব্যিক' মনে হয়েছিল কথা-কয়টিকে। এই উদাহরণে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেটুকু আছে;—তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলী যখনই পড়ি,—তখনই ঐ কথাগুলো

মনে পড়ে। মনে হয়,—কাব্যহিসাবে এ'রা স-গোত্র;—গভীরতম অনুভূতির সত্য-তম প্রকাশ। কেবল চণ্ডীদাস-পদাবলীতে প্রকাশের ক্ষেত্রটুকু বিস্তৃত-তর, এই যা পার্থক্য। কথাগুলো অদ্ভুত শোনাচ্ছে সন্দেহ নেই,—কিন্তু সহৃদয় পাঠককে স্মরণ করতে বলি,—চণ্ডীদাসের বহু বিখ্যাত পদটি :—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

এই পদ সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে তর্কের অবধি নেই। অনেকের মতেই এটি রূপগোস্বামি-কৃত সংস্কৃতপদের অনুবাদ মাত্র। কিন্তু এমন কথাও শোনা যায় যে, চণ্ডীদাসের মূল বাংলা-পদেরই সংস্কৃত অনুবাদ করে থাকতে পারেন শ্রীরূপগোস্বামী। বারে বারে দেখা গেছে,—এ সকল তর্কের শেষ নেই। কিন্তু আমরা যে রস-বিচারের ভিত্তির 'পরে বর্তমান চণ্ডীদাস-পদাবলীর আলোচনা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি, উল্লিখিত পদ তা'র সঙ্গে সম-সূত্রে আবদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ চণ্ডীদাসের আর একটি অতিবিখ্যাত পদ স্মরণ করি,—

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি॥
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥"…ইত্যাদি।

এই পদটির মধ্যেও সেই একই সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে না কী?- মনের গভীরতম ভাবানুভূতিকে কবি যেমন-তেমন করে প্রকাশ করে দিয়েছেন,—লেখনী-মুখে;—যেমন পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-সংগীতের শ্রোতাটি করেছিলেন মুখে মুখে। এঁদের মধ্যবর্তী শৈল্পিক পার্থক্য গুণগত নয়,—পরিমাণগত।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে উপলব্ধ হওয়া উচিত যে,—অবিমিশ্র প্রাণের কথাকে মুখে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারলে তা' যে-রূপ লাভ করে,—তাই চণ্ডীদাস-পদাবলীর কাব্যিক স্বরূপ। কবিকে 'রূপ-দক্ষ' বলা হয়েছে,—বস্তুতঃ কবি যেখানে রূপদক্ষ, সেখানে তিনি স্রষ্টা। কিন্তু চণ্ডীদাস প্রাণের কথায় ভাব,

রূপ, এমন কি ভাষা পর্যন্ত সৃষ্টি করেন নি;—প্রাণের কথাকে মুখে ফুটিয়ে রূপ দিয়েছেন মাত্র। তাই কাব্যক্ষেত্রে তিনি স্রষ্টা নন,—দ্রষ্টা। অর্থাৎ প্রাণের অন্তর্নিহিত ভাবের অনুধ্যানে কবি এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েছেন যে, তাঁর ব্যক্তি-চেতনা এমন কি ব্যক্তি-সংস্কার পর্যন্ত সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। একমাত্র মূলগত হৃদয়-ভাব কিংবা চিত্তবৃত্তিটি অবশিষ্ট জাগ্রত থেকে কথা বলে উঠেছে। কবি যেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ঐকান্তিকতা নিয়ে সেই বাণীর অপেক্ষা করেছিলেন; যখন যা পেয়েছেন, তা'কেই লেখনী-মুখে তুলে ধরেছেন। এই কারণে চণ্ডীদাস-পদাবলীর শিল্প-শৈলীর পৃথক্ বিচার করলে, তা'র উৎকর্ষের স্বরূপ-নির্ণয় ক্লেশকর হয়। অনেক স্থলেই ছন্দ অপরিণত, বাক্য অসম্পূর্ণ,—রীতি অ-সংহত—মণ্ডন-কলার অভাব ত সর্বাধিক প্রস্ফুট। তবু, সব কিছু মিলে ঐ চণ্ডীদাস-পদাবলীই ভাল লাগে হয়ত সব চেয়ে বেশি।—কারণ, ঐখানেই ত বাঙালির প্রাণের কথাও প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। ভেবে দেখা উচিত,—চণ্ডীদাসের সে প্রাণ-কথা রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত নয় কেবল,—শাশ্বত প্রেমগাথা। রাধা নামে বাংলা দেশের প্রাণের বাঁশি কখন প্রথম সাধা হয়েছিল, তা' আজ নিশ্চিত করে বলা দুষ্কর।—কিন্তু এ কথা বলা যেতে পারে, কেবল রাধাকৃষ্ণলীলার অন্তর্বর্তী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের জন্যই তা' বাংলাদেশে সর্বাত্মক জনপ্রীতি লাভে সমর্থ হয় নি,—এই দু'টি চরিত্রকে উপলক্ষ্য করে বাঙালির প্রেমাকাঙ্ক্ষা সর্বাধিক মুক্তিলাভ করেছে।—বাঙালি-চেতনার নিকট এঁরা 'যুগলপ্রেমের' শাশ্বত প্রতীক। তাই যখন বাঙালি প্রেমিক প্রাণের আনন্দে প্রেমের গান ধরেছে,—অমনি বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, হিন্দু অহিন্দু নির্বিশেষে সকলের মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে জাতীয়-প্রেমের চিরন্তন আদর্শ, ঐ যুগলপ্রেমিকের মিলিতচিত্রটি। বাঙালি প্রেম-সাধকের নিকট রাধাকৃষ্ণ ধর্মবিশেষের দেবতা মাত্র নন,—প্রাণ-দেবতা। চণ্ডীদাস-পদাবলীর রাধাকৃষ্ণও প্রেমিকের প্রাণ-দেবতা,—এই দেবতার স্বরূপ স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

চণ্ডীদাসের কাব্যকথা, শাশ্বত প্রেমগাথা

"আমাদেরি কুটির কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে,—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ! এই প্রেমগীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা॥"

অন্যান্য বৈষ্ণবপদে যাই ঘটে থাক্, চণ্ডীদাস-পদাবলীতে 'প্রিয়েতে' 'দেবতা'তে কোন পার্থক্য নেই;—বরং 'প্রিয়ই' সেখানে 'দেবতা'র মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রেমকে,—প্রেমাকৃতির স্বরূপকে চণ্ডীদাস কী অপরূপ সত্যদৃষ্টির তন্ময়তা নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন,—ওপরের উদ্ধৃতি ক'টি থেকেই তা স্পষ্ট হওয়া উচিত। আরো দু' একটি সর্বজন-বিদিত পদাংশ উদ্ধার করি,—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই কেন বা এমন হৈল।"

কবি আবার জিজ্ঞাসা করেন,—

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনি
দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু'হাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ুর ময়ুরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কহে নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥"

বর্ণনায় কোন আড়ম্বর নেই,—কোন প্রকার বক্তব্য-প্রতিদানের ব্যস্ততা

নেই,—একান্ত অনায়াসে নিছক ঘটনার উপস্থাপনা—statement of facts —কেবল অনুভূতি-গভীরতার ফলে কাব্য হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য,—এ অনুভূতি রাধার বিশেষ সম্পদ নয়,—কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ রামী, তথা যে কোন প্রেমিকের সত্যানুভূতির অবিমিশ্র প্রকাশ হতেও বাধা নেই। অনুভূতির এই 'সত্যতা' এবং প্রকাশের অকৃত্রিম অবিমিশ্রতাই চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-কাব্যকে নিখিলবাঙালির প্রেম-সংগীতে রূপায়িত করেছে। চণ্ডীদাস-পদবলীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মর্যাদা এইখানেই।

চণ্ডীদাস পদাবলী সম্বন্ধে সাহিত্য-ঐতিহাসিকের বক্তব্য

এই আলোচনা আর অধিকদূর টেনে নেওয়া নিরাপদ নয়, কারণ বিচার যতই গভীর হবে, ইতিহাসের জিজ্ঞাসা ততই জটিল এবং তর্কজাল অনপনেয় হয়ে উঠবে। কিন্তু চণ্ডীদাস-পদাবলীর এই অতি সাধারণ আলোচনা শেষ করেও, সন্দেহ ঘুচতে চায় না,—এই আলোচনার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল কী?—কোনো প্রয়োজনই কী সাধিত হয়েছে এই বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যহীন আলোচনার ফলে?—এ প্রশ্নের একমাত্র জবাবদিহি স্পষ্ট করে উপস্থিত করা চলে,—বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক বিচারের নিকট এ আলোচনা নিতান্তই অর্থহীন। এই জন্যই একাধিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-ইতিহাসগ্রন্থে চণ্ডীদাস পদাবলীর উপস্থাপনা পর্যন্ত উহ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু পূর্বেও বলেছি,—এতে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শিত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। চণ্ডীদাস-পদাবলীর বহু কবিতা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ—এই তথ্য অনস্বীকার্য। ততোধিক পরিচয় এ সম্বন্ধে পাওয়া যায়নি বলে কোন তথ্যের স্বল্পতা হেতু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে ইতিহাস-পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে বিলুপ্ত করে দেবার অধিকার ঐতিহাসিকের নেই। বর্তমান আলোচনার ফলে এই সত্যটুকু প্রতিষ্ঠিত হলেই এ চেষ্টা সার্থক হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আদি-মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদ-সাহিত্য

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি মিথিলার শৈব-ব্রাহ্মণ-রাজসভার শৈব-ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিত ও সভাকবি। তা'হলেও তাঁর কবি-প্রতিভার আলোচনা না ক'রে আদি-মধ্য-যুগের বৈষ্ণব-পদসাহিত্যের বিচার সম্পূর্ণ হয় না। বিদ্যাপতির প্রতিভা ছিল বিচিত্র শক্তির আধার। তিনি একাধারে স্মার্ত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং কবি ছিলেন। আর, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একাধিক বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবু, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি কবি,—কেবলমাত্র বৈষ্ণব-কবি-চূড়ামণি রূপেই বিখ্যাত। বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় বিদ্যাপতি বিচিত্র ভাষারও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর রাধা-কৃষ্ণ-পদাবলী রচনার মাধ্যম মূল-ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিত-সমাজে বিতর্কের অবধি নেই,—তবে সে ভাষা যে বাংলা নয়,—এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। বিদ্যাপতি পণ্ডিত-ঐতিহাসিক হয়েও বাঙালির চোখে কেবলই কবি,—অ-বাংলা ভাষায় কবিতা লিখেও বাঙালিরই হৃদয়ের কবি,—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! এরূপ অবস্থায় মৈথিলকবি বিদ্যাপতির 'পরে বাঙালির দাবির সংগতি সম্বন্ধে সহজেই সংশয় জাগে।

মিথিল কবি বিদ্যাপতির 'পরে বাঙালির দাবি

এই সংশয় নিরসনের সার্থক চেষ্টা করেছেন ৺রামগতি ন্যায়রত্ন—"বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আমরা বাংলার প্রাচীন কবিশ্রেণিভুক্ত বলিয়া দাবি করিতে ছাড়িব না; যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশে এখনকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে অনেক মৈথিল ছাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতেন এবং এতদ্দেশীয় অনেক ছাত্র মিথিলায় যাইয়া পাঠ সমাপন করিয়া আসিতেন।.........অনেকের মতে বাংলার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্ন রাজ্য ছিল, এবং সম্ভবতঃ উভয় দেশের ভাষাও অনেকাংশে একবিধ ছিল ;...অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলায় এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হইতেছে, তখন যে কবি কবিজয়দেবের প্রণীত 'গীতগোবিন্দের' অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক

সংগীত রচনা করিয়াছিলেন, - যে সকল সংগীত বঙ্গদেশের ধর্ম-প্রবর্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরম ভক্তিভরে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুকাল হইতে সংকীর্তন করিয়া আসিতেছেন এবং যে সকল সংগীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারিব না'[১]। আবেগ-বাহুল্য থাকলেও, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমি এই উদ্ধৃতির মধ্যে সার্থক আভাসিত হয়েছে বলে মনে করি। বিদ্যাপতি-পদাবলীর মৌল রূপ-স্বভাব সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে মতভেদ রয়েছে। আপাততঃ সেই আলোচনা পরিহার করেও বলা চলে,— চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত হওয়ার ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে বিদ্যাপতি-পদাবলী বাংলাদেশে এক অ-পূর্ব রস-মর্যাদা লাভ করেছিল। বস্তুতঃ মৈথিল কবি-শ্রেষ্ঠের কাব্য-শাশ্বতির উৎস এই নূতন মর্যাদার মূলে নিহিত। শুধু তাই নয়, বিদ্যাপতি-পদাবলীর এই বিশেষ রস-মর্যাদা বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে ভাব-ভাষাগত এক নূতন রস-মান (aesthetic standard)-ও সৃষ্টি করেছিল। তারই ঐতিহ্য অনুসরণ করে অসংখ্য বাঙালি কবি-ভক্ত বৈষ্ণব কাব্য-রচনায় এক নূতন স্বরমূর্ছনার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। চৈতন্যোত্তর যুগের কবি-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস কবিরাজও ঐ একই ধারার অনুবর্তন করে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। ফল কথা, বিদ্যাপতি-পদাবলী এবং বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক পরস্পর-পরিপূরক।— বাঙালির রস-বাসনার সমর্থন পেয়ে বিদ্যাপতি-পদাবলী নব-মর্যাদা এবং স্থায়িত্ব লাভ করেছে। আবার, নবাদর্শ-মহিম বিদ্যাপতি-পদাবলী বাঙালির পদসাহিত্য-রচনায় নূতন প্রেরণা ও রস-সংস্কারের প্রবর্তন করেছে। অতএব, উভয়ের আলোচনা ব্যতিরেকে উভয়ের বিচারই অপূর্ণ ও অসার্থক।

কিন্তু, আলোচনার সূচনাতেই বিদ্যাপতির কাল-বিচার নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্য সবই নিতান্ত অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, এমন কি, কখনো কখনো পরস্পর-বিরোধী-ও। ফলে, অনুমানের 'পরে নির্ভর না করে বিদ্যাপতির জীবদ্দশা সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা অসম্ভব।

১। বাঙালা ভাষা ও বাঙালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

বিদ্যাপতি মিথিলার ব্রাহ্মণ-রাজবংশের একাধিক শাসনকর্তা, এমন কি তাঁদের পত্নীদের-ও অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রথমগ্রন্থ 'কীর্তিলতা' কীর্তিসিংহের রাজত্বকালেই রচিত হয়েছিল,—গ্রন্থের একাধিক ভণিতাংশ থেকে তা' প্রমাণিত হয়। কীর্তিসিংহের রাজত্বকাল চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষে হওয়াই সম্ভব। কীর্তিসিংহের পরে তাঁর পিতৃব্য-পুত্র দেবসিংহের রাজসভায় কবিকে দেখতে পাই; সেখানে তিনি 'ভূপরিক্রমা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তারপরে বিদ্যাপতি এসেছেন শিবসিংহের সভায়। তাঁর অধিকাংশ পদাবলী এখানেই রচিত। আর বিদ্যাপতির জীবৎকালের নির্দিষ্ট সন তারিখের প্রথম উল্লেখও পাওয়া যায় এই শিবসিংহেরই রাজত্বকালে। নানা সূত্র থেকে কবি-কীর্তির সংগে যুক্ত নিম্নলিখিত সন-তারিখ কয়টির সন্ধান পাওয়া গেছে:—

বিদ্যাপতির কাল-বিচার

১। ২৯১ লক্ষ্মণসংবৎ অর্থাৎ ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ শিবসিংহের শাসনাধীনে তীরভুক্তির অন্তর্গত গজরথপুর নগরে 'সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠক্কুর' বিদ্যাপতির আদেশে শ্রীদেবশর্মা ও শ্রীপ্রভাকর দুজনে মিলে কাব্য-প্রকাশের টীকার অনুলিপি করেছিলেন।

২। আরো দুবছর পরে, অর্থাৎ ২৯৩ ল-সং-এ রাজা শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতিকে বিসপী নামক একটি গ্রাম দান করেন। এ বিষয়ের একখানি দানপত্র প্রথম আবিষ্কার করেন ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পরে ডঃ গ্রীয়ার্সন প্রমাণ করেছেন,—দানপত্রখানি জাল। ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভূমিকায় এ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, "তাম্রলিপি জাল বলিলে এরূপ অর্থ হইতে পারে যে, শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে আদৌ গ্রাম দান করেন নাই; জাল দানপত্রের বলে বিদ্যাপতিঠাকুর ও তাঁহার বংশধরগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন অথবা বিদ্যাপতি স্বয়ং এমন কর্ম করেন নাই, তাঁহার বংশধরেরা এরূপ করিয়া আসিতেছিলেন। দলিল জাল করিয়া যে একখানা গ্রাম চুরি করা যায় এ' কথা কিছু নূতন রকমের;......প্রকৃত কথা এই যে, মূল দানপত্রখানি নাই, তাম্রলিপিখানি বিদ্যাপতির কোন বংশধর প্রস্তুত করাইয়া থাকিবেন।" এই মতবাদই এতদিন সাধারণ ভাবে গ্রাহ্য

হয়েছিল, কিন্তু অধুনা ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন,—দান-পত্রের ব্যাপারটি আগাগোড়া জাল[২]। এ সম্বন্ধে আর কোন তর্ক না করেও বলা চলে,—সংশয় যখন রয়েছে,—তখন এই তারিখটি প্রামাণ্য বলে গৃহীত হতে পারে না।

৩। বিদ্যাপতি-কৃত লিখনাবলী নামক সংস্কৃত পুথিতে ২৯৯ ল-সং অর্থাৎ ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের পৌনঃপৌনিক উল্লেখ রয়েছে।

৪। তাছাড়া "বিদ্যাপতি যে ৩৪১ লক্ষ্মণাব্দে (১৪৬০ খ্রীঃ) শুধু জীবিত নয়, সমর্থ ও অধ্যাপনারত ছিলেন তার স্বাধীন ও বলবৎ প্রমাণ মিলেছে। এই সালে, "মুড়িয়ারগ্রামে, এক পড়ুয়া ছাত্র শ্রীরূপধর হলায়ুধমিশ্রের ব্রাহ্মণসর্বস্ব নকল করে সদ্‌ব্রাহ্মণ শ্রীসোমশ্বরকে দিয়ে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছিলেন[৩]।"

৫। বিদ্যাপতি-কর্তৃক অনুলিখিত বলে কথিত একখানি ভাগবতপুথির লিপিকালকে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ গ্রীয়ার্সন ৩৪৯ ল-সং পড়েছিলেন। পরে ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পড়েছেন ৩০৯ ল-সং। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন,—যেহেতু রাজকৃষ্ণ ও গ্রীয়ার্সন পুথিখানি ৺নগেন্দ্র গুপ্তের পূর্বে দেখেছিলেন,—এবং তখন পুথিখানির লিপি উৎকৃষ্ট ও স্পষ্টতর থাকা স্বাভাবিক, সেইহেতু এই প্রসংগে ৩৪৯ ল-সং অর্থাৎ ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দই গ্রাহ্য[৪]। ডঃ সেনের বিচার যথার্থ হ'লে বিদ্যাপতির জীবন-সায়াহ্নের আর একটি বর্ষের হিসাব পাওয়া গেল।

বিদ্যাপতির জীবৎকাল

খুঁটিনাটি তারিখ বিষয়ক বিতর্কে আর না গিয়েও এবার বলা যেতে পারে,—চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধের কোনো সময়ে আবির্ভূত হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ-সপ্তম দশক পর্যন্ত কোনো সময়ে বিদ্যাপতি তিরোহিত হয়েছিলেন।

অতঃপর বিদ্যাপতির রচনা-পঞ্জীর উৎস-সন্ধান উপলক্ষ্যেও কবির পোষক মিথিলার রাজগোষ্ঠীর কুলপঞ্জীর অনুসরণ আরো একটু প্রয়োজন। হরগৌরী কিংবা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী ছাড়াও শিবসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠা ভাষায় কীর্তিপতাকা রচনা করেন। পুরুষপরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থও শিবসিংহের জীবদ্দশাতেই সূচিত হয়েছিল,—যদিও গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বেই শিবসিংহের তিরোভাব ঘটেছিল। নিঃসন্তান রাজার মৃত্যুর পর তাঁর অনুজ

২। বিদ্যাপতি গোষ্ঠী। ৩। ঐ। ৪। ঐ।

পদ্মসিংহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু রাজ্যশাসন করেছিলেন রাজ্ঞী বিশ্বাস দেবী। এই বিশ্বাস দেবীর আশ্রয়-পুষ্ট হয়েই পণ্ডিত বিদ্যাপতি দু'খানি সংস্কৃত গ্রন্থ গঙ্গাবাক্যাবলী ও শৈবসর্বস্বহার,—রচনা করেন। তারপরে বিদ্যাপতিকে দেখি নরসিংহদেবের সভায়। নরসিংহ ও রাজ্ঞী ধীরমতিদেবীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাপতি বিভাগ-সার, দানবাক্যাবলী ও দুর্গাপূজাতরঙ্গিনী রচনা করেন। এরপর বিদ্যাপতিকে প্রত্যক্ষভাবে আর কোন রাজসভায় দেখা যায় নি।

শেষ জীবন-পরিচয়

বিদ্যাপতির আবির্ভাব এবং অবস্থান বিষয়ক অপেক্ষাকৃত অপূর্ণ এই তথ্যাবলী আবিষ্কারের পরে এবারে সমস্যা তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে। বিদ্যাপতি মহারাজ গণেশ্বরের সুহৃদ্ গণপতি ঠাকুরের পুত্র ছিলেন, এই তথ্য সর্বজন-স্বীকৃত। গণপতি ঠাকুর তাঁর বহু-প্রশংসিত গ্রন্থ 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' মৃত সুহৃদের পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় উৎসর্গ করেন। তা'ছাড়াও পিতামহ-প্রপিতামহ নির্বিশেষেও বিদ্যাপতি ছিলেন পরমপণ্ডিত বংশের সন্তান। সমালোচকের ভাষায়,—"যে বংশে সরস্বতীর নিত্য অর্চনা হইত, পুরুষানুক্রমে বীণাপাণি বাগ্দেবীর সাধনা হইত, সেই বংশে সরস্বতীর এই বরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[৫]।" বিদ্যাপতির এই কুলপরিচয় সম্বন্ধে সংশয় নেই। যত বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে কেবল বিদ্যাপতির ধর্মমত নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে এই তর্ক অর্থহীন বলে মনে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই প্রশ্নের একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের 'পরে বিদ্যাপতি-পদাবলীর যুগ-যুগ-বিলম্বী মূল্যবোধের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভরশীল। পূর্বে বলেছি, চৈতন্যদেব-কর্তৃক আস্বাদিত হয়েই বিদ্যাপতি-পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এক নূতন মূল্যবোধে মহিমান্বিত হয়েছিল। সেই মূল্য-মান অনুসারে পদকর্তা বিদ্যাপতি একান্তভাবে 'বৈষ্ণব মহাজন', আর তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সংগীত অপরিহার্যরূপে বৈষ্ণব ভাবে বিমণ্ডিত।

কবির ব্যক্তি-পরিচয়

কিন্তু ইতিহাস এই সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সমর্থন করে না। তথ্যাদির দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে,—বংশানুক্রমে বিদ্যাপতি এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ যে রাজবংশের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন,—তাঁদের সকলেই পুরুষানুক্রমে ছিলেন শৈব। বংশপরম্পরায় বিদ্যাপতিও যে শৈব ছিলেন, তাতে সন্দেহ

৫। ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

নেই। এমন কি, 'বিসপী' গ্রামে কবির নিজের প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির না-কি আজও রয়েছে। কবির শ্মশান-ভূমিতেও শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। অতএব, সাধারণভাবে বিদ্যাপতি শৈব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। অবশ্য, ব্যাপকতর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখি,—বিদ্যাপতির বংশ ছিল স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশ।

বিদ্যাপতির ধর্মমত

কবি নিজেও যে একাধিক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, পূর্ববর্তী গ্রন্থপঞ্জী থেকে তা বোঝা যাবে। পৌরাণিক স্মার্ত-পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের মতই কবি একাধিক দেবদেবীর প্রতি নিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন।—কবি-লিখিত গ্রন্থাবলী থেকেও এই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। জন্মগত ঐতিহ্য-প্রভাবের ফলে হয়ত কবি শিব দেবতার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রতিও তাঁর যে বিরূপতা ছিল না, এ'কথা নিশ্চিত করে বলা চলে। শুধু তাই নয়, যখনই কবি যে দেবতার বর্ণনা করেছেন, নিষ্ঠাবান্ পৌরাণিক ব্রাহ্মণের মত তাঁকেই তখন সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাই, কোন রচনায় বিদ্যাপতি কোন দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন দেখে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, কবি বিশেষভাবে ঐ দেবতারই উপাসক ছিলেন। তাঁর ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য সাধারণভাবে অনুধাবনযোগ্য,—"তিনি (বিদ্যাপতি) মিথিলা, বাঙালা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন, অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন[৬]।" বিদ্যাপতি বিশেষভাবে এই পঞ্চদেবতারই উপাসনা করতেন কি না, সে কথা নিশ্চিত করে বলা চলে না বটে,—তবু সাধারণভাবে তিনি যে পৌরাণিক দেব-দেবীদের মাহাত্ম্যে আস্থাবান ছিলেন, এ'কথা নিশ্চিত। বিদ্যাপতির বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে ভক্তগণ বিশেষ করে তাঁর প্রার্থনা-পদাবলীর উল্লেখ করে থাকেন। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, শিল্পি-চিত্তের মুক্তিতেই শিল্পের সার্থক অভিব্যক্তি সম্ভব। আর, ঐ প্রার্থনা-পদাবলীর মধ্য দিয়েই বিদ্যাপতির ব্যক্তি-প্রাণের যে মুক্তি ঘটেছিল, এ সত্য অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অতএব, কবি-চেতনার একটি সহজ আকৃতি 'মাধব-মহিমা'র প্রতি

৬। কীর্তিলতা ভূমিকা।

স্বত-উৎসারিত হয়েছিল, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। কিন্তু একই সংগে একথাও স্বীকার করব যে, প্রার্থনা পর্যায়ের অতি অল্প সংখ্যক পদ-কয়টি থেকে বিদ্যাপতির অনন্য-চিত্ত বৈষ্ণবতাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় না।

যাইহোক, ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে এই সকল আনুমানিক বিতর্কের ক্ষেত্র অতিক্রম করে এসে তাঁর কবি-স্বরূপের উদ্ঘাটনও কম সঙ্কটজনক নয়। বিদ্যাপতির প্রতিভা লোক-বিশ্রুত মহিমায় মণ্ডিত হয়েছিল। ফলে, বহু 'মন্দ কবিযশঃপ্রার্থী' তাঁর ভণিতায় নিজ নিজ পদ চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন; এ কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। নিজ নিজ পালাগানের জনপ্রিয়তা বর্ধনের জন্য একাধিক কীর্তনীয়াও যে অপরের পদে বিদ্যাপতির নাম বা উপাধিযুক্ত ভণিতা সংযোগ করেছিলেন, তাও অসম্ভব নয়। এই সকল কারণে বিদ্যাপতির পদাবলী চয়নে সাবধানতা আবশ্যক। কিন্তু ৺নগেন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত পদাবলীতে সে সাবধানতা অবলম্বিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। বিদ্যাপতি-ভণিতা ব্যতীত নিছক কবি-কণ্ঠহার, কবি-বল্লভ, কবিশেখর ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদগুলোও নির্বিচারে উক্ত পদাবলী-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। ফলে, এমন বহু পদই বিদ্যাপতির নামে চলে গেছে, বস্তুতঃ যা' একেবারেই বিদ্যাপতির রচনা নয়। ডঃ সুকুমার সেন যুক্তি-বিচার-নির্ভর অনুমানের সাহায্যে একটি কবিপঞ্জী রচনা করেছেন, -যাঁদের রচনা বিদ্যাপতি-পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে[৭]। এঁদের মধ্যে 'বাঙালি-বিদ্যাপতি'ও ছিলেন একজন, —তিনি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন,— তাঁর উপাধি ছিল বিদ্যাপতি[৮]।

বিদ্যাপতির পদ-চয়নে সমস্যা

বিদ্যাপতি-পদাবলীর উৎস-বিচারের এই ত্রুটি সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা চলে, তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী;—আধুনিক কালের রবীন্দ্র-প্রতিভার সমকক্ষ যদি না'ও হয়, তবু ছিল অনেকটাই তার সমধর্মী। এবিষয়ে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক মন্তব্য স্মরণীয়,—"তাঁহার প্রতিভা যে খুব উজ্জ্বল ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। উহা যে সর্বতোমুখী ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি

৭। বিদ্যাপতিগোষ্ঠী দ্রষ্টব্য।
৮। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন।

যদি তাহার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মত স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী[১]।" এ মন্তব্য যে কত সার্থক, বিদ্যাপতির রচনাপঞ্জীর পুনরালোচনা থেকে তা স্পষ্ট হতে পারবে। তাঁর বিভাগসার, দানবাক্যাবলী পাণ্ডিত্য-বিচার সম্বলিত স্মৃতিগ্রন্থ ; - বর্ষক্রিয়া, গঙ্গাবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী পৌরাণিক হিন্দুর অপরিহার্য পূজা ও সাধনপদ্ধতির সঞ্চয়ন ; —কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা উৎকৃষ্ট ইতিহাসগ্রন্থ ; ভূপরিক্রমা ভৌগোলিকের তীর্থপরিক্রমা ;— পুরুষপরীক্ষা মনীষা ও শিল্প-কৃতির সমন্বয়-রূপ কথাসাহিত্য ; —লিখনাবলী অলংকারশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ। কিন্তু কেবলমাত্র বিচিত্র বিষয়ের অবতারণার মধ্যেই বিদ্যাপতি প্রতিভার সর্বতোমুখীনতার পরিচয় সীমাবদ্ধ নেই,—ভাষা-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিচিত্রকর্মা। মাতৃভাষা মৈথিল ছাড়া আর তিনটি ভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়।

বিদ্যাপতির রচনাপঞ্জী

১। বিদ্যাপতির স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং পুরুষপরীক্ষা সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

২। কীর্তিলতা এবং কীর্তিপতাকা অপভ্রংশজাত বিমিশ্র 'অবহট্‌ঠা' ভাষায় রচিত। সংস্কৃতভাষা ছেড়ে এই বিমিশ্র লোক ভাষায় গ্রন্থরচনার কারণ কবি নিজেই বর্ণনা করেছেন,—

বিদ্যাপতির রচনাবলীতে অবলম্বিত ভাষা-বৈচিত্র্য

"সক্কয়বাণী বুহঅন ভাবই।
পাঁউঅ-রসকো মম্ম ন পাবই॥
দেসিল বঅনা সবজন মিঠ্‌ঠা।
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহঠ্‌ঠা॥"—কীর্তিলতা

—"বুধজন সংস্কৃত ভাষা চিন্তা করেন ; প্রাকৃত রসের মর্ম পান না। দেশী বচন সকল জনের মিষ্ট, তাই সেই প্রকার অবহট্‌ঠা ভাষায় বলছি।"

নিজের মাতৃভাষা 'মৈথিল'-এ লেখা বিদ্যাপতির হরগৌরী বিষয়ক পদাবলী ছাড়াও কিছুসংখ্যক রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীও পাওয়া গেছে।

৩। কিন্তু বাংলা দেশে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বিখ্যাত বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভাষাই সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক। পূর্বে বলেছি, মিথিলা থেকে

১। কীর্তিলতার ভূমিকা।

মূল মৈথিল ভাষায় লেখা বিদ্যাপতির কিছু সংখ্যক রাধাকৃষ্ণ-পদ আবিষ্কৃত হয়েছে ;—আবিষ্কর্তা ছিলেন ডঃ গ্রীয়ার্সন। কিন্তু বাংলা দেশে বিদ্যাপতির অনুরূপ যত পদ পাওয়া গেছে, তার সব কয়টিই বাংলা-মৈথিল-অবহট্‌ঠা বিমিশ্র কৃত্রিম ভাষায় রচিত। পরবর্তী কালে এই ভাষাকে 'ব্রজবুলি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'ব্রজবুলি' ব্রজের বুলি বা ভাষা নয়,—বস্তুতঃ এ ভাষা কোন কালের কোন জাতিরই কথ্য বা লিখ্য ভাষা ছিল না। বাংলা-মৈথিল-অবহট্‌ঠাদি মিশ্রিত এই কৃত্রিম কাব্যিক ভাষার মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা উৎকৃষ্ট সাংগীতিক অভিব্যক্তি পেয়েছে বলে এই ভাষার নাম ব্রজবুলি। কিন্তু এই ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস এবং বিদ্যাপতি কর্তৃক এই ভাষাতেই পদ-রচনার যথার্থতা বিষয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের শেষ নেই। এ সম্বন্ধে প্রথম আলোচকদের মনোভাব সুষ্ঠু প্রকাশ পেয়েছে ৺নগেন্দ্র গুপ্তের উক্তিতে,—"বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিলিতেই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে ঐগুলি বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া বাংলা ভাষার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ বিকৃত রূপই ব্রজবুলি নামে পদ রচনার ভাষারূপে চলিয়াছে।"[১০] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও এই মত সমর্থন করে বলেছেন,—বিদ্যাপতিপদাবলীর মূল মৈথিল ভাষাকে "আমরা ভাঙিয়া-চুরিয়া গড়িয়া-পিটিয়া একপ্রকার করিয়া লইয়াছি।"[১১] এঁদের মতবাদের পেছনে ডঃ গ্রীয়ার্সন-কর্তৃক আবিষ্কৃত মৈথিল পদগুলিই প্রধান যুক্তি। কিন্তু এই অনুমান-নির্ভর যুক্তি-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সমর্থনীয় বলে মনে হয় না। কারণ :—

ব্রজবুলি ভাষার স্বরূপ-পরিচয়

(১) বিদ্যাপতি-লিখিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ মৈথিল ভাষায় পাওয়া গেলেও, তাদের সংখ্যা আজও অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া, কাব্য-বিচারেও ঐ পদগুলি নিকৃষ্টতর।

(২) বিদ্যাপতি কর্তৃক মৈথিল ভাষায় লিখিত পদগুলিই বাঙালির অজ্ঞানতা এবং অসাবধানতা-হেতু রূপ-বিকার লাভ করেছে,—এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লে দেখা যাবে, ঐ বিকৃত-রূপ পদগুলিই মূল মৈথিলপদের তুলনায় কাব্যহিসাবে অনেক উৎকৃষ্ট। কবির মৌলিক রচনা অজ্ঞানতাজনিত রূপ-

১০। নগেন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভূমিকা।
১১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

বিকারের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করেছে,—এরূপ সিদ্ধান্ত বিদ্যাপতির প্রতি সুবিচারের পরিচায়ক নয়।

(৩) বহুভাষা-বিদ্ শিল্পী বিদ্যাপতির পক্ষে অবহট্‌ঠার মত আরো একটি বিমিশ্র ভাষা-সৃষ্টি কিছুই আশ্চর্যজনক নয়। ভাষা যে মূলতঃ ভাবেরই বাহন,—আর ভাবই আসলে ভাষার জনয়িতা,—এ বিষয়ে পণ্ডিত-বিদ্যাপতির সচেতনতার প্রমাণ বিচিত্র ভাষায় রচিত তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি।

(৪) জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্তী যুগের কবি-শ্রেষ্ঠগণ বিদ্যাপতির ভাব-ভাষা অবলম্বন করে পদাবলী রচনা করেছিলেন যে, তার প্রমাণ রয়েছে। বিশেষভাবে বিদ্যাপতির আদর্শানুসরণের জন্যই গোবিন্দ-দাস-কবিরাজ 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যা লাভ করেছিলেন,—আর গোবিন্দ-দাস-কবিরাজ কেবল 'ব্রজবুলি' ভাষাতেই পদ-রচনা করে গেছেন। অব্যবহিত পরবর্তী শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেও বিদ্যাপতির মূল রচনার কাঠামোটুকু পর্যন্ত গোবিন্দদাস কিংবা অন্যান্য কবিকুলের জ্ঞানগোচর ছিল না,—এ অনুমান সহজগ্রাহ্য-নয়।

(৫) তা'ছাড়া, কেবল বঙ্গদেশেই নয়, উড়িষ্যা এবং সুদূর আসামেও বিদ্যাপতির সমসময়ে অথবা কিছু পরে ব্রজবুলির অনুরূপ ভাষায় পদ-রচনা যে করা হয়েছিল, তা'ও জানা গেছে। পূর্বাবধি একটি নির্দিষ্ট আদর্শ গড়ে উঠে না থাকলে একটি কৃত্রিম ভাষার পক্ষে এ-রকম সর্বজনীনতালাভ সম্ভব ছিল না।

বস্তুতঃ, আধুনিক কালের গবেষণায় ব্রজবুলির ভ্রান্তি-সম্ভবতার বিরুদ্ধে প্রমাণ না পেলেও সঙ্কেত পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন 'বিদ্যাপতিগোষ্ঠী' নামক গ্রন্থিকায় ব্রজবুলির প্রাচীন ঐতিহ্যের আলোচনা করেছেন। তাঁর ধারণা,—"মোরাঙ্-নেপালের রাজসভার আওতায়ই বাংলা-মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণে এবং অবহট্‌ঠের ঠাটে ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছিল[১২]।"

অবশ্য বিদ্যাপতি-রচিত পদাবলী সম্বন্ধে রাগ-তরঙ্গিণীর যে প্রমাণ ডঃ সেন উদ্ধার করেছেন,—তা'তে মনে হয়,—বিদ্যাপতি হয়ত মৈথিল ভাষাতেও কিছু পদ-রচনা করে থাকতে পারেন। রাগ-তরঙ্গিণীর উদ্ধৃতিতে—"মিথিলাপভ্রংশ ভাষয়া শ্রীবিদ্যাপতি নিবদ্ধাস্তাস্তা মৈথিলগীত" এর উল্লেখ

১২। বিদ্যাপতিগোষ্ঠী।

রয়েছে।[১৩] কিন্তু এই উল্লেখ থেকে বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় লিখিত পদাবলীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও, মৈথিল-মিশ্রিত অবহট্‌ঠার রূপ-বিশেষের মাধ্যমেও তাঁর পদ রচনার সম্ভাবনা অপ্রমাণিত হয় না। তা'ছাড়া রাগ-তরঙ্গিণীর "সংকলনকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদ, সম্ভবতঃ ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ[১৪]।" অথচ, জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস কবিরাজ দু'জনেই এর পূর্ববর্তীকালের কবি।—অতএব, এঁদের রচনার সাক্ষ্য এ বিষয়ে উপেক্ষণীয় হওয়া উচিত নয়।

দীর্ঘ যুক্তি-বিচারের শেষে অনুমান করা যেতে পারে,—বিদ্যাপতি-পদাবলীর মূলভাষার পরিবর্তন বাংলাদেশে কালে কালে খুবই হয়েছে। প্রাচীন বাংলা রচনা মাত্রেরই পক্ষে এই ভাষাগত পরিবর্তন অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা'হলেও, ব্রজবুলিভাষার একটি প্রাথমিক কাঠামোর মধ্যেই বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর মূল অংশ বিধৃত হয়েছিল, এমন কথা মনে করতে বাধা নেই। ব্রজবুলি নামক বিশেষ আঙ্গিক-গত অভিধা তখনও হয়ত ঐ ভাষার 'পরে আরোপিত হয় নি। তবু, মৈথিল-অপভ্রংশ এবং অন্যান্যভাষাদিবিমিশ্র অবহট্‌ঠারই একটি নূতনতর রূপে এই ভাষার পরিকল্পনা একেবারে অসঙ্গত নয়।—অবহট্‌ঠার মত এ-ও ত "দেসিল বঅনা সবজন মিঠ্‌ঠা!"

ঐতিহাসিক উপাদানের বিচারাগত এই সিদ্ধান্ত সাহিত্যিক অনুভূতির মধ্যেও সমর্থিত হয়ে থাকে বলে মনে করি। বিদ্যাপতি সকল ক্ষেত্রেই মিষ্ট বচন, তথা, ভাবের শ্রুতিমধুর উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন।—তাঁর রচনাবলী থেকে এই অনুমানের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। সংস্কৃত-মৈথিল-অবহট্‌ঠা নির্বিশেষে যে আধারের মধ্যে যে ভাব সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারে, বিদ্যাপতি তাকে সেই ভাষার আধারেই উপস্থিত করেছেন। এদিক থেকে মনে হয়, ব্রজবুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট আধার বুঝি বিদ্যাপতি-পদাবলীর আর কিছু হতে পারত না। আলংকারিক পরিভাষানুযায়ী রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা চিত্রণে বিদ্যাপতি বিশেষভাবে "সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গাররসের কবি[১৫]।" আর শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় বিদ্যাপতি প্রধানতঃ

বিদ্যাপতি-প্রকাশিত ভাব-বস্তুর উৎকৃষ্ট আধার ব্রজবুলি

১৩। বিদ্যাপতিগোষ্ঠী। ১৪। ঐ।

১৫। প্রাচীনবঙ্গসাহিত্য—কবিশেখর কালিদাস রায়।

জয়দেব-গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণই করেছিলেন যে,- তা'তে সন্দেহ নেই। —জয়দেবের মত বিদ্যাপতিও 'বিলাস-কলাকুতূহল' কবি,—তাই তিনি 'অভিনব-জয়দেব'। পরবর্তীকালে আরোপিত জয়দেব-পদাবলীর বৈষ্ণব-মূল্যায়নের তত্ত্বগত বিচার পরিহার করলে, নিছক সাহিত্যিক রস দৃষ্টিতে তাঁকে প্রেমের কলা-বিলাসের কবি বলে মনে করা যেতে পারে। গভীর হৃদয়াবেগ তথা করুণ প্রেমার্তি অপেক্ষা উজ্জ্বল প্রেমোচ্ছলতার প্রতিই জয়দেবের আকর্ষণ ছিল সমধিক। এদিক থেকে বিদ্যাপতি জয়দেবেরই সগোত্র। বিদ্যাপতির কাব্যের প্রেম-চিত্রের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কবি-চেতনার সাহায্যে উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি পেয়েছে। বিদ্যাপতি-কাব্যের প্রেমাধার রাধা সম্বন্ধে কবি বলেছেন, - "বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি।... আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন; কেবল উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতিসাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।......যৌবন, সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে,—তখন সকলই রহস্যপরিপূর্ণ।"[১৬] যৌবন-চেতনার এই অরুণাভাষ এবং তার প্রভাবিত সহজ কৌতুকোচ্ছলতাই বিদ্যাপতির রাধার চারপাশে একটা অনায়াস-রহস্যময়তার যবনিকা তুলে ধরেছে। এই যবনিকা যতই দীপ্ত,—আলোক-স্নাত হয়েছে, প্রেমের 'কলা-বিলাস' ততই হয়েছে বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক। অতএব, 'নবীনা-নবস্ফুটা' রাধার প্রথম প্রণয়ের চাঞ্চল্যকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলতেই বিদ্যাপতি-প্রতিভা হয়েছে নিমগ্ন।—এই কারণেই বাংলা-সাহিত্যের সৃজন-ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি বর্ণ-বৈচিত্র্যের সুষমাময় রূপ-শিল্পী,—সার্থক রূপ-কার। "এই জন্য ছন্দ, সংগীত এবং বিচিত্র রংএ বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য-সুখ-সম্ভোগের এমন তরঙ্গ লীলা।"[১৭] দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে,—

বিদ্যাপতির রাধা

১৬। আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ। ১৭। ঐ।

খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসন-ধূলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দসন ছটাছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চউকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয়-মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দ-এ খনে হোয় ভোর॥
বালা সৈসব তারুন ভেট।
লখএ ন পারিঅ জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বর কান।
তরুনিম সৈসব চিহ্নই ন জান॥

তরঙ্গ-লীলায়িত প্রেমের এরূপ উল্লাসময়চিত্র কল্পনাকে উচ্চকিত করে তোলে। আর, এই উল্লাস,—এই তরঙ্গ-লীলা-চাঞ্চল্য,—এই বিলাস-কলা-কুতূহলের উদ্ভাবনে বিদ্যাপতির অপূর্ব শব্দ ও অর্থালংকার-চিত্র,—ছন্দের নৃত্যঝঙ্কার,—কেবল সার্থক পরিবেশই সৃষ্টি করে নি,—বস্তুতঃ তা'কে করেছে আবিষ্কার। এখানেই বিদ্যাপতি-পদাবলীর রচনায় ব্রজবুলি-রূপ ভাষা-বাহন অপরিহার্য ছিল বলে মনে করি। এমন কি বেদনার্তি-পূর্ণ 'বিরহের' পদেও এই উক্তির সার্থকতা অনুভূত হতে পারবে,—

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিম-সিখর সিধারল
পিয়া নিজ দেশ ন আওইরে॥
চনন চান তন অধিক উতাপএ;
উপবন অলি উতরোল রে॥
সময় বসন্ত কন্ত রহু দূর দেস
জানল বিহি প্রতিকূলরে॥

আনমিখ নয়ন নাহ মুখ নিরখইত
তিরপিত ন ভেল নয়ান রে ॥
ই সুখ সময় সহএ এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ রে ॥
দিন দিন খিন তনু কমলিনি জানি
ন জানি কি জিব পরজন্ত রে ॥
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুন কন্ত রে ॥

ছন্দ-বর্ণ-ভাব-রূপ সুষমার এ এক অপরূপ বৈচিত্র্য,—বেদনাক্ষেপেরও এক মধু-মদির প্রকাশ। সৌন্দর্যের এই মদিরসুষমা,—ব্রজবুলি ছাড়া অপর আধারে কল্পনাতীত বলে মনে হয়! হতে পারে,—মূলতঃ এ ভাষা অবহট্‌ঠার রূপান্তর।—কিন্তু যে অবহট্‌ঠায় কীর্তিলতা লিখিত হয়েছে দেখতে পাই,—এ সে অবহট্‌ঠা কিছুতেই নয়। ইতিহাসের ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষায় যে পার্থক্য,—এদের মধ্যেও পার্থক্য সেই একই প্রকারের। এইখানেই বিদ্যাপতি স্রষ্টা,—'রূপদক্ষ', কেবল ভাবের নয়, ভাষারও।

বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভাষাসম্বন্ধীয় আলোচনা এখানেই শেষ করব। এই আলোচনা ইতিহাসের পাঠককে কোনো সিদ্ধান্ত না হোক্, অনুমানের সার্থক সংকেতও যদি যোগায়, তা'হলেই যথেষ্ট। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভাব-সৌন্দর্যের যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তার পরিচয় লক্ষিতব্য। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা-চিত্রণে বিদ্যাপতি রূপ-শিল্পীই নন কেবল, রূপ-মুগ্ধতার কবি। এই রূপ-সায়রে ডুব যে দিয়েছে,—সে অরূপকেও ভুলেছে। কিন্তু সেজন্য চিত্তের আক্ষেপ থাকে না মোটই। অরূপের মধ্যে নয়, বিদ্যাপতি রূপের মাধ্যমেই অপরূপের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছেন। কৃষ্ণ-বিরহার্তা রাধার আক্ষেপ-বাণী থেকে আবার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করি :—

বিদ্যাপতি কেবল রূপ-শিল্পীই নন্,—রূপমুগ্ধতার কবি

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল ॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিলোল ॥

স্থন ভেল মন্দির স্থন ভেল নগরী।
স্থন ভেল দসদিস স্থন ভেল সগরী॥"

শূন্যহৃদয়ের শূন্যতাবোধের এ-এক বিস্ময়কর অনুভূতি,—চারিদিকে নিঃসীম শূন্যতা কেবল থমথম্ করছে না,—আছড়ে পড়ছে যেন। কিন্তু এ শূন্যতা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি যত, তার চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করি চোখ দিয়ে। অনুভূতির এই রূপময়তা,—এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রায়ণ,—এইটুকুই বিদ্যাপতি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তাই বলছিলাম, বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-জগতে রূপদক্ষ শিল্পী,—তুলি হাতে বসে ছবি এঁকেছেন কেবলই। প্রাণের সংস্পর্শে আসবার আগেই সে ছবি চোখকে,—কেবল চোখ নয়, প্রাণকেও অভিভূত করেছে। আর একটি দৃষ্টান্ত দেব,—বিদ্যাপতির বিখ্যাত ভাবোল্লাসের পদ থেকে,—

"সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ বখানি এ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুবোল শ্রবণহি স্থনল
শ্রুতিপথ পরস ন ভেল॥
কত মধু জামিনি রভস গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তই হিয় জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রস আমোদঈ
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ-জুড়াএত
লাখে না মিলল এক॥"

'অননুভবনীয়'কে কবি এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্ররূপ দান করেছেন।—বিদ্যাপতি এমনি এক চিত্রকর;—প্রেমের প্রাণ-রস-প্রোজ্জ্বল ছবি আঁকাই তাঁর ধর্ম।

এই উপলক্ষ্যে মৈথিল-কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের পার্থক্যের কথা মনে আসে। চণ্ডীদাসের সাহিত্যের,—সে কৃষ্ণকীর্তন কিংবা পদাবলী, যাই হোক,—যে আলোচনা পূর্বে করেছি, তা'তে এই সত্যই প্রতীয়মান হয়েছে যে, সকল রকমের পূর্ব-সংস্কার মুক্ত অনুভূতি-নিবিড়তাই চণ্ডীদাসের রচনার প্রধান সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। সন্দেহ নেই, কৃষ্ণকীর্তনে পৌরাণিক চেতনার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা কবি করেছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, একদিকে সেই চেষ্টার ব্যর্থতা এবং অপরদিকে কবির গভীর জীবন-রস-তন্ময়তা কৃষ্ণকীর্তনকে রুচিমান সমাজে অপাংক্তেয় করেও শাশ্বত কাব্যমূল্যে করেছে সমুদ্ভাসিত। কিন্তু, বিদ্যাপতির সাহিত্যে অনুভূতির এই নিবিড়তা অপেক্ষা বর্ণাঢ্য বিচিত্রতাই যেন সমাধিক। চণ্ডীদাসের গ্রাম্য সংগীত একতারার সুরে ঝঙ্কৃত হয়েছে, বিচ্যুতি এবং একঘেয়েমি সত্ত্বেও তা অনুভূতির প্রাণস্পর্শে নিয়ত-সঞ্জীবিত। বিদ্যাপতির সংগীত 'কলাবিদ্',—কালওয়াতের হাতের বিচিত্র-তন্ত্রী সুর-যন্ত্র। মুগ্ধ, আবিষ্ট, অভিভূত যত করে, তত যেন সমাহিত করে না। তা'র কারণ,—মনে হয়,—বিদ্যাপতির সৃজন-পরিবেশের বিভিন্নতা। পূর্ববর্তী আলোচনায় একাধিকবার ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত উদ্ধার করেছি,—রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সাধনা মূলতঃ বাংলার লোকজীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল দীর্ঘদিন। বিশেষভাবে চৈতন্যদেবের জীবন-বাণীর দ্বারাই এই প্রেম-সাধনা সর্বজনীন জীবন-উপাসনার উপাদান হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়গাথা তার আগেই অভিজাত সমাজে সাহিত্যের,—আদিরসাত্মক সাহিত্যের সামগ্রীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বারে বারে বলেছি, লোক-কথার এই স্বীকৃতি-বিধানে জয়দেব গোস্বামী ছিলেন কবি-কুলপতি। কিন্তু তাঁর পৌরাণিক সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ কবিমানস অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোক-সমাজের নিষ্ঠা-বিশ্বাসের দ্বারা ঐ লৌকিক লীলা-কথার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত হয়েছিল না। তাই, লোকগাথার জীবন-বাচ্যের সঙ্গে আন্তরিক সংযোগের অভাবের ফলে পণ্ডিত-কবির রচনায় সেই গ্রাম্য মেঠো সুরটি আর শুনতে পাই না—তা'র পরিবর্তে শুনি 'মেঘমেদুর-অম্বরের' সংস্কৃত-অলংকার-শাস্ত্র-নিস্যন্দী ঘনগম্ভীর ধ্বনি। এতে কাব্যের কাব্যত্ব নষ্ট হয় নি,—কিন্তু স্বাদের তারতম্য ঘটেছে। বিদ্যাপতি সম্বন্ধেও একই কথা বক্তব্য। বার বার বিদ্যাপতিকে জয়দেবের স-গোত্র কবি বলে উল্লেখ

করে আস্‌ছি। জয়দেব যেমন দেব ভাষায় লোক-কথাকে আভিজাত্য দান করেছিলেন, তেমনি বিদ্যাপতিই অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে এই লোকগাথাকে লৌকিক ভাষার মাধ্যমে প্রথম প্রকাশ করলেন। এঁদের রচনার আধার ভাষা পৃথক্ হলেও, আধেয় কবি-মানস-সংগঠন ছিল এক এবং অভিন্ন। তাই, বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ পদাবলীও যত না অনুভূতি-ঘন, তার চেয়ে বেশি অলঙ্কার-সমৃদ্ধ, সংস্কৃত-সাহিত্য-প্রভাবিত উজ্জ্বলতায় বর্ণাঢ্য। তাহলেও, জয়দেব এবং বিদ্যাপতি উভয়ের ক্ষেত্রেই রূপ-সমৃদ্ধি কিংবা সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের অনুসরণ কাব্যগুণের পক্ষে প্রাণান্তকর হয়নি। কারণ, জয়দেব-বিদ্যাপতিও তাঁদের নিজ নিজ জীবন-স্বভাবের অনুধ্যানে ছিলেন একান্ত সত্যনিষ্ঠ। চণ্ডীদাসের মত জয়দেব কিংবা বিদ্যাপতির জীবন-পরিবেশ ভাব-সুনিবিড় ছিল না;—রাজসভার নাগর-জীবন ছিল বর্ণাঢ্য, চাঞ্চল্য-দীপ্ত, উল্লাস-রস-প্রোজ্জ্বল। লক্ষ্মণসেন-রাজসভার এই উজ্জ্বল-রসাশক্তির পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমাজে প্রায় দ্বিমত নেই। বিদ্যাপতির পরিবেশও যে সমধর্মী ছিল,—আর অনুরূপ জীবনের প্রতি কবি-মানসের যে স্বাভাবিক প্রবণতাও ছিল,—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই কীর্তিলতায়,—পরোক্ষ প্রমাণ বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ পদাবলী। জৌনপুরের নাগরিক জীবনের বর্ণনায় ঐতিহাসিক-বিদ্যাপতি বিমুগ্ধচিত্ত কবি-বিদ্যাপতির হাতে লেখনী তুলে দিয়েছেন,—কবি তন্ময় হয়েছেন নাগর-নাগরীর লাসবেশ-দীপ্ত জীবনের বর্ণনায়। এই নাগর জীবনরস-তন্ময়তাই প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী-রচনার পটভূমিকা সৃষ্টি করেছিল। সেই পরিবেশে,—সেই প্রেমে জীবনের নয়নমন-বিমোহী বর্ণচ্ছটার যে বৈচিত্র্য প্রতি মুহূর্তেই উৎক্ষিপ্ত,—বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তাকেই সংহত, সমৃদ্ধ করে প্রেমের সপ্তবর্ণী রামধনু রচনা করেছেন কবি-বিদ্যাপতি। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাই বিদ্যাপতি ভাব-নিবিড়তার নয়,—বর্ণ-সুষমার, রূপ-বৈচিত্র্যের, উজ্জ্বলরস-তন্ময়তার কবি।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি

কিন্তু, এই প্রসংগ-সমাপ্তির পূর্বে একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই। দীর্ঘদিনব্যাপী ভক্তি-রস-তন্ময় সাহিত্যানুসন্ধিৎসার ফলে বিদ্যাপতির পদাবলী যে বৈষ্ণব ঐতিহ্য লাভ করেছে,—যে-বিশেষ ঐতিহ্য প্রধানতঃ কালের গ্রাস থেকে এই রস-সমৃদ্ধ সাহিত্যকে রক্ষা করে এসেছে, তাকে উপেক্ষা

করবার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। তাহলেও, একমাত্র রসাস্বাদন-পদ্ধতির ঐতিহ্য-নির্ভর ইতিহাস-আলোচনার স্তর বাংলাসাহিত্য অতদিনে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে করি। সৃষ্টির যথার্থ উৎস এবং পরিবেশ সম্বন্ধে প্রমাণ-নির্ভর তথ্যের সংস্কার-মুক্ত বিচারের 'পরেই সাহিত্যের ইতিহাসের ভিত্তি এবারে রচিত হওয়া উচিত। এদিক থেকে এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের যে বিচার ওপরে করা হয়েছে, তাতে বিদ্যাপতির স্মার্তপাণ্ডিত্য এবং পৌরাণিক-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের ওপরে তাঁর অবিমিশ্র বৈষ্ণবতা প্রমাণিত হয় না। তাই, এ কথা বলা চলে, বিদ্যাপতি-রচিত রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী মৌল স্বভাবে একান্ত বৈষ্ণব-গীতিই হয়ত ছিল না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, প্রেমের একটি জীবন্তসত্য-রূপ বিদ্যাপতি-পদাবলীতে মূর্তিমান হয়েছে। সেই প্রেম-সত্যের ভিত্তি নিছক ব্যক্তিগত আসক্তির উর্ধ্বে, সর্বজনীন অনুভূতি-লোকে প্রতিষ্ঠিত হবার দাবি রাখে। সর্বজনীন, শাশ্বত প্রেমের পূজারী মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভাব-তন্ময়তার মধ্যে বিদ্যাপতি-পদাবলীর এই সাধারণ দাবি বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এই স্বীকৃতির মধ্যেই,—স্রষ্টার হৃদয়ে নয়,—বিদ্যাপতি-পদাবলীর বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের প্রথম বিকাশ। এই বিচারে বিদ্যাপতি-পদাবলীর সাহিত্যিক, কিংবা বৈষ্ণব-ঐতিহ্যগত, কোন মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হয় বলে মনে করি না। বস্তুতঃ, গভীর আত্মানুভূতি এবং ভাগবত-অনুভূতিতে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আত্মানুভূতির চরম পর্যায়ে তার ব্যক্তি-সম্পর্ক-বিচ্যুতি,—তথা নিরাসক্তি ঘটলেই তা সর্বজনীন ভাগবত-উপলব্ধির আকর হয়ে ওঠে। এই অর্থেই উপনিষদের ঋষি ব্রহ্ম-বোধ ও আত্ম-বোধকে সমপর্যায়-ভুক্ত করেছেন। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রেমানুভূতির তন্ময়তা-জনিত এই নৈর্ব্যক্তিকতা সর্বজনীনতার যে সম্ভাব্য পটভূমিকা রচনা করেছিল,—চৈতন্য-জীবানুভূতির স্পর্শে তা ভাগবত-মহিমা লাভে ধন্য হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা আমাদের মূল প্রতিপাদ্য স্পষ্টতর রূপে প্রমাণিত হয়ে থাকে;—চৈতন্যদেব কাব্য-কবিতার রচয়িতা না হলেও বিশেষরূপ কাব্য-রস-বোধের—সাহিত্য সংস্কৃতির যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ। মহাকবি বিদ্যাপতির রচনা সেই মহত্ত্বের স্পর্শে নূতন মর্যাদায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

বিদ্যাপতির কাব্যে বৈষ্ণব রস-মূল্যের স্বরূপ

চতুর্দশ অধ্যায়

'মঙ্গল-সাহিত্য'

মঙ্গলসাহিত্য, - তথা মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত রচনাবলী মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য-ইতিহাসের এক অপূর্ব সম্পদ। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা একাধিক প্রভাবে পুষ্ট। এই বিচারে মঙ্গলকাব্য-গ্রন্থাবলীকে বাংলার মাটির সম্পদ (A product of the soil) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ফলে আলোচ্য শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ বাংলার লোক-জীবনের জন্ম ও বিবর্তন ধারার সংগে ওতপ্রোত জড়িত হয়ে পড়েছে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন,— "খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ একপ্রকার সাম্প্রদায়িক (sectarian) সাহিত্য প্রচলিত ছিল,— তাহাই বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।"[১]

'মঙ্গলকাব্য' বাংলা মাটির সম্পদ্

সকল বিষয়েরই দেশ কাল-পাত্রানুগত অব্যবহিত তথ্য বিচার ঐতিহাসিকের প্রধান অবলম্বন। এই কারণে অনুরূপ সিদ্ধান্তও তাঁর পক্ষে অপরিহার্য;—বস্তুতঃ বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রসার এবং প্রতিপত্তি এই কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু জীবন-উৎসের সাময়িক বিচার,—সে যতই ব্যাপক হোক,—সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই, বাঙালি জন-জীবন-সম্ভব মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ নির্ধারণেও এই কাল-চিহ্ন সাধারণ ভাবেই গ্রাহ্য,—সর্বাত্মক ভাবে নয়। বিংশ শতাব্দীতেও মঙ্গলকাব্য,— মনসামঙ্গল-কাব্য যে রচিত হয়েছে তার প্রমাণ আছে। তেমনি, অপর সীমায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বেও অপূর্ণ ভাবে হলেও এই শ্রেণীর কাব্য-কথা যে বিদ্যমান ছিল, এমন অনুমানের সমর্থন রয়েছে। ফলে, আলোচ্য সাহিত্যধারার একটি আনুপূর্বিক পরিচয় অবধারণার জন্য সাধারণভাবে বাঙালি জীবনের হিসাব নিকাশ প্রয়োজন।

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত।

'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি'র ইতিহাস বিচার প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,—"বাংলাদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রথম আলোকরশ্মি পড়তে শুরু হয়েছে উত্তর-পশ্চিম থেকে আর্যদের আগমনের ও বসতি-স্থাপনের পর হতে। তার পূর্বে এদেশে দ্রাবিড়, মঙ্গল, কোল প্রভৃতি যে-সব অনার্য জাতির বাস ছিল, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইসারা পাই শুধু কতকগুলি স্থানের নাম এবং কয়েকটি চলিত শব্দে।"[২] বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-উৎস ঐ "ইসারা"ময় যুগে নিবদ্ধ। ফলে তার জন্মলগ্ন সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তা হলেও, যতটুকু অনুমান করা গেছে, তাতে বোঝা যায়, বাংলা দেশ আর্যাধিকারভুক্ত হওয়ার আগেই এখানকার আদিম জনসাধারণ নিজ নিজ চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাত্রা পদ্ধতির অন্যান্য উপাদানের পূর্ণায়ত পরিকল্পনা করতে পেরেছিল। বলা বাহুল্য, ধর্মাদর্শ এবং দেবদেবীগণের পরিকল্পনাও তার থেকে বাদ পড়ে নি। অবশ্য, আধুনিক যুগের বিচারে ঐ সকল সংস্কার এবং পরিকল্পনা অদ্ভুত বলে মনে হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। পরবর্তীকালে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাধ্যমে আর্য-সম্পর্কের ফলে অনার্য লোক-সমাজের ঐ সব আদিম দেব-পরিকল্পনা ও ধর্ম-সংস্কার ভাব-রূপে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার মূল-কাঠামোটি কখনো সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয় নি। লক্ষ্য করা উচিত,—উচ্চশ্রেণীর অনার্যগণ ভারতবর্ষের সর্বত্রই আর্যসমাজের আভিজাত্যের অঙ্গীভূত হয়েছিলেন,—আর এই সাঙ্গীকরণ পৌরাণিক যুগেই প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছিল। কিন্তু বর্তমান উপলক্ষ্যে সে আলোচনা প্রাসংগিক নয়। তখনও যে লোক-সমাজ প্রাচীন আর্যীকরণ-পদ্ধতির বাইরে থেকে গিয়েছিল, বিশেষ করে তাদের ঐতিহ্যই আমাদের আলোচ্য। মনে করা যেতে পারে,—প্রাচীনতম কাল থেকেই বাংলার লোক-সাধারণ তাদের নিজস্ব আদর্শানুযায়ী এই লৌকিক দেবতাদের পূজা-পদ্ধতি ও মহিমাখ্যাপক কাহিনী রচনা করেছিল। বলাবাহুল্য, সেই পূজা-পদ্ধতি এবং মহিমা-বোধ প্রকাশের ভাব এবং ভাষা দুই'ই কালের অগ্রগতির সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। এই ভাবে, অনুমান করতে বাধা নেই,—বাংলা ভাষা-সাহিত্যের আদিযুগে অসম্পূর্ণ ভাষায়, অ-গঠিত কাব্যে,—ঐ সকল লৌকিক দেব-দেবীগণের মহিমাগাথা পাঁচালীর

২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি—ডঃ সুকুমার সেন।

আকারে রচিত হয়েছিল। আর, পণ্ডিতগণ মনে করে থাকেন,—পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর যুগ-প্লাবী প্রয়োজনের প্রভাবে, এই পাঁচালী-কাব্য পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের আকার ধারণ করেছে। কিন্তু পাঁচালীর উৎস থেকে মঙ্গলকাব্য-রূপের বিকাশের ইতিহাস আবিষ্কারের জন্য আলোচ্য সাহিত্যের ঊষা-লগ্নে লোক-জীবন-স্বভাবের আদিম পরিচয় উদ্ধার প্রয়োজন। অবশ্য, যথোচিত তথ্যের অভাবে এই পরিচায়নে অনেকটাই যুক্তি-সিদ্ধ অনুমানের 'পরে নির্ভর করতে হবে।

মঙ্গলকাব্য,—লৌকিক ধর্ম-চেতনা বিকাশের ফল

নানারূপ আর্য-প্রভাবের দ্বারা বাংলার লোক-জীবনের ধর্ম ও দেব-বন্দনার পদ্ধতি বারে বারে প্রভাবিত,—বিবর্তিত হয়েছিল বলে পূর্বে অনুমান করেছি। কিন্তু, এই প্রভাব-পরিবর্তনের ধারা আকস্মিক বা যথেচ্ছ ছিল বলে মনে করা চলে না। প্রথমেই জৈনধর্ম এবং তার প্রায় সমসময়ে, বৌদ্ধধর্ম এ দেশে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল বলে অনুমিত হয়। আর্য্য-গোষ্ঠি-সম্ভব হলেও ঐ ধর্মমত-দুটি প্রথম থেকেই বৈদিক আর্যাচার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কারের আমূল বিরুদ্ধাচারী ছিল। হয়ত অনেকটা এই কারণেই জৈন-বৌদ্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে অনার্য আদিম বাঙালি-সমাজের আত্মার সংযোগ-সাধন অনায়াস-লব্ধ হয়েছিল। তা'ছাড়া, ঐ ধর্মাচার দু'টির, বিশেষ করে বৌদ্ধ-ধর্মের লোকমুখীনতা তাদের আচার-আচরণকে বহুল পরিমাণে লোক-প্রিয় করে তুলেছিল। ফলে, লৌকিক ধর্মাচরণে বৌদ্ধ-প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করে। বৈদিক আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে। তা ছাড়া, আপন স্বরূপে আর্য-ব্রাহ্মণ্যধর্ম-সংস্কার ছিল লোক-বিমুখ। প্রধানতঃ রাজশক্তির পরি-পোষকতায় অভিজাত সমাজের মধ্যেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাচারের প্রতাপ ও মহিমা সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ সেন-রাজ-সভার বিদগ্ধ পটভূমিকায় বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-সংস্কারের সার্থক অভ্যুত্থান ও বহুল বিস্তার ঘটেছিল। অন্যদিকে, ঐ সময়েই জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের স্বল্পাবশেষ লোক-জীবনের সহজিয়া-সাধনার তলায় এসে আত্মগোপন করেছিল, সে কথা পূর্বের আলোচনায়ও লক্ষ্য করেছি। সমাজ ও ধর্মজীবনের এই অবস্থায় বাংলা দেশে তুর্কী আক্রমণ সংঘটিত হয়। বার বার বলেছি, সমাজের উচ্চশ্রেণীর

মঙ্গল কাব্যোদ্ভবের মূলবর্তী লোকধর্ম-বিবর্তনের ইতিহাস

নৈতিক মেরুদণ্ডও সেই চরম মুহূর্তে ভঙ্গুর হয়েছিল,—আর তার ফলেই ঘটে বাংলার পরাভব। পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি না করেও বলা চলে,—কেবল রাষ্ট্রিক পরাজয় নয়, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি,—সর্বোপরি ধর্মনীতি এবং যুগ-যুগ-বিলম্বী আচার-আচরণ-ঐতিহ্যের সর্বাত্মক পরাভব-হেতু উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাঙালি সমাজের পুনর্গঠনের প্রয়োজন তখন অ-পরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আর, ঐ সংকটলগ্নে সর্বাধিক পরাভব ঘটেছিল আপামর বাঙালির নৈতিক শক্তি ও বুদ্ধির। ফলে, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাঙালি জাতি সেদিন আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়েছিল,—নিতান্ত অসহায়ের মত হয়েছিল দুর্বলের একমাত্র আশ্রয় দৈবী-শক্তির দ্বারস্থ। এদিক থেকে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাঙালিজাতি সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী হ'তে পেরেছিল। অন্যদিকে তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জন-জীবনেও বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের সর্বশেষ প্রভাব লুপ্ত হয়েছিল। চারদিকের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে বাঙালি-সাধারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল,—বিশ্ব-সংসার কেবলই 'শূন্য' নয়,—এখানে ভয় আছে, বিপদ আছে, আঘাত আছে ;—'শূন্য' বললেই এ-সব কিছু 'শূন্য' হয়ে যায় না। তাই, মোহ-মুদ্গরাহত জাতি পুরাতন নেতিবাদী ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে, নূতন ধর্মাদর্শের শরণ-ভিক্ষা করেছে। এখানে ধর্মের কাছে,—আরাধ্য দেবতার কাছে দুর্বলের সহস্র প্রার্থনা,—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক আদর্শ-সম্ভূত দেব-দেবীগণের দ্বারে জনসাধারণের পক্ষে এই আশ্রয়লাভ সম্ভব ছিল। অন্যদিকে সদ্যো-বিলুপ্ত-আভিজাত্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষেও আত্মপ্রসারের জন্য লোকাশ্রয় কামনা অপরিহার্য হয়েছিল। দীর্ঘদিন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে আভিজাত্য অর্জন করেছিল,—মূলশক্তির ভিত্তি-চ্যুত হয়ে তুর্কী আক্রমণোত্তর যুগে তা ত্রিশঙ্কুর অবস্থা-সঙ্কট প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের কর্ণধারগণ উপলব্ধি করেছিলেন,—এবারে গণ-শক্তির 'পরে নির্ভর করতে না পারলে আত্মরক্ষা অসম্ভব। তাই, বাধ্য হয়ে তাঁরা লোকজীবনের সাধারণ সংস্কার, তাদের ধর্মবিশ্বাস, এমন কি তাদের দেবদেবীকে পর্যন্ত গ্রহণ করে আর্য-আভিজাত্য-দানে স্বীকৃত হলেন। এইরূপে দীর্ঘদিন পরে আর্য-অনার্যের মিলন-পথ প্রাথমিকভাবে রচিত হতে পারল। আর প্রধানতঃ আর্যেতর মূলোদ্ভূত

লৌকিক দেব-দেবীরাই এই মিলনের সুযোগ নিয়েছিলেন সর্বাধিক। বাংলার মৌলিক মঙ্গলকাব্যসমূহ এই মিলনাত্মক চেষ্টার ফল।

আর্যীভবনের এই সুযোগে যে সকল লৌকিক দেবতা এ সময়ে রূপান্তরিত হয়েছিলেন,—তাঁদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মঠাকুর বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'কালিকামঙ্গলে'র অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকার উল্লেখও এই প্রসংগে করা হয়ে থাকে। কিন্তু, প্রাচীনবঙ্গে কালিকাদেবীর অস্তিত্ব থেকে থাকলেও কালিকামঙ্গলের উদ্ভবকে সেই সূত্রের সঙ্গে যুক্ত করা চলে না। বিশেষভাবে 'চৌরপঞ্চাশৎ' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর মত বহিরাগত উপাখ্যানের বিস্তার-প্রসঙ্গেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ভিন্নতর পটভূমিকায় কালিকামঙ্গল কাব্যের জন্ম[৩]। তা'ছাড়া শিব-দেবতাকেও মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী গোষ্ঠীর সমশ্রেণিভুক্ত করা চলে না। মনে হয়, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের মত বাংলার আর্যেতর লোকধর্মেও শিব দেবতার স্বীকৃতি একেবারে প্রথমাবধিই অবিসংবাদী সর্বজনীনতা লাভ করেছিল। বলাবাহুল্য, পৌরাণিক শিব এবং লৌকিক শিব নিজ নিজ স্বরূপে সম্পূর্ণ পৃথক।—একজন আর্যাচার-মহিমান্বিত পরমেশ্বর,—আর একজন লোকজীবন-দৈন্যের আকর,—লৌকিকতার মূর্ত-বিগ্রহ। এই পার্থক্যের পরিচয় শিবায়ন কাব্যের আলোচনা প্রসংগে উদ্ধৃত হবে। এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র তথ্যই জ্ঞাতব্য যে, আর্য-অনার্য নির্বিশেষে বাঙালি হিন্দুসমাজে শিবের এই সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠাই অংশতঃ তাঁকে মঙ্গলকাব্যিক দেব-দেবীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে দেয় নি। পূর্বে বলেছি, বিশেষভাবে সাবিক প্রতিষ্ঠাহীন দেব-দেবীরাই এ যুগে আত্ম-প্রতিষ্ঠার লড়াই বাঁধিয়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ, ঐ সব সাম্প্রদায়িক দেবতার উপাসকেরাই নিজ নিজ উপাস্যকে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা দেবার অতি-আগ্রহে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগের রচনাবলী দেখে মনে হয়, ঐ সময়ে মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মের উপাসকেরাই এ-বিষয়ে তৎপর হয়েছিলেন সমধিক। এই সকল দেব-দেবীদের আর্যেতর প্রাথমিক উদ্ভব ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নানারূপ তথ্য উদ্ধার করে থাকেন। বর্তমান প্রসংগে এইটুকু জানলেই যথেষ্ট যে, নানারূপ

মঙ্গল দেবতাগণের পরিচয় এবং

৩। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কালিকামঙ্গল অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

অনার্য-পরিকল্পনা-সূত্রে উদ্ভূত এই সকল দেব-দেবীগণ তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তীকালে জাতির মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগে আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। পূর্বে বলেছি,—আত্মশক্তিতে আস্থাহীন দুর্বল বাঙালির জাতীয় জীবনের সব দিকে সেদিন ছিল অমঙ্গল-বিভীষিকার ঘন অন্ধকার। এই বিভীষিকা থেকে উদ্ধারলাভ,—তথা, জীবনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল-বিধানের প্রার্থনা নিয়ে বাঙালি সেদিন ধর্মের দ্বারে ধর্ণা দিয়েছিল। ফলে, মঙ্গলকাব্যিক দেবতাগণের উপাসকেরা নিজ নিজ দেবতার মঙ্গলকারী শক্তি সম্বন্ধে কাব্য রচনায় হয়েছিলেন মুখর। এমন কি, উপাস্য দেবতার মাঙ্গলিক শক্তি-মহিমা প্রচার করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি,—ভক্তি-হীন অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী অপর কোন দেবতার ভক্তের প্রতি তাঁর অমঙ্গলকারী শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনেও হয়েছিলেন তৎপর। এইরূপে আলোচ্য কাব্যগুলি মঙ্গল অমঙ্গলে মিশ্রিত দ্বন্দ্ব-গাথা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দেবতায়-মানুষে দ্বন্দ্ব, নিজ নিজ ভক্তকে রক্ষার প্রচেষ্টায় দেবতায়-দেবতায় দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের মধ্যেই মঙ্গল-কাব্যগোষ্ঠীর জন্ম। লক্ষ্য করা উচিত,—এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত, - এই মঙ্গল-অমঙ্গল-কারী দৈবীশক্তি সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব সকল কাহিনীই সমসাময়িক জনচিত্তকে অভিভূত করেছিল। -কারণ, সম্ভব-অসম্ভব, সঙ্গত-অসঙ্গত সম্বন্ধে সাধারণ বিচারবুদ্ধি সেদিন ছিল নিতান্ত আচ্ছন্ন। বহিরাগত তুর্কী আক্রমণের উৎপীড়নের মধ্যে অকস্মাৎ-দৃষ্ট শক্তির বিভীষিকা বাঙালিকে সেদিন জ্ঞানহীন, অভিভূত করেছিল। শক্তি-দীন জাতি এই শক্তির উৎস, স্বরূপ-পরিচয়, কিছুর সম্বন্ধেই অবহিত ছিল না। তাই, এ সম্বন্ধে যে যা বলেছে স্তম্ভিত বিমূঢ়তায় তাকেই নির্বিচারে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে,—শক্তির আশ্রয়-কামনা করে তারই প্রতি ছুটেছে অন্ধ আবেগে। জাতীয় জীবনের এই অন্ধ বিমূঢ়তাই একদিক থেকে এই মঙ্গল-দেবতাগণের নির্বিচার প্রতিষ্ঠার অবকাশ রচনা করেছিল।

মঙ্গলকাব্যসমূহের উদ্ভব

এতক্ষণের আলোচনার ফলে মঙ্গলকাব্য এবং মঙ্গল-দেবতাগণের সম্বন্ধে একটি, সীমাবদ্ধ হলেও বোধগম্য, সংজ্ঞানির্ণয়ের সুযোগ ঘটতে পারে বলে মনে করি। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুমান, 'মঙ্গল'-সুর থেকে মঙ্গল নামের উৎপত্তি হয়েছে। আর, মূল মঙ্গল-শব্দটি

নাকি অনার্য উৎস-সম্ভূত।[৪] কিন্তু, এই সিদ্ধান্তের মধ্যে এক বিশেষ-শ্রেণীর সাহিত্যের 'মঙ্গলকাব্য' নামকরণের কারণ স্পষ্ট হ'ল না[৫]। শ্রীভট্টাচার্য নিজেও স্বীকার করেছেন,—ঐ শ্রেণীর কাব্য ছাড়া অন্যান্য কাব্য-কবিতাও,—সাধারণ ভাবে দেব-বিষয়ক সঙ্গীতমাত্রই প্রাচীনকালে মঙ্গলসুরে গীত হো'ত। বর্তমান প্রসংগে এ-কথাও লক্ষ্য করা উচিত যে,—কাব্যের নামের সঙ্গে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত ছিল বলেই কোন কাব্য মঙ্গলকাব্যের গোষ্ঠিভুক্ত হয় নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে,—'চৈতন্যমঙ্গল', 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'গোবিন্দমঙ্গল' ইত্যাদি কাব্য মঙ্গলকাব্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু, 'মনসারভাসান' কিংবা 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত কাব্য-সমূহকে নিশ্চিতরূপে মঙ্গলকাব্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই সকল অভিধাবুদ্ধি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল-জাত হয়ে থাকলেও, লক্ষ্য করা উচিত, এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্য-গোষ্ঠীর বিশেষ ভাবাদর্শ ও রূপ-গত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই ধরণের নামকরণ করা হয়েছিল। আর, মঙ্গলকাব্যের এই ভাব এবং রূপাদর্শ অনেকটা পরিমাণেই-যে তাদের উদ্ভব-পরিবেশের 'পরে নির্ভরশীল, সে-কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। এ'সম্বন্ধে ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে,—যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়,—যে গান মঙ্গল-সুরে গাওয়া হয়,—যে গান 'যাত্রা' বা মেলায় গাওয়া হয় (হিন্দীতে মঙ্গল শব্দের অর্থ "মেলা, যাত্রা বা গমন"), তা'কেই মঙ্গল-কাব্য বলা হয়ে থাকে। বর্তমান উপলক্ষ্যে ৺বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের প্রথমাংশই গ্রহণ-যোগ্য বলে মনে করি। মঙ্গলকাব্য-সমূহের আভ্যন্তরিক প্রমাণ অনুসরণ করে বলা চলে,—যে-দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য-কীর্তন, এমন কি, শ্রবণেও মঙ্গল হয়, এবং বিপরীতটিতে হয় অমঙ্গল ;—যে-কাব্য মঙ্গলাধার,—এমন কি, যে কাব্য ঘরে রাখ্‌লেও মঙ্গল হয়,—তাই মঙ্গলকাব্য। লক্ষ্য করা উচিত,—অনুরূপ অন্ধবিশ্বাস এক অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন যুগেরই বৈশিষ্ট্য। আর, উদ্ভব-যুগের এই ঐতিহ্যের প্রতি আলোচ্য শ্রেণীর কাব্যের নামকরণ যেখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে,—সেখানেই আধুনিক হলেও এই অভিধা-বুদ্ধি সার্থক।

মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা

৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং) ৫। অধ্যাপক ভট্টাচার্য অধুনা 'মঙ্গলকাব্যের' সংজ্ঞাকে আরো ব্যাপক এবং সাধারণ অর্থাবহ করে তুলতে চেয়েছেন। দ্রষ্টব্য—'বাইশা'—ভূমিকা।

তবে, এ' কথা মনে করা কিছুতেই উচিত হবে না যে, এই প্রাথমিক পরিচয়ের মধ্যেই মঙ্গলকাব্য-প্রবাহ আনুপূর্বিক সীমাবদ্ধ হয়েছিল। সহজেই বোঝা যা'বে,—তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত বিপর্যয়-বিহ্বলতা দূর হয়ে যাওয়ার পরে মঙ্গল-সাহিত্যের উদ্ভব-পটভূমির মৌল স্বভাবটি সহজেই পরিবর্তিত হয়েছিল। তখন, স্বাভাবিক কারণেই ঐ বিশেষ রূপে এই সাহিত্য-প্রবাহের অস্তিত্ব আর সম্ভব ছিল না। লোক-জীবন-সম্ভব ঐ সাহিত্যাবলী তখন নূতন পরিবেশে নবজাগ্রত লোক-জীবনাকাঙ্ক্ষার বাণী বহন করে এক নবীন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে, সাম্প্রদায়িক দৈবী-কাহিনী দেখা দিল সর্বজনীন মানবিক সংবেদনাময় সাহিত্যরূপে। সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের এই শৈল্পিক অভিব্যক্তির পেছনে ব্যক্তি-বিশেষ অপেক্ষা গোষ্ঠীর দীর্ঘ-স্থায়ী সাধনার প্রভাব সমধিক। পটভূমিকা এবং স্রষ্টা, উভয়পক্ষের বিচারেই সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্য যৌথ-শিল্প। মধ্যযুগের বাংলা দেশের কবি-সমাজে নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অভাব ঘটেছিল;—তাই প্রথম-শ্রেণীর কবিরাও অভিনবতর কাহিনী সৃষ্টির চেয়ে বহু-প্রচলিত কাব্য-কাঠামোর মাধ্যমে নিজ নিজ বক্তব্যকে মুক্তিদানের পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য, তার জন্য সব রচনাই যে কাব্য-হিসেবে বৈচিত্র্যহীন অনুকরণ মাত্র হয়ে পড়েছিল, এমন কথা বলা চলে না। বিভিন্ন কবি একই রূপের মধ্য দিয়ে বিচিত্র প্রাণ-রসের বিস্তার করেছেন। সমগ্র সমাজ-জীবন-সত্যকে আত্মস্থ করেই মধ্যযুগের মঙ্গল-কবি শিল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাই, শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্যে কবির ব্যক্তি-জীবন এবং সার্বিক সমাজ-জীবনের বাণী অভিন্ন ঐক্যে গ্রথিত হয়েছে। তখন আর বোঝবার উপায় থাকেনি যে, কাব্যের মূল স্রষ্টা কবি, না,—সমাজ-জীবন। তাই বল্‌ছিলাম মঙ্গলকাব্য যৌথ-শিল্প। কেবল ভাবের বিচারেই নয়, —'রূপ' তথা আঙ্গিক-বিচারেও মঙ্গলকাব্য যৌথ-শিল্প। পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—মঙ্গলকাব্যের অসংখ্য কবি একই কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছিলেন। অতএব, কাহিনী-বিন্যাসে একই রকম প্রক্রমের স্বল্পাধিক অনুসরণের ফলে এই সব কাব্য-কাহিনী বর্ণনার একটা পূর্বসংস্কারগত (conventional) রূপায়ন-পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল।—এই পূর্বসংস্কার-জাত রূপায়ন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক আঙ্গিক-রূপে স্বীকৃত

মঙ্গলকাব্যের ক্রমবিকাশ ও শিল্প-স্বরূপ

হয়ে থাকে। এই আঙ্গিক-পদ্ধতি নীতি-নিষ্ঠ নয়,—সংস্কারাগত। অতএব, এদের মধ্যে পুংখানুপুংখ সর্বজনীনতা প্রত্যাশা করা চলে না। তবু, এই আঙ্গিক-উপাদানের সাহায্যে মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার সাধারণ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। একথা ভেবেই ঐ বহুলাংশে অ-সম উপাদান কয়টির উল্লেখ করছি।

একেবারে প্রথম পর্যায়ে মঙ্গলকাব্য-কাঠামোর রূপাঙ্গিক রচনায় প্রাচীন সংস্কৃত পৌরাণিক আদর্শ সচেতন ভাবেই অনুসৃত হয়েছিল; এ-কথার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের বন্দনাংশ পুরাণের প্রারম্ভিক বহুদেবতা-বন্দনার আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। ঐ অংশে নানা দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশে পৌরাণিক শ্লোকের ভাব, এমন কি ভাষাগত ঐতিহ্যকেও অনুবাদ করার চেষ্টাই করা হয়েছে প্রায়শঃ। মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বও অনেকাংশে পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ। যেখানে সৃষ্টি পরিকল্পনায় প্রধানতঃ আর্যেতর ঐতিহ্যকে অনুসরণ করা হয়েছে,[৬] সেখানেও সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মূল কাঠামোটি পৌরাণিক রূপাঙ্গিকেরই অনুবর্তন করেছে। তা'ছাড়া, গোটা দেবখণ্ডটিই অ-পৌরাণিক দেব-কথায় পৌরাণিক ঐতিহ্যকে সাঙ্গীভূত করে নেবার সচেতন চেষ্টার সূচক। মঙ্গলকাব্যের মনুষ্যখণ্ড পুরাণেতর স্বকীয়তার স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে। কিন্তু, সেখানেও দেব-মহিমার প্রকাশে নানা পৌরাণিক প্রসংগের অবতারণা করা হয়েছে।

পুরাণ ও মঙ্গলকাব

পুরাণের প্রতি মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের এই পক্ষপাত দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই। আগেই বলেছি, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈদিকেতর দেবতাদিগকে বিপর্যস্ত বৈদিক আর্য-চেতনার সাঙ্গীভূত করার আকাংক্ষা থেকেই প্রধানতঃ পুরাণগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। এদিক থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্য ও সংস্কৃত পুরাণ-সাহিত্যের উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মত। তা'ছাড়া, মঙ্গলকাব্য রচনার যুগ বাংলাদেশে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগও বটে। এদিক থেকে মঙ্গল-দেবতাদের পৌরাণিক দেবতারূপে প্রতিপন্ন করার দিকে আলোচ্য কবিদের লোভ থাকাই স্বাভাবিক। এই কারণেই, মঙ্গলকাব্যগুলিকে তাঁরা বাংলাভাষায় পুরাণ-এর

৬। দ্রষ্টব্য ধর্মমঙ্গল।

আদর্শে গড়তে চেয়েছিলেন। অনেকটা সেই চেষ্টার প্রভাবেই মঙ্গলকাব্যের সংস্কারগত রূপাঙ্গিক ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল।

১। ফলে, আগেই বলেছি, প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেরই সূচনা হয়েছে বন্দনা দিয়ে। বন্দনা অংশে কেবল একটি দেবতারই বন্দনা করা হত না, উদ্দিষ্ট মঙ্গল-দেবতার পক্ষ-বিপক্ষ সকল দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন করা হত। এমন কি, যে-সব মনসামঙ্গল কাব্যে চণ্ডী মনসার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অতি তীব্র আকারে প্রদর্শিত হয়েছে,—সে সকল কাব্যের সূচনায়ও চণ্ডী আদ্যাশক্তি রূপেই বন্দিতা হয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, সাম্প্রদায়িক পূর্বসংস্কারের মধ্যে মঙ্গল-কাহিনীগুলির প্রাথমিক উদ্ভব ঘটলেও সাহিত্যিক পর্যায়ে এই সকল কাব্য অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক মিলনাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল। আলোচ্য বন্দনাংশ সেই মনোভাবেরই সাহিত্যিক ভূমিকা। শাক্ত-বৈষ্ণব, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র গ্রামীণ জন-সম্প্রদায় জাতির প্রতিভূত্বের দাবি নিয়ে শ্রোতা হিসেবে মঙ্গলকাব্যের আসরে উপস্থিত হয়েছিল। তাই, প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাস এবং রুচির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা-নিবেদনের গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে মঙ্গল-সাহিত্যিক সকলকেই সাদর-আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির রস-লোকে।

মঙ্গল-কাব্যাঙ্গিক

২। মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই দ্বিতীয়াংশে সাধারণতঃ "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবির ব্যক্তিপরিচিতিও উদ্ধার করা হয়েছে। এই অংশ কবির 'আত্মপরিচয়'-অংশ নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' প্রসঙ্গে প্রায় সকল কবিই আলোচ্য দেব কিংবা দেবীর প্রদত্ত প্রত্যক্ষ আদেশ অথবা স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা যেতে পারে,—প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ-সকল দৈবাদেশ-কথা লোক-সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের কৌশল-হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তী সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্যে নিছক আঙ্গিক-গত বৈশিষ্ট্য (Technical peculiarity)-রূপে এ-অংশের রচনা ও পরিকল্পনা অনুসৃত হতে থাকে। ঐ সকল দৈবাদেশের বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি-রচনার জন্য কবির ব্যক্তিগত জন্ম-সূত্র, জীবৎকাল এবং বাসস্থানের বিশদ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে, ঐতিহাসিকের পক্ষে এই বর্ণনা বিশেষ তথ্যের আকর হয়েছে। ঐ অংশগুলির অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঙ্গল-কবিগণের পরিচয় আবিষ্কার অসম্ভব হ'ত।

৩। মঙ্গলকাব্যের তৃতীয় অংশ সাধারণতঃ 'দেবখণ্ড' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। লৌকিক অনার্য-দেবতা'র আর্য-ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রদায়িক যুগের মঙ্গল-কবিগণ মূল কাব্য-কাহিনীকে পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ কারণেই পুরাণানুগ উপায়ে সৃষ্টিতত্ত্বাদির ব্যাখ্যা, নানা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনা ইত্যাদির চেষ্টা করা হ'ত। বলাবাহুল্য, যথেষ্ট জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের অভাবে পৌরাণিক অনুকরণ প্রায়ই লৌকিক রুচি-বিশ্বাসের খুব একটা ঊর্ধ্বে উঠ্‌তে পারেনি। দেবখণ্ডাংশে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাধারণ অবতারণা লক্ষিত হয়ে থাকে,—সৃষ্টিরহস্য-কথন, দক্ষপ্রজাপতির শিবহীন-যজ্ঞ, সতীর-দেহ-ত্যাগ, হিমালয়-গৃহে নব-রূপে জন্মলাভ, মদনভস্ম, উমার তপস্যা, গৌরীর বিবাহ, কৈলাসে হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষা-যাত্রা ইত্যাদি। এই সকল অংশে শিব-দেবতার প্রাধান্যটুকু বিশেষ লক্ষিতব্য। পূর্বেই বলেছি,—পুরাণ এবং বাংলার লোক-জীবন উভয় স্থলেই শিবের শ্রেষ্ঠতা সন্দেহাতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাই, পৌরাণিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মিলন-সূত্র রূপে সকল মঙ্গলকাব্যেই শিব-দেবতা'র 'পরে নির্ভর করা হয়েছে সমধিক।

এই উপলক্ষ্যে উল্লেখ করা উচিত,—ওপরে দেবখণ্ডের যে সাধারণ বিষয়সূচি উদ্ধার করা হয়েছে, অন্ততঃ ধর্মমঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে তা'র আনুপূর্বিক অনুসরণ লক্ষিত হয় না। অন্যান্য গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে দু'একটি পার্থক্য আছে, তার সঙ্গে বিশেষভাবে এই পার্থক্যটুকুর 'পরে নির্ভর করেই হয়ত ডঃ সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন,—মঙ্গল-কাব্য নামে বাংলা সাহিত্যে এক-বিশেষ শ্রেণিগত 'নির্মিতি'র পরিচয় নির্দেশ করা চলে না;—কারণ, এদের মধ্যে রূপগত সংহতি এবং সাদৃশ্যের অভাব স্পষ্ট।[৭] কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, ধর্মমঙ্গলের দেবখণ্ডে পৌরাণিক শিব-কাহিনীর দীর্ঘ বর্ণনা না থাকলেও,—সৃষ্টি-তত্ত্বাদির ব্যাখ্যা যথা-রীতি করা হয়েছে। তা'ছাড়া পৌরাণিক-কাহিনীর পরিবর্তে এই কাব্যে যে অবিমিশ্র লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেও শিব-দেবতার প্রাধান্য স্পষ্ট সূচিত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল আঙ্গিকে বৈচিত্র্য

৭। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)

অতএব, ডঃ সেনের অভিধা-রচনার সার্থকতা স্বীকার করেও বল্‌তে হয়,—'পাঁচালী-কাব্য' ত এ'গুলো বটেই,—কারণ পাঁচালী-সম্ভূত কাব্য যে এরা তাতে ত সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্বসংস্কারাগত আঙ্গিকের ব্যবহারিক সাধারণ সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এদের মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভূত করার পথেও বাধা থাকা উচিত নয়।

৪। মঙ্গলকাব্যের চতুর্থ তথা 'নরখণ্ড'ই সর্বশ্রেষ্ঠ খণ্ড। এই অংশে কোন দেবশাপ-গ্রস্ত স্বর্গবাসি-দম্পতির মর্ত্য জীবনের বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রধানতঃ উদ্দিষ্ট মঙ্গলদেবতার পূজা প্রচারের জন্য তাঁরা ঐ বিশেষ দেবতার দ্বারা পৃথিবীতে প্রেরিত হয়ে থাকেন। এখানে নর-জীবনে বহু দুঃখকষ্টভোগ ও কৃচ্ছ্র সাধনা করে এঁরা দেবতার পূজা প্রচারে সমর্থ হন। অবশেষে এই সৎকর্মের জন্য স-শরীরে স্বর্গে গমন করে থাকেন। দেব-লোকবাসীদের নর-জীবনের বর্ণনা উপলক্ষ্যে 'বারমাস্যা' (নায়ক কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়িকা কর্তৃক বারমাসের দুঃখ বর্ণনা) নায়কের রূপদর্শনে নারীগণের পতি-নিন্দা, কাঁচুলি-(নারীগণের কারুকলা সমৃদ্ধ বক্ষাবরণ)-নির্মাণ, নায়িকার রন্ধন-প্রণালী, চৌতিশা (বিপন্ন নায়ক কিংবা নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ অক্ষরে আলোচ্য দেবতার স্তব) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বহুল ব্যবহারের ফলে নরখণ্ডের অপরিহার্য আঙ্গিকগত উপাদানে পরিণত হয়েছিল।

এইরূপে মূলতঃ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক পরিবেশে উদ্ভূত এই সকল লোক-কাব্য ক্রমশঃ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন জাতীয়কাব্যে পরিণত হয়েছিল। এই রূপান্তরের কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় আবিষ্কার করা চলে মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক আঙ্গিক-বিবর্তনের ইতিহাস-আলোচনার ফলে। এই আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যের গভীরতর অনুধাবনের দ্বারা আরো স্পষ্ট হ'তে পারে যে, বাংলার জাতীয় সাহিত্য-রূপে মঙ্গল-কাব্য সমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য—সমাজ-জীবনের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ এবং জীবনায়ন। এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলেই লোক-জীবন-কথা-সম্ভূত এই সাহিত্য জাতীয় ইতিহাসেরও সামগ্রী হয়ে দেখা দিয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালি জীবন-ইতিহাসের বহু অপ্রাপ্ত পরিচয়ের সংকেত আভাসিত হয়েছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর মধ্যে।

মঙ্গলকাব্যের সাহিত্য-ঐতিহাসিক মূল্য

পঞ্চদশ অধ্যায়

আদি-মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য-গোষ্ঠীর মধ্যে মনসামঙ্গল সম্বন্ধেই প্রাচীনতম ঐতিহাসিক পরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। নিগৃহীত মানবতার জীবন-বাণী রূপে মঙ্গল কাব্যের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি, মনসামঙ্গলের চন্দ্রধর-চরিত্র তার সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ। মানবিকতার সর্বময় পরাভব ও আত্ম-গ্লানিকর সেই যুগে এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান বিদ্রোহীর জীবনাঙ্কনও সম্ভব হয়েছিল, ভেবে বিস্মিত হ'তে হয়। মনে হয়, নিগৃহীত জাতীয়-জীবনের আর্তনাদী বিক্ষোভই যেন প্রাণমূর্তি পরিগ্রহ করেছে চন্দ্রধরের বিদ্রোহী সত্তার মর্ম-মূলে। আর, জাতীয় আত্মার বাঙ্‌ময় প্রকাশরূপেই জাতির অন্তঃকরণে সে শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ আসনটি লাভে সমর্থ হয়েছিল। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য-কাহিনীতেও নানা প্রসঙ্গে চন্দ্রধরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। শুধু তাই নয়,—চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি, এমনকি ধর্মমঙ্গলের লাউসেন চরিত্রেও এই চন্দ্রধর চরিত্রেরই সশ্রদ্ধ অনুসরণের পরিচয় লক্ষিত হয়।

মনসামঙ্গল

কিন্তু মনসামঙ্গলের এই প্রাচীন কাহিনী বাংলার লোক-সমাজে সর্প পূজার আদিম ঐতিহ্যের সংগে যুক্ত। তাই, মূল কাহিনী-বর্ণনার আগে বাংলাদেশে সর্পপূজার প্রাসংগিক পরিচয় উদ্ধার প্রয়োজন। আর্যশাস্ত্রে সর্প শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, ঋগ্‌বেদে। কিন্তু সর্প অর্থে সেখানে বৃত্রাসুরকে বোঝানো হয়েছে; সরীসৃপ জাতীয় কোন জীবকে নয়। যজুর্বেদেই সর্প শব্দ প্রচলিত অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয়। সর্পপূজার মন্ত্র কিন্তু যজুর্বেদেও নেই; অথর্ববেদ এবং বিশেষ করে আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্রে এ-বিষয়ে মন্ত্র ও পূজাচারের বর্ণনা রয়েছে। এর থেকে মনে হয়, সর্পের সংগে বৈদিক আর্যদের প্রথমাবধি কোন পরিচয় ছিল না; যজুর্বেদের কাল থেকে তাঁদের মধ্যে সর্প-জ্ঞান ক্রম-বিকশিত হয়েছে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এই অনুমানের ব্যাপকতর ব্যাখ্যা করেছেন।[১] তাঁর মতে

ও সর্পপূজার ইতিহাস

১। 'বাইশা'—ভূমিকা—অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য।

সর্পজাতীয় জীবের সংগে বৈদিক আর্যরা ভারতবর্ষে এসেই প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্য-পূর্ব যুগ থেকেই সর্প এবং সর্প-ভীতি দুইই প্রচলিত ছিল; আর এই কারণেই পূজার দ্বারা এই ভয়ঙ্কর জীবকে পরিতুষ্ট করার রীতিও ছিল সুপ্রাচীন। বৈদিক আর্যরা ধীরে ধীরে সেই রীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। অতএব, বাংলা দেশেও সর্পপূজার ধারা আর্য-পূর্ব যুগেই প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

আবার, আর্য-পূর্ব বাংলার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দ্রাবিড়েরাই ছিল প্রধান। দাক্ষিণাত্যের নিম্নবর্ণীয় দ্রাবিড়-ভাষীদের মধ্যে আজও সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আবার, এ-বিষয়ে সারা উত্তর ভারতে দাক্ষিণাত্যের সংগে কেবল বাংলা দেশেরই সাদৃশ্য রয়েছে। এই কারণে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন, বাংলার এই দ্রাবিড় আদিবাসীদের কাছ থেকেই এদেশে সর্পপূজার প্রথম প্রচলন ঘটে।[২]

বর্তমান ভারতে সর্পপূজার প্রধান তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়:— (১) নাগরাজ বাসুকি ও তাঁর সরীসৃপ মূর্তির পূজা বিশেষ ভাবে উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত। (২) দক্ষিণ ভারতে জীবন্ত সর্পপূজার আদর্শই প্রবল। (৩) বাংলা দেশে সর্পপূজার কেন্দ্রে আছেন নারী-রূপা সর্প দেবতা;— জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, মনসা ইত্যাদি নামে এঁর পরিচয়। অবশ্য বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই সর্প-প্রতীক পূজার রীতিও প্রচলিত আছে। এই প্রতীকরূপে কখনো 'মনসার ঘটে' অঙ্কিত নানা আকৃতির সর্পফণা, কখনো বা ফণি-মনসা গাছের ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পূজনীয়া দেবতা হচ্ছেন দেবী মনসা। সর্প-দেবতারূপে এই মাতৃকা-মূর্তির পরিকল্পনাই বাংলার সর্পপূজার বৈশিষ্ট্য।

মনে করা হয়, নারী-দেবতার পরিকল্পনা প্রধানতঃ মাতা-প্রধান (Matriarchal) অনার্য সমাজেরই বৈশিষ্ট্য; আর্য-সমাজ পিতা-প্রধান (Patriarchal) ছিল বলে আর্য-দেবতারা প্রায়ই পুরুষ। অতএব, বাংলা দেশের সর্পদেবতার এই মাতৃকা-মূর্তি আর্যেতর সমাজ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আদিম অনার্য সমাজে এই সর্প-মাতা কি নামে পরিচিত ছিলেন সে কথা জানা যায় না। তবে, বৌদ্ধ যুগের জাঙ্গুলী নামক

২। 'বাইশা'—ভূমিকা—অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য।

দেবতা যে সর্প-মাতার সংগে একাত্ম হয়েছিলেন, তার পরিচয় আছে। সর্প-দেবতা মনসার একটি প্রচলিত ধ্যানে তাঁকে 'ফণিময়ী', 'জাঙ্গুলী' এবং বিষহরী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 'জাঙ্গুলী' শব্দটি 'জঙ্গল' শব্দ থেকে আসা বিচিত্র নয়। তাই অনুমিত হয়েছে, বৌদ্ধ-পূর্ব কোন আরণ্য জাতির পূজিতা মাতৃকা-দেবী ছিলেন জাঙ্গুলী। বৌদ্ধ সমাজে হয়ত তিনি বুদ্ধ-সমসাময়িক কালেই আসন পেয়েছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে এঁর অস্তিত্বের কোন নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায় নি। এই জাঙ্গুলীর মধ্যে একাধারে সর্প-বিষধাত্রী এবং বিদ্যা-দাত্রীর ঐতিহ্য সমসূত্রে বিধৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই 'জাঙ্গুলী' নামটি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে 'বিষহরী'র চেয়ে সর্প-মাতৃকা 'মনসা' নামে অধিক পরিচিতা।

মনসামঙ্গলের 'মনসা'

এই মনসা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট্ অঞ্চলের একটি নিম্নবর্ণীয় জাতি 'মনে মঞ্চাম্মা' নামক একটি সর্পিনীর পূজো করে থাকে। অনেকে অনুমান করেছেন এই মঞ্চা শব্দ থেকেই মনসা শব্দের উদ্ভব। কিন্তু অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ছোট নাগপুরের সিংভূম, মানভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ ইত্যাদি জেলার আদিবাসীদের মধ্যে মনসা নামের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, ঐ সকল প্রতিবেশী অঞ্চল থেকেই বাংলা দেশ মনসা নামটি গ্রহণ করেছিল।[৩]

মনসামঙ্গলের প্রাচীন কাহিনী

মনসা-বিষয়ক একটি প্রাচীন কাহিনী হয়ত ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে। সেটি শঙ্কর গাড়রী ও নেতার কাহিনী। ঐ গল্পে রয়েছে নেতার শিষ্য শঙ্কর গাড়রী নেতার পরেই 'অজরামর' দেহের অধিকারী হয়েছিলেন। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, পরবর্তী কালে এই শঙ্কর ও নেতার ঐতিহ্য চন্দ্রধর-কাহিনীতে যুক্ত হয়ে পড়েছে। নেতা সেখানে স্বর্গের ধোপানি এবং মনসার সহচরী। আর, শঙ্কর গাড়রী চন্দ্রধরের অজেয় সর্প-বৈদ্য। স্পষ্টই মনে হয়, চন্দ্রধর কাহিনীটি নেতা ও শঙ্কর-কাহিনীর তুলনায় অর্বাচীন। কিন্তু এই চন্দ্রধর-বেহুলা-সনকার কথাই

৩। সর্পপূজা বিষয়ক এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের ঋণ স্বীকৃতব্য। ব্যাপকতর আলোচনার জন্য তাঁর মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (২য় সং) ও 'বাইশা'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মনসামঙ্গলকে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জীবনের সুখদুঃখ-হাসিকান্নার সমসূত্রে গ্রথিত করে তুলেছে। তাই মনসামঙ্গলের মধ্যযুগীয় কাব্যিক ঐতিহ্যের বিচারে ঐ চন্দ্রধর-কাহিনীই আমাদের একমাত্র আলোচ্য। স্মরণ রাখা উচিত,—মনসামঙ্গলের আলোচ্য কাহিনীর মূল কোন সংস্কৃত কাব্য-পুরাণে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রচলিত কাহিনী

প্রচলিত মনসা-কাহিনীর 'নরখণ্ডে' দেখি, দেবী মনসা পূজা আদায় করে নেবার অ-মানবিক উল্লাসে অকথ্য অত্যাচার করেছেন শৈব সাধু চন্দ্রধরের 'পরে। চন্দ্রধর বীরপুরুষ, তাই তিনি আত্ম-শক্তিতে অবিচল-বিশ্বাসী। তিনি তত্ত্বজ্ঞ, তাই শান্তি-স্নিগ্ধ মহাজ্ঞানী দেবতা শিব তাঁর একমাত্র উপাস্য। অথচ, এই চন্দ্রধর পূজা না করলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচার হয় না। তাই দেবী মনসা এলেন নানা লোভের পসরা সাজিয়ে চন্দ্রধরের হাতে পূজা প্রার্থনা করতে। মনসার পূজা করলে চন্দ্রধরের আধিভৌতিক সমুন্নতির সীমা থাকবে না। কিন্তু মহাজ্ঞানী, মহাবীর চন্দ্রধর অনাসক্ত উদাসীনতায় সেই লোভাতুর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন,—জ্ঞান-যোগী শিব ছাড়া আর কোন উপাস্যকে তিনি স্বীকার করেন না। ফলে মনসার রোষ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে,—চন্দ্রধরের 'পরে নেমে আসে দৈবী জিগীষার উদ্যত বজ্র।

সেই আঘাতে প্রথম নিহত হন চন্দ্রধরের পরম শুভানুধ্যায়ী দৈবজ্ঞ-ভিষক্ ধন্বন্তরী। —একে একে চাঁদের ছয়টি পুত্রেরও মৃত্যু হল সর্পাঘাতে। পত্নী সনকা এবং ছয় বালিকা-পুত্রবধূর আর্তনাদে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হল। কিন্তু, পুরুষকারের সাধনায় চন্দ্রধর অটুট-প্রতিজ্ঞ,—অবিচল। পুত্র-শোক অস্বীকার করে জীবনের সকল সম্পদের পসরা সাজিয়ে সপ্তডিঙ্গা-মধুকর নিয়ে চাঁদ চললেন বাণিজ্যে। কিন্তু পথে মনসার রোষে কালিদহে সব কিছু সলিল-সমাধি লাভ করল। বিভীষণ ঝড়ের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর বক্ষে চন্দ্রধর ভাসমান রয়েছেন কালিদহের জলস্রোতে, এমন সঙ্কট-সময়ে মনসা দৈববাণী করলেন, —এখনও যদি চন্দ্রধর মনসা-পূজায় স্বীকৃত হন তাঁর ছয়পুত্র পুনর্জীবন লাভ করবে, সপ্তডিঙা উঠ্‌বে ভেসে—অন্যথায় মৃত্যু অবধারিত। সেই অবধারিত মৃত্যুর শীর্ষদেশ হতে চন্দ্রধর বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল :—

"এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর।
হেঁতালের বাড়ি স্কন্ধে কাঁপে থর থর॥
মনেতে ভাবিছ কানি অন্তরীক্ষে রৈয়া।
সাহস যদ্যপি থাকে কহ আগু হৈয়া॥
মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
তবে কেন কানা চক্ষুর ঔষধ না কর॥"

সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জমান চন্দ্রধরের সাম্নে পদ্মা আশ্রয়রূপে পদ্মবন তুলে ধরেন। হত-চেতনায় জীবনের সেই শেষ আশ্রয়টিকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে হঠাৎ জেগে ওঠে চন্দ্রধরের নির্জিত পৌরুষ ;—মনে পড়ে যায়,—পদ্মানামের সঙ্গে পদ্মবনেরও সংযোগ-সম্পর্ক রয়েছে! বেঁচে থাক্‌বার শেষ সম্বলটুকু ত্যাগ করে চাঁদ তৎক্ষণাৎ মহামৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দেয়। পদ্মা এবারে নিজের স্বার্থেই তাকে রক্ষা করেন। কিন্তু তীরে উঠ্‌লেও চাঁদের নিগ্রহ সমানভাবে চল্‌তে থাকে। সারাটি পথ মনসা কেবলই লোভের পর লোভ দেখিয়ে সঙ্গে চলেন,—আর প্রতি পদেই ঘৃণা-পূর্ণ উপেক্ষার ফলে বারেবারে চাঁদের দুর্ভোগ বাড়তে থাকে। অবশেষে দেবীর স্বার্থেই মর্‌তে মর্‌তে সে নিজ গৃহের আশ্রয় ফিরে পায়। এবারে তার সপ্তমপুত্র লক্ষ্মীধর, লখিন্দর বা লখাই নধরকান্তি যুবক হয়ে উঠেছে। অনেক সন্ধানের পর চাঁদ সর্ব-রূপ-গুণ-সমৃদ্ধা 'সাএবেনের-ঝি' বেহুলার সঙ্গে লখাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করে। কিন্তু পদ্মা এবারেও 'বাদ' সাধলেন। সরোষে অভিসম্পাৎ দিলেন,—তাঁর পূজা না করলে বিবাহ-রাত্রির বাসরেই লখাই সর্পদংশনে প্রাণ হারাবে। বিবাহের 'পিঁড়ি'তে সর্পভয়ে লখাই বার বার ঢলে পড়তে লাগ্‌ল, আর বেহুলা নিজ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে বারেবারে তুল্‌তে লাগ্‌ল পুনরুজ্জীবিত করে। চন্দ্রধর বাঙালি-পৌরুষের অনির্বাণ আদর্শ-মূর্তি হ'লে, বেহুলা চিরন্তন বাঙালি-নারীত্বের পরম-পরিণাম। বিদগ্ধ সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক-হিন্দু কবিকুল সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর চরিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় নারীত্বের মহিমাময় আদর্শকে বাণী-রূপ দিয়েছেন। কিন্তু, শিক্ষা-সংস্কৃতি-দীন গ্রামীণ বাঙালি-কবি বেহুলার মধ্যে বাঙালি-নারীত্বের যে প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন, তা' কেবল ত্যাগ-তিতীক্ষা সমুজ্জ্বল-ই নয়,—অ-তন্দ্র আত্ম-বিশ্বাস এবং অমিত বীর্যে সুষমা-ভাস্বর। যে-যুগে অপরিচিত অগ্রজের নিকট অনুজা সহোদরার নারীত্ব-সম্মান নিরাপদ

ছিল না, যে-যুগের পতি-পুত্রবতী কুল-নারীগণ শ্রী-মান্ পরপুরুষের দর্শনমাত্র পতিনিন্দায় মুখর হয়ে উঠ্‌ত, সেই যুগ-পরিবেশে বেহুলার সতীত্ব-যজ্ঞের মহিমা আজ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু দৈবী ষড়যন্ত্রের নিকট বেহুলার এই অজেয় মানবশক্তিকেও সাময়িক পরাভব স্বীকার করতে হল। তন্দ্রাবিষ্টা নারীর অনবধানতার সুযোগ নিয়ে 'লৌহ-মানব' চাঁদের নির্মিত লোহার বাসরের ছিদ্র-পথে প্রবেশ করে' মনসার সর্প নিদ্রিত লখাইর জীবন হরণ করল।

সপ্তপুত্রের পুত্রহারা জননী সনকা গগন-বিদারী আর্তকণ্ঠে স্বামী এবং পুত্রবধূকে ভর্ৎসনা করে উঠ্‌ল। নির্বিকারচিত্ত চন্দ্রধর হেঁতাল যষ্টি হস্তে 'চেংমুড়ি কানির' সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল,—কর্তব্য-ব্রতে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে বেহুলা কলার 'ভেলা' বেঁধে অকূল সাগরে ভাস্‌ল স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে। পথের অশেষ বিপদ এবং উন্মত্ত লালসার আক্রমণ থেকে নিছক সতীত্বের বলে বার বার আত্মরক্ষা করে 'সতী' বেহুলা উপস্থিত হ'ল দেবপুরে। সেখানে দুঃসাধ্য সাধনায় দৈবী শক্তিকে আয়ত্ত করে স্বামিসহ শ্বশুরের সাতপুত্রের প্রাণ উদ্ধার করল,—উদ্ধার করল শ্বশুরের সমুদ্র-তলশায়ী অতুল ধনসম্পদ। দৈবী-শক্তির 'পরে মানবী-শক্তি-সাধনার বিজয় ঘোষণা করে বিজয়িনী বেহুলা সপ্তডিঙ্গা মধুকরে ভর করে ফিরে চল্‌ল দেশের পথে। মনসাও সংগ নিলেন! সেই পুরোণো আব্দার; চন্দ্রধরের হাতে এক মুষ্টি 'পুষ্পপানি' চাই,—চাই মানবী-শক্তির দ্বারে আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

এবার ঘনিয়ে এ'ল চন্দ্রধরের পরাভবমুহূর্ত। দৈবী নির্যাতনের চরমতম পর্যায়েও কেবলমাত্র আত্ম-বলে নির্ভর করে সে সব কিছুকে নিরুদ্বেগ ঔদাসীন্যে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু এতদিনে তাকে মনসা-পূজায় স্বীকৃত হতে হ'ল। কিন্তু, চাঁদের এই পরাভব দৈবীশক্তির পাদপীঠে মানবী-শক্তির আত্ম-বিলোপ সূচনা করে না; এ পরাভব স্নেহ-প্রেম, নিষ্ঠা-সাধনাপূর্ণ মানবী-শক্তির বেদীমূলে শাশ্বত মানুষের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি-জ্ঞাপন। মনসামঙ্গলের বেহুলা চন্দ্রধরের পুত্রবধূই নয় কেবল,—সে নরের শ্রদ্ধেয়া 'নারী'। বেহুলার নারীশক্তি চন্দ্রধরের পৌরুষেরই সমগোত্রীয়; - হয়ত তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর। যে আত্ম-শক্তির প্রাচুর্য-বলে চন্দ্রধর বার বার ব্যর্থতা বরণ করেও ভেঙ্গে পড়েনি,—ক্ষুব্ধ আক্রোশে কেবল উন্মত্ত হয়ে উঠেছে;—সেই মানবী-শক্তির সার্থক

পরিণাম-রূপে চন্দ্রধরের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিল দেবপুরী-প্রত্যাগতা বেহুলা। বেহুলার এই সার্থকতার মহিমাকে অস্বীকার করবার সাধ্য ছিল না চন্দ্রধরের। তাই, বেহুলার অনুরোধেই সে মনসাপূজায় স্বীকৃত হয়েছিল। বস্তুতঃ, মনসা-মঙ্গল দেবী-মনসার মঙ্গল-গাথাই নয়; বিদ্রোহী মানবতার যশোগান।

মনসামঙ্গল কাব্যের এই মানবজীবন-রস-নির্ভরতা অসংখ্য বাঙালি কবিকে আকৃষ্ট করেছে,—বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য কবি এই কাহিনী অবলম্বন করে সার্থক কাব্য-রচনা করেছেন; বহু ব্যর্থকাম কবি-যশঃ-প্রার্থীর প্রচেষ্টারও অবধি নেই। এই সর্বাত্মক জনপ্রিয়তার ভীড়ে মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্ভব-পরিচয় আচ্ছন্ন হয়েছে। তবে এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্যাদি থেকে অনুমান করা যেতে পারে,—'কানা হরিদত্ত' ছিলেন বাংলা মনসামঙ্গলের আদি কবি। মনসামঙ্গলকাব্যের সন-তারিখ যুক্ত প্রাচীনতম পুথির লেখক বিজয়গুপ্ত কানা হরিদত্তের প্রসংগে লিখেছেন:—

মনসামঙ্গলের 'আদি-কবি' কানা হরিদত্ত

"মূর্খে রচিল গীত না জানে বৃত্তান্ত।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোর ছলে
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥"

বিজয়গুপ্ত পরম পণ্ডিত কবি ছিলেন যে, তাঁ'র কাব্যই এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ। কিন্তু, পূর্বসূরীর নিকট ঋণ-স্বীকারের পদ্ধতিটি যে পণ্ডিতজনোচিত হয় নি, তা' বলাই বাহুল্য। বিজয়গুপ্তের গ্রন্থ-রচনা কালে হরিদত্তের লুপ্ত-গীত কিরূপ বিপর্যস্ত হয়েছিল, তা'র প্রমাণ এ' পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কিন্তু কানা হরিদত্তের ভণিতায় প্রাপ্ত পদ বা পদাংশের বিচার করলে কবি সম্বন্ধে বিজয়গুপ্ত-পরিবেশিত সংবাদ গ্রাহ্য মনে হয় না।

যাইহোক্, বিজয়গুপ্ত ছাড়া পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েনের উল্লেখ থেকেও কানা হরিদত্তের প্রাচীনতার পরিচয় আবিষ্কার করা চলে, ইনি শ্রদ্ধার সংগে হরিদত্তের ঋণ-স্বীকার করেছেন:—

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।

তার অনুবন্ধ লাচাড়ীর ছন্দ
শ্রীপুরুষোত্তম গায় ॥

কিন্তু, বিজয়গুপ্ত এবং পুরুষোত্তম, কারো কাছ থেকেই কানা হরিদত্তের ব্যক্তি-কিংবা কাল-গত পরিচয় আবিষ্কার করা চলে না। তবে বিজয়গুপ্তের কাব্য রচনাকালে কানা হরিদত্তের কাব্য লুপ্ত যদি না-ও হয়, তবু নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন হয়েছিল। এদিক্ থেকে হরিদত্তের রচনাকে অন্ততঃ দু'শতাব্দী পূর্ববর্তী মনে করলেও তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। এই সময়েই মঙ্গল-কাব্যগোষ্ঠীর উদ্ভব-কল্পনা যে করা হয়ে থাকে,—তা পূর্বে বলেছি।[৪] কানা হরিদত্তের রচিত মনসা-মঙ্গলের কোন আদ্যন্ত পুথি আজও পাওয়া যায় নি। কিন্তু বিভিন্ন কবির রচনার মধ্যে যে পদ কিংবা পদাংশ-সমূহ পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই ময়মনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত। এই কারণে ঐ অঞ্চলেই কবির বাসস্থান ছিল বলে অনুমিত হয়। পূর্বেই বলেছি, কানা হরিদত্তের বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর পরিচয় বিজয়গুপ্তের অভিযোগের অসারতা প্রতিপন্ন করে; বিজয়গুপ্তের মত পাণ্ডিত্য যদি তাঁর না-ও থেকে থাকে, তবু কবিত্ব কিংবা পাণ্ডিত্য, কিছুরই দীনতা ছিল না। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি রচনাংশ উদ্ধার করি :—

"ওলা শুনি আদ্যের কাহিনী।
মুই হেন সেবক শরণ লইলাম গো
ঘটে লামি লও ফুল পাণি ॥
নেতা বলে বিষহরি এথা রহিয়া কি করি
মর্ত্যভুবনে চল যাই।
মর্ত্যভুবনে যাইয়া ছাগমহিষ বলি খাইয়া
সেবকেরে বর দিতে চাই ॥
নেতারে সঙ্গতি করি মাও লামে বিষহরি
হাসে পদ্মা রচনা দেখিয়া।
হেটে ধান্যের সরা উপরে বিচিত্র ঝরা
সে না ঘটে চন্দন দিয়া ॥

৪। অধুনা অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য কানাহরিদত্তকে বিজয়গুপ্তের শতাব্দী-পূর্বে স্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, মনসা-মঙ্গল কাব্য-কথা ঐ সময়েই বিহার থেকে বাংলা দেশে প্রথম প্রবেশ করে। দ্রষ্টব্য 'বাইশা'—ভূমিকা।

… … … …

চারি চতুর্বেদ নিশি জাগরণ করে
পূজা হইলে ছাগ বলিদান।
কবি কহে হরিদত্ত যে জানে পরমতত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান ॥"[৫]

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন,—ময়মনসিংহ জেলায় 'দাস' হরিদত্তের ভণিতায় যে তিনখানি 'কালিকামঙ্গলে'র পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মূলীভূত কাব্যেরও স্রষ্টা এই কানা হরিদত্ত। ঐ কালিকা মঙ্গল কাব্যে "মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অন্তর্গত সপ্তশতী অংশের বাংলা অনুবাদ" করা হয়েছে। শ্রীভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত সত্য হলে হরিদত্তের বিরুদ্ধে বিজয়গুপ্ত-কৃত পাণ্ডিত্য-হীনতার অভিযোগ আরো অসার্থক প্রমাণিত হয়।

নারায়ণদেব

মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবিদের মধ্যে কানা হরিদত্তের পরেই নারায়ণ দেবের নাম প্রথম উল্লেখ্য। মনসামঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম কবিদের মধ্যেই কেবল একজন নন তিনি,—এই কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিও বটে। নারায়ণদেবের কবি-প্রতিভা পূর্ব-বঙ্গের সীমা অতিক্রম করে রাঢ়, এমনকি আসামের দূরবর্তী প্রত্যন্ত ভাগেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। অসমীয়া ভাষায় লিখিত নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের পুথি পাওয়া গেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন বহুল-প্রচারিত জনপ্রিয় কাব্যের একখানিও সম্পূর্ণাঙ্গ পুথি এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তা'ছাড়া নারায়ণদেবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধেও মত-পার্থক্য প্রচুর।—

(১) 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়' গ্রন্থে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছিলেন,—"নারায়ণদেব অনুমান ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করেন।" পরে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে তিনি নূতন করে সিদ্ধান্ত করেন,—নারায়ণদেব পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বিজয়গুপ্তের কিছুকাল পূর্বে কাব্য রচনা করেন।

(২) ডঃ সুকুমার সেন কোন বিশেষ কারণ নির্দেশ না ক'রেই নারায়ণ দেবকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৫। পদটির প্রামাণ্য বিচার উপলক্ষ্যে 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' (২য় সং) দ্রষ্টব্য।

(৩) অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য নারায়ণদেবের কুলপঞ্জী উদ্ধার করে বলেছেন, বঙ্গবিভাগের পূর্বপর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামে নিবসমান কবির সর্বশেষ বংশধরগণ "নারায়ণদেব হইতে বর্তমানে অষ্টাদশ পুরুষ। চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া লইলে নারায়ণদেব আনুমানিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে"।[৬]

নারায়ণদেবের কাল-পরিচয়

৪। ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পাদিত নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের ভূমিকায় নানাবিধ বিচার উত্থাপন করে কবিকে ত্রয়োদশ শতকের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রসংগে তিনি শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের উপস্থাপিত তথ্য অন্যভাবে পরিবেশন ও বিচার করেছেন। ডঃ দাশগুপ্তের যুক্তি নিম্নরূপ,—

(ক) ডঃ দীনেশচন্দ্র তাঁর বঙ্গসাহিত্যপরিচয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,—কবির বর্তমান বংশধরগণ তাঁর থেকে "বিংশপর্যায়ে" অবস্থিত। অতএব, তিন পুরুষে এক শতাব্দী হিসাব করলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই কবির আবির্ভাব নির্ণীত হওয়া উচিত।

এখন বিচার্য,—নারায়ণদেব থেকে তাঁর বর্তমান বংশধরগণের অবস্থান সত্যই কিরূপ?—এদিক থেকে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের গবেষণা-ফলের 'পরে নির্ভর করাই সঙ্গত; অতএব, শ্রীভট্টাচার্যের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয় বলে মনে করি। কিন্তু, আবার প্রশ্ন,—তিন পুরুষেই কী এক শতাব্দী হিসাব করা উচিত, না চার-পুরুষে? এ'দিক থেকে শ্রীভট্টাচার্যের বিচার-পদ্ধতিই যে ঐতিহাসিক মহলে অধিকতর গ্রাহ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই কাল-বিচার নির্ভুল না-ও হতে পারে। আভ্যন্তরিক্ প্রমাণ অন্যরূপ কাল-সূচনা করলে, এই বিচারের অসার্থকতা মেনে নিতেই হয়। ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর বিচারের পরবর্তী অংশে এই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন;—

(খ) নারায়ণদেবের কাব্যের পুথির আলোচনা করলে দেখা যায়,—তাতে বৈষ্ণব-প্রভাব বড় একটা নেই,—যা আছে, তা'ও লিপিকার-কৃত

৬। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

প্রক্ষেপ যে, তা'তে সন্দেহ নেই। অতএব, অনুমান করতে বাধা নেই, নারায়ণদেবের কাব্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-পূর্বকালে রচিত হয়েছিল।

(গ) নারায়ণদেবের কাব্যে হাসেন-হোসেনের উল্লেখ মাত্র আছে;—কিন্তু বিজয় গুপ্তের কাব্যে হাসেন-হোসেনের কাহিনী একটি আনুপূর্বিক 'পালা'র আকর। এর থেকে মনে করা যেতে পারে,—এ'দেশে তুর্কী-সমাগমের অব্যবহিত পরে যখন তা'রা সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে উঠ্‌তে পারে নি,—সেই আদিযুগেই নারায়ণদেব কাব্য রচনা করেছিলেন।

(ঘ) নারায়ণদেবের গ্রন্থে 'দেব-দেবী-বন্দনা', 'সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনা', 'দেবখণ্ড', এমন কি 'নরখণ্ডের' চৌতিশা, বারমাসী, কাঁচুলি-নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব-সংস্কারগত মঙ্গলকাব্যিক বৈশিষ্ট্যের অভাবই লক্ষিত হয়ে থাকে।[৭] এ'র থেকে এই অনুমানই হয়ত সঙ্গত যে, মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যবহারাগত পূর্বসংস্কার গড়ে উঠ্‌বার আগেই নারায়ণদেব কাব্য রচনা করেছিলেন।

এই সকল প্রমাণ এবং বিচারের যৌক্তিকতা যদি স্বীকারও করে নেওয়া যায়,—তবু নারায়ণদেবের কাল-বিচারে এগুলিকে অকাট্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণ রূপে উপস্থিত করা চলে না। এ'র থেকে কেবল একটা সাধারণ ধারণা করা করা যেতে পারে যে, বিজয়গুপ্তের থেকে নারায়ণদেবের কালগত পার্থক্য হয়ত খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট ছিল না। এ-সম্বন্ধে সর্বাগ্রে একটি কথা মনে আসে। বিজয়-গুপ্ত নিতান্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে হলেও কানা হরিদত্তের আদর্শ অনুসরণ করেই কাব্য-রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কানা হরিদত্তের কাহিনী যদি লুপ্ত হ'য়েও গিয়ে থাকে, তবু তাঁর ঐতিহ্যাদর্শ অবলম্বন করেই যে অন্যান্য বাংলা মনসামঙ্গলকাব্যসমূহ গড়ে উঠেছিল, এ'কথা সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে। কিন্তু নারায়ণদেবের কাব্যের একটি পুথিতে দেখি,—

"পদ্মাপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণদেব তা'রে পাঁচালী রচিছে॥"

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিকও স্বীকার করেন,—"কোনো বাংলা মনসামঙ্গলের লেখককে নারায়ণদেব আদর্শরূপে ব্যবহার করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে তাঁহার কাব্যের পৌরাণিক অংশের রচনায় যে তিনি সংস্কৃত

৭। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি।

পুরাণগুলিকেই মুখ্যত অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।"—এই প্রসঙ্গে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি হচ্ছে,—

"মুনিমুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন।
পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন।" ৮

এই সকল উদ্ধৃতি এবং বিচার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়,—মনসামঙ্গল-কাব্যের রচনাকালে নারায়ণদেব বিশেষভাবে সংস্কৃতপুরাণের আশ্রয়ই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাব-বিচারে কবি-ধর্মের যে পরিচয় পাই, তাতে সহজেই বোঝা যায়,—সংস্কৃত পুরাণশাস্ত্রের প্রতি নারায়ণদেবের পণ্ডিত-জন-সুলভ কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। বিজয়গুপ্তের প্রতিভার মধ্যে বরং সংস্কৃতানুসারিতার একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষিত হয়। তবু-যে নারায়ণদেব বাঙালি পূর্বসূরী অপেক্ষা সংস্কৃত পুরাণেরই অনুসরণ করতে চেয়েছেন, তাতে উপযুক্ত বাংলা পূর্বাদর্শের অভাবই সূচিত হয় বলে মনে করি। অতএব, মনে করা যেতে পারে, কবি নারায়ণদেব যখন কাব্য রচনা করেন, তখনও হরিদত্তের রচনা মনসামঙ্গলকাব্যের সর্বাত্মক আদর্শের মর্যাদা লাভ করে নি। এই সকল অনুমান এবং বিচার গ্রাহ্য হ'লে, বলা যেতে পারে, নারায়ণদেব বিজয়গুপ্তের কিছু পূর্ববর্তীকালে আবির্ভূত হয়ে কাব্য-রচনা করেছিলেন।

কবির আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক নিম্নলিখিত বর্ণনাটি কোন কোন পুথিতে পাওয়া যায়।

কবি-পরিচিতি

"নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ।
মিশ্র-পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ॥
অতিশুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদ্গোল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব, নরসিংহ মোর পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্বপুরুষ মোর অতিশুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রাম বসতি॥"

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 'মগধ' শব্দটি 'মুগ্ধ'-শব্দ-জাত বলে মনে করেছেন[৯]। আলোচ্য অংশ থেকে বোঝা যাবে, কবির পূর্বপুরুষগণ রাঢ় পরিত্যাগ করে

৮। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। ৯। ঐ।

বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত।

নারায়ণদেবের কাব্যের সর্বাত্মক জন-প্রিয়তা অবিসংবাদিত। কিন্তু যে অপূর্ণ আকারে তাঁর রচনার পরিচয় আধুনিক কালের হস্তগত হয়েছে, তাতে কবি-প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ বিচার প্রায় দুঃসাধ্য। নারায়ণদেবের একাধিক পুথিতে একই রচনাংশ একাধিক ভণিতায় পাওয়া যায়,—আর প্রত্যেক পুথিতেই মূল কবির রচনার মধ্যবর্তী পাদপূরণার্থ অন্য একাধিক কবি-গায়েনের ভণিতা-যুক্ত বহু পয়ার ও লাচাড়ি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নারায়ণদেবের গ্রন্থের পুথিগুলির এই প্রক্ষেপ বাহুল্য কবির রচনার অত্যধিক জনপ্রিয়তার পরিচয়ই বহন করে থাকে। মনসা-মঙ্গলের তথা মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই কাব্যিক আস্বাদনের একমাত্র মাধ্যম ছিল গায়েন-সংগীত। আর, এই গায়েনগণ বহু কবির রচনাংশের আশ্রয় গ্রহণ করে, এমন কি নিজেরাও পয়ার-লাচাড়ি রচনা করে মূল পালার বৈচিত্র্য-বিধান ও জনপ্রিয়তা বর্ধনের প্রয়াস পেতেন। নারায়ণদেবের কাব্যে অনুরূপ রচনা-বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য থেকে প্রমাণিত হয়,—পুথিগুলি প্রধানতঃ গায়েনের পুথি। আবার, গায়েন-লিখিত পুথি-প্রাচুর্য হ'তে কবির কাব্যের বহুল সাংগীতিক প্রচারের তথ্য সহজেই প্রমাণিত হয়ে থাকে।

নারায়ণদেবের কাব্যের পুথি-সমূহে প্রক্ষেপ-বাহুল্য

কিন্তু কাহিনী এবং রূপগত এই বিমিশ্রতা মূল কবির পরিচয় আবিষ্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। সাধারণ ভাবে অনুমিত হয়ে থাকে,—নারায়ণদেবের কাব্যে 'দেবখণ্ড'ই সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে, এবং এই খণ্ডের রচনায় কবি সংস্কৃত পুরাণ-শাস্ত্রের 'পরেই বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন[১০]। কিন্তু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবির যে পুথিখানি প্রকাশ করেছেন, এবং সম্পাদক ভূমিকাংশে যে পুথিখানিকে নারায়ণদেবের মূল রচনার মোটামুটি পরিচয় বলে দাবি করেছেন, তাতে 'দেবখণ্ড' অতিসংক্ষিপ্ত,—অসম্পূর্ণও। 'নরখণ্ডে'র বর্ণনাও অভিনব এবং অসংলগ্ন। সম্পাদক কাহিনী-বর্ণনার এই অসংলগ্নতাকে প্রাচীনতার লক্ষণ বলে দাবি করেছেন,—যদিও আলোচ্য পুথিখানির লিপিকাল ১৭১৮ শকাব্দের আগে নয়। লক্ষ্য করা উচিত, কাহিনী-উপস্থাপন-পদ্ধতির এই

নারায়ণদেবের কাব্যপরিচিতি

১০। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

অভিনবত্ব ঐ একটিমাত্র পুথি ছাড়া অন্যত্র পাওয়া গেছে বলে জানা যায় না। কিন্তু, বিভিন্ন পুথির মৌলিকতার প্রমাণ সম্বন্ধে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হ'য়েও বলা চলে,—প্রায় সকল পুথিই নারায়ণদেব-রচিত 'নরখণ্ডের' সংক্ষিপ্ততা এবং বর্ণনা-জনিত অল্পাধিক অসংলগ্নতার পরিচয় বহন করে। এদিক থেকে নারায়ণদেবের পরবর্তী লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল যেমন কাহিনী-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, তেমনি দীর্ঘ ও সুপরিকল্পিত। নারায়ণদেবের কাব্যে কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা, এমন কি বর্ণন-ভঙ্গির আঙ্গিকগত অসংলগ্নতার মধ্যেও ভাব-কল্পনার দৃঢ়-পিনদ্ধ সংহতি সুস্পষ্ট। অন্যদিকে, বিজয়গুপ্তের রচনায় কাহিনীর প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য, এমন কি আঙ্গিক-পরিকল্পনার সমৃদ্ধি সত্ত্বেও ভাব-বস্তুর সংহতি এবং সজীবতার অভাব দুর্লক্ষ্য নয়। এই তুলনা-মূলক বিচার উপস্থাপনার উদ্দেশ্য,—এ'র দ্বারা নারায়ণদেবের কাব্যের রস-পরিচয় স্পষ্টতর হতে পারবে। আমাদের ধারণা,—নারায়ণদেবের কাব্য আপন স্বরূপে অনেকটাই যেন মৌলিক মহাকাব্যের (authentic Epic) পর্যায়-ভুক্ত। লাঞ্ছিত জাতীয়-চেতনার সর্বাত্মক বিক্ষোভের পরিণাম-রূপেই আমরা চন্দ্রধর ও বেহুলা চরিত্রের উদ্ভব কল্পনা করেছি। সেই বিক্ষুব্ধ, লাঞ্ছিত জাতীয়-মনুষ্যত্ব স্বভাবসিদ্ধ অভিব্যক্তি লাভ করেছে নারায়ণ-দেবের কাব্যে; কোন প্রকার সচেতন প্রচেষ্টা (Conscious Literaty Effort) এতে লক্ষ্য করা যায় না। আলংকারিক চমৎকৃতি, রচনা-বৈদগ্ধ্য, কাহিনী-বৈচিত্র্য ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবার সুযোগ ছিল না নারায়ণদেবের;—এর একটি কারণ হয়ত সমসাময়িক নিপীড়িত যুগ-চেতনার অতি-তীব্র প্রকাশ-কামনা।—অপর কারণ, কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত পূর্বাদর্শের অভাব। জীবনের চরম মুহূর্তেও বেহুলা ও চন্দ্রধর চরিত্রের বর্ণনায় কবি তা'দের মৌলিক পরিচয়টি বিস্মৃত হন নি। সে পরিচয়,—নির্বিচার এবং যথেচ্ছ দৈবী নিপীড়নের উর্ধ্বে মানবীশক্তির মস্তক উত্তোলন-বাসনা। বিবাহ-রজনীতে সদ্য-মৃত পতির শয্যাপার্শ্বে বেহুলার শোকাভিব্যক্তির প্রাথমিক চিত্রটি এইরূপ :—

"লখাই কোলে লইয়া বেউলা কান্দে।

পাপ কর্মের ভাগে   তোরে খাইল কাল নাগে

প্রাণ গেল সমুরের বিবাদে॥

… … … …

যদি বেউলা হয় সতি সাহসে জিয়াব পতি

জেন জস ঘোষয়ে সংসারে।

জাইব দেবের পুরি রঞ্জাইব বিসহরি

আমি জাইয়া জিনিব মনসারে॥"

শোক-দৌর্বল্যের চরমমুহূর্তেও নিজ মানবী-শক্তির 'পরে এই দৃঢ় বিশ্বাস, এবং এই আত্মসম্মানবোধ যুগ-চেতনার অবিমিশ্র প্রকাশ-পরিণাম বলেই মনে করি। এই শোকের পরিপ্রেক্ষিতে পিতা-চন্দ্রধরের পৌরুষকে প্রত্যক্ষ করলে আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য স্পষ্টতর হতে পারবে,—

"চান্দো বলে পুত্র চাহিমু গিয়া পাছে।
বিচারিয়া চাহি নাগ কোন খানে আছে॥
বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলো চান্দো বিসাদ ভাবিয়া॥

… … …

কথোক্ষণ থাকি চান্দে স্থির কৈল মন।
পদ্মাকে মন্দ বোলে কঠোর বচন॥
পুত্র মৈল খোটা জদি দেয় মোরে কানি।
তাহার জতেক গুণ আমি তারে জানি॥
পদ্মবনে পরিহাস্য করিল সঙ্করে।
সেই ত্বরাক্ষর বানি ঘোষয়ে সংসারে॥
পথে আনিতে ব'ছাই করিতে চাইল বল।
ঘরে আসি খাইল তবে সতাইর ঠোকর॥
দেব করিয়া বুলিতে লজ্জা নাহি কানি।
একরাত্রি বিহা করি ছাড়ি গেল মুনি॥
হাসন-হোসেন লাজ দিল বিধি মতে।
হেমতালে কাকালি ভাঙ্গিলো মোর হাতে॥
বেদ করিয়া গেল ধনন্তরীর ঘরে।
জপতপ করে কানি ধরিয়া নিল তারে॥

কোন দোস পাইয়া মোর কাটীল বাউগান।
অকারণে বুড়াইল ডিঙ্গা চৈদ্ধ খান॥
ডালমূল গেল মুর মৈদ্ধ হৈল সার।
অখনে কানির সনে চাপি করোঁ বাদ॥
যদি কানির লাইগ পাম একবার।
কাটিয়া স্থজিব আমি মরা পুত্রের ধার॥
জে করি করিমু কানিরে আমার মনে জাগে।
নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিঞা গাঙ্গে॥"

আধুনিক রুচির পক্ষে শোকার্ত পিতৃত্বের এই প্রকাশ যদি অমানুষিক, এমন কি 'বর্বর' বলেও প্রতিভাত হয়, তবু স্মরণ রাখা উচিত,- ব্যক্তি-চরিত্রের নিরাবরণ, নিরাভরণ প্রকাশ-জাত এই 'বর্বরতা' আদিম মনুষ্যত্বের সাধারণ লক্ষণ।—মানবধর্মের এই আদিম পরিচয়কেই কবি নারায়ণদেব অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ধার করেছেন। মৃত পতির সঙ্গে দেবপুরে গমনার্থিনী বেহুলার জন্য কলার ভেলা রচনার প্রস্তাব মাত্রেই—

"চান্দো বলে এক দুঃখ মৈল সাত বেটা।
তাহা হইতে অধিক দুঃখ কলা জাইব কাটা॥"

এইত আদিম মানুষের চরিত্র,—শোকে উন্মাদ, প্রতিহিংসায় অসুর-বল-ধারী, স্বার্থে সংকীর্ণ চিত্ত,—কিন্তু সর্বত্রই আত্ম-গোপনে অক্ষম,—স্ব-প্রকাশ-মানতার মহিমায় ভাস্বর,—সার্থক মহাকাব্যিক নায়ক (Epic Hero)।

কাব্য-কাহিনীর অধিকতর অনুসরণ করে লাভ নেই,—তাছাড়া অবকাশও অল্প। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক বলেন,—"মনসামঙ্গলকাব্য করুণরসের আকর। এই করুণ রসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণদেবের সমকক্ষ বড় কেহ নাই।" আমরা বলি,—কেবল শোক বর্ণনাতেই নয়,—শোকে-দুঃখে, আনন্দে-উল্লাসে,—স্বার্থপরতা এবং ঔদার্যে, সব দিক থেকেই, আদিম-মনুষ্যত্বের ধীরোদাত্ত স্বভাব বর্ণনায় নারায়ণদেব তুলনা-রহিত। নারায়ণদেব বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে আদিম-বর্বর (Crude) মনুষ্যত্বের মহাকবি।

মনসা-মঙ্গলের পরবর্তী কবি বিজয়গুপ্ত। মঙ্গলকাব্যের সন-তারিখ-যুক্ত প্রাচীনতম পুঁথির লেখক যে ইনিই—সে কথা পূর্বে বলেছি। রচনাকাল

সম্বন্ধে বিজয়গুপ্তের কাব্যের মুদ্রিত পুঁথিতে নিচের পয়ারটি পাওয়া গেছে :—

বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল ; রচনাকাল

"ঋতু শূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥"

প্রথম ছত্রটির বিচার অনুযায়ী ১৪০৬ শক গ্রন্থ-রচনাকাল বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু পরবর্তী ছত্রটির সংগে পূর্বছত্রের কোন প্রকার কালগত সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, প্রথম ছত্রের সংখ্যা নির্ণয়ে কোথাও কোন ত্রুটি আছে। কারণ, হুসেনশাহের রাজকালের সঙ্গে ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনো যোগ নেই। ১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া, বিজয়গুপ্তের গ্রন্থের কোন কোন পুথিতে পূর্বোক্ত প্রথম ছত্রটি নিম্নরূপে লিখিত হয়েছে :—

"ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক।"—

—সংখ্যাবিচারে এই ছত্রটি ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের দ্যোতনা করে ; হোসেনশাহের রাজত্বকালের অন্তর্ভুক্ত বলে এই সালেই বিজয়গুপ্তের কাব্য রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

কবির বর্ণনা থেকে জানা যায়,—

কবি-পরিচিতি

"মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গারোড়া তক্সিম্ ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
চারিবেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল ॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের শূর।
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর ॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয় ॥"

"গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রাম বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত। এই গ্রামে বিজয়গুপ্তের পূজিত বলিয়া কথিত মনসাদেবীর মূর্তি অদ্যাপি বর্তমান আছে।"[১১] কবির পিতার নাম সনাতন, মাতা রুক্মিণী,—এঁরা বৈদ্যবংশ-সম্ভূত।

১১। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

কানা হরিদত্ত সম্বন্ধে বিজয়গুপ্তের উল্লেখ থেকেই কবি-প্রতিভার নিজস্ব প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায়,—"যোড়া গাঁথা", "কথার সঙ্গতি ও সুস্বর" এবং "মিত্রাক্ষর" রচনাই বিজয়গুপ্তের কাছে কাব্যোৎকর্ষের সার্থক আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। ফলে, তাঁর নিজের রচনার মধ্যেও ঐ সকল বিষয়ের প্রতি,—আলংকারিক চমৎকৃতির প্রতি বিশেষ অরধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে বোঝা যায়,—বিজয়গুপ্ত সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। আর, কাব্য-রচনাকালে গভীর ভাবানুভূতির চেয়ে বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের 'পরেই তিনি সমধিক নির্ভর করেছিলেন। বিজয়গুপ্তের কবি-মানসের বিশিষ্টতা সম্পাদনে কালধর্মের প্রভাবও যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে করি। ইতিহাসের বিচারে বিজয়গুপ্ত যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক আলোচনায় সাম্প্রদায়িক মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা-শক্তি এবং পটভূমি রূপে আমরা তুর্কী-আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তী বিপর্যয়-কালের পরিচয় উদ্ধার করেছি। বিজয়গুপ্ত কাব্য-রচনা করেছিলেন তার সার্ধ দুই শতক পরে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিপর্যয়ের প্রাথমিক তীব্রতা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে পেয়ে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। বিদেশাগত আক্রমণকারিগণ এই সময়ে 'স্বদেশী'-রূপে এ দেশে সংস্থিত হয়েছিল। পারস্পরিক বোঝা-পড়ার প্রাথমিক অবস্থার শেষে মিলনাত্মক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছিল।[১২] কিন্তু এই নবোদ্ভূত মিলনবোধ কোন সুসংজ্ঞক জীবনাদর্শের অভাবে তখনো সর্বাত্মক সামাজিক পরিণামরূপে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। বারে বারে বলেছি,—তার জন্তে চৈতন্যাবির্ভাবের অপেক্ষা ছিল। এক কথায়, বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক বাঙালি জীবনে সাম্প্রদায়িক বিবদমানতার অবসান ঘটেছিল,- কিন্তু অখণ্ড-সংসক্ত নবযুগ-চেতনা গড়ে ওঠেনি। ফলে, নারায়ণদেবের কাব্যের প্রাণ-সংহতি কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের কাব্যের প্রাণ-ব্যাপ্তি কোনটিই বিজয়গুপ্তের কাব্যে দানা বেঁধে উঠ্‌তে পারেনি। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে কোন নিশ্চিত জীবন-বোধের নিয়ন্ত্রণের অভাবে কবি

বিজয়গুপ্তের কবি-ধর্মের স্বরূপ

১২। এসময়ের ঐতিহাসিক পরিচয়ের জন্ত 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রূপ-চাকচিক্য সৃষ্টির প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। ছন্দ, অলংকার ও বাচনভঙ্গির কলাকৌশলের সাহায্যে বিজয়গুপ্ত পাঠকসাধারণের মনোহরণের চেষ্টা করেছিলেন। কাব্যাংশের আলোচনা করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে।

বিজয়গুপ্তের বিদগ্ধ বাচনভঙ্গি তাঁর রচনার বহু অংশকে আজও বাঙালি জন-জীবনে বহুপ্রচলিত প্রবচনের মর্যাদা দান করে রেখেছে :—

"অতিকোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর।
অতি বড় গাঙ্ হইলে ঝাটে পড়ে চর ॥"
"যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে খসে।"

বাচন-ভঙ্গির এই বৈদগ্ধ্য কেবল পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতাই নয়, বিজয়গুপ্তের বাক্-চাতুর্য এবং কলা-কুশলতারও পরিচয় প্রকাশ করে থাকে।

বিজয়গুপ্তের কাব্যের শিল্পমূল্য

শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে এই চাতুর্যের সহায়তায় অনুভূতি-নিবিড় রস-সৃষ্টি অপেক্ষা চটকদার রসিকতার প্রতিই কবির ঝোঁক ছিল বেশি। এই প্রচেষ্টার একটি উৎকট উদাহরণরূপে পদ্মার বিবাহ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে হর-গৌরী কথোপকথনের অংশ-বিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে। শিব-কর্তৃক পদ্মার বিবাহ উপলক্ষ্যে স্ত্রী আচারের আয়োজন করার জন্য আদিষ্ট হলে—

"হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এ'য়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা চাইবে পান খাইতে
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে ॥
হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হইয়া।
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়া ॥"

সন্দেহ নেই, ব্যভিচারী গ্রাম্য চরিত্রের এই বর্ণনা আধুনিক রুচির দরবারে অপাংক্তেয়। কিন্তু বিজয়গুপ্তের কাব্যের পক্ষে ঐটুকুই বড় কথা নয়। মঙ্গল-কাব্যপ্রবাহের মধ্যে সাধারণভাবে শিব-চরিত্রের যে চিত্রাংকণ করা হয়েছে,—তা'তে নৈতিক রুচিবোধের উৎকৃষ্টতর পরিচয় বড় একটা নেই। বস্তুতঃ, সমসাময়িক লোক-জীবনের দৈন্য-দুর্বলতার আধারেই এই লোক-

দেবতার উদ্ভব। কিন্তু, লক্ষ্য করা উচিত, লৌকিক শিব ব্যভিচারী হলেও সাধারণ লোক-জীবনের নিকট ঐটুকুই তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল না,—ব্যভিচারী হলেও তিনি নৈতিক দুর্বলতাসম্পন্ন ছিলেন না,—সাধারণের চোখে তাঁর চারিত্রিক অখণ্ডতা বা বিশুদ্ধতা (Integrity of character) অক্ষুন্ন হয়েছিল। কিন্তু বিজয়গুপ্তের রচনার উদ্ধৃতাংশে আদিরস-রসিকতার প্রতি অত্যধিক উল্লাসহেতু শিব-দেবতার সেই চারিত্রিক সামগ্রিকতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। বিজয়গুপ্তের সমগ্র কাব্যের মধ্যেই এই সামগ্রিকতাবোধ-জনিত ভার-সাম্যের অভাব আছে বলে মনে করি। কারণ হিসেবে পূর্বেই বলেছি,—বিজয়গুপ্ত ছিলেন যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধরণের উপাদানকে একই চরিত্রের মধ্যে সংহতি-দান করা বা বিভিন্ন চরিত্রকে ভাবৈক্যে-নিবিষ্ট সামগ্রিক করে তোলার মত সংসক্ত জীবন-বাণীর সঞ্চয় কবির ছিল না। তাই, ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের প্রতি,—সংহতি-সামগ্রিকতা অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন স্বয়ম্পূর্ণতা সৃষ্টির প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল সর্বাধিক। তাই দেখি, বিজগুপ্তের কাব্যে বিভিন্ন পালা-বিভাগের যেন আর অন্ত নেই,—আর প্রতিটি 'পালাই' এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনী। অত কাহিনী-বিচ্ছিন্নতার দরুণ মূল বিষয়ের সামগ্রিক সংসক্তি নষ্ট হয়েছে। তাহলেও, একথা বলতেই হয়, কবির অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য এবং রস-বৈদগ্ধ্যের মধ্যে গল্প-রসটি বেশ জমাট্ হয়ে উঠেছে। লখাইর মৃত্যুর পর, বিজয়গুপ্ত চন্দ্রধরের শোক-গাথা রচনা করেছেন :—

"কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর।
চম্পকের রাজা আমার বালা লক্ষ্মীন্দর॥" ··

শোক-বিহ্বল পিতৃ-হৃদয়ের এই আর্তি করুণরসের আকর সন্দেহ নেই। এর সংগে পূর্বোদ্ধৃত নারায়ণদেবের শোকার্ত চন্দ্রধরের চিত্রটি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। সেখানে অন্যায় লাঞ্ছনার প্রতিবাদে পিতার শোক প্রতিহিংসা-ক্রোধানলে ঝল্‌সে উঠেছে—

নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্ত

"ডাল মূল গেল মোর মৈদ্ধ হৈল সার।
অখনে কানির সনে চাপিয়া করোঁ বাদ॥
জদি কানির লাইগ পাম একবার।
কাটিয়া সুজিব আমি মরা পুত্রের ধার॥"

আর একটি রচনাংশের পরিচয় উদ্ধার করি। বাণিজ্য-পথে সপ্তডিঙা হারিয়ে চন্দ্রধর তখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অশেষ দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে। এমন অবস্থায়, হঠাৎ দৈবের কৃপায় তিনি 'চারপণ' কড়ি পেয়ে যান। নিঃস্ব চন্দ্রধর এই চারপণ কড়ি নিয়েই বিলাসিতার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন। এই প্রসংগে বিজয়গুপ্ত লিখেছেন :—

"এক পণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হ'ব।
আর এক পণ কড়ি দিয়া চিড়া কলা খাব॥
আর এক পণ কড়ি দিয়া নটীবাড়ী যাব।
আর এক পণ কড়ি দিয়া সোনেকারে দিব।"

নারায়ণদেব একই ঘটনার চিত্রোদ্‌ঘাটন করেছেন,—

"চান্দ বলে অর্ধেক কড়ি বৈসায়া খাব।
আর অর্ধেক কড়ি আমি নটীরে বিলাইব॥
নগরে বাজাইব বাদ্য বিষহরি মুডান।
লঘু কাণি শুনিলে যেন পায় অপমান॥"—

নারায়ণ দেবের রচনায় এখানেও সেই ক্রোধ-প্রতিহিংসার সমুজ্জলতা। এ'কেই বল্‌ছিলাম চারিত্রিক সংহতি,—আনুপূর্বিক সামগ্রিকতা,—Integrity of character. এর সংগে তুলনায় আলোচনা করলেই বোঝা যাবে, বিজয়গুপ্তের চন্দ্রধর বিচিত্র, কিন্তু সমগ্র নয়।

কাহিনী-পরিকল্পনা, ভাষা-রচনা, ছন্দ-অলংকারের প্রয়োগ,—সর্বত্রই বিজয় গুপ্তের এই বৈচিত্র্য-প্রীতির পরিচয় সুস্পষ্ট। নারায়ণদেবের কাব্য পয়ার-লাচাড়ীর গতানুগতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ, বাংলা ছন্দের একঘেঁয়েমির যুগে বিজয়গুপ্তই প্রথম বিচিত্র ছন্দোসুষমা সৃষ্টির চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেন। ছন্দ-অলংকারের প্রয়োগ, তথা কাব্যের রূপ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিজয়গুপ্তের মধ্যে ভারতচন্দ্রের পূর্বাভাসটিই যেন ফুটে উঠেছে। প্রকাশ-ভঙ্গি, কাহিনী-রচনা চরিত্র-সৃষ্টি, — সর্বোপরি ভাবাদর্শের উপস্থাপনায় নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণকে যদি প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা সংগত হয়, তা'হলে বিজয়গুপ্তের কাব্যকে গল্প-বৈচিত্র্যে পুষ্ট শ্লথ-বন্ধন কাহিনী-কাব্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। নারায়ণদেবের কাব্য জীবন-রসের আকর,— বিজয়গুপ্তের কাব্যে গল্প-রসেরই প্রাধান্য।

আদি-মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে বিপ্রদাস পিপিলাইর উল্লেখও করা হয়ে থাকে।[১৩]

কবির আত্ম-বিবরণী থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম ছিল মুকুন্দ-পণ্ডিত। কবি সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, এঁদের গোত্র বাৎস্য, কৌথম শাখা, পঞ্চপ্রবর, পিপিলাই গাঁই। বহুদিন যাবৎ কবির পূর্বপুরুষগণ ছিলেন বাদুড্যা বটগ্রাম নিবাসী।[১৪]

মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই

রচনাকালজ্ঞাপক নিচের পদটি বিপ্রদাসের গ্রন্থে পাওয়া গেছে :—

"সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান॥
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রত গীত।
শুনিয়া বিবিধ লোক পরম পীরিত॥"

কিন্তু, মূল রচনার সম্বন্ধে এই শ্লোকটির প্রামাণ্য কতদূর প্রযোজ্য, এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে।[১৫] বিপ্রদাসের কাব্যের মাত্র দু'খানা পুথি পাওয়া গেছে। কোনটিরই লিপিকাল উনিশ শতকের আগে নয় বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। তা'ছাড়া, পুথি দুইখানিই খণ্ডিত; কোনটিতেই বেহুলা-লখিন্দরের গল্পের আরম্ভ হতে পারেনি। দু'খানি পুথিরই লিপি, ভাষা ও বিষয়-বর্ণনায় নিতান্ত অর্বাচীনতার লক্ষণ রয়েছে। এ-বিষয়ে নানা তথ্য-প্রমাণ উদ্ধার করে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করেছেন,—"পুথির কাল-নির্দেশক পদ উহার মধ্যস্থিত অন্যান্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।"[১৬]

যাই হোক্, স্পষ্টতর বিরুদ্ধ-প্রমাণের অভাবে আমরা বিপ্রদাসকে আলোচ্য কাল-সীমাতেই উপস্থিত করছি।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে চণ্ডীমঙ্গল সাহিত্যের স্থান সমুচ্চ। পূর্বালোচিত মনসামঙ্গল বিশেষ করে পূর্ববাংলায় জাতীয় কাব্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই, প্রতিভাধর নানা কবি শতাব্দীর পর শতাব্দী

১৩। ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় অধুনা বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' মুদ্রিত হয়েছে।

১৪। পাঠান্তরে নাদুড্যা

১৫। দ্রষ্টব্য—বাইশা-ভূমিকা; মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

১৬। দ্রষ্টব্য—ঐ।

ধরে মনসামঙ্গল কাব্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। এদিক্ থেকে, মনসামঙ্গলের রচনাগত উৎকর্ষের নিঃসংশয় নিদর্শন যেমন রয়েছে, তেম্‌নি সংখ্যাগত প্রাচুর্যও অজস্র। চণ্ডীমঙ্গলের ইতিহাস কিন্তু তার বিপরীত। এপর্যন্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ্য মাত্র দুজন কবির পরিচয় পাওয়া গেছে।[১৭] কিন্তু, ঐ দুজন-মাত্র কবিই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে বাংলা মঙ্গল-কাব্যের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম কেবল মঙ্গলকাব্যেরই নয়, মধ্যযুগের বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যেরও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

কবি মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতর বিখ্যাত কবি দ্বিজমাধবও ছিলেন তাঁর সমসাময়িক।

চণ্ডীমঙ্গল ও চণ্ডীদেবতার উৎস

এর চেয়ে প্রাচীনতর কালে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়নি। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের এই সব কাব্যগ্রন্থকে আশ্রয় করে চণ্ডীমঙ্গলের মূল দৈবীচেতনার পরিচয় আবিষ্কার সম্ভব নয়। তবু, এই চণ্ডীদেবতাও যে মূলতঃ আর্যেতর লোক-জীবন-সম্ভব, এ-বিষয়ে সংশয় থাকা উচিত নয়।

পরে ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক ধর্মাদর্শের স্বভাবগত বিমিশ্রতার প্রভাবে এই আর্যেতর দেব-কল্পনা নানা বৈচিত্র্য অর্জন করেছে। আর্যেতর মূলোদ্ভূত অন্যান্য বহু দেবদেবীর মত চণ্ডীও কালে কালে আর্য-পৌরাণিক ধর্মপ্রবাহের সংগে বিচিত্ররূপে মিলিত হয়ে পড়েছেন। আজ আর তাঁর মৌল স্বভাবকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, একাধিক পারিপার্শ্বিক ও ঐতিহাসিক কারণে চণ্ডীদেবতার 'পরে ধর্মগত কল্পনা-বিমিশ্রতার পরিমাণ সমধিক হয়েছিল। ফলে, স্বভাবতঃ জটিল লোক-দেবতাদের মধ্যে চণ্ডীর কল্পনা-উৎস অধিকতর দুরধিগম্য হয়েছে।

প্রাচীনতর পণ্ডিতদের চিন্তাধারা অনুসরণ করে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-কার চণ্ডীকে অনার্য উৎস-সম্ভব বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে 'চণ্ডী' শব্দটিই আসলে অনার্য ভাষা-সঞ্জাত,—"সম্ভবতঃ অষ্ট্রিক কিংবা

১৭। অধুনা চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে অভয়ামঙ্গল নামে আর একখানি কাব্যের পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। আবিষ্কারক শ্রীআশুতোষ দাস। পণ্ডিতেরা এই কাব্যের শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছেন। যথাস্থানে এর আলোচনা করা যাবে।

দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত।"[১৮] আবার, ছোট নাগপুরের দ্রাবিড়-ভাষী ওরাওঁ জাতির মধ্যে "চাণ্ডী" নামক এক শক্তিদেবীর পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি শিকারী ও যোদ্ধাদের বিজয়দাত্রী। ব্যাধ কালকেতুর পূজিত মঙ্গলচণ্ডীর কার্যাবলী ও মহিমার সংগে এই চণ্ডীদেবতার বহুল সাদৃশ্য রয়েছে। যথা: (১) তিনি মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবতা, (২) বহুরূপধারিণী (৩) শিকারির দৃষ্টি থেকে পশু-গোপন-কারিণী ইত্যাদি। এর থেকে অধ্যাপক ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করেন,—"ওরাওঁ সমাজের উপরিবর্ণিত[১৯] চাণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ-কাহিনী-বর্ণিত চণ্ডীদেবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই,—উভয়েই অভিন্ন।"[২০]

চণ্ডী অনার্য উৎস-সম্ভব

অন্যদিকে দেখা যায়,–বেদ, রামায়ণ-মহাভারতের মত মহাকাব্য, এমন কি কোন প্রাচীন পুরাণেও চণ্ডীর প্রামাণ্য উল্লেখ নেই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কালের পুরাণেই এই দেবতার বিশদ্ উল্লেখ-বর্ণনা রয়েছে। আর, পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, প্রায় এই সময়েই লৌকিক মঙ্গল-দেব-দেবীরা ব্রাহ্মণ্য-পুরাণের ঐতিহ্যের সংগে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এদিক থেকেও মনে করতে বাধা নেই যে, আলোচ্য চণ্ডী-দেবতা আদিতে অনার্য মূলোদ্ভূত-ই ছিলেন; পরে নানা বৌদ্ধ ও হিন্দু-তান্ত্রিক দেব-পরিকল্পনার সংগে বিমিশ্রতা লাভ করে ক্রমে ইনি পৌরাণিক পার্বতীর সংগে সম-ঐতিহ্য-সূত্রে বিধৃত হয়েছেন।

অধুনা শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য মঙ্গলচণ্ডী সম্বন্ধে এই মৌল অনার্য স্বভাবের কথা অস্বীকার করেছেন।[২১] তাঁর মতে তন্ত্রের সূত্র সন্ধান করলে মঙ্গল চণ্ডীর অনার্যেতর উৎস আবিষ্কৃত হতে পারে। শ্রীভট্টাচার্যের বিচারের উপস্থাপনা সম্বন্ধেই সংশয়ের কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ তন্ত্রকে বেদ-পুরাণের মত আর্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধি বলে দাবি করা চলে না; যদিও ভারতের এক বিশাল অংশে বেদ-প্রাচীন সময় থেকেই তন্ত্রের প্রাধান্য লক্ষিত হয়েছে। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এ-বিষয়ে দ্বিধাহীন মন্তব্য করেছেন,—"দ্রাবিড়াদি বিভিন্ন অনার্য জাতির মধ্যে তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীনকালেই

মতান্তর ও চণ্ডীর তান্ত্রিক রূপ

১৮। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)। ১৯। দ্রষ্টব্য ঐ। ২০। ঐ। ২১। মঙ্গল চণ্ডীর গীত-ভূমিকা।

ভারত এবং তৎসমীপবর্তী দেশে প্রচলিত ছিল। মনে হয়, তাহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় আর্যগণ উহা গ্রহণ করিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন।”[২২] অতএব, চণ্ডীদেবতা যদি তন্ত্র-মূলোদ্ভূত হয়েও থাকেন, তা'হলেও তাঁর আর্যেতর মৌল-স্বভাব অস্বীকার করবার কারণ নেই।

অন্যদিক থেকে শ্রীভট্টাচার্য মঙ্গলচণ্ডীর দৈবীলক্ষণ সমূহের মধ্যে উমা, চণ্ডিকা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মত পৌরাণিক দেবতার প্রভাব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এ'দিক থেকে শ্রীভট্টাচার্য ষোড়শ শতকে লিখিত দু'খানি বাংলা চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। সন্দেহ নেই, কবি মুকুন্দরাম এবং দ্বিজমাধব, দুজনেই স্মার্ত-পৌরাণিক সমাজের অধিবাসী ছিলেন, এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁদের ব্যুৎপত্তিও ছিল যথেষ্ট। অতএব, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সেই যুগে চণ্ডীদেবতার মধ্যে আর্য-স্বভাবই অধিক প্রকট হয়েছিল, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী-cult পরিকল্পনার আদিমতমরূপ মুকুন্দরাম অথবা দ্বিজমাধবের কাব্যে অটুট থেকেছে,—একথা কিছুতেই অনুমান করা চলে না। ঐ দুটি কাব্য মঙ্গলচণ্ডী-cult-এর পরিণামী পরিচয়ই বহন করে; আর তাতে পুরাণ-তন্ত্রাদির অজস্র প্রভাব রয়েছে। কিন্তু, তাতে করে মঙ্গলচণ্ডীর আদিম দৈবীস্বভাবের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না। বস্তুতঃ, শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য নিজেও তন্ত্র থেকে মঙ্গলচণ্ডীর “আদিরূপ” উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন—“এই আদি-মূর্তির মূলে যে-ঘোরা তান্ত্রিক দেবী-মূর্তি রহিয়াছেন, তিনি হয়ত অনার্য সমাজ হইতেই গৃহীত।[২৩]

আমাদের ধারণা, শ্রীভট্টাচার্য-ও মঙ্গলচণ্ডীর মৌল আর্যেতর উৎস সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান না। কেবল ওঁরাও জাতির চাণ্ডী দেবতার সংগে এঁর অভিন্নত্ব স্বীকারেই তাঁর আপত্তি। তিনি বলেন,—“কালিকা-পুরাণে কামাখ্যাক্ষেত্রের নিকটেই মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং, আমাদিগকে একান্তই যদি অনার্য সমাজে মঙ্গলচণ্ডীর আদিপীঠের সন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে কিরাত মহাজাতির অর্থাৎ মোঙ্গলীয় অনার্যদের ধর্মজগতেই তাহা করিতে হইবে, ওঁরাও-মুণ্ডাদের সমাজে মঙ্গল-চণ্ডীর আদি-পীঠ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করি না।”[২৪]

২২। তন্ত্রকথা। ২৩। মঙ্গলচণ্ডীর গীত—ভূমিকা। ২৪। ঐ।

বর্তমান প্রসংগে, এতাধিক বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ওঁরাও-মুণ্ডা, অথবা কিরাত-মোঙ্গলিও, যাই হোক্, চণ্ডীদেবী মূলতঃ আর্যেতর সমাজ থেকেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিলেন। কালে কালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পুরাণ এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনতন্ত্রাদির নানা দেবী-কল্পনার প্রভাব তাঁর মধ্যে এসে পড়েছে। আর, এই বিমিশ্রতা-জনিত রূপ-জটিলতা নিয়েই তিনি ষোড়শ শতকের চণ্ডী-কাব্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সাধারণ ধারণাকে স্বীকার করে নিয়ে এবার আমরা চণ্ডীকাব্য-কাহিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

সিদ্ধান্ত

চণ্ডীমঙ্গলের মূল কাহিনী অর্থাৎ 'নরখণ্ড' ছ'টি পৃথক্ গল্পের দ্বারা গ্রথিত। আর মনসামঙ্গলের মত চণ্ডীকাব্যের কাহিনীও কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় নি। অতএব, চণ্ডী-কাহিনীও মনসামঙ্গলের মতই লোক-জীবন-সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম গল্পটিতে ব্যাধ-দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরার জীবন গাথা রচনা প্রসংগে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ব্যাধ-জীবনের গ্লানি এবং দৈন্য থেকে মুক্ত হয়ে দেবী চণ্ডীর প্রসাদে কি করে ফুল্লরা এবং কালকেতু বিশাল রাজ্যাধিকারী হয়েছিল ;—আবার আকস্মিক ভাগ্য-স্ফীতির ফলে দাম্ভিকতা-হেতু চণ্ডীকে বিস্মৃত হয়ে কি ক'রে অশেষ দুর্গতি লাভ করেছিল ; সবশেষে চণ্ডীর শরণাপন্ন হ'য়ে কি করে দেবীর কৃপায় পুনরায় সুখ-সমৃদ্ধি-পূর্ণ রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,—তারই কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল। অবশ্য, এই উপলক্ষ্যে কালকেতু-ফুল্লরার জীবন-সাধনার মাধ্যমে কি ক'রে জগতে দেবী-পূজা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল,—আলোচ্য কাহিনীর মৌল প্রতিপাদ্যের ঝোঁক ছিল সে-দিকেই।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীদ্বয়

দ্বিতীয়, ধনপতি-লহনা-খুল্লনা-কাহিনী অনেকটা পরিমাণে মনসামঙ্গলের বলিষ্ঠ নায়ক চন্দ্রধরের শৌর্যময় চরিত্রের ব্যর্থ অনুকরণের চেষ্টা। ধনবান্ এবং বিলাসী সদাগর ধনপতি পায়রা ওড়াতে গিয়ে জ্ঞাতি-শ্যালিকা বালিকা খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হ'ন ও তাকে বিয়ে করেন। বিবাহের পর প্রথমা পত্নী লহনার তত্ত্বাবধানে খুল্লনাকে রেখে সাধু বাণিজ্যোপলক্ষ্যে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন এবং সেখানে বারবনিতা-বিলাসে মত্ত হয়ে থাকেন। এই অবকাশে দুর্বলা নাম্নী দাসীর প্ররোচনায় লহনা খুল্লনার 'পরে অকথ্য অত্যাচার করতে

থাকে। চেলী-মাত্র-বাস খুল্লনা বনে ছাগল চরাতে গিয়ে চরম বিপদের মুখে চণ্ডী-মাহাত্ম্য জ্ঞাত হয়। পরে চণ্ডীর আরাধনা করে, তাঁরই কৃপায় বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামীর সোহাগ-ভাগিনী হয়। খুল্লনা সন্তান-সম্ভবা হলে ধনপতি-সদাগর পুনরায় বাণিজ্যযাত্রা করে। কিন্তু শিব-ভক্ত সাধু চণ্ডী-বিদ্বেষ হেতু বিদেশে গিয়ে কারারুদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে চণ্ডী-কৃপা-লব্ধ খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত বড় হয়ে উঠে দেবী-কৃপায় বিদেশস্থ পিতার বিপন্মুক্তি সাধন করে। অবশেষে ধনপতি চণ্ডী-মাহাত্ম্য-স্বীকার করতে বাধ্য হন। এইরূপে চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই দুটি কাহিনীর মধ্যে কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীটি প্রাচীনতর কালের কল্পনা; ধনপতি-লহনা-খুল্লনা কাহিনী অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। দৈহিক শক্তি-মত্ততা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, রুচি এবং চিন্তাগত স্থূলতার প্রতীক কালকেতু ও ফুল্লরার চরিত্র-দুটি যেন আদিম 'শূর-দম্পতি'র মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। চাঁদসদাগর-চরিত্রের মতই এরা যেন আদিম মনুষ্যত্বের দুটি ক্ষেত্র-জ বিকাশ। অপরপক্ষে ধনপতি-কাহিনীতে সেই গভীর জীবন-বোধ, সেই কাব্যিক উদাত্ততা যেন অনেকটা ক্ষুন্ন হয়েছে। রুচিবিকার, সম্পন্ন-জীবনের নিকৃষ্ট দেহ-বিলাস ইত্যাদি মানস-আবেদনহীন বিষয়ের চাকচিক্যপূর্ণ বর্ণনাই সমস্ত গল্পটিতে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। বাঙালি জীবনে ব্যক্তি-মহিমা যে আদিম যুগে চরম-বর্বরতার সঙ্গে পরম-মনুষ্যত্বের সৌন্দর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল, চাঁদসদাগর-বেহুলা অথবা কালকেতু-ফুল্লরার প্রাথমিক পরিকল্পনা সেই যুগেই অন্ততঃ কাঠামোর আকারে গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু ধনপতি-কাহিনী বাংলার পরবর্তী কোন দুর্বল যুগের নৈতিক ব্যভিচার-পীড়িত নির্বীর্য সমাজের বীরত্ব-পরিকল্পনার ব্যর্থ চেষ্টা বলে মনে করি। এই কৃত্রিম শৌর্য-চিত্রণের চেষ্টায় মঙ্গল-সাহিত্যের বীর্যবত্তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক চন্দ্রধর-চরিত্রের অন্ধ অনুকরণ করা হয়েছে। তাতে বিকৃতি ঘটেছে যথেষ্ট, কিন্তু সার্থকতা বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

কাহিনী-দ্বয়ের কাল-বিচার

পূর্বে বলেছি, মঙ্গলসাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি মুকুন্দরামের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-কাহিনীর মাধ্যমে। কিন্তু এই কাব্য-কাহিনীর

উদ্ভব-ইতিহাস এবং আদিকবির পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তবে চৈতন্য-পূর্ব বাংলাদেশে মঙ্গলচণ্ডী-গীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা যে অর্জন করেছিল, তার প্রমাণ পাই বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে। চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্ববর্তী নবদ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেন,—

"ধর্মকর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥"

অপরপক্ষে স্বয়ং মুকুন্দরাম কবি-বন্দনা-প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয় ॥
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া পিতামাতার চরণ ॥"

এর থেকে অনুমান করা হয়,—মাণিকদত্ত নামে কোন পূর্বসূরীর রচনার অনুসরণ করে মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যরচনা করেছিলেন; আবার কবিকঙ্কণ নাম বা উপাধি-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি ছিলেন তাঁর কাব্যগুরু। মুকুন্দরামের কাব্য ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। অতএব, মাণিকদত্ত যে তার পূর্ববর্তী কালের লেখক, একথা মনে করা যেতে পারে। কিন্তু কোন কোন গবেষক মাণিকদত্তকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর কাব্যে মুকুন্দরামের প্রভাব পর্যন্ত প্রদর্শন করেছেন। মাণিকদত্তের গ্রন্থে মুকুন্দরামের প্রভাবিত অংশসমূহ যে প্রক্ষিপ্ত, স্বয়ং মুকুন্দরামের পূর্বোদ্ধৃত স্বীকৃতি থেকে তা অনুমান করা চলে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মাণিকদত্তকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করেন। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উদ্ধার করে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন, "এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্যসংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বেই মাণিক দত্তের কাহিনী রচিত হইয়াছিল।" অপর পক্ষে "মাণিকদত্তের নামে প্রচলিত একখানিমাত্র হস্তলিখিত পুথির"[২৫] সন্ধান পাওয়া গেছে। তা'র কোন এক শূন্য পৃষ্ঠায় ১১৯১ সাল অর্থাৎ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ লিখিত আছে দেখে শ্রীভট্টাচার্য অনুমান করেছেন,—ঐ সনেই আলোচ্য পুথিখানি অনুলিখিত হয়েছিল। আর "ইহার অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্বে পুথিটি রচনা হওয়া

কবি মানিকদত্ত

২৫। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

সম্ভব।"[২৬] সন্দেহের সুযোগ দিয়ে আমরা মাণিকদত্তকে আলোচ্য চৈতন্য-পূর্ব-যুগের অন্তর্ভুক্ত করছি।

মানিকদত্তের পুথির সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায়,—তিনি ফুলুয়া নগরের অধিবাসী ছিলেন। অনেকে এই ফুলুয়া মালদহ জেলার বর্তমান ফুলবাড়ী বলে নির্দেশ করে থাকেন। কবির রচনাংশসমূহ মালদহ জেলা থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া, কাব্যে বর্ণিত বহু স্থান মালদহ জেলায় অবস্থিত। যাইহোক্, কবির আত্মপরিচয় থেকে আরো জানা যায়, তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। কিন্তু দেবীর প্রসাদে তাঁর বিকলাঙ্গ-সমূহ সুস্থ-সবল হয়ে ওঠে। আবার দেবীর প্রসাদেই কবিত্ব লাভ করে তিনি কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মাণিক-দত্তের কাব্য-পুথির প্রক্ষেপ-বাহুল্য থেকে মূল কবির রচনা-পরিচয় উদ্ধার করে পূর্ণাঙ্গ কাব্য-বিচার সম্ভব নয়। মোটামুটি বলা চলে, এই প্রাথমিক ধরণের রচনাতেও সরসতার অভাব ছিল না।

কবি-পরিচয়

মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর তুলনায় ধর্মমঙ্গলের দেবতা ধর্ম ঠাকুরের দেব-স্বভাবে আর্যেতর কল্পনার প্রভাব স্পষ্টতর। এর কারণ আবিষ্কারও দুঃসাধ্য নয়। ধর্মপূজা বাংলা দেশের এক বিশেষ অঞ্চলেই একান্ত-নিবদ্ধ ছিল। মনসা এবং মঙ্গলচণ্ডী আঞ্চলিক দেবতা হলেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক ভূখণ্ডে এঁদের পূজা প্রসারিত হয়েছিল। অবশ্য আঞ্চলিক প্রভাব-হেতু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার পূজাচার ও লোকাচার অনুসৃত হত। কিন্তু ধর্মপূজা একমাত্র পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলেই দীর্ঘস্থায়ি হয়েছিল। "প্রাচীনকালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি—এই সীমানা বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল।"[২৭] বর্তমানে রাঢ়খণ্ড হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত হয়ে আছে। রাঢ়ের বৃহত্তর অঞ্চল দীর্ঘকাল অনার্য অধ্যুসিত ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের মধ্যে রাঢ়ের উত্তর-পূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধনেই হয়ত আর্যসভ্যতার প্রথম বিস্তার ঘটেছিল। বাংলা দেশে প্রথম আর্য-প্রভাব প্রসারের কাল হিসেবে খ্রীঃ পূঃ শেষ কয় শতাব্দীর নির্দেশ করা হয়। কিন্তু রাঢ়ে আর্য-প্রতিষ্ঠার

রাঢ়ের ধর্মপূজা

২৬। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)। ২৭। দ্রষ্টব্য—ঐ।

পূর্ণ পরিচয় পাই ঐ অঞ্চলে সেন-রাজদের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। আর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকেই, হয়ত পাল আমলে, পৌণ্ড্রবর্ধন অঞ্চল থেকে আর্য-বৌদ্ধ সংস্কার রাঢ়ভূমিতে প্রথম প্রবেশ করতে পায়।[২৮] অতএব, বৃহত্তর বঙ্গের আর্যীভূত হওয়ার পরেও প্রায় এক সহস্রাব্দী রাঢ়ে অনার্যপ্রভাব প্রবল প্রতাপে অক্ষুণ্ণ ছিল,—একথা মনে করা যেতে পারে। এই কারণেই আর্য-প্রভাবিত বাঙালিরা প্রাচীন কাব্যে 'রাঢ়' শব্দের দ্বারা অসভ্য, অনার্য ইত্যাদি অর্থের দ্যোতনা করতে চেয়েছেন। রাঢ়ের এই আর্যেতর তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজেই ধর্মপূজা একদা একান্তবদ্ধ ও বহুল প্রচারিত ছিল। অনুমান করতে বাধা নেই, দীর্ঘকাল আর্য সামাজিকতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে রাঢ়ের ধর্ম-পূজকেরা নিজ নিজ আচার-আচরণ সম্বন্ধে দৃঢ় রক্ষণশীল হতে পেরেছিলেন। তারই ফলে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ধর্ম-সংমিশ্রণের যুগ-সন্ধিক্ষণেও ধর্মদেবতা আর্য-পৌরাণিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন নি। অন্ততঃ এ-কথা নিশ্চিত যে, দ্বাদশ শতকের পরবর্তীকালে রচিত প্রায় সকল হিন্দু পুরাণেই মনসা এবং চণ্ডীর উল্লেখ-বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকেও ধর্মগীতি রচনার অপরাধে কবি রূপরাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু সমাজে পতিত হয়েছিলেন। অতএব, ধর্মপূজা বিশেষভাবে অনার্য-মূলোদ্ভূত যে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ধর্মদেবতার বিমিশ্র স্বরূপ

কিন্তু, প্রাচীন আলোচনায় ধর্মঠাকুরের এই অনার্য স্বভাব সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হয় নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন; তাঁর মতে ধর্ম প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-দেবতা। তিনি মনে করেন, ধর্ম শব্দটি, বৌদ্ধ ত্রিশরণের একটি। এই অনুমানের প্রতিষেধক হিসেবেই যেন পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা ধর্মঠাকুরকে কেউ যমের সংগে, কেউ বিষ্ণুর সংগে কেউবা সূর্যের সংগে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেছেন,—ধর্ম শব্দটি এসেছে কূর্ম-পূজক কোন অনার্য জাতির ভাষা থেকে। এই প্রসংগে তিনি কূর্মাকৃতি ধর্মশিলার উল্লেখও করেছেন। আগেই বলেছি, ডঃ সুকুমার সেন ধর্মের সংগে বৈদিক সূর্যের বহুল সাদৃশ্য উপস্থিত করেছেন। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, ধর্মদেবতার বর্তমান

২৮। দ্রষ্টব্য—মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

পরিকল্পনা ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে বৌদ্ধ-লোকাচার এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রীয় ও লৌকিক আচার নানা পরিমাণে মিশ্রিত হয়েছে। ফলে ধর্মদেবতা এক জটিল বিমিশ্র রূপ লাভ করেছেন, যার উৎস বিচারে জটিলতার পাক খুলতে গিয়ে জটিলতাই কেবল বেড়ে যায়। কিন্তু ধর্মপূজার নানারূপ লোকাচার, ধর্ম-কাহিনী এবং তথাকথিত নিম্নসমাজে আজও ধর্মদেবতার একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দেখে এই দেবতার অনার্য-মূল সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। ধর্ম-কাব্যগুলির আভ্যন্তরীণ বিচারেও এই অনার্য-স্বভাব স্পষ্ট হতে পারবে।

কিন্তু এই প্রসংগেও প্রথমেই স্বীকার করতে হয় যে, ধর্ম-সাহিত্যের উদ্ভব বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় নি। ধর্মদেবতা সম্বন্ধে লিখিত যত কাব্যের পরিচয় এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার একটিরও লিপিকাল সপ্তদশ শতকের আগে নয়। বিষয়বস্তু অনুযায়ী এই সকল কাব্য-পুথিকে দুইভাগে ভাগ করা চলে। (১) ধর্মপূজা-পদ্ধতি বা ধর্মপুরাণ এবং (২) ধর্মদেবতার মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মপুরাণ সম্বন্ধে বলা হয় রামাই পণ্ডিত নামে কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে লিখিত হয়েছে,—

ধর্মসাহিত্য

"তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোসাঞি গ্রন্থে কহিলা যেমন॥"

অনেকের ধারণা, এই পণ্ডিত গোসাঞি ও রামাই পণ্ডিত অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রামাই পণ্ডিতের মৌলিক রচনা বলে কথিত শূন্যপুরাণের আলোচনা ও ঐতিহাসিক বিচার বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ-পর্যায়ে করেছি।

এবারে ধর্মমঙ্গল কাব্য-কাহিনীর আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই বলতে হয়, অধুনাতনকালে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর সকল কাব্যেরই প্রধান উপজীব্য লাউসেন-কথা। তবে, মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের মত ধর্মমঙ্গলেরও একটি প্রাচীনতর কাহিনী ছিল বলে অনুমিত হয়। লাউসেন-কাহিনীতে দেখি,—পুত্র-কামনা করে রঞ্জাবতী 'শালে ভর' দিয়ে প্রাণান্তকর সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি স্বামীর আদেশ প্রার্থনা করেছেন হরিশ্চন্দ্র রাজার পত্নী মদনার সাধন-কাহিনী উল্লেখ করে। এই হরিশ্চন্দ্রকে মূলতঃ বেদ-কল্পিত, পরে রামায়ণ-প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিপর্যস্ত লৌকিক রূপ বলে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী

অনুমান করেছেন। যাই হোক্, রঞ্জাবতীর পূর্বোদ্ধৃত স্বীকৃতি দেখে অনুমান করা হয়ে থাকে যে,—লাউসেন-কাহিনীর প্রচলনেরও আগে ধর্ম-পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই হরিশ্চন্দ্র-কাহিনীই আদর্শ ধর্ম-সাধন-কথা রূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই প্রাচীন কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় আজ আর পাওয়া যায় না। হয়ত, লাউসেন-কাহিনীর অত্যধিক জনপ্রিয়তা তা'র বিলুপ্তির কারণ হয়েছিল।

ধর্মমঙ্গলে লাউসেন উপাখ্যান

লাউসেন-কাহিনী অতি-দীর্ঘ বিভিন্ন পালায় বিভক্ত। মোটামুটি গল্পটি এইরূপ,—ধর্মপালের পুত্র যখন গৌড়ের রাজা, তখন তাঁর শ্যালক দুর্দণ্ড-প্রতাপ মহামদপাল ছিলেন রাজমন্ত্রী। অনুগত প্রজা সোম-ঘোষকে মন্ত্রিহস্তে নিগৃহীত হতে দেখে গৌড়েশ্বর তাকে মুক্তি দেন ও স-পুত্রক ত্রিষষ্ঠীর গড়ে সামন্তরাজ কর্ণ-সেনের আশ্রয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু, কালক্রমে সোমঘোষের ছেলে ইছাই পার্বতীর কৃপা লাভ করে নিতান্ত দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। কর্ণসেনকে রাজ্যচ্যুত করে সে নিজে ত্রিষষ্ঠীর গড় অধিকার করে ও নূতন ভাবে গড়পত্তন করে নাম রাখে ঢেঁকুর। গৌড়েশ্বরের দূত রাজ-কর আদায় করতে এলে ইছাই তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। সসৈন্য গৌড়েশ্বর ইছাইর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন,—কিন্তু দেবী-কৃপা-পুষ্ট ইছাইর হাতে অপমানিত এবং পরাভূত হয়ে ফিরে আসেন। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয়টি পুত্র মৃত্যু বরণ করে:—তাদের পত্নীরাও অনুমৃতা হন। কর্ণসেনের পত্নীও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন।

বৃদ্ধ অমাত্যের এই দুর্দশা দেখে গৌড়েশ্বর ও রাজ্ঞী পরমাসুন্দরী রাজ-শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁর পুনর্বিবাহ দেবার সংকল্প করেন। কিন্তু বৃদ্ধের সংগে পরম স্নেহাস্পদা অনুজার বিবাহ দিতে মহামদপাত্র প্রবল আপত্তি করেন। রাজা-রাণীর কৌশলে মহামদপাত্র রাজধানী থেকে স্থানান্তরিত হ'ন এবং এই সুযোগে কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ হয়। পরে রাজার আদেশে কর্ণসেন ময়নাপুরের অধিকার লাভ করে তৎক্ষণাৎ রঞ্জাবতীসহ রাজধানী ছেড়ে যান। এই সংবাদ জান্‌তে পেরে মহামদপাত্র অত্যন্ত রুষ্ট হন, এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে,—জীবনে আর কখনো রঞ্জাবতীর মুখ দর্শন করবেন না। রঞ্জাবতীর অনুরোধে মহামদের সন্ধান করতে এসে কর্ণসেন রাজধানীতে প্রচুর অপমানিত হন,—মহামদ রঞ্জাবতীকেও বন্ধ্যা

বলে বিদ্রূপ করে। স্বামীর মুখে এই সংবাদ জেনে রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় 'শালে ভর' করে প্রাণান্তকর ধর্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই উপলক্ষ্যে তিনি রামাই পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং স্বামীর অনুমতি লাভের জন্য তাঁর কাছে হরিশ্চন্দ্র রাজার পত্নী মদনার কাহিনীর উল্লেখ করেন। রঞ্জাবতীর সাধনায় তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর তাকে পুত্র-বর দেন ; ফলে লাউসেনের জন্ম হয়। কিন্তু, অতি শৈশবেই লাউসেনকে অপহরণ করবার জন্য মহামদ ইন্দা-মেটেকে পাঠিয়ে দেন। লাউসেনকে হরণ করে নিয়ে যাবার পথে ধর্মঠাকুরের আদেশে হনুমান তাঁকে উদ্ধার করেন এবং কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর নিকট ফিরিয়ে দেন। লাউসেনের খেলার সাথীরূপে ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে কর্পূরসেন নামে দ্বিতীয় পুত্র দান করেন।

দুটি ভাই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠ্‌লে ধর্মঠাকুরের নির্দেশে হনুমান তাদের মল্ল-বিদ্যা শিক্ষা দেন। তাছাড়া, পার্বতী লাউসেনের চরিত্র-বল পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আপন অজেয় অসি দান করেন। এমনি করে দেহ-বল এবং দেব-বলে বলীয়ান্ হয়ে লাউসেন এবার কর্পূরকে নিয়ে গৌড়যাত্রা করেন। পথের বিঘ্নস্বরূপ ব্যাঘ্র এবং কুমীরকে লাউসেন অবলীলাক্রমে জয় করেন। এমন কি জামতি ও গোলাহাটে নয়ানী ও সুরিক্ষা নাম্নী ব্যভিচারিণী নারীদের লালসাগ্নি থেকেও ধর্মকৃপায় আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। এইরূপে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করে তিনি গৌড়ে উপনীত হন।

কিন্তু গৌড়ে উপস্থিতিমাত্র মহামদের চক্রান্তে লাউসেন চোর বলে কারারুদ্ধ হন। কর্পূর লাউসেনকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় এবারেও লাউসেন আপন নির্দোষতার পরিচয় প্রদানে সক্ষম হন। তাছাড়া, অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে তিনি রাজার কাছ থেকে "ইন্দ্রের অশ্ব"-তুল্য একটি শ্রেষ্ঠ অশ্ব লাভ করেন ও দেশে ফেরার পথে কালু প্রভৃতি ১৩ জন ডোমকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

কিন্তু ঘরে ফিরে গিয়েও মহামদের হিংস্রতার হাত থেকে লাউসেনের মুক্তি ছিল না। মন্ত্রীর চক্রান্তে রাজা তাঁকে কামরূপ বিজয়ের বিভীষণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করেন। লাউসেন ধর্মের কৌশলপূর্ণ নির্দেশে ব্রহ্মপুত্রনদ অতিক্রম করেন ও পুরাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বিতাড়িত করে রাজ্য জয় করেন। অবশেষে রাজকন্যা কলিঙ্গার সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

ফেরার পথে মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা ও বর্ধমান-রাজকন্যা বিমলাকেও তিনি বিবাহ করেন।

লাউসেনের এই সার্থকতা মহামদের প্রতিহিংসা-বৃত্তিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এদিকে সিমুলার রাজকন্যা কানড়ার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হয়ে গৌড়েশ্বর তা'কে বিয়ে করতে চান; কানড়া বৃদ্ধের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর নবলক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু রাজশক্তি সিমুলায় উপনীত হলে কানড়া একটি লৌহ-গণ্ডা উপস্থিত করে বলেন,—এক আঘাতে যে এই গণ্ডা দ্বিখণ্ডিত করবে, তাকেই তিনি স্বামীরূপে বরণ করে নেবেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও রাজা ব্যর্থ এবং উপহসিত হন। কিন্তু, ধর্ম-কৃপায় লাউসেন অনায়াসে গণ্ডাটি দ্বিখণ্ডিত করে কানড়া-লাভের অধিকারী হন। এ ব্যাপারে রাজাও ক্ষুন্ন হলেন। অবশেষে ধর্মের কৃপাবলেই সিদ্ধান্ত হল,—কানড়া যদি লাউসেনকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন, তবে লাউসেন তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হবেন। লাউসেন এবারে ধর্মের লীলা-বশে পরাজিত হয়ে কানড়াকে বিবাহ করেন।

মহামদের চক্রান্তে লাউসেনকে এবারে বিদ্রোহী ইছাই'র শাস্তি-বিধানে প্রবৃত্ত হতে হয়। ইছাই'র সেনাপতি লোহটা-বজ্জরের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধের পর লাউসেন তাকে নিহত করেন ও তার ছিন্নমুণ্ড গৌড়-দরবারে ভেট প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই ছিন্নমুণ্ড দিয়ে কৌশলে মহামদ লাউসেনের একটি ছিন্নমুণ্ড প্রস্তুত করান এবং তা' কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর নিকট পাঠিয়ে দেন। পুত্রশোকে রাজা-রাণী অধীর হয়ে পড়েন, বধূগণ দেহ-ত্যাগে কৃত-সংকল্প হন, এমন সময়ে ধর্মঠাকুরের নির্দেশে হনুমান এসে সত্য উদ্ঘাটন করেন।

এবারে ইছাইএর সঙ্গে লাউসেনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ' যেন দেবতায় দেবতায় যুদ্ধ। ইছাই'র পক্ষে দেবী পার্বতী,—আর লাউসেনের সহায় স্বয়ং ধর্মঠাকুর। অবশেষে লাউসেনেরই জয় হয়;—এই যুদ্ধে কালুডোম প্রভুর পক্ষে বীরত্বের অপূর্ব পরিচয় প্রদান করে।

লাউসেনের সর্বশেষ পরীক্ষা হয় পশ্চিমোদয় সংঘটনে। গৌড়েশ্বর ধর্মপূজার অনুষ্ঠান করেন;—কিন্তু নানা কারণে ধর্মঠাকুর রুষ্ট হয়ে রাজ্যে ঝড়-বর্ষণের নির্দেশ দেন। রাজ্যের এই পাপ-বিনাশহেতু পশ্চিমোদয় সাধনের জন্য লাউসেন রাজাদেশে 'হাকন্দ' গমন করেন। পশ্চিমোদয় ধর্ম-সাধকদের পক্ষে

সর্বাপেক্ষা কঠিন সাধনা। লাউসেন নিজ দেহকে নবখণ্ডে বিভক্ত করে তারই আহুতি দিয়ে সুকঠোর ধর্ম-সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। এমন সময় মহামদ সদলবলে কর্ণসেনের পুরী আক্রমণ করেন। লাখাই ডোম্‌নী যুদ্ধে প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে শত্রু-সৈন্যকে নদীর পরপারে বিতাড়িত করে দেয়। স্বয়ং কানড়া মহামদকে পরাজিত ও বন্দী করেন; পরে তার মুখে চূণকালি লেপে দিয়ে দূর করে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে প্রভুভক্ত বীর কালুডোম শত্রুহস্তে প্রাণ হারায়।

এদিকে লাউসেনের 'পরে সন্তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর সূর্যদেবকে অমাবস্যা-রজনীতে পশ্চিমে উদিত হতে নির্দেশ দেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত মহামদ এবারেও পশ্চিমোদয় মিথ্যা প্রমাণিত করার অপচেষ্টা করে। ফলে, মহামদ ধর্মঠাকুরের রোষ-ভাজন হয়, এবং তার সর্বাঙ্গে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধির চিহ্ন দেখা দেয়। লাউসেনের প্রার্থনায় ধর্ম তাকে রোগমুক্ত করেন, কিন্তু পাপের শাস্তি-স্বরূপ তার মুখে একটি চিহ্ন থেকে যায়। এইরূপে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করে লাউসেন সবশেষে স-শরীরে স্বর্গগমন করেন। ধমমঙ্গলের নরখণ্ড এখানে সমাপ্ত।

এই লাউসেন-কাহিনীর ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নির্দেশে অনেকের সচেষ্টতা লক্ষিত হয়। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১ম সং-এ মন্তব্য করেন,—"লাউসেন বলিয়া কোনো কালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই।......লাউসেনের কাহিনীগুলি প্রকৃতপক্ষে Folk tale বা উপকথা মাত্র। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজিতে গেলে ঠকিব।" কিন্তু একই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তিনি আবার বলেছেন,—এই কাহিনীর ঐতিহাসিকমূল যদি কিছু নাও থাকে, তবু গৌড়সভার বর্ণনায় ইতিহাসের ছাপ আছে।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের শিল্পগুণ বিচার করতে গিয়ে ডঃ সেন বলেছেন,—"Adventure বা কেরামতি-কাহিনী বলিয়া ধর্মমঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গল কাব্যের অপেক্ষা অনেক অংশে সুখপাঠ্য।" এ সিদ্ধান্ত যদি সত্যও হয়, তবু এর দ্বারা শিল্প-কৃতি হিসেবে মনসামঙ্গলের চেয়ে ধর্মমঙ্গলের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না। আধুনিক যুগেও দেখা যায়,—অনেক সময় Adventure বা ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনী উৎকৃষ্ট উপন্যাস অপেক্ষা সুখ-পাঠ্য, এমন কি জন-প্রিয়ও

হয়ে থাকে। তাই বলে শিল্প-কর্ম হিসেবে ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনীকে উপন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা চলে না।

ধর্মমঙ্গলকাহিনীর সাহিত্যিক বিচার

ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যাবে,—গল্পটিতে যুদ্ধ এবং বীরত্বের ছড়াছড়ি থাক্‌লেও, সুপরিকল্পিত সংহতি নেই। গল্প যেন গল্পের জন্য,—যুদ্ধ যেন যুদ্ধের জন্য সংঘটিত হচ্ছে। বিভিন্ন গল্পাংশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংযোগ নিতান্ত অল্প,—একটা বিশেষ রস-পরিণাম সম্বন্ধেও কাহিনীকার খুব সচেতন বলে মনে হয় না। সর্বোপরি, যে মানসিক আবেদন মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ,—ধর্মমঙ্গলকাব্যে তার নিতান্তই অভাব লক্ষিত হয়ে থাকে। ধর্মমঙ্গল সত্যই 'দেবদেবীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার' লড়াই নিয়ে পরিপূর্ণ। মনে হয়, দীর্ঘদিন তথাকথিত অন্ত্যজ-সমাজের পরিকল্পনাক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকার জন্যই ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে এ সকল ত্রুটি প্রথমাবধি মজ্জাগত হয়েছিল।

কবি ময়ূরভট্ট

এবারে ধর্মমঙ্গলের এই প্রাথমিক পরিচয় উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের জিজ্ঞাসা,—এই কাহিনীর আদিকবি কে? ধর্মমঙ্গল-কাব্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি ঘনরামের রচনায় এই প্রশ্নের একটি উত্তর পাওয়া যায়। বন্দনা-প্রসঙ্গে ঘনরাম এক জায়গায় বলেছেন,—

"ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।"— এই ময়ূরভট্টই যে ধর্মমঙ্গল সংগীতের 'আদ্যকবি' তা' আরো স্পষ্ট হয়—ঘনরামের গ্রন্থে বারবার তাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখে। এক জায়গায় গ্রন্থাদর্শ সম্বন্ধে ঘনরাম স্পষ্ট স্বীকার করেছেন,—

"হাকন্দপুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্মসভায়।" —এ'র থেকে বোঝা যায়,—ময়ূরভট্টের গ্রন্থের নাম ছিল 'হাকন্দপুরাণ'। ঘনরাম ছাড়াও মাণিক গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবি কাব্য-রচনা প্রসঙ্গে ময়ূরভট্টের বন্দনা করেছেন।

ময়ূরভট্টের কাব্যের কোন প্রামাণ্য নিদর্শন এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত ময়ূরভট্টের

কাব্যের একখানি পুথি দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন।[২৯] পরবর্তীকালে ঐ পুথিখানির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। ১৩১০ বাংলা সনে লিখিত একখানি পুথি অবলম্বন করে শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যপরিষদ্ থেকে ময়ূরভট্টের শ্রীধর্ম্মপুরাণ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। আলোচ্য পুথিখানির ভাব, ভাষা, প্রকাশ-ভঙ্গি সব কিছুই নিতান্ত অর্বাচীন। তাই পাণ্ডতগণ এর মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ময়ূরভট্টের কাব্য

ময়ূরভট্টের কাব্য-পরিচয় নিশ্চিত আবিষ্কৃত হতে পারে নি; কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে চেয়েছেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গলের পুথিতে ময়ূরভট্ট "দ্বিজ" বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন। আবার বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় ভট্টশালী গাঞির ব্রাহ্মণ এক ময়ূরভট্টের উল্লেখ রয়েছে। অনেকে মনে করেছেন, ইনিই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট। কিন্তু এই ময়ূরভট্টের কবি-প্রসিদ্ধি নেই; তা' ছাড়া বরেন্দ্রভূমিতে ধর্মপূজার প্রসারও দুর্লক্ষ্য। তাই, এই অনুমানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। আবার সংস্কৃত 'সূর্যশতকের' কবি ময়ূরভট্টের কথাও এই প্রসংগে উত্থাপিত হয়ে থাকে। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন,—"মনে হয়, ময়ূরভট্ট কোন বাঙালি কবির প্রকৃত নাম নহে—সংস্কৃত 'সূর্যশতক'-রচয়িতা ময়ূরভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙালি কবি গ্রহণ করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য এক হিসাবে সূর্য-দেবতার মাহাত্ম্যসূচক কাব্য,—এই উদ্দেশ্যেই বাঙালি কবি সংস্কৃত কবির নামটি এখানে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।"[৩০]

বলা বাহুল্য, এ-সবই অনুমান মাত্র। তা' ছাড়া শ্রীভট্টাচার্য আরো অনুমান করেছেন,—ময়ূরভট্টের কাব্য হয়ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক, বা তার কাছাকাছি সময়ে লিখিত হয়েছিল।

২৯। বৌদ্ধ গান ও দোহা—ভূমিকা।

৩০। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।

ষোড়শ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ-পরিণাম

বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের বিকাশপথে এ-বারে আমরা পৌঁচেছি এক নূতন যুগ-সন্ধিক্ষণে নয়,—পূর্বযুগ-চেতনার পরিণাম-মুখে। আগেই বলেছি, তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলার বিপ্লব-চেতনা দুটি পৃথক্ পর্যায়ে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তীকাল বিপর্যয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু, নিরন্ধ্র আঁধারের গভীরে আলোক-নীহারিকা যখন প্রথম জেগেছে, তখন থেকেই ব্যথাহত বাঙালি চেতনা নব-জীবনামুখী হয়েছে। আদি যুগের বাংলা সাহিত্যে ছিল বাস্তব-বিমুখ উন্মার্গগামিতা; এবার দেখা দিল বস্তু-জীবন ও পার্থিব অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত সচেতনতা। আদি-মধ্য যুগের অনুবাদ-বৈষ্ণব-মঙ্গলকাব্যের ধারায় এই বাস্তব প্রয়োজন-বুদ্ধির তীব্রতাই লক্ষিত হয়েছে,—কখনো ব্যক্তিগত,—কখনো গোষ্ঠিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কিন্তু, নিজ নিজ পথে ও মতে ঐ সকল প্রচেষ্টা ছিল স্বতোবিচ্ছিন্ন—পরস্পর-পৃথক্ এককতার মহিমায় বিধৃত। ঐ সকল একক-বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা একটি জাতীয় প্রেরণার জারক-রসে জারিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় সর্বজন-সাধারণ জীবনাবেগের সঞ্চার করল নূতন করে। আর, জাতীয় চেতনার এই সার্বিকতা বিধানের কেন্দ্র-দূত,—মধ্যমণি হলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মই নয় কেবল,—তাঁর ব্যক্তি-জীবনাচরণ ও জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-গোষ্ঠি নির্বিশেষে এক সর্বময় মানব-প্রেমের আদর্শ,—সর্বজনীন মানব-মিলনের মহাবাণীকে করেছিল সমুদ্‌ঘোষিত। আগেই বলেছি এই জীবন-চৈতন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে নব-স্বভাবে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিল। এবার সেই দীপ্ত ইতিহাসের আকার-প্রকারগত স্বরূপকেই সন্ধান করব কেবল।

মধ্যযুগ-পরিণাম ও

পূর্বের আলোচনায় চৈতন্যোত্তর সৃজন-পঞ্জীর একটি মোটামুটি কাঠামো উদ্ধার করেছি। চৈতন্য-পূর্ব মধ্যযুগের রচনা-পঞ্জীর সংগে তুলনায় আলোচনা

করলে দেখব, আলোচ্য উপযুগের রচনা-ধারায় কেবল দুটি বিষয়ের অভিনবতা রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরাতন বিষয়েরই পুনরবতারণা করা হয়েছে। এই নূতন বিষয় দু'টির প্রথমে রয়েছে জীবনী সাহিত্য,—আর সর্বশেষে আছে লোকসাহিত্য। আমাদের ধারণা, প্রথম বিষয়ক রচনাবলীর মাধ্যমেই পূর্ব যুগ মানসের 'পরে চৈতন্য-যুগ-চেতনার ভাবাধিবাসন সাধিত হয়েছে। আর শেষোক্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে সেই ভাব-চেতনারই ঘটেছে ঐতিহাসিক পরিণতি-পরিসমাপ্তি।

চৈতন্যযুগ-চেতনা

আগেই বলেছি, সর্বদেশ-কালের মানুষের সমাজ-মানস একটি সাধারণ বিকাশ-ধারাকে অনুসরণ করে চলেছে। নিরবচ্ছিন্ন দেব-বাদ থেকে দেব-বাদ-বিনির্মুক্ত মানবতাবোধের মধ্য দিয়ে এই ধারা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে সর্ব-পরিছিন্ন, সর্বাবয়বপূর্ণ, স্বতন্ত্র-বলিষ্ঠ মানবতা-সাধনার পথে। এদিক্ থেকে আদি যুগ-চেতনা প্রায় অন্ধভাবেই দেব-বাদ-নির্ভর বলে মনে করা যেতে পারে। যথার্থ পৌরাণিক যুগ (mythological age)-এর অনেক পরে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ সূচিত হয়েছিল। তা-হলেও, সে-যুগের সৃজন-কর্মেও দেববাদ-প্রাধান্যের ঐকান্তিকতা ঘটেছিল-যে, সে কথা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। তারপরে, দেবাভিমুখী হলেও আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মানব-প্রয়োজনের অনুসারী হয়েছিল বলে দেখেছি। এখানেই দেববাদ-নির্ভর মানবতাবোধের অঙ্কুরোদ্গম। চৈতন্য-পূর্ব অনুবাদ-মঙ্গল-বৈষ্ণব কাব্যে এই ভাবাঙ্কুর অজস্র বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। চৈতন্যোত্তর জীবনী-সাহিত্যে সেই সদ্য অঙ্কুরিত দেববাদ-নির্ভর মানবতা-বোধ মহীরুহ রূপ পেয়েছে।

দেববাদ-নির্ভর মানবতাবোধ ও

লক্ষ্য করতে হবে, চৈতন্য-জীবনী-সাহিত্যকে আশ্রয় করেই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট মানব-জীবন বাংলা সাহিত্যের প্রধান এবং একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে গোর্খবিজয় ও গোপীচাঁদের গানে মানবকথা সাহিত্যের বিষয় হয়েছে। আর, ঐ সকল কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের অনেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু তা হলেও, ঐ সকল রচনায় আলোচ্য চরিত্রাবলীর মানব-স্বভাবকে খুব কম স্বীকৃতিই দেওয়া হয়েছে। গোরক্ষনাথ ও ময়নামতী দু'জনেই সেখানে দেব-প্রতিদ্বন্দ্বী; অ-মানব না হলেও,—অতিমানব। তা ছাড়া, ঐ সকল কাব্যের এ-পর্যন্ত

প্রাপ্ত পরিচয়ে চৈতন্য-ঐতিহ্যের নিঃসংশয় ছাপ রয়েছে। আগেই বলেছি, নাথ-সাহিত্যের আবিষ্কৃত পুথিগুলির একটিও সপ্তদশ শতকের আগে লেখা হয় নি। চৈতন্য জীবনী-সাহিত্যে মহাপ্রভুর মানব-রূপ অপ্রকট থাকে নি; বরং তাঁর মানব-মহিমাকেই দেবত্ব-মণ্ডিত করা হয়েছে। এদিক্ থেকে, গোরক্ষনাথ বা ময়নামতী অতিমানব হলে, মহাপ্রভু নর-চন্দ্রমা। সন্দেহ নেই, জীবনী-সাহিত্যকার বৈষ্ণবভক্তদের দৃষ্টিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন, "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ।" কিন্তু, সে ত তাঁর শ্রেষ্ঠ "নরলীলা"রই প্রভাবে। চৈতন্যকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্য মানব-জীবনাভিমুখী হয়েছে। অবশ্য মধ্যযুগে সেই মানবাভিমুখিতা ছিল মহৎ-মনুষ্যত্বের,—নর-চন্দ্রমার স-ভক্তি পূজায় একান্ত নিবদ্ধ। চৈতন্যেতর-বিষয়ক বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্যে এই নর-চন্দ্রমা পূজার ধারা আরো স্পষ্ট-ব্যক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টিতে মহাপ্রভু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং;" নিত্যানন্দ বলরামের অবতার; অদ্বৈতাচার্য স্বয়ং মহেশ্বর। কিন্তু অদ্বৈত-পত্নী 'দেবী-সীতা' 'দেবীত্ব-সংজ্ঞা' আয়ত্ত করতে পেরেছেন তাঁর মানবী-মহিমার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরই ফলে। সীতা-জীবনী-গ্রন্থাবলীতে সীতাদেবী বস্তুতঃ নারী-চন্দ্রমা রূপেই ভাস্বর।

চৈতন্য জীবনী সাহিত্য

বৈষ্ণব সাহিত্যে 'দেবতারে প্রিয়' এবং 'প্রিয়েরে দেবতা' করতে পারার অপরূপ শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ-পর্যন্ত জীবনী-সাহিত্যের আলোচনায় দেখেছি,—চৈতন্যদেবের নরলীলা-মাহাত্ম্যে বিগলিত-চেতন বৈষ্ণব জীবনীকারেরা প্রিয়কে অনায়াসে দেবত্বমণ্ডিত করেছেন। আবার দেবতাকে প্রিয় করতে পারার শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ঐতিহ্য লক্ষ্য করি চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ উপজীব্য রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা। অভিজাত ও অনভিজাত সমাজের বিভিন্ন বাঙালি জীবন-পর্যায়ে এই লীলা-সত্য বিচিত্ররূপে প্রকটিত হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ব যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনা-প্রসংগে বলেছি, বিশেষভাবে কবি-মানসের ব্যক্তিগত অনুভূতির উত্তাপ-নিবিড়তাই ঐ সকল কবি-কর্মকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। চৈতন্যোত্তর কালের দ্বৈতাদ্বৈত-মহিমাবোধ,- জীবে-ব্রহ্মে, দেবে-মানবে ভেদাভেদের অপূর্ব প্রেম-সৌন্দর্য-মূল্য সে-যুগের বৈষ্ণব-

বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্য-চেতনা

পদাবলীতে কোথাও কোথাও অস্পষ্ট-ব্যক্ত হলেও কখনো স্বয়ংস্ফুট বা অনায়াস-প্রাঞ্জল ছিল না। এই দুর্লভ লোকোত্তর রস-বুদ্ধি সর্বজনীনতা লাভ করেছিল চৈতন্য জীবনাচরণের মাধ্যমে। আর, এই অপূর্ব রস-চেতনার প্রভাবে একদিকে যেমন বাংলা দেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই'; তেমনি গৌরগীতি ছাড়া কানুগীতিও অ-সিদ্ধ। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব ভক্তজন গৌরলীলা আস্বাদনের মাধ্যমেই রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে করেছেন উপলব্ধি। ফলে, মুরারিগুপ্ত, নরহরি সরকার প্রভৃতি চৈতন্য-পরিকর কবিরাই নন, জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের মত চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তারাও গৌরাঙ্গলীলার অন্তরালে দাঁড়িয়ে রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে উপভোগ করেছেন। রাধাকৃষ্ণের দৈবী মহিমা চৈতন্য-প্রেমের ভাবাধিবাসনে প্রিয়ত্বের মর্যাদায় প্রাণরস-ঘন হয়ে উঠেছে। এক কথায় বলা চলে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব জীবনী ও পদ-সাহিত্য প্রিয়কে দেবতা এবং দেবতাকে প্রিয় করে দেবে-মানুষে একাকার করে দিয়েছে। ফলে, এই নব-প্রেম-প্রবুদ্ধ নরচন্দ্রমা-প্রীতি ধর্ম সম্প্রদায়ের সকল সীমায়তি অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে বৃহত্তর বাঙালি-জীবনের দিকে দিকে। আর, মধ্যযুগের সাহিত্যের সকল পর্যায়েই এই নির্বাধ প্রাণ-সম্পদ সঞ্চারিত হতে পেরেছে।

চৈতন্যোত্তর মঙ্গলসাহিত্যের আলোচনা থেকে এই ধারণার পরিপোষকতা সহজ হবে। পূর্বে লক্ষ্য করেছি,—আদি-মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসমষ্টি মূলতঃ লোক-জীবনের সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, চৈতন্যোত্তরযুগের মঙ্গল-কাব্যে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে এক সর্বাত্মক জাতীয় মিলন-সূত্র গ্রথিত হতে পেরেছিল।

চৈতন্যোত্তর মঙ্গল-কাব্যে দেববাদ-নির্ভর মানবতা

এ-সম্বন্ধে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন……"এই সকল (মঙ্গলকাব্যের) লৌকিক দেবতা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বেশি দিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ, এই দেশে এই সকল সংকীর্ণতামূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের কূলপ্লাবনী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে।"[১] বলাবাহুল্য, 'বৈষ্ণব

১। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—২য় সং।

সাহিত্যের কূল-প্লাবনী বন্যা' বলে শ্রীভট্টাচার্য যাকে বোঝাতে চাইছেন, তাকেই আমরা চৈতন্য-সংস্কৃতি নামে অভিহিত করেছি। এ-সম্বন্ধে শ্রীভট্টাচার্যের উল্লেখ পরবর্তী অংশে আরো স্পষ্ট ও তথ্য-সচেতন হয়েছে। আদি-মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর পরিকল্পনা ও কাহিনী-বর্ণনায় অনভিজাত, অমার্জিত সমাজের রুচি-বিকারের পরিচয় ছিল ওতপ্রোত ভাবে ছড়ানো; অথচ চৈতন্য-সংস্কৃতির রুচি-সমৃদ্ধ মানবিকতা-বোধের স্পর্শে এই সাহিত্য ভাবে-চিন্তায় নবরূপ পরিগ্রহ করেছে। এই তথ্য পরিবেশন প্রসংগে শ্রীভট্টাচার্য বলেছেন,—"চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্য মাত্রই নীতির দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত; ইহার কারণ, চৈতন্যদেবের চরিত্রের মধ্যে যে উচ্চ নৈতিকগুণ ছিল, তাহা সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে বাংলার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"[২] আমাদের বক্তব্য,—চৈতন্য-চরিত্রের ঐ 'উচ্চ নৈতিক গুণ' বঙ্গীয় সমাজ-জীবনের একটা নৈতিক মান-মাত্র সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নি,—বাঙালি জীবনে এক নবীন মানবিক মূল্য-বোধের প্রবর্তন করেছিল। আর বিশেষ করে, তারই ফলে মূলতঃ নিম্নশ্রেণীর পরিকল্পিত দৈবী-সাহিত্য একদা সর্বজনীন মানবিক-সাহিত্যে পরিণত হতে পেরেছিল।

কিন্তু প্রসংগ-সমাপ্তির আগে শ্রীভট্টাচার্যের একটি মন্তব্যের বিচার প্রয়োজন। সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হলেও, এই বিচারের দ্বারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চৈতন্য-প্রভাবের পরিমাণ সম্বন্ধে সংশয়-সন্দেহের সম্ভাবনা অবসিত হতে পারবে। চৈতন্যোত্তর মঙ্গলসাহিত্যে বৈষ্ণবসাহিত্য ও রুচির প্রভাব পূর্বোক্ত উপায়ে স্বীকার করেও শ্রীভট্টাচার্য বৈষ্ণবসাহিত্যের 'পরে মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে,—

চৈতন্যোত্তর মঙ্গল ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

"বৈষ্ণব কবিতায় দেবতাকে বাদ দিয়া মানুষ নহে, এবং এই দুই-ই সেখানে অভিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে, এবং তার ফলে মানুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাহাতে সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই,—তাহার একটা বিশেষ অংশ মাত্র সমুজ্জল হইয়া আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে প্রতিটি মানুষ পূর্ণাঙ্গ, তাহার দেহের মালিন্য পর্যন্ত তাহাতে প্রত্যক্ষ। শুধু তাহাই নহে, এই মলিনতা লইয়া

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং।

মানুষ সেখানে তথাকথিত দেবতার উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে মানুষই লক্ষ্য, দেবতা উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় দেবতা লক্ষ্য, মানুষ উপলক্ষ্য। এই সর্বজনীন মানবতার ভিত্তির উপরেই মঙ্গলকাব্যের কাব্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।"৩ শ্রীভট্টাচার্যের উদ্ধৃত উক্তি তিনটির মধ্যে প্রথম দুটির সংগে শেষটির সম্বন্ধ-সূত্র সুসংবদ্ধ নয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেবতা লক্ষ্য এবং মানুষ উপলক্ষ্য কি না, সে আলোচনা আপাততঃ পরিহার করে, "মঙ্গলকাব্যে মানুষ লক্ষ্য এবং দেবতা উপলক্ষ্য" কিনা, এই সিদ্ধান্তের বিচার করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে মৌলিক মঙ্গল-কাব্য বলতে শ্রীভট্টাচার্য যে সাহিত্যের ধারণা করেছেন,—সেখানেও কি 'মানুষ লক্ষ্য' এবং 'দেবতা উপলক্ষ্য'! না, তার বিপরীতটিই সত্য! শ্রীভট্টাচার্য নিজেই স্বীকার করেছেন, ঐ সকল নিম্নশ্রেণীর দুর্বল দেব-পরিকল্পনা এবং নিকৃষ্ট রুচি-বিকারের অবসান ঘটতে পেরেছিল যথাক্রমে 'বৈষ্ণবধর্মের কূল-প্লাবনীশক্তি' এবং 'চৈতন্য-চরিত্রের উচ্চনৈতিক গুণাবলীর' প্রভাবে। বস্তুতঃ, যে-সকল মঙ্গলসাহিত্যে শ্রীভট্টাচার্য মানবীয় শক্তির অকুণ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন, সে-সব চৈতন্য-সংস্কৃতির প্রভাবে নব-রূপায়িত সাহিত্যিক-মঙ্গলকাব্য ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ঐসকল কাব্যেও মানবী-শক্তির প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে দেববাদ-বিনির্মুক্ত নয়। সত্যবটে, ঐসকল কাব্যে,—বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে মুরারিশীল ভাঁড়ুদত্তর মত 'মালিন্যযুক্ত' চিত্রও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এরা দেবতাদের উর্ধ্বে উঠে গেছে, এমন সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না। সত্য বটে, চন্দ্রধর বা কালকেতু, বেহুলা-সনকা বা ফুল্লরা তাদের অসাধারণত্বের সঙ্গে যুগপৎ মানবিক দুর্বলতা নিয়েও তথাকথিত দৈবী-শক্তির উর্ধ্বে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু, তাদের ঐ-সব দুর্বলতাকে 'মালিন্য' নামে কিছুতেই অভিহিত করা চলে না। বরং, ঐ দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়েই আলোচ্য চরিত্র-কয়টির মানবী-মহাত্ম্য গড়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুতঃ, চন্দ্রধর-কালকেতু, বেহুলা-সনকা-ফুল্লরাদের চরিত্রের ত্রুটি কিছু থাকলেও আলংকারিকের ভাষায় তাদের বলতেই হয় 'ধীরোদাত্ত,'—Grand & Lofty! আর, এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা এদের নর—এবং নারী-চন্দ্রমা বলে অভিহিত করেছি। আলোচ্য

৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং।

উদ্ধৃতির এক অংশে শ্রীভট্টাচার্যও স্বীকার করেছেন,—আমরাও বলেছি, চৈতন্য-সংস্কৃতি বাংলাদেশে একদা দেবে-মানুষে একাকার করে দিয়েছিল। ঐ একাকার হয়ে-যাওয়া মানবী-মহাত্ম্যেরই মঙ্গলকাব্যিক বিকাশ চন্দ্রধর-কালকেতু প্রভৃতি চরিত্র। অন্যদিকে আবার, কেবল নবোদ্গত ঐ জীবন-মহিমা ও মূল্য-বোধের অভাবেই প্রচুর বাস্তবতা এবং 'মালিন্য' সত্ত্বেও ধনপতি কাহিনী রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি।

বর্তমান বিচার-চেষ্টার পেছনে একটি মাত্র সত্য-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই নিহিত আছে। বস্তুতঃ, বৈষ্ণব জীবনী, কিংবা পদ-সাহিত্য, এমন কি, মঙ্গলকাব্য-সৃষ্টিরও মূলে চৈতন্যোত্তর যুগের একটিমাত্র প্রেরণা সক্রিয় হয়েছিল, —সে হচ্ছে দেব-বাদ-নির্ভর মানবতা-বোধের প্রতিষ্ঠা। একেই আমরা বলেছি 'চৈতন্য-সংস্কৃতি'। সমসাময়িক বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্যে ঐ একই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র উপায়ে। মঙ্গলকাব্যের মূল দেব-দেবী-পরিকল্পনায় কোন রূপ মহিমা-বোধ ছিল না বলেই, মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের আলোচ্য যুগে তাঁরা উপেক্ষণীয় নেপথ্যাশ্রয় করেছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মূল দৈবী-মহিমা চৈতন্যের মানবী-মহিমার অন্তরালে আত্ম-গোপন করেছিল যে, সে কথা আগে বলেছি। উভয় ক্ষেত্রেই মৌল সত্য এক, কেবল তার প্রকাশ বিচিত্র। এদিক থেকে বরং শ্রীভট্টাচার্যের অন্যতর মন্তব্যের অনুসরণ করে বলা চলে,—এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যাবলী পরস্পরের পরিপূরক-অনুপূরক। একই যুগ-সত্যের বিভিন্ন দিককে এরা বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেছে।

চৈতন্য-সংস্কৃতির স্বরূপ; দেব-বাদ-নির্ভর মানবতা

চৈতন্যোত্তর যুগের সকল শ্রেণীর সাহিত্যিক সৃষ্টি সম্বন্ধেই এই মন্তব্য সমপরিমাণে সত্য; বিভিন্ন অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধেও তাই। এই জন্যই দেখি, কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের রূপ, ভাব এবং কাহিনীগত প্রভেদ মৌলিক ও দূর-প্রসারী। ঐ একই কারণে মালাধর বসুর শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদের অনুসরণে বিকশিত বিভিন্ন ভাগবত এবং পুরাণের অনুবাদে লৌকিক দানলীলা, নৌকালীলাদি বর্ণনের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। আবার, ঠিক্ এই জন্যই কাশীরাম দাসের মহাভারত ব্যাসের মহাভারত-কাহিনী

চৈতন্যোত্তর অনুবাদ-কাব্যে এই মানবতা-বোধের স্বরূপ-পরিচয়

পথ থেকে বারে বারে বিচ্যুত হ'তে চায়। পণ্ডিতেরা এই উপলক্ষ্যে অদ্ভুতী-রামায়ণ, বাশিষ্ঠ রামায়ণ, জৈমিনী-ভারত ও অন্যান্য পুরাণাদির প্রভাবের কথা বহুল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ-সব কিছুর পেছনে যে বাঙালি-প্রভাবটুকু আত্ম-গোপন করে আছে, তার স্পষ্ট প্রকাশ অস্বীকার করবার উপায় নেই। বস্তুতঃ, চৈতন্যোত্তর অনুবাদ সাহিত্যের প্রতিটি নায়কচরিত্রে যেন বৈষ্ণব-লীলা-বিশ্বাসের কৃষ্ণ, বাঙালির ঘরের 'কানু' হয়ে দেখা দিয়েছেন। আর, সেই কানুর পেছনেও স্পষ্ট-লক্ষিতব্য রূপে আত্ম-গোপন করে আছেন নিখিল-প্রেম-রসঘন দেবায়িত চৈতন্য-মূর্তি। আর আগেই বলেছি, এই কারণে বাংলাদেশে 'কানুছাড়া গীত নাই'; - সকল সঙ্গীতিক প্রচেষ্টারই প্রাণকেন্দ্র কানুর আদর্শ। আবার, গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া কানু-গীতি নাই। সমস্ত জীবন-পরিকল্পনার পেছনে চৈতন্যদেবের আদর্শায়িত প্রেম-মূর্তিই সার্থকরূপ পরিগ্রহ করেছে।

মুসলমানী লোক-সাহিত্য ও চৈতন্য-সংস্কৃতি

সবশেষে বল্‌ব, এইযুগের লোক-সাহিত্যের কথা। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এই সাহিত্য ইস্‌লামিক ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট হয়েছে। অনেকটা এই কারণেও আলোচ্য পর্যায়ের রচনাবলীকে আমরা সাধারণ-ভাবে চৈতন্য-প্রভাব-বিনির্মুক্তি যুগের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছি। এই সব সাহিত্য দেব-বাদ-নির্ভর মানবতার চেয়ে বিশেষ করে লোক-মানবের জীবন-পরিচয়কেই প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে; যদিও তা হয়ত সর্বাংশেই দৈবী সংস্কার মুক্ত নয়। বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলেছি, বাঙালি জীবনে চৈতন্য-সংস্কৃতি-জাত মানব-ধর্মের পরিণামী ব্যঞ্জনা বিকাশ পেয়েছে এই শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যেই। এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদিত 'বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' নামক গবেষণা-গ্রন্থিকা। আলোচ্য গ্রন্থিকাতে অধ্যাপক ভট্টাচার্য শতাধিক মুসলমান কবির লিখিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক পদের উদ্ধার করেছেন। প্রত্যেকটি নামই যে এক-একজন পৃথক্ ব্যক্তির অস্তিত্বের দ্যোতক, কবিতার ভণিতা দেখে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। বরং, প্রায়ই মনে হয়, অনেক সময় একই নাম বিভিন্ন ভণিতায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য প্রত্যেকটি পৃথক্ ধরণের ভণিতাকে এক-

একটি পৃথক্ কবির অস্তিত্বের পরিচয়-রূপে গ্রহণ করেছেন। যাইহোক্, ঐ সকল পদের সব-কয়টিই যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন নয়, এবং কবিদেরও অনেকে যে বিশেষভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন না, অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিজেই তা স্বীকার করেছেন। তবু যে এঁরা মুসলমান হয়েও বিশেষভাবে হিন্দুদের দেবদেবীর মধ্যে কেবল রাধা-কৃষ্ণকেই কাব্য-বিষয়ের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন,—অধ্যাপক ভট্টাচার্য তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন,—"এই শ্রেণীর মুসলমানরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রায়শঃ স্বীকার করেন নাই। স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্তপ্রতীক রাধাকৃষ্ণকে। ইহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না, জানেন রাধা-বন্ধু কৃষ্ণকে। এই রাধাকৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুষেয়। ইহারা বৃষভানু-নন্দিনী বা যশোদা-নন্দন নহেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই', 'কানু ছাড়া উপমা নাই',—প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা যে প্রেমিক কানুর কথা বলা হইয়াছে প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কানুর নাম মুসলমান কবিরাও গ্রহণ করিয়াছেন।"[৪]

বস্তুতঃ, এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটি বর্তমান প্রসংগে বিশেষ লক্ষণীয়। আলোচ্য মুসলমান কবি-সম্প্রদায় যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-কথাকে তাঁদের কাব্যের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেছেন,—সেই রাধা এবং কৃষ্ণ কোন ধর্মসম্প্রদায়ের দেবদেবী নন,—তাঁরা নিখিল প্রেম-সাধনার পরম প্রতীক। চৈতন্য-জীবন-সাধনার ফল-পরিণামেই রাধাকৃষ্ণ-প্রেম এমন সর্বজনীন প্রেম-মিলনের ঐতিহ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর, এই মুসলমান কবিকুল যখন সুফীধর্ম, কায়াধর্ম অথবা লোকজীবন-প্রভাবিত প্রেমসঙ্গীত রচনা করেছেন,—তখন সর্বত্রই সকল প্রেম ঐতিহ্যের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছেন রাধাকৃষ্ণ। অবশ্য, ঐ সকল প্রেম-সঙ্গীতের কয়েকটি নিছক বৈষ্ণব-ভাব-প্রভাবিতও বটে। কিন্তু, যেখানে তা নয়, সেখানেও ঐ প্রেম-ঐতিহ্য এবং সেই ঐতিহ্যের আকর 'গৌরদেব' যে কবির হৃদয়স্থিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ দুর্লভ নয়,—

"আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপিন ধরা ॥

৪। 'বাঙালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি।'

গোরা হাসে কাঁদে ভাবের অন্ত নাই।
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই ॥
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা হয়েছে কি ধন হারা ॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে।
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে ॥
মরি হায় কি লীলা কলিকালে বেদ-বিধি চমৎকারা ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
গোরা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়।
অধীন লালন বলে ভাবুক হলে, সে ভাব জানে তা'রা ॥"

আমাদের ধারণা, মুসলমান কবিগণের রচিত অ-বৈষ্ণব পদাবলীকেও যখন অধ্যাপক ভট্টাচার্য 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন' বলে প্রকাশ করতে চেয়েছেন,—তখন তিনি 'বৈষ্ণবভাব' অর্থে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রভাব-মুক্ত, সর্বজনীন প্রেম-মিলনাত্মক চৈতন্য-সংস্কৃতিকেই বুঝেছিলেন। এই সংস্কৃতি যেখানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়, এমন কি হিন্দুসমাজের সীমাকেও অতিক্রম করে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বজনীন প্রেমৈতিহ্যে পরিণত হয়েছে, সেখানেই তার ব্যঞ্জনা হয়েছে সার্থক। এই ব্যঞ্জনাময় ঐতিহ্যের শেষ প্রকাশ মুসলমান কবিগণের রচিত লোক-সাহিত্য। পণ্ডিতগণ স্বীকার করবেন, আলাওলের 'পদ্মাবতী' কবি 'জয়সীর 'পদুমাবৎ'এর বাংলা অনুবাদ মাত্রই নয়,—এর সৃষ্টিতত্ত্ব, কাহিনী-কল্পনা, রূপক, সর্বত্রই বাঙালিধর্মী কবি-চেতনার প্রভাব স্পষ্ট এবং তীব্র। বলাবাহুল্য, এই বাঙালিধর্মী চেতনা চৈতন্য-সংস্কৃতির প্রেম-মিলন-সমন্বয়ের প্রভাব-পুষ্ট।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্য-সংস্কৃতির প্রভাব-পরিণাম বিচার এখানেই শেষ হওয়া উচিত। কারণ, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই দেশের জীবন ও সাহিত্যে চৈতন্য-সংস্কৃতির বিপর্যয় এবং স্মার্ত-পৌরাণিক বুদ্ধির পুনঃ প্রতিষ্ঠা স্পষ্ট সূচিত হয়েছে। তাই দেখি, লৌকিক মঙ্গলকাব্য-গোষ্ঠীর স্থান অধিকার করেছে একদিকে পৌরাণিক দুর্গামঙ্গল ও অন্যদিকে কালিকামঙ্গল নামে অভিহিত রুচি-দীন বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী। বিভিন্ন অনুবাদ সাহিত্যেও জীবনানুসরণের চেয়ে পৌরাণিক কাহিনীর চটক-সৃষ্টির চেষ্টা তীব্র হয়েছে। বৈষ্ণব কাব্য-কবিতার উৎস শুষ্ক হয়ে একদিকে গড়ে

উঠেছে নূতন মানবিক সংবেদনাসম্পন্ন শাক্ত-গীতি সাহিত্য,—অন্যদিকে জীবন-সম্পর্কহীন ভারতচন্দ্রের আলংকারিক কাব্য। এই যুগ-পরিবেশ ও যুগ-সত্যের পরিচয় পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এখানে শুধু বলা যেতে পারে যে,—চৈতন্য-সংস্কৃতির সর্বজনীন মিলন-সমন্বয়-মূলক দেববাদ-নির্ভর মানবতার আদর্শ ক্রমে যখন লুপ্ত হতে লাগল, তখন পৌরাণিক দৈবী সংস্কার-সংকীর্ণ এক প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি উঠ্‌ল উৎকট হয়ে। যার অন্যতম নিদর্শন আজুগোঁসাই কৃত রামপ্রসাদী কাব্যের বিকৃত-রূপায়ণ। এই প্রসঙ্গে একটি সত্য স্পষ্ট করে নেওয়া উচিত। এতক্ষণের আলোচনায় যে সময়কে আমরা চৈতন্য-সংস্কৃতি-প্রভাবিত যুগ বলে অভিহিত করেছি,—সে যুগেও নব্য-স্মৃতির অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। কেবল তাই নয়, সম্প্রদায়গতবিভেদ-বোধ, এমন কি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজেও কম ছিল না। চৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব একদা প্রায় উন্মূলিত হয়ে এসেছিল। সেই সময়ে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের সাধনা-ধারাকে বয়ে এনে এদেশে মুমূর্ষু ধর্ম-চেতনার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ হোতা ছিলেন শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ। কিন্তু, এই পুনরুজ্জীবিত চেতনাও যে বিশেষভাবে সংহতি-সম্পূর্ণতার অভাবে, দীর্ঘস্থায়ি হয় নি, ইতিহাস এই সাক্ষ্যও বহন করে থাকে। হয়ত অনেকটা এই কারণেও ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে যে সর্বমানবিক ধর্মাদর্শের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল, দুর্বল উত্তরসাধকগণের অক্ষমতার সুযোগে এদেশে তা' শিকড় গাড়তে পারেনি।[৫] অতএব, সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বুদ্ধিও আমাদের আলোচ্য-যুগেও একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আগেও একবার বলেছি,—আবার বল্‌ব,—বিশেষ শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠি-জাত কয়েকটি লোকের ধর্মসংস্কার ও সামাজিক আচরণে স্মার্তবুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বোধ অনুস্যূত হয়ে থাকলেও সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বজনীন জীবন-চর্যার ক্ষেত্রে তা আত্মপ্রকাশ করতে

কাব্য-সাহিত্যে চৈতন্য-সংস্কৃতির বিপর্যয়-চিহ্ন

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২য় সং।

পারে নি। সর্বত্র বিরাজ করেছে প্রেম-মিলন-সমন্বয়পূর্ণ দেববাদ-নির্ভর-মানবতা-বোধ। তাহলেও, বর্তমান আলোচনাংশে কেবল একটি সত্যই প্রতিপন্ন হল,—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম চৈতন্য-দেব কর্তৃক প্রবর্তিত হলেও, সেই ধর্ম-সংস্কৃতি নয়,—চৈতন্য-সংস্কৃতি আরো ব্যাপক, সর্ব-ধর্ম-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন।

সপ্তদশ অধ্যায়

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য

বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য সম্বন্ধে যুগ-প্রাচীন সংস্কার রয়েছে :—"বৈষ্ণব ধর্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়া এই সাহিত্যের আলোচনা চলে না।"[১] কিন্তু সাহিত্য-ইতিহাসের পক্ষে এই সিদ্ধান্তের সীমায়তি আছে। চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনায় ইঙ্গিত করেছি,—সেকালের কোন রাধা-কৃষ্ণ পদাবলীতেই বৈষ্ণব-ধর্মপ্রভাবের আনুপূর্বিক অনুস্থতি নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করা চলে না। বস্তুতঃ, বৈষ্ণবপদাবলীর প্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের একমাত্র উল্লেখ-তাৎপর্য চৈতন্য-প্রভাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের স্বীকৃতি। কিন্তু, বাংলাদেশে এই বিশেষ দার্শনিক চেতনার অস্তিত্ব চৈতন্য-পূর্ব কালে ছিল না। অতএব, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির যুগে যা একেবারে অনুপস্থিত ছিল, তাঁদের কাব্যে সে-বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাহলেও, চৈতন্যোত্তর যুগের দার্শনিক-আলংকারিক মূল্য-মান পরবর্তীকালে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীতে আরোপ করা সম্ভব হয়েছে ;—এই অর্থেই তাঁরা বৈষ্ণব কবি-কুলের পূর্বসূরী।

এদিক্ থেকে, বৈষ্ণব-পদাবলীর সংগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও অলংকারিক রূপাদর্শের পূর্ব-সংযোগ সাধারণভাবে স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। কিন্তু, মনে রাখতে হবে,—সাহিত্যের স্বকীয় ঐতিহ্য জীবন-মূলোদ্ভূত। ধর্ম-সমাজ, রাজনীতি-অর্থনীতির নানা উপাদানকে আশ্রয় করে বিচিত্র ভাব-রূপে জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্ছে। এই কারণে জীবনানুসারী সাহিত্যের পক্ষে ধর্মাশ্রয়ী হয়ে উঠ্তে বাধা নেই। তাই বলে ধর্ম-বিষয় মাত্রই সাহিত্য নয়; ধর্মতত্ত্ব (Theology) আর কলা-কর্মে (art) পার্থক্য আমূল। ধর্মচেতনা যেখানে প্রধানতঃ জীবনের মূল্য-বোধকে উদ্বুদ্ধ, বিকশিত, অথবা পরিণত করতে পেরেছে, সেখানেই তা সাহিত্যের বিষয় হবার যোগ্য। আর পূর্বের অধ্যায়ে দেখেছি, চৈতন্যদেবের জীবনাচরণের মধ্যে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম এবং বাঙালির জীবন-চেতনা যুগপৎ এক নবীন মূল্যবোধে আলোড়িত হয়েছিল। চৈতন্য-

---

১। ৺অমূল্যধন বিদ্যাভূষণ।

প্রবর্তিত ধর্ম সেই জীবনালোড়নের ফল; চৈতন্য-সমকালীন ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী সেই জীবন-মন্থন-জাত অমৃত। এই অর্থেই এদের পারস্পরিক যোগ রয়েছে। আর, বৈষ্ণব-পদাবলীর সংগে বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত জীবন-মূল্যবোধের এই সংযোগ-সূত্রই সাহিত্য-ইতিহাসের একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয়;—সর্বাঙ্গীণ বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব নয়।

এদিক থেকে নিঃসংশয়ে বলা চলে, বৈষ্ণবধর্ম প্রধানতঃ উপলব্ধির ধর্ম। ব্যক্তির অনুভূতি-নিবিড় 'অহেতুকী' নিষ্ঠার মূলেই এই ধর্ম-চেতনার উদ্ভব। ঈশ্বর-সাধনার জন্য প্রধানতঃ ত্রিবিধ-পন্থা শাস্ত্রে প্রোক্ত হয়েছে:—(১) জ্ঞানমার্গ; (২) কর্মমার্গ; ও (৩) ভক্তিমার্গ। চৈতন্য-ধর্ম, সর্ব-পরিচ্ছিন্ন একান্ততার সংগে ভক্তিমার্গের অনুসারী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের যে-কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে এই সত্যের স্বীকৃতি অনায়াস-লভ্য। এই প্রসঙ্গে চৈতন্য-চরিতামৃত বৈষ্ণবের একমাত্র সাধ্য হিসেবে 'শুদ্ধাভক্তি'র উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থানুসারে শুদ্ধাভক্তির পরিচয় নিম্নরূপ:—

"অতএব শুদ্ধভক্তির লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি 'জ্ঞান কর্ম'।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চ রাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

আবার শুদ্ধাভক্তি উদ্ভবের উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে:—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রযোজন সর্বানন্দ ধাম॥"

প্রেম-স্বরূপ সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা-ত্বটির বিচার করলে বোঝা যায় :—(১) কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ অন্য সকল কাণ্ডের প্রভাব-মুক্ত নিষ্ঠা ও সেই নিষ্ঠা-পরিণামী নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি,—বৈষ্ণবদের একমাত্র সাধ্য। পারিভাষিক অর্থে এই বিশুদ্ধ ভক্তিকেই প্রসঙ্গান্তরে বলা হয়েছে 'কেবলারতি'।

(২) 'কেবলারতি' একমাত্র ব্যক্তিগত নিষ্ঠা, অভ্যাস এবং সাধনার দ্বারাই আয়ত্তগম্য। অর্থাৎ, 'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা' উৎপন্ন হতে পারে তখনই, যখন ঐকান্তিকী নিষ্ঠা তার স্বভাব-জ হয়ে ওঠে। এই শ্রদ্ধার ফলে সাধুসংগে শ্রবণ-কীর্তনাদির অভ্যাস, সেই অভ্যাস বশে 'অনর্থ-নিবৃত্তি' অর্থাৎ সমস্ত বাধার বিনাশ ঘটে। তার ফলে, ভক্তি-নিষ্ঠার সক্রিয়-প্রকাশ ; তৎফলে ঐকান্তিকী আসক্তি, রতি এবং গাঢ়-রতি বা প্রেমের উৎপত্তি।

(৩) কিন্তু গাঢ়-রতি-চর্যার প্রধান সোপান হচ্ছে—"আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন"।—এই 'সর্বেন্দ্রিয়' বলতে কেবল চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বা বাক্-পাণি-পাদাদি কর্মেন্দ্রিয়ই নয়, মন-বুদ্ধি-অহংকারাদি পঞ্চতন্মাত্রাকেও গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের ঐকান্তিকী ভক্তি-সাধনার সিদ্ধিই 'প্রেম'। আর, এই মূর্তিমতী সিদ্ধিকেই বৈষ্ণবেরা রাধা নামে অভিহিত করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

ভক্তিবাদের সার-নিষ্কাসণ,—রাধা

"কৃষ্ণতে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ ধরে প্রেম নাম।
আনন্দ বিস্ময়-রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥"

এই 'মহাভাবরূপা'র প্রেমেই বৈষ্ণব সাধক তন্ময়। কিন্তু, পরমা-প্রেম-সিদ্ধি-রূপিনীর মহা-প্রেমকে তিনি নিজের আয়ত্তগম্য বলে কল্পনা করতে পারেন না ;—দেহ-মন-প্রাণের ঐকান্তিকী প্রচেষ্টায় কেবল ঐ প্রেমেরই অনুসরণ

করে তাকে যথাসম্ভব আস্বাদনের প্রয়াস করেন। তাই, বৈষ্ণবভক্তের প্রার্থনা,—

"আমি ত চাহি না রাধা হতে, হব রাধার পরাণ-প্রিয়া।"

কারণ, রাধা-প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় স্বয়ং কৃষ্ণও করে উঠ্‌তে পারেন না,—একে কেবল উপলব্ধির মধ্য দিয়েই উপভোগ করতে হয়। আর, সেই উপভোগের পূর্ণতার জন্য কৃষ্ণকেও নর-দেহ ধারণ করতে হয়,—

রাধাবাদ ও গৌরা-বতারের তাৎপর্য

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশ বানয়ৈবা-
স্বাদ্য, যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কিদৃশং বেতি লোভাৎ,
তদ্ভাবাঢ্য সমজনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।" (চরিতামৃত)

'শ্রীরাধার (আমার প্রতি) প্রণয় মহিমা কিরূপ, আমারই বা কি মধুরিমা রয়েছে, আমাকে অনুভব করে রাধার কেমন সুখবোধ হয়, এ'সব কথা জান্‌বার লোভে, সেই ভাবযুক্ত হয়ে হরি-রূপ ইন্দু শচীর গর্ভ-সিন্ধুতে জাত হয়েছিলেন।

অতএব, দ্বাপরের যশোদা-দুলাল এবং কলির শচীনন্দন অভিন্ন। কেবল দ্বাপরে যিনি লীলা-সুখে দ্বৈতমূর্তি, কলিতে তিনিই অ-দ্বৈত রূপ। এ-দুয়ের অভিন্নতা-বোধ থেকেই দ্বৈতাদ্বৈত বুদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে। তাই চৈতন্যচরিতামৃত আবার বলেন :—

"রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি—
রস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি দেহভেদং গতৌ তৌ,
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্।
রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।"

—রাধা কৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতি-রূপা;—তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। এই দু'জন একাত্ম হওয়া সত্বেও পুরাকালে দেহ-ভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অধুনা সেই 'দুই' চৈতন্য-নামে ঐক্য-প্রাপ্ত হয়ে আবার প্রকটিত হয়েছেন। রাধার ভাব-কান্তি-যুক্ত সেই কৃষ্ণ-স্বরূপকে নমস্কার।—

এখানে কলিযুগে কৃষ্ণের প্রেম-স্বভাবকে নূতন ভাব-রূপে আস্বাদন করলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য; ভগবানের পক্ষে এটি আত্ম-রতির আনন্দ। চৈতন্য-পরিকর ভক্তেরা আবার এই ভাগবত আনন্দলীলাকে প্রত্যক্ষ করে তদ্গত,—

অভিভূত হয়েছেন। অতএব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-চেতনার পক্ষে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস-লোকে উত্তরণের শ্রেষ্ঠ সেতু গৌরলীলা। এই সেতু-সংযোগের ফলেই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদসাহিত্য চৈতন্য-পূর্ব পদাবলীর তুলনায় স্বাদে-গন্ধে-রূপে নবতর পরিণাম লাভ করেছে। আর, আগেই বলেছি, এই নব-বিকাশ ও পরিণামই সাহিত্য-ইতিহাসের একমাত্র বিচার্য। এই বিচার-মানের অনুসরণে এবার বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনার পথ পরিহার করে অনুসরণ করব অনুভব-বেদ্য জিজ্ঞাসার পথ।

এদিক্ থেকে সকল ধর্ম-জিজ্ঞাসারই মূলে রয়েছে আত্মজিজ্ঞাসার প্রধান প্রেরণা ;—কোন-না-কোন উপায়ে আপন-আত্মার স্বরূপ সন্ধান! প্রাচীন ঋষিও নির্দেশ দিয়েছেন—"আত্মানং বিদ্ধি।"—কারণ আত্মাকে জানলেই সকল জানার শেষ হয়। কিন্তু স্বভাব-বশেই এই আত্ম-স্বরূপ রূপাতীত। তাই, একে জানতে হলেই ভাব, চিন্তা ও কর্মের জগতে ব্যাপ্ত করে অনুভব করতে হয়। এই ব্যাপ্তির স্তর-ক্রমাবলী অতিক্রম করে মানুষ পরমাত্মার মধ্যে আত্ম-স্বরূপের পরিচয় আবিষ্কার করে। এই পরমাত্মাই ধর্মের 'সাধ্য'। চিন্তা অথবা কর্ম,—জ্ঞান অথবা ক্রিয়ার সাহায্যে পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কিন্তু, আলোচ্য প্রচেষ্টা-দুটিই স্বভাবতঃ নেতিবাচক। কারণ, যা আছে তার অস্তিত্ব প্রমাণের আবশ্যক হয় না। যা নেই বলেই কোন-না-কোন পক্ষ থেকে সন্দেহ উপস্থাপিত হয়ে থাকে,—সেই সন্দেহকে স্বীকার করে নিয়েই তবে, তারই অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের প্রচেষ্টা 'না' কে 'হাঁ' করার চেষ্টা। কিন্তু ভক্তির চেষ্টা প্রথম থেকেই ইতিবাচক। ভক্তি প্রথমেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেয়, তিনি আছেন; আছেন যে, তার একমাত্র প্রমাণ ভক্তের ঐকান্তিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে সকল বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে গেলে চাই অন্তরের অনুরাগ বা প্রেম। অপরপক্ষ যতই এই বিশ্বাসকে ভাঙ্‌তে চাইবে,—ভক্ত ততই তাকে অন্তরের ভালবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরেন। বলাবাহুল্য, এই ভালবাসা লৌকিক ভালবাসা। বহু-কর্ষণের ঐকান্তিকতার ফলে তা অতিলৌকিক মহিমা-ব্যঞ্জনা লাভ করে। বৈষ্ণব সাধনার পথ এই ভালবাসার পথ,—এই প্রেমানুরাগেরই পথ। ভালবাসার আবার বিভিন্ন পর্যায় আছে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য,

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-চেতনায় প্রেমবাদ

মধুর। যে যে-ভাবে সাধ্যের আরাধনা করে, সেই ভাবের আনন্দের মধ্যেই তার সিদ্ধি রূপায়িত হয়ে ওঠে।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

—যে আমায় যেমন করে কামনা করে, আমি তাকে তেমন ভাবেই ভজনা করি,—

আগেই বলেছি,—এক্ষেত্রে সাধ্যের অস্তিত্ব সাধকের ঐকান্তিক বিশ্বাসের 'পরেই নির্ভর করে থাকে। এই বিশ্বাস হৃদয়ের অনুরাগ-বশে দৃঢ় হয়ে ওঠে। আর, অনুরাগ-প্রধান বিশ্বাসের দৃঢ়তা অন্তরে যতই বাড়তে থাকে, অনুরাগের আবেগও ততই বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, অনুরাগ এবং বিশ্বাস, ভক্তি এবং ভগবান পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক-পরিপূরক,—পরস্পরের রক্ষক। অনুরাগ ও বিশ্বাসের,—ভক্ত ও ভগবানের এই বিচার-তর্ক-সংগ্রাম-বিমুখ যে একাভিমুখী সমন্বয়-মিলন, এরই আনন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান কাম্য,—কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"সেই প্রেমা প্রযোজন, সর্বানন্দ ধাম।"

পদাবলী সাহিত্যে এই সার্বিক জীবন-কামনাই সার্থক শিল্প-রূপ লাভ করেছে।

বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য রাধাভাবাত্মক 'মধুরপ্রেম'। সন্দেহ নেই, চৈতন্যোত্তর যুগের পদ-সাহিত্যে বাৎসল্য-বাল্যলীলাদি বিচিত্র বিষয়ক পদের সংখ্যাবাহুল্য রয়েছে। তবু, সাধারণভাবে সকল ভক্ত কবিরই রস-চেতনা যে মধুরভাব-রস-সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আছে, তাতে সংশয় নেই। আর, চৈতন্য-পূর্ব যুগের কাব্যে রাধা-ভাবেরই ছিল একচ্ছত্র প্রাধান্য। অথচ, আগেও বলেছি, বাংলা দেশে রাধা-বাদের উদ্ভব-ইতিহাস আজও অজ্ঞাত রয়েছে। অবশ্য, বাংলার লোক-চেতনার মধ্যে রাধা-নামের প্রথম উদ্ভবের কথা ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন। কিন্তু, কবে কোন্ যুগে প্রথম কাদের চিত্তে এই রাধা-নামের বাঁশি প্রথম সাধা হয়েছিল, তা বলা যায় না। সে যখন, যে ভাবেই হয়ে থাক্, এবং তাতে শ্রীমদ্ভাগবতের বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের বিশেষ-কৃপা-পুষ্টা কোন একটি গোপিকার যত প্রভাবই থাক্, এ'কথা জোর করে বলা চলে যে, একটি বিশেষ লোক-গোষ্ঠীর গভীর

প্রেমোপলব্ধির পরিণামেই এই কল্পনা সম্ভব হতে পেরেছিল। তাই দেখি, কী প্রাকৃত-অপভ্রংশে লিখিত লোক-কথা, কি সংস্কৃত-বাংলায় লিখিত জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-মহাজন-গাথা,—কী 'রতিসুখসার', কি প্রেমরস-ঘন রাধাকৃষ্ণলীলা-সংগীত, সর্বত্রই এই নির্বাধ উপলব্ধির অকুণ্ঠ আনন্দই হয়েছে স্বত-উৎসারিত। একটি প্রচলিত ধারণা আছে,—পদকর্তা

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদ সাহিত্যে প্রেমানুভূতির পরিচয়

চণ্ডীদাস রাধার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে মন্ময় চিত্তের উপলব্ধি-নিবিড়তার মধ্যেই কৃষ্ণ-প্রেমকে উপভোগ করেছেন। কিন্তু জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের মত চৈতন্যোত্তর-কবি চৈতন্যের আড়ালে দাঁড়িয়ে করেছেন রাধাকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন। অবশ্য এখানে পদকর্তা চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয়েছে। চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় বিতর্কে নূতন করে প্রবৃত্ত না হয়েও একথা স্বীকার করা চলে যে, চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের প্রেম-রচনায় শিল্পি-চিত্তের একটা তদ্গত আন্তরিকতার পরিচয় নিবিড়। আগে বারে বারে বলেছি,—এই ব্যক্তিগত প্রেম-তন্ময়তাতেই জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীর মূলগত শিল্প-প্রেরণা। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব যুগে সে প্রেম-সত্য ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে মাত্র গুহায়িত হয়েছিল, ব্যক্তিচেতনার অনতি-সাধারণ উচ্ছ্বাস-তীব্রতা ছাড়া তার অন্য নিয়ামক ছিল না।—চৈতন্য-জীবনের সাধনা এবং প্রচারের প্রভাবে সেই সত্যবোধ এক বৃহত্তর ধর্ম উপলব্ধির পটভূমিতে 'সর্বজনীন' যদি না-ও হয়, তবু বহুজনীন রূপলাভ করে। ফলে, চৈতন্য-জীবন-বিকাশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রভাবে ব্যক্তিগত ভাব-কল্পনার সমুচ্ছ্বাস সাধারণীকৃত হল; তার অতিশায়িতা হল মন্দীভূত। অন্যদিকে, নিছক মন্ময় আবেগানুভূতিকে সাধারণীকৃত, সর্বজনীন করে তোলার দায়িত্ববোধ হেতু চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণব পদকর্তাগণকে 'রূপদক্ষ' হয়ে উঠ্‌তে হয়েছে। ফলে, চৈতন্যোত্তর যুগে, বিশেষ করে চৈতন্যলীলার প্রভাবেই বৈষ্ণব-পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে ভাব এবং রূপগত এক অভিনব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ও পার্থক্যের প্রধান নিদর্শন গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরচন্দ্রিকানুসারী রাধাকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন। আগেই বলেছি, চৈতন্যদেব তাঁর জীবন এবং ধর্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা আস্বাদনের যে পদ্ধতি সংকেত করেছিলেন, তারই প্রভাবে কবির ব্যক্তিত্ব-সঞ্জাত

সৃষ্টি গোষ্ঠীর সাহিত্যে পরিণত হয়। তাই, আমরা জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কাব্যকে কবি-ব্যক্তির মানস-বিকাশের আধারে ধরে বিচার করেছি। কিন্তু, চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্য-আলোচনার প্রারম্ভেই ধর্মগত ভূমিকাটুকু হয়েছে অপরিহার্য। কারণ, মুরারিগুপ্ত, নরহরি, ইত্যাদি চৈতন্য-পারিষদ্‌গণই নয়,—জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসকবিরাজের মত চৈতন্য-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রেমবর্ণনাতেও কবি-ব্যক্তির উপলব্ধি তত প্রখর নয়, যত প্রবল কবি-ভক্তের গোষ্ঠিগত বিশ্বাস। এক বিশেষ শ্রেণীর মানবগোষ্ঠী, এক বিশেষ ধরণে গৌরচন্দ্রের লীলা-রস আস্বাদন করে, এমন এক বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, যা'র ফলে তাদের প্রেম-সাধনা, তথা রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-উপলব্ধির আকার প্রকার সম্পূর্ণ নবরূপায়িত হয়ে উঠেছিল। আর, এই সাধারণ পটভূমিকার ব্যাখ্যার জন্যই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যালোচনার অতবড় 'গৌরচন্দ্রিকা' রচনা অপরিহার্য হ'ল।

গৌরী-লীলা-নির্ভর বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যের দুইটি স্তর

কিন্তু, গৌরচন্দ্রিকা শেষ করেও বলতে হয়, গৌরচন্দ্রকে কেন্দ্রবর্তী রেখে রাধাকৃষ্ণ-লীলাস্বাদনের এই যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হ'ল তা'র স্পষ্ট লক্ষিতব্য দুটি পৃথক্ পর্যায় রয়েছে।—প্রথমটি চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদসাহিত্য। দ্বিতীয়, চৈতন্যোত্তর অর্থাৎ চৈতন্য-তিরোভাবোত্তর বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য। প্রথম পর্যায়ে গৌরলীলাস্বাদনের অভিজ্ঞতা সজীব এবং প্রত্যক্ষ। তাই, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং উপভোগ-জনিত আবেগ বহুল হলেও প্রকাশ সহজ, অনাড়ম্বর এবং স্পষ্ট। এই পর্যায়ে অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত এবং নিবিড় বলেই সজীব। তাছাড়া, প্রত্যক্ষাস্বাদনের নিরবছিন্নতা এবং নিত্য-নূতনতার দরুণ কোন রকমের ধীর-কল্পিত গোষ্ঠি-চেতনার (schooling) প্রভাব এতে লক্ষিত হয় না। ইতিহাসের বিচারে, সমসাময়িকগণের আস্বাদনে ব্যক্তিগত পার্থক্যের মধ্যে অদ্বৈত-গোষ্ঠী, নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী, নরহরি-গোষ্ঠী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব-গোষ্ঠীর (Emotional schools of thought) নীহারিকা-রূপ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, সে-সবই অনুস্যূত হয়েছিল ব্যক্তিগত আস্বাদন-বৈশিষ্ট্যেরই মধ্যে। সুপরিকল্পিত গোষ্ঠি-চেতনারূপে তার কর্ষণ ঘটতে পেরেছিল, কেবল চৈতন্য-তিরোভাবের পরেই। তাছাড়া, চৈতন্য-সমসময়ে, বিশেষ করে চৈতন্যোত্তর যুগের বৃন্দাবনে

গোস্বামিগণের হাতে গৌরলীলানুভূতি ও সে সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা নূতন দার্শনিক এবং আলংকারিক মহিমা লাভ করেছিল। চৈতন্য-সমসাময়িক কালের কবিগণের চেতনার 'পরে তা' কোন সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অন্য পক্ষে, চৈতন্যোত্তর যুগের কবির হাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সম্পদ না থাকলেও, তার পরিবর্তে ছিল সেই অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ মহাজন-চেতনা-সৃষ্ট বিরাট দার্শনিক এবং আলংকারিক ঐতিহ্য। এই পূর্বসংস্কার কবি-চেতনাকে বৃহত্তর উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফলে, সম্ভব হয়েছিল অধিকতর সার্থক এবং সুন্দর পদ-সাহিত্যের সৃষ্টি। চৈতন্য-সমসাময়িক শিল্পিগণ যেখানে যথা-দৃষ্ট অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে সহজ মুক্তি দান করেছেন,—চৈতন্যোত্তরকালের কবিগণ সেখানে, সেই একই অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে দার্শনিক-আলংকারিক ঐতিহ্যের পটভূমিকায় দিয়েছেন সার্থক শিল্প-মূর্তি। প্রত্যক্ষ উদাহরণের সাহায্যে এই বক্তব্যের তাৎপর্য স্পষ্ট হতে পারবে।

চৈতন্য-পরিকর বাসুঘোষ গৌরচন্দ্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। সুরধুনী-তীরে গৌর-রূপের বর্ণনা করেছেন বাসুঘোষ :—

বাসুঘোষের গৌরাঙ্গবিষয়কপদ

"একদিন ঘাটে জলে গিয়াছিলাম
কিরূপ দেখিনু গোরা
কনক কষিল, অঙ্গ নিরমল,
প্রেমরসে পঁহু ভোরা॥
সুন্দর বদন, মদন মোহন,
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ছটা।
সুচারু কপালে চন্দন-তিলক,
তারা সনে বিধু ঘটা॥
মধুর অধরে, ঈষৎ হাসিয়া,
বলে আধ আধ বাণী।
হাসিতে খসয়ে মণি মোতিবর,
দেখিতে ভুলয়ে প্রাণী।
বাসু ঘোষ কহে এমন নাগর
দেখি কে ধৈরজ ধরে।

ধন্য সে যুবতী ওরূপ দেখিয়া
কেমনে আছয়ে ঘরে ॥”

নরহরি সরকারঠাকুরের মত বাসুঘোষও গৌর-নাগরিয়াভাবের[২] সাধক ছিলেন। ফলে, তাঁর এই পদটিতেও,—বিশেষ করে শেষের ভণিতা-ছত্র কয়টিতে সেই ভাবের স্পষ্ট বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু গোটা পদটির অনুভূতিগত সহজ সরলতা ও বর্ণনার যাথাযাথ্য দৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। সত্যই একদিন ঘাটে গিয়ে কবি 'গোরা'কে যে-রূপে দেখেছিলেন,—সেই মূর্তিটিকে চোখের 'পরে রেখেই যেন তিনি গৌরাঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা করেছেন। মনে হয়, একবার করে দেখে নিচ্ছেন, আর একটি করে পদাংশ লিখে যাচ্ছেন যেন।—চৈতন্য-সমসাময়িক যুগের পদ-বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

এরই পাশে চৈতন্যোত্তর যুগের কবি-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস কবিরাজের বর্ণিত 'সুরধনী-তীর-উজোর' গৌরাঙ্গমূর্তির চিত্র উদ্ধার করি—

গোবিন্দদাস কবিরাজ-অঙ্কিত গৌরমূর্তি

“নীরদ নয়নে নীরঘন-সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধনী তীর উজোর ॥
চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর ॥
অবিরত প্রেম- রতনফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর ॥”

২। পরবর্তী অংশে নরহরি-সম্বন্ধীয় আলোচনায় 'গৌরনাগরিয়াভাবের' ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সহজেই বোঝা যায়,—বাসুঘোষের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব-চিত্রটি গোবিন্দদাস কবিরাজের সুপরিকল্পিত মণ্ডনকলা এবং সুবিন্যস্ত দার্শনিক-আলংকারিক চেতনা-প্রভাবে শিল্পরূপ লাভ করেছে। চৈতন্য-সমসাময়িক কাব্যের শিল্পগুণ অস্বীকার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের বক্তব্য,—চৈতন্য-সমসাময়িক যুগে বৈষ্ণব-পদাবলী প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার আবেগ জাত স্বভাব-কবিতা। কিন্তু, চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী একদিকে যেমন সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত দার্শনিক-আলংকারিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি মণ্ডন-সুষমা-ভাস্বর। এ আলোচনা আর দীর্ঘায়ত করে লাভ নেই,—উদাহরণ দুটি থেকেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হওয়া উচিত।

অদ্বৈতপ্রভু-কৃত চৈতন্য-বন্দনা

এবারে চৈতন্য-সমসাময়িক পদসাহিত্যের আলোচনার সূচনাতেই স্মরণ কার চৈতন্য-ভাগবত-কার বৃন্দাবনদাসের কথা। তাঁর উক্তি প্রামাণ্য হলে অদ্বৈত মহাপ্রভুই সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ-কীর্তনের সূচনা করেছিলেন,—

"আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি॥
'শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥'
অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥"

কিন্তু চৈতন্য-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ-রচয়িতা হিসেবে নরহরিসরকার ঠাকুরই "বোধ হয় প্রাচীনতম"। এঁর বাসস্থান ছিল শ্রীখণ্ডে,—পিতার নাম নারায়ণ। জীবৎকাল বিস্তৃত হয়েছিল ১৪৭৮—১৫৪০ খ্রীঃ। নরহরি গৌর-নাগরিয়া ভাবের প্রবর্তক ছিলেন। গৌরনাগরিয়া ভাবের উদ্দেশ্য,—নাগরী-ভাবে শ্রীচৈতন্য-স্বরূপের আস্বাদন। ব্রজ-গোপীগণ

নরহরি সরকার ঠাকুর

যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করেন,—গৌর-নাগরীগণও সেই ভাবে ভাবিত হয়ে গৌরলীলা আস্বাদন করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য,—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নাগরী,—বৈষ্ণব চেতনার নিকট শ্রীকৃষ্ণ, তথা কৃষ্ণাবতার গৌরচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ। নরোত্তমদাস নরহরি সম্বন্ধে গেয়েছেন,—

"প্রেমের নাগরী ভেল দাস নরহরি।
গৌরাঙ্গের হাটে ফেরে লইয়া গাগরী ॥"

যে পদটির মাধ্যমে নরহরি গৌর-লীলা-কীর্তনের পথনির্দেশ করেন, সেটি নীচে আংশিকভাবে উদ্ধৃত হল,—

"গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু ॥

* * * *

কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা ॥"

নরহরির প্রতিভাবান্ শিষ্য লোচনদাস লোক-প্রিয় চৈতন্য মঙ্গলকাব্য লিখে গুরুর ইচ্ছার চরিতার্থতা বিধান করেছিলেন। নরহরি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট পদও রচনা করেন।

চৈতন্য-পরিকরগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা শ্রীহট্টের বৈদ্যবংশ-সম্ভূত মুরারিগুপ্ত। ইনি চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও নবদ্বীপে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। মুরারি স্বয়ং আদর্শ-বৈষ্ণব হয়েও বিশেষভাবে ছিলেন রামচন্দ্রের ভক্ত। তাই, তিনি হনুমানের অবতার বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এঁর চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থ 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' নামে বিখ্যাত। বাংলা ভাষায় লেখা মুরারির রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে চৈতন্য-প্রেমার্তি যেন স্থানে স্থানে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। নিবিড় আন্তরিকতাই এঁর পদ-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য,—

শ্রীহট্টের মুরারিগুপ্ত

"সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন পুতলি করি লইলোঁ মোহনরূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুন জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবন গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে,
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারিগুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥"

পদটির মধ্যে রাধার পশ্চাৎবর্তী গৌর-মূর্তিটি যেন স্বতোভাস্বর!

গোবিন্দ, মাধব ও বাসুঘোষ

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ এঁরা তিন ভাই-ই চৈতন্য-পরিকর ছিলেন; আর তিনজনেই পদরচনা করে গেছেন। পদকর্তা হিসেবে অবশ্য বাসুঘোষই এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। "বাসুদেব ঘোষের সবগুলি পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক[৩]।" এঁর রচনা সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী উল্লেখ করেছেন,—

"বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥" চৈঃ চঃ

বাসুঘোষের কাষ্ঠ-পাষাণ-দ্রাবী পদগুলির একটি আমরা পূর্বেই উদ্ধার করেছি। সেই প্রসঙ্গে এ-কথাও উল্লেখ করেছি যে,—বাসুঘোষের গৌর-পদাবলীতে 'গৌরনাগরীভাবের' প্রভাব আছে।

৩। ডঃ সুকুমার সেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়কাব্যের বিখ্যাত কবি কুলীনগ্রামবাসী মালাধরবসুর পৌত্র ছিলেন[৪] চৈতন্য-পার্শ্বচর রামানন্দ বসু। ইনি বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদরচনা করেন।

রামানন্দ বসু

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশে রচিত ব্রজবুলি পদাবলীর এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম পদটি এর আগেই রচিত হয়েছিল। ঐ পদের ভণিতাংশে হুসেন শাহের উল্লেখ রয়েছে। অতএব, মনে করা যেতে পারে, ১৪৯৩ খ্রীঃ থেকে ১৫১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত হুসেনশাহের রাজত্বকালের কোন সময়ে পদটি রচিত হয়েছিল[৫]। পদটির লেখক হিসেবে ভণিতায় 'যশোরাজখান'-এর উল্লেখ আছে :—

বাংলাদেশে রচিত প্রাচীনতম ব্রজবুলিপদ

"এক পয়োধর চন্দনলেপিত আরে সহজই গোর
হিম ধরাধর কনক ভূধর কোরে মিলল জোর।
মাধব, তুয়া দরশন-কাজে
আধপদচারি করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে।
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম
নীল ধবল কমল যুগলে চাঁদ পূজল কাম।
শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ সোহ এ রস-জান
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভনে যশোরাজখান॥"

চৈতন্য-পার্ষদ বংশীবদন চট্ট একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। এঁর বহু রচনা শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য পদকর্তা বংশীদাসের রচনার সংগে মিশে গেছে। বংশীবদনের অধিকাংশ পদই সরল সাবলীল বাংলায় রচিত। বংশীবদনের গৌরলীলার একটি বিখ্যাত পদ—

"শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বদনে।
ধবলি শাঙলি বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙার শবদ করি বদনে বাজায়॥
নিতাইচাঁদের মুখে শিঙার নিশান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥

বংশীবদন চট্ট

৪। মতান্তরে পুত্র। ৫। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ২য় সং (ডঃ সুকুমার সেন)।

ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
'ভেইয়ারে ভেইয়ারে' বলি ডাকে অভিরাম ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমার আবেশ।
শিরে চূড়া শিখিপাখা নটবর বেশ ॥
চরণে নূপুর বাজে সর্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্ধন ॥"

সহজেই বোঝা যাবে,—পদটি স-পার্ষদ গৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলার পদ। বর্ণনার সারল্য এবং যাথাযাথ্যের সৌন্দর্যে পদটি চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলীর একটি উৎকৃষ্ট ভাব-পরিচয়।

চৈতন্য-সমসাময়িক পদকর্তাদের আলোচনা এখানেই শেষ করি। সন্দেহ নেই, একাধিক কবি অনুল্লিখিত রয়ে গেলেন। কিন্তু চৈতন্য-সমকালীন ও চৈতন্যোত্তর যে অসংখ্য বৈষ্ণব কবিকুলের পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেরই সাধারণ পরিচয় ও একটি করে পদ বা পদাংশ উদ্ধার করতে গেলেও গ্রন্থ-কলেবর অসঙ্গতরূপে বেড়ে যাবে। তা ছাড়া, বারে বারে বলেছি, রচনা-পঞ্জী প্রস্তুত করা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের যুগ-যুগ-বিলম্বী ঐতিহ্যধারার স্থান-কাল-জাতিগত বিন্যাস ও সাধারণ মূল্যায়নই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার একমাত্র কাম্য। এদিক্ থেকে চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের যুগ এবং ভাব-গত ঐতিহ্যের যথাসম্ভব বিশ্লেষণের পরে আমাদের দায়িত্ব নিঃশেষিত হয়েছে বলে মনে করি। এবারে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের আলোচনা। বলা বাহুল্য, এখানেও, তথা এই গ্রন্থের পরবর্তী সমগ্র অংশে এই একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে।—শ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনার বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে যুগাশ্রিত ভাবৈতিহ্যটির প্রকাশ এবং বিশ্লেষণের সংগে সংগে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় পুংখানুপুংখ তথ্যোদ্ধার অপূর্ণ রেখেই প্রতিটি প্রসঙ্গ হবে সমাপ্ত।

চৈতন্যোত্তর যুগের কবি-শ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণীয় পদকর্তা জ্ঞানদাস। এঁর বিস্তৃত পরিচয় আবিষ্কৃত হতে পারে নি। যতটুকু জানা যায়,—জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলার কাঁদড়াগ্রামের এক ব্রাহ্মণবংশে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী ছিলেন তাঁর গুরু। গোবিন্দদাসকবিরাজ, বলরাম-দাস প্রভৃতির সংগে জ্ঞানদাসও খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

চৈতন্যোত্তর কালের পদকর্তা জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব পদ-রচনা উপলক্ষ্যে জ্ঞানদাস একাধারে বাংলা, ব্রজবুলি ও বাংলা-ব্রজবুলি-বিমিশ্র ভাষায় ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্রজবুলিভাষায় রচিত পদের সংখ্যাই সমধিক। কিন্তু, বিশেষভাবে যে-সকল পদের জন্য জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর পদ-কর্তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত হয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিই বাংলা ভাষায় লেখা। আর, ভাবের নিবিড়তা ও প্রকাশ-ভঙ্গির অনাড়ম্বর সাবলীলতাই জ্ঞানদাসের কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞানদাসের রচনা-বৈশিষ্ট্য

তাই, রাধাকৃষ্ণ-লীলার গভীর উপলব্ধি-গম্য, আক্ষেপানুরাগ রূপানুরাগাদি বিষয়ের পদেই তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে সমধিক। এই কারণে, প্রাচীন-রসিক-সমালোচক-জন জ্ঞানদাসকে কবি চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তর-সূরী বলে অভিহিত করেছেন। এই উপলক্ষ্যে অবশ্য প্রথমশ্রেণীর পদকর্তা কোন এক প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসেরই কল্পনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু, প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, বড়ুচণ্ডীদাসের সংগেও জ্ঞানদাসের সাদৃশ্য অনুমান করা খুব অন্যায় নয়।

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন শুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারেহে।"—ইত্যাদি

কৃষ্ণ-কীর্তনের বিখ্যাত পদটির সঙ্গে জ্ঞানদাসের নিম্ন-ধৃত পদটির তুলনায় বিচার করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

"মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপন দেখিলুঁ যে, শ্যামল বরন দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরী বোল,
কোকিল কুহরে-কুতূহলে।
ঝি ঝা ঝিনিকি বাজে, ডাহুকি সে গরজে,
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥

মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক রহু কুলের কামিনী
রূপে-গুণে রস-সিন্ধু, মুখ-ছটা জিনি ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে,
আমা কিন বিকাইনুঁ বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণের ভূষণ অঙ্গ,
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিঃসরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥"

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস

বস্তুতঃ, পদপদকর্তা চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত পদাবলী অথবা কৃষ্ণকীর্তনকার বড়ুচণ্ডীদাসের তথাকথিত রুচিহীন পদাবলীই হোক্,—উভয়েরই রস-উৎস শিল্পি-চিত্তের নিবিড় গভীর ভাবানুভূতির গহনে নিহিত। মৌলস্বভাবে এই চণ্ডী-কবি দুজনের অভিন্ন-হৃদয় সাধর্ম্য রয়েছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আস্বাদনে জ্ঞানদাসও ঐ একই ভাব-রসের কবি। তাই, উভয় চণ্ডীদাসের ভাব-সমুচ্ছ্বসিত পদাবলীর সঙ্গে জ্ঞানদাসের ভাব-প্রধান পদাবলীর সাদৃশ্য একান্ত 'অন্তরঙ্গ'। তাহলেও, এই প্রসঙ্গেই লক্ষ্য করা উচিত,—চৈতন্য-পূর্ববর্তী পদাবলীকার কবি চণ্ডীদাসের সংগে চৈতন্যোত্তর যুগের কবি-প্রতিভূ জ্ঞানদাসের শিল্প-কৃতির আকার ও প্রকারগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। ওপরে উদ্ধৃত জ্ঞানদাসের পদটির অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে, চণ্ডীদাস যেমন অন্তরের ঐকান্তিক ভাবকে অন্তরেরই এলোমেলো অসংবদ্ধ ভাষা-বন্ধে যদৃচ্ছ প্রকাশ করেছেন, জ্ঞানদাস তেমনটি করেননি।

আমাদের বক্তব্য এই নয় যে,—চণ্ডীদাস-পদাবলীর রস-সমৃদ্ধি স্বল্পতর। বরং, স্বীকার করতেই হবে,—হৃদয়-ধর্মের কবি হিসেবে চণ্ডীদাসই জ্ঞানদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনায় বলেছি,—অন্তরের ভাষাকে মুখের কথায় ফুটিয়ে তুলতে পারলেই যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা জেগে ওঠে,—চণ্ডীদাস সেই প্রাণের ভাষা-কবিতার কবি। কিন্তু, জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের মত অনুভূতি-মাত্র সম্বল করেই কাব্য-রচনায় ব্রতী হন নি। তাঁর কাব্যে অনুভূতি নিবিড় হলেও একান্ত হয়ে উঠেনি। অন্যদিকে, চৈতন্য জীবন-সাধনার ঐতিহ্য, ও বৈষ্ণব দার্শনিক-আলংকারিক পরিকল্পনার সমৃদ্ধিপ্রভাবে ব্যক্তি-সর্বস্ব অনুভূতি সংযত,--যথা পরিমিত হতে পেরেছে। তাই, ওপরে ধৃত পদটিতে দেখি,—স্বপ্নে কৃষ্ণ-দর্শন ও কৃষ্ণ-মিলন জনিত রাধার সুখাবেশটুকুর সজীব ব্যঞ্জনা-চিত্র সৃষ্টি করেই কবি ক্ষান্ত হন নি,--পরিবেশ-চিত্রণ, সু-চয়িত শব্দ-সম্ভারের ঝংকার, ও সর্বোপরি মিলনের উল্লাস-প্রবণতাকে সুতীব্র, সমন্বিত করে রস-মণ্ডিত,—শিল্পায়িত করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, জ্ঞানদাসের এই মণ্ডন-প্রয়াস চেষ্টা-কৃত বহিরাগত নয়;—চণ্ডীদাসের কাব্য-প্রেরণার মতই জ্ঞানদাসের কাব্য-প্রেরণাও স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক। বিশেষ-ভাবে চৈতন্যজীবন এবং চৈতন্যোত্তর ভাবাদর্শের ঐতিহ্য যেখানে তাঁর কবি-সংস্কারের সাঙ্গীভূত হয়েছিল,—সেখানে প্রচেষ্টার এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর কবি-চেতনার পক্ষে হয়েছিল সহ-জ। আর, এই সহ-জ কবি-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সংগতভাবে বলা চলে,—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার রচয়িতা হিসেবে চণ্ডীদাস গভীরতম প্রাণ-বেদনার গীতিকার, আর জ্ঞানদাস ঐ একই প্রাণ-বেদনার সার্থক চিত্রকর। একজন স্বভাব-শিল্পী, আর একজন মণ্ডন-শিল্পী। বক্তব্যের স্পষ্টীকরণের জন্য আবার উদাহরণের আশ্রয় গ্রহণ করি। কৃষ্ণ-রূপানুরাগ-তন্ময় জ্ঞানদাস গাইলেন,—

"রূপের সায়রে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রূপ অন্তরে পশিল।
অনেক যতন কৈল বাহির না হৈল॥
লম্ফ দিয়া ব্যাধ যেন ধরে বনে পাখী।
তেমতি ঠেকিলাম গো উপায় বল সখি॥

ঘর যাইতে পথ মোর হইল হারান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ ॥
কি করিতে কি না করি কত উঠে মনে।
তিলেক না রহে প্রাণ দরশন বিনে
জ্ঞানদাস কহে আমি এই সে করিব।
শ্যাম বন্ধু লাগি আমি যমুনায় পশিব ॥"

একই সংগে চণ্ডীদাসের পদ দেখ্‌তে পাই, একই আর্তির প্রকাশ নিয়ে ;—

"কাহারে কহিব মনের বেদনা
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে পশিয়া রহিলে,
সদাই পরশে চিত ॥
গুরুজনা আগে, দাঁড়াইতে নারি,
ছল ছল করে আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে ;
শ্যামময় সব দেখি ॥
সখির সহিতে, যমুনা যাইতে,
সে কথা কবার নয়।
মুকুর কবরি, যমুনার জল,
তা' হেরি পরাণ রয় ॥
রাখিতে নারিনু, কুলের ধরম
কহিনু তো সভার আগে।
চণ্ডিদাস কয়, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে ॥"

এই প্রসংগে বিস্তৃততর বিচার-আলোচনার প্রয়োজন নেই। উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে, চণ্ডীদাস 'হিয়ায়-জাগা' মূর্তিকে হিয়ার মাঝে বসিয়েই ধ্যাননেত্রে তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন,—তাঁর রচনায় এই তদ্গত ধ্যান-তন্ময়তার পরিচয় সুনিবিড়। আর, জ্ঞানদাস সেই একই মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন চৈতন্য-ঐতিহ্যের মাধ্যমে, তাই চিত্রকরের দৃষ্টি-তীক্ষ্ণতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর পদ।

আগেই বলেছি, ব্রজবুলি পদে জ্ঞানদাস উল্লেখ্য সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। তাই অনুরূপ পদের বিস্তৃত আলোচনা পরিহার করছি। বর্তমান প্রসংগে কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে,—ব্রজবুলি পদের আশ্রয়-রূপে রাধাকৃষ্ণ-লীলার যে উচ্ছল প্রেম-মুহূর্তগুলিকে জ্ঞানদাস গ্রহণ করে-ছিলেন,—সেই সব মুহূর্তের নিবিড় অনুভূতি তাঁর কবি-প্রতিভার পক্ষে সহজাত ছিল না। তাই, আলোচ্য পদগুলি যত মণ্ডন-সমৃদ্ধ তত শিল্প-সমৃদ্ধ নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি পদাংশ মাত্র উদ্ধার করেই জ্ঞানদাস-প্রসঙ্গ শেষ করব।

জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি পদ

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচকাই ॥
এ সখি এ সখি দেখিলুঁ নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি ॥" ইত্যাদি—

পদটির কাব্যগুণ-বিচারের পুনরবতারণা নিষ্প্রয়োজন,—তাতে পূর্ববর্তী মন্তব্যের পুনরাবৃত্তিই করা হবে।

চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠপদকর্তা গোবিন্দ দাস কবিরাজ

(জ্ঞানদাসের পরেই স্মরণ করি চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজকে। পূর্বেই বলেছি,—জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস প্রায় সমসাময়িক ছিলেন,—একই সময়ে এঁরা দু'জনে খেতুরীর মহোৎসবে ছিলেন উপস্থিত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অনুমানিক তৃতীয় দশকে (১৪৫৯ শকে) শ্রীখণ্ডে মাতুলালয়ে গোবিন্দ দাসকবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা; এবং সংগীত-দামোদর গ্রন্থের বিখ্যাত গ্রন্থকর্তা দামোদর ছিলেন তাঁর মাতামহ। বিখ্যাত সংস্কৃত কবি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দদাসের অগ্রজ ছিলেন। কবির মাতামহ দামোদর ছিলেন উগ্রপন্থী শক্তিসাধক, তাঁর প্রভাবে গোবিন্দদাসও প্রথমজীবনে শাক্ত পন্থা আশ্রয় করেন। কথিত আছে,—দুরারোগ্য গ্রহণী পীড়া থেকে মুক্তি লাভের জন্য শেষবয়সে দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৪৯৯ শক)। গোবিন্দদাসের দীক্ষা-গুরু ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। ১৫৩৫ শকে কবির দেহান্ত ঘটে।

সাধারণ ধারণা,—গোবিন্দদাসকবিরাজ কেবল ব্রজবুলি ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। গোবিন্দদাস 'ভণিতায়' যে সকল বাংলা পদ পাওয়া যায়, তার সবগুলিই গোবিন্দ চক্রবর্তী নামক অপর এক পদকর্তার রচনা বলে অনুমিত হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাস্বাদন ও তার শিল্পরূপায়নে জ্ঞান-দাসকে যেমন চণ্ডীদাস-অনুসারী বলে অনুমান করা হয়,—গোবিন্দদাস কবিরাজকে ততোধিক পরিমাণে,—বিদ্যাপতির ভাব-ভাষার একান্ত উত্তর-সূরী বলে স্বীকার করা হয়। এ সম্বন্ধে কবি বল্লভদাসের মন্তব্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—

গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'

"ব্রজের মধুর লীলা যা' শুনি দরবে শিলা।
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈত নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥"

গোবিন্দদাস যে সত্যই দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ছিলেন, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। বিদ্যাপতি-কৃত 'ত্রিচরণ'-পদের চতুর্থপাদ পূরণ করে গোবিন্দদাস পূর্ণাঙ্গ পদ গড়ে তুলেছেন; একাধিক ব্রজবুলিপদ রয়েছে বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের যুক্ত-ভণিতায়। কিন্তু গোবিন্দদাস সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা,—গোষ্ঠিগত ঐতিহ্য-সমৃদ্ধি, ব্যক্তিগত প্রতিভা-চমৎকৃতি ও অনুভূতি-নিবিড়তার প্রভাবে তিনি বৈষ্ণব-পদ-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে গুরুর সিদ্ধিকেও হয়ত অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি,—বিশেষভাবে বিলাস-কলা-সমুচ্ছল, উজ্জ্বল-রস-চপল প্রেম-চাঞ্চল্যের কবি ছিলেন রাজ-সভাকবি বিদ্যাপতি। তাঁর কাব্য-প্রেরণার পশ্চাতে বিশেষ বৈষ্ণবচেতনার প্রভাব থাক্, কিংবা নাই থাক্,—কবি হিসেবে বিদ্যাপতিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির 'পরেই নির্ভর করতে হয়েছিল একান্ত ভাবে। তা ছাড়া, বিদ্যাপতির হাতে আর যে দু'টি উপাদান ছিল, তা হচ্ছে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র এবং জয়দেবের মধুর-কান্ত পদাবলীর ঐতিহ্য। এ-সব কিছুই তাঁর রাজসভার পরিবেশ-জাত সম্পন্ন, নাগরিক জীবনের প্রেমাভিজ্ঞতার উপলব্ধি-ধারায় রস-সঞ্চার করেছে, সেই উচ্ছল-উজ্জ্বল রসকেই ভাবে-ভাষায়

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

করে তুলেছে নিবিড়। তাই বিদ্যাপতির রাধা হঠাৎ-আলোর-ঝল্‌কানির মত চোখ ধাঁধিয়ে ছুটে চলে যায়; তাঁর ব্রজবুলি ভাষা নেচে কথা কয়; তাঁর বর্ণাঢ্য প্রকৃতি-চিত্র কারুকার্য এবং উজ্জ্বলতায় হৃদয়কে বিস্ময়-স্তব্ধ করে। কিন্তু গোবিন্দদাসের কাব্য-রচনার পটভূমি ছিল ভিন্নতর,—বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ-তর। তাঁর উপলব্ধিও ছিল সেই পরিবেশোপযোগী বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। চৈতন্যদেবকে দেখ্‌তে পান নি গোবিন্দদাস; বার বার নানা প্রসঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গে সেকথা উল্লেখ করেছেন.- চৈতন্য-লীলাস্বাদনের অপূর্ব অবকাশ-ক্ষেত্র থেকে গোবিন্দদাস দূরেই রয়ে গেলেন,—"গোবিন্দদাস রহুঁ দূর।" কিন্তু চৈতন্য-জীবনের সাধনা যেদিন বিশেষ করে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল,—সেদিন সেই নব-রূপ-মহিম চৈতন্য-ধর্ম-ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন কবি গোবিন্দদাস। আগেই বলেছি, গোবিন্দদাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের সুযোগ্য শিষ্য। আর, চৈতন্য-তিরোধন শেষের বাংলাদেশে চৈতন্য-চেতনা যেদিন বিলুপ্ত-প্রায় হয়েছিল, সেদিন বিশেষ করে শ্রীনিবাস আচার্যই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের সাধন-ঐতিহ্য বাংলায় বহন করে এনেছিলেন,—নূতন প্রাণ-প্রবাহে তাকে করেছিলেন পুনরুজ্জীবিত। গুরুর সাধনার উত্তরাধিকার স্বাভাবিক ভাবেই শিষ্যের উপর বর্তেছিল। তা ছাড়া, গোবিন্দদাস সত্যই তার উপযুক্ত অধিকারীও ছিলেন। বস্তুতঃ, চৈতন্য-জীবন এবং চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-সাধনার সমগ্র ঐতিহ্যটিকে স্বী-কৃত (assimilate) করে নিয়ে,—সেই সাধন-ঐতিহ্যের—প্রতিভূরূপেই যেন গোবিন্দদাস কাব্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই, ভাবনা, চিন্তায়, উপলব্ধি ও উপভোগের বিস্তার-বৈচিত্র্যভারে গোবিন্দদাসের প্রতিভা প্রশান্ত, সুধীর,—পরিপূর্ণ। তাঁর রচনায় কবি-কথাকে ছাপিয়ে একটা সমগ্র যুগের যৌথ-সাধনা যেন কথা বলে উঠেছে,—তাঁর পদাবলী একটি যুগের সামগ্রিক সাধনা ও উপলব্ধির বাঙ্‌ময় প্রকাশ। এখানেই বিদ্যাপতির সংগে গোবিন্দদাস-কাব্যের মৌলিক পার্থক্য। বিদ্যাপতির কাব্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি-মানসের শৈল্পিক প্রকাশ; গোবিন্দদাসের কাব্য কবি-ব্যক্তির মানসাশ্রয়ে-সৃষ্ট যুগবাণী ও যুগ-সাধনার সুষমাময় সামগ্রিক অভিব্যক্তি। স্মরণ রাখা উচিত,—এই যুগবাণী ও যুগ সাধনার একমাত্র

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-সাধনার শিল্পি-প্রতিভূ গোবিন্দদাস

প্রাণ-কেন্দ্র ছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্য-ঐতিহ্যের সংগে স্বয়ং চৈতন্যদেবকে নিজ কবি-প্রাণ-চেতনার একীভূত করে নিয়ে গোবিন্দদাস পদ-রচনায় ব্রত হয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রাণ-চেতনার সংগে সংগে কাব্যে চৈতন্য-ঐতিহ্য-চেতনা একাত্মরূপে প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দদাস বলেছেন,—

"মম হৃদয়-বৃন্দাবনে কানু ঘুমায়ল,
প্রেম-প্রহরী রহুঁ জাগি।"............. সাধনার

ঐকান্তিকতায় কবি আপন হৃদয়কে কানুর চিরন্তন বিশ্রাম-কেন্দ্র নিত্য-বৃন্দাবনে পরিণত করেছেন; আপন প্রেমময় কবি-চেতনাকে সদাজাগ্রত প্রহরীরূপে রক্ষা করেছেন সেই প্রেম-তীর্থের দ্বারে;—কানুর প্রশান্ত-নিদ্রাটি যেন ভেংগে না যায়! গোবিন্দদাসের প্রায় সমগ্র কবিতায় এই নিষ্ঠা-বিশ্বাসপূর্ণ প্রেম নিত্যবৃন্দাবনের বংশীধ্বনির সুরটিকে অনুরণিত করেছে। এই প্রশান্ত বিশ্বাস এবং ধীর নিষ্ঠা ব্রজবুলির চঞ্চল ছন্দ-ঝংকারে মন্ত্রের সুর-মূর্ছনা জাগ্রত করেছে যেন,—

গোবিন্দ দাসের শিল্প-কৃতি

"নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বুকন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপ-গোকুল
কুলজ কামিনী কান্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল
কুঞ্জমন্দিরে সন্ত॥
গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
চূড়ে উড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
বাহুদণ্ডিত-দণ্ড॥
কঞ্জলোচন কলুষ-মোচন
শ্রবণ-রোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ কিসলয়
নিলয় গোবিন্দদাস॥"

ব্রজবুলির ছন্দোঝংকার, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র মন্থন করা শব্দ এবং অর্থালংকারের সমৃদ্ধি,—চিত্ত-চমৎকারী রূপ-সুষমা,—বিদ্যাপতি-প্রতিভার সকল বৈশিষ্ট্যই এখানে রয়েছে। কিন্তু, তারও চেয়ে বেশি আছে একটি বহুবিস্তৃত সুদূর-প্রসারী ঐতিহ্যে নিষ্ঠা-বিশ্বাস জনিত প্রশান্তি ও ধীরতা। —সমস্ত রূপ-বর্ণনার পদটিকে তা বন্দনা-স্তোত্রের মাহাত্ম্য দান করেছে। ভণিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

"অমল কোমল চরণ কিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস ॥"—সমগ্র পরিকল্পনাটির মধ্যে গোবিন্দদাস-কবি নি-লীন হয়ে আছেন বলেই এমন ভাব-ধীরতা-সমুজ্জ্বল প্রাণ-চিত্রাংকণ সম্ভব হয়েছে।

আর ব্যাখ্যার অবকাশ নাই,—কেবল রচনা উদ্ধার করে যাব একই বক্তব্যের পরিপোষণের জন্য। গোবিন্দদাস সাধারণতঃ অভিসারের কবি হিসাবেই বিখ্যাত। লাস-বেশময় অভিসার-চিত্রকেও কবির উপলব্ধির ব্যাপ্তি কেমন প্রশান্তি দান করেছে, তারই দৃষ্টান্ত দেখতে পাই অপেক্ষাকৃত অ-খ্যাত পদটিতে,—

"পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরনী ॥
অঞ্চল পরশি চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান ॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পায়ল হেম ॥
হাসি দরশি মুখ আগোরল গোরী।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস ॥"

স্পষ্টই বোঝা যাবে,—আলোচ্য পদটি কেলি-কলা-বিলাসের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু ভাব-ধৈর্য ও প্রশান্তির প্রভাবে লাস-বেশের উচ্ছলতা এখানে একান্ত সীমাতিক্রমী হয়ে উঠ্তে পারেনি। এই সমগ্র লীলা-চিত্রটির একাধারে স্রষ্টা ও তন্ময় দ্রষ্টা যিনি,—তিনি যে অন্তরে অন্তরে অখণ্ড চৈতন্য-ঐতিহ্যের ভাব-তদ্গত চিত্ত সাক্ষী, তা'রই প্রমাণ খুঁজে পাই ঐ ধৈর্য-প্রশান্তির মধ্যে। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদে এই ঐতিহ্যের পরিচয় সমধিক প্রকাশ লাভ করেছে,—

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম মরি জাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকত লোচন তার॥
ইথে যব সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখব দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥"

কবিতাটির প্রথমাংশে 'মানস-সুরধুনীর' অপর-তীরবর্তী হরি-সম্মিলনের একটি সাধন-গত ইঙ্গিত রয়েছে। তা ছাড়া, সমগ্র পদ-রচনার পেছনে কবি-চেতনার যে অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি সক্রিয় হয়েছিল, তার চিত্রটি পাই ভণিতাংশে। যে বাণ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে,—তাকে কি করে ফিরিয়ে আনা চলে!—সে যেমন নির্বার,—তেমনি নির্বাধ। রাধার,—চৈতন্যোত্তর প্রেম-সাধকেরও এই হৃদয়ার্তির তৃপ্তি নেই,—সমাপ্তিও নেই। তাই, অভিসার-সময়ের শেষেও গোবিন্দদাসের রাধার ক্লেশকর অভিসার-সাধনার বিরাম নেই,—

"কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধই
মন্দিরে যামিনী জাগি॥..."

সমস্ত চিত্রটির পেছনে চৈতন্য-যুগের প্রেমার্তির,—সাধন-বেদনার ঐতিহ্য যেন প্রমূর্ত হয়ে আছে। তাই অত বেদনার,—অত-সাধনার শেষে যে মিলন, তাতে কোন চাপল্য নেই,—নেই কোন উল্লাস। আছে কেবল পরম-মিলনের অক্ষয় তৃপ্তি,—

"মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে,
যদি হয় মুখ লাখ লাখ॥
মন্দির তেজি যব' পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদ যুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুল কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।

পন্থক দুখ তৃণ করি গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥”

বর্তমান অধ্যায়ের সূচনায় বৈষ্ণব ধর্ম-সাধনার মূলীভূত আদর্শ সম্বন্ধে সার্থক প্রেম মিলনাদর্শের উল্লেখ করেছি। এ সেই সর্বদুঃখ-হর “সর্বানন্দ-ধাম” মিলন-চিত্র। তাই, এর মধ্যে নেই নায়িকা-মিলনের আলংকারিক উজ্জ্বল-রস-চ্ছটা,—নেই ব্যক্তিধর্মী বিলাস-কলা-পরিতৃপ্তির লুব্ধতা। সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সৌন্দর্য-প্রশান্ত প্রেম-সাধনার মহিমা। গোবিন্দদাস কবিরাজ এই প্রেম-মহিমারই সাধক,—এই মহিমাময় বাঁশির সুরেই ঘর ছেড়েছেন তিনি। আর, বহু ত্যাগ-দুঃখ-ক্লেশ-বরণের শেষে আনন্দময় সিদ্ধি যেদিন করায়ত্ত হয়েছে,—তখন একটি কথা বলেই কবি সব কথা শেষ করেছেন,—

“তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল।”

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর ভাবৈতিহ্যের “দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ” সাধক,—আর এই সাধন-ঐতিহ্যের প্রাণবান্ রূপকার হিসেবেই তিনি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।

গোবিন্দদাস কবিরাজের একই সংগে গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁরা দু'জনেই সমসাময়িক এবং শ্রীনিবাসআচার্যের শিষ্য ছিলেন।

গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী

তাছাড়া, আগেই উল্লেখ করেছি,—গোবিন্দদাসের ভণিতায় রচিত বাংলা পদাবলীর অধিকাংশই এঁর রচনা বলে অনুমিত হয়ে থাকে। ইনি ব্রজবুলি পদও লিখেছিলেন। কিন্তু সেগুলি কবিরাজ গোবিন্দদাসের রচনার মধ্যে হারিয়ে গেছে। বাংলা পদাবলীর মধ্যেও বহু উৎকৃষ্ট পদ আছে। গোবিন্দ চক্রবর্তীর নিবাস ছিল বোরাকুলি গ্রামে।

চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তাদের মধ্যে লোচনদাস অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ইনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জীবনীকাব্য চৈতন্যমঙ্গলের রচয়িতা হিসেবেই

লোচনদাস

বিখ্যাত। কিন্তু পদ-রচনার ক্ষেত্রেও লোচন চৈতন্যোত্তর ভাব-সাধনার একজন উৎকৃষ্ট স্রষ্টা। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, লোচন গৌর-নাগরী ভাবের প্রবর্তক নরহরি সরকারের ভক্ত-শিষ্য ছিলেন। চৈতন্যমঙ্গলকাব্যে এই ভাব-প্রেরণা সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়,

পদ-রচনার ক্ষেত্রেও এই একই ভাবাদর্শের রূপায়নের জন্য লোচন এক নূতন পদ্ধতির অনুশীলন করেন। প্রাচীন বাংলার গ্রাম্য ধামালি-সংগীতের মাধ্যমে সাধারণতঃ রুচিহীন চিন্তারই প্রকাশ ঘট্‌ত :—কিন্তু সেই তরল ভঙ্গির সুর-পদ্ধতি অবলম্বনে লোচন গৌর-নাগরী ভাব-তত্ত্ব সুন্দর প্রকাশ করেছেন। একটি অনুরূপ পদাংশ উদ্ধার করি,—

"আমার প্রাণ ছম্‌ছম্‌ করে সখি, মন ছম্‌ছম্‌ করে।
আধ কপাইলা মাথার বিষে রইতে নারি ঘরে॥
লোচন বলে কান্‌চিস্‌ কেনে ঢোক্‌ আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে প্রাণ ডুবায়্যা গোরাচান্দে ধর॥"

বলরামদাস

চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম বিখ্যাত পদকর্তা বলরামদাস ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমানজেলার দোগাছিয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বলরাম নামে বৈষ্ণব-সাহিত্যে একাধিক কবি আছেন। আলোচ্য বলরাম জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় ইনি "সংগীতকারক" বিশেষণ-সহ উল্লিখিত হয়েছেন। বলরামদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ-রচনা করেছেন। তার মধ্যে বাংলা পদ-গুলিই উৎকৃষ্টতর। বিশেষভাবে বাৎসল্য-রসের কবি হিসাবেই বলরাম সুপরিচিত।

শ্রীদাম-সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর, নব তৃণ কুশাঙ্কুর,
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে, গোপালে রাখিয়া মাঝে,
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাঙা পায়ে জানি লাগে,
প্রবোধ না মানে মোর মন॥
নিকটে গোধন রেখ্য, মা বলে শিঙায় ডেক্য,
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈল গোপ জাতি, গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥

বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী,
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া, দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥"

উদ্ধৃত পদটি বলরামদাসের একটি বিখ্যাত রচনা। কারো কারো মতে "কবিত্বের বিচারে তিনি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের সহিত তুলনীয়।"[৬]

অনন্তদাস

অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য অনন্তদাসও পদকর্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর রচিত অতি অল্প সংখ্যক ব্রজবুলি পদ পাওয়া গেছে। ক'টি পদেই অনন্তদাসের কবি-প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট।

"ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেম-তরঙ্গিনী
সাজলি শ্যাম বিহারে॥"– ইত্যাদি অনন্তদাস-কৃত অভিসার-উল্লাসের একটি উৎকৃষ্ট পদ। অনন্তদাস নামেও একাধিক কবির পরিচয় পাওয়া যায়।

নরোত্তমদাস চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকার। কিন্তু, নরোত্তমের একমাত্র পরিচয় কেবল পদকর্তা হিসেবেই নয়। শ্রীনিবাস আচার্য. নরোত্তম ও শ্যামানন্দের যৌথ প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে স্তিমিত-প্রায় বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। এঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে অনেকেই পদ-রচনা করে গেছেন।

আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহীর খেতুরী গ্রামে বিখ্যাত জমিদার বংশে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন।—পিতার নাম কৃষ্ণদাস দত্ত মাতা নারায়ণী। প্রবল ধর্মানুরাগবশে অল্প বয়সেই নরোত্তম খুল্লতাত-পুত্রের হাতে পৈত্রিক সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেখানে তিনি লোকনাথ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। আর, শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট করেন ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নরোত্তমের প্রেরণায় তাঁর জন্মভূমি খেতুরীতে ছয়টি দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিরাট মহোৎসব হয়। বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে এই উৎসব খেতুরীর মহোৎসব নামে বিখ্যাত।

নরোত্তম ও 'খেতুরীর মহোৎসব'

৬। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র—পদামৃতমাধুরী (৪র্থ খণ্ড)—ভূমিকা।

নরোত্তম রাধা-কৃষ্ণ লীলার নানা বিষয়ে পদ রচনা করেছেন ; কিন্তু বিশেষ করে প্রার্থনার পদ-রচনাতেই তাঁর কবি-প্রতিভার সমধিক স্ফূর্তি ঘটে।

বৃন্দাবনীয় গোস্বামিগণকৃত লীলা-দর্শনের সংগে নরোত্তমের নিবিড় হৃদয়ার্তির সংযোগ-পরিচয় নীচের পদটিতে পাওয়া যাবে—

"হরি হরি আর কবে এমন দশা হবে।
ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দোঁহারে নূপুর পরাইব ॥
টানিয়া বান্ধিব চূড়া তাহে দিব গুঞ্জা-বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতাম্বর বাস অঙ্গে পরাইব সখা সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর ॥
দুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া।
রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া ॥
হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি
এই করি মনে অভিলাষ ॥
জয় রূপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস।"

নরোত্তমের পদ

শ্রীনিবাস আচার্যও কিছু কিছু পদ-রচনা করেছিলেন। চৈতন্য-দেবের জীবদ্দশাতেই এঁর আবির্ভাব ঘটে। ইনি ব্রাহ্মণ বংশ-সম্ভূত। প্রথমতঃ নরহরিসরকারঠাকুরের প্রভাবে তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নীলাচলে চৈতন্য-দর্শনে গমন করেন। কিন্তু পথে মহাপ্রভুর আত্মগুপ্তির সংবাদ পান। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট ইনি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-চেতনার পুনরুজ্জীবনে এঁর শিক্ষাই যে সমধিক কার্যকরী হয়েছিল, তার উল্লেখ করেছি। শ্রীনিবাস-রচিত পদগুলির মৌলিকতা কিংবা কাব্য-সৌন্দর্য উল্লেখ্য নয়। কিন্তু কাব্যস্রষ্টা হিসেবে না হ'লেও, কবি-স্রষ্টা হিসেবে শ্রীনিবাস অবশ্য-স্মরণীয়। গোবিন্দদাস কবিরাজের মত শ্রেষ্ঠ কবিও শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেও অনেকে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউই উল্লেখ্য কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। এ সময়কার একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবপদ-গ্রন্থ ক্ষণদা গীতচিন্তামণি। এটি প্রথম বৈষ্ণবপদ-সংগ্রহ। গ্রন্থখানিতে ৪৫ জন কবির রচিত ৩০৯টি পদ আছে। গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও পদ-রচয়িতাদের অন্ততম।

ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদ-সাহিত্যের ঐতিহ্য-পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা সম্পূর্ণ হয়েছে বলেই মনে করি। কেবল চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির নামে যে একাধিক কবি পদ-রচনা করে মূল কবিগণের রচনা-পরিচয় সংশয়-সঙ্কুল করে তুলেছেন,—তাঁদের উল্লেখমাত্র করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

চৈতন্যোত্তর যুগের চণ্ডীদাস-নামধেয় কবিদের মধ্যে দীনচণ্ডীদাস বিখ্যাত। ৺মণীন্দ্রমোহন বসু বিশেষভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি-অবলম্বনে দীনচণ্ডীদাসের একখানি পদ-সংগ্রহগ্রন্থ সম্পাদন করেন। ঐ সংগ্রহে ধৃত পদগুলির একটিও দ্বিতীয় শ্রেণীর উর্ধ্বতর কাব্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করে না। কিন্তু, চণ্ডীদাস-সমস্যার ক্ষেত্রে গ্রন্থখানির মূল্য অতুলনীয়। চণ্ডীদাস-সমস্যার বিচার প্রসঙ্গে এঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

দীন চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতির ভণিতায় কতকগুলি বাংলা পদ পাওয়া যায়। সেগুলি ষোড়শ শতাব্দীর কবি শ্রীখণ্ডের 'কবিরঞ্জন'-এর রচনা বলেই অনুমিত হয়ে থাকে। ইনি রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। এঁর পদগুলিতে কবিরঞ্জন এবং 'বিদ্যাপতি' এই উভয় প্রকার ভণিতাই পাওয়া যায়। ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত এঁর পদ মৈথিল বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে মিশে গেছে।

শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি

রায়শেখর নাম বা উপাধি-যুক্ত একটি কবিও স্বীয় রচনা-দ্বারা মৈথিল-কবি বিদ্যাপতির পদ-পরিচয় আবৃত করেছেন। ইনি 'শেখর রায়' 'রায়শেখর' 'দুখিয়া শেখর', 'শেখর' ইত্যাদি বিচিত্র ভণিতায় পদ-রচনা করেছেন। এই শেখর ষোড়শ শতাব্দীর কবি

রায়শেখর

এবং রঘুনন্দনের শিষ্য। বিশেষভাবে ব্রজবুলি পদ-রচনায় শেখরের অপূর্ব দক্ষতা ছিল।

"এ সখি হামার দুঃখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর॥"

ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভণিতায় প্রচলিত বহু-খ্যাত পদটি "পীতাম্বর দাসের অষ্টরস-ব্যাখ্যায় এবং পদরত্নাকরে শেখরের ভণিতাতেই পাওয়া" যায়। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, "শেখরের ভণিতাযুক্ত ছত্রটিই সঙ্গততর পাঠ।"[৭]

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)

অষ্টাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্য

আগেই বলেছি, বিশেষভাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনাচরণের প্রেরণাকে কেন্দ্র করেই বাংলা জীবনী সাহিত্যের উদ্ভব,—তাঁর জীবনের 'নরলীলা'-মহিমাই বাংলা ভাষায় মানব-কথাকে অনন্য-নির্ভর সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তুতঃ, এই কারণেই বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-সংস্কারের মূল পরিচয় এইসব জীবনী-কাব্যকে অবলম্বন করেই অভিব্যক্ত হতে পেরেছিল। তাহলেও, বর্তমান প্রসংগে আবার স্মরণ করি,—আলোচ্য যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল, অবিমিশ্র মানবতার স্বীকৃতি নয়, দেববাদ-নির্ভর মানবতার ঐকান্তিক আরাধনা। অবিমিশ্র মানবতা-সাধনার জন্যে তখনো আধুনিক যুগের অপেক্ষা ছিল। সে যাই হোক, চৈতন্য হচ্ছেন সেই একক ও অনন্যতুল্য ব্যক্তিত্ব যাঁর জীবনকে আশ্রয় করে এই দেববাদ-নির্ভর মানবতা-বোধ জাগ্রত, বিকশিত ও পরিণত হয়েছিল।

বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্যের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য

সন্দেহ নেই, তিনি সমসাময়িক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। কিন্তু, কেবল নর-শ্রেষ্ঠ রূপেই সেই যুগ-চেতনার কাছে তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল না, 'নর-দেব' রূপে তিনি সেকালে হয়েছিলেন যুগ-পূজিত। আলোচ্য জীবনী-কাব্য সমষ্টিও সেই যুগ-পূজারই অঙ্গ। তাই, এইসব গ্রন্থে কেবল নর-শ্রেষ্ঠের মহিমময় জীবন কথাই তথ্যবদ্ধ হয়ে নেই, নর-দেবতাকে উপলক্ষ্য করে উদ্বুদ্ধ যুগ-ভক্তির আবেগও প্রস্ফুটিত হয়েছে বাস্তব তথ্য-সজ্জার মাধ্যমে। অতএব, বৈষ্ণব জীবনী-গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাসের উপাদান যত আছে,—ভক্তির উপাদান আছে ততোধিক। তাহলেও, সেই ভক্তি ছিল বস্তু-নির্ভর,—চৈতন্য-জীবন-মাহাত্ম্য-নির্ভর। তাই, আলোচ্য জীবনী-কাব্যগুলিতে ভক্তি এবং দৈবী-বিশ্বাসের দ্বারা মানবী-পরিচয় মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন যদি হয়েও থাকে,—তবু, কোন পর্যায়েই বাস্তব তথ্যগত ভিত্তিটুকুর পরিচয় আবিষ্কার কঠিন হয় না। বিভিন্ন চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থে চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। আর, এই অলৌকিক কাহিনী-সমূহ

পরিকল্পিতও হয়েছে বিচিত্রভাবে। যাঁরা তা' করেছেন, তাঁরা নিষ্ঠার সংগে নর-শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যের দৈবী মহিমায় বিশ্বাস করতেন। কিন্তু, সেই নিষ্ঠা-ভক্তির পটভূমি-পরিচ্ছিন্ন আধুনিক চেতনার কাছে আকাশ-কুসুম-কল্পনা ছাড়া এ-সবের আর কোন মূল্য নেই। তাই, আলোচ্য জীবনীকাব্য সমূহে অসম্ভব কল্পনার প্রাবল্য দেখে এইসব রচনার অন্তর্গত লৌকিক তথ্যসমূহের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সম্বন্ধেও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু, লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে,—ঐতিহাসিক তথ্য এবং ভক্তি-জাত আবেগ-বিশ্বাসকে চৈতন্য জীবনীর শিল্পিগণ জড়িয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেন নি। তেল-জলের মতই যেন এরা একত্র-সংবদ্ধ হয়েও স্পষ্ট-লক্ষিতব্য পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। তাই, অলৌকিক কল্পনা-সমষ্টিকে বেছে নেওয়া অত সহজ হয়। অন্যদিকে, লৌকিক তথ্যাবলীর বর্ণনায় ঐতিহাসিক যাথাযাথ্য-রক্ষার দিকেও এঁদের সচেতনতার অভাব ছিল না। প্রতিটি তথ্যের উদ্ধার-প্রসঙ্গে এঁরা বারে বারে উৎস-নির্দেশ (authority quote) করেছেন। এই প্রসঙ্গে পরিমিতিবোধের পরিচয়ও বিস্ময়কর। বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত গৌড়লীলা-তথ্যে বিশেষ-কিছু যোগ করার নেই, কেবল এই কারণেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঐ অংশের বিস্তৃত আলোচনা পরিহার করেছেন। বাংলা ভাষায় বৃন্দাবনদাস প্রথম-চৈতন্য-জীবনীকার ;—চৈতন্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকও তিনি। সন্দেহ নেই, ভাগবত-লীলার কাঠামোর মধ্যে চৈতন্য-লীলাকে ঢেলে সাজ্‌তে গিয়ে বহু অলৌকিক অবিশ্বাস্য ঘটনার অবতারণা তিনি করেছেন। তাহলেও, তথ্যাংশের কতটুকু মুরারিগুপ্তের দ্বারা প্রভাবিত, কোথায় নিত্যানন্দ-প্রভুর সহায়তা আছে,—কোথায় তথ্যের উৎস হয়ে আছেন জননী নারায়ণী,—তার ইঙ্গিত বা স্পষ্ট উল্লেখ-রচনায় কবি সম্পূর্ণ সচেতন। বস্তুতঃ, বৈষ্ণব-জীবনীকারগণ কাউকেই ফাঁকি দিতে চান নি। তথ্য-সচেতন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভক্তি-তদ্গত বিশ্বাসীর কাম্য একত্র সন্নিবিষ্ট করে গেছেন, তেল-জলেরই মত। যিনি তথ্য-ভার-সমৃদ্ধ তৈল সম্ভারে সন্তুষ্ট, তিনি জল ছাড়িয়ে ঐটুকু নিলেই যথেষ্ট। আবার যিনি একবিন্দু স্বচ্ছ-পূত ভক্তি-অশ্রু-নীরে চরিতার্থ, তার জন্য সেটুকুই জমা আছে জীবনীকাব্যগুলিতে। তবু, যাঁরা ভক্তি আছে বলেই তথ্যাংশের যথার্থতা স্বীকার করতে চান না, তাঁরা যুক্তি-বিচার অপেক্ষা একাদেশদর্শী চিত্তবিমুখতার চর্চাই করেন বেশি।

সন্দেহ নেই, অনেক-সময়ে একই তথ্যের বর্ণনায়ও বিভিন্ন জীবনীকারদের মধ্যে অল্পাধিক মতানৈক্য লক্ষিত হয়ে থাকে। তাহলেও, কয়েকটি জীবনী-কাব্য একসংগে বিচার করে দেখ্‌লে সত্য-মিথ্যার আবিষ্কারে বিলম্ব ঘটে না। প্রায় কোন দেশের ইতিহাসেই মধ্যযুগে এইরূপ উদ্দেশ্য-প্রাণোদিত কিছু কিছু তথ্যাপলাপ দুর্লক্ষ্য নয়। এমন কি, আধুনিক কালেও উত্তর-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় ইতিহাস হয়ত বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম প্রত্যন্তে দুই বিভিন্ন আকারে লিখিত হবে। চৈতন্য-জীবনী-সাহিত্যে এর চেয়ে বেশি তথ্যের অপলাপ,—যদি তা' অপলাপও হয়,—কখনো লক্ষিত হয় না। তাই, চৈতন্য-জীবন এবং সমসাময়িক যুগের বাংলার ইতিহাসের সর্বপ্রধান উপাদান আজও ঐ জীবনীসাহিত্যগুলিই বহন করছে;—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস-রচয়িতার পক্ষে এদের জীবন-মূল্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই, সাহিত্য-ইতিহাসে বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্যের অবতারণা কেবল সাহিত্যিক কারণেই নয়, ঐতিহাসিক কারণেও অপরিহার্য।

জীবনী-সাহিত্যে ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ণয়ের পদ্ধতি

চৈতন্য-জীবন অবলম্বনে রচিত প্রথম গ্রন্থ বাঙালির লেখা হলেও বাংলা ভাষায় লিখিত নয়। প্রাচীনতম চৈতন্য-জীবনীর লেখক ছিলেন চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীহট্টবাসী মুরারিগুপ্ত। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' সাধারণভাবে 'মুরারি-গুপ্তের কড়্‌চা' নামে বিখ্যাত। গ্রন্থখানির রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য রয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্রের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থখানির রচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৩৩ খ্রীঃ। ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান অনুসারে গ্রন্থরচনাকাল ১৫২০ খ্রীঃ। 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' প্রণেতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সিদ্ধান্ত করেছেন,—গ্রন্থখানি ১৫৩৬ খ্রীঃ থেকে ১৫৪০ খ্রীঃ এর মধ্যে কোন সময়ে রচিত হয়েছিল। ডঃ মজুমদারের যুক্তি হচ্ছে,—যেহেতু গ্রন্থখানিতে চৈতন্য-জীবনের অন্ত্য-লীলা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে,—সেই হেতু গ্রন্থখানি চৈতন্য-তিরোভাবের পরেই সমাপ্ত হওয়া সম্ভব।

সংস্কৃতে লিখিত চৈতন্য-জীবনকথা,—মুরারিগুপ্তের কড়চা

'মুরারিগুপ্তের কড়চা'র পরেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন ও প্রামাণ্য চৈতন্য-চরিতগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখযোগ্য কবিকর্ণপূর-উপাধিক

পরমানন্দসেনের তিনখানি গ্রন্থ। প্রথমখানি—'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক আনুমানিক ১৪৯৪ খ্রীঃ থেকে ১৫০১ খ্রীঃ-এর মধ্যে রচিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর থেকে গম্ভীরা-লীলা পর্যন্ত কালের বর্ণনায় নাটকখানির প্রামাণ্য সর্বাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়ে থাকে। কবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য' চৈতন্য-জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস। গ্রন্থখানির প্রথম ১১টি সর্গ মুরারিগুপ্তের কড়্চার অনুসরণে লেখা। 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' নামক কবিকর্ণপূরের তৃতীয় গ্রন্থখানি সমসাময়িক বৈষ্ণব দার্শনিক-চেতনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কবি কর্ণপূরের গ্রন্থত্রয়

মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপূরের এই-সব রচনাকে প্রধানতঃ অনুসরণ করেই বাংলা ভাষায় চৈতন্য-চরিত গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছিল। মুরারিগুপ্তের গ্রন্থরচনাকালের পূর্বে বঙ্গীয় সমাজে শ্রীচৈতন্যের দৈবী-মহিমার স্বীকৃতি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাই, মুরারির কাব্যেও অলৌকিক কল্পনার পরিচয় আছে,—কর্ণপূরের গ্রন্থাবলীতে ত আছেই।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত

"বাংলায় রচিত সর্বপ্রথম চৈতন্য-চরিত কাব্য,—বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত[১]।" কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্যান্য কয়েকটি বৈষ্ণবগ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের কাব্যের নাম চৈতন্যমঙ্গল বলে উল্লিখিত হয়েছে। কথিত আছে, বৃন্দাবনদাস গ্রন্থরচনা করে প্রথমে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামকরণই করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে লোচনদাস একই নামের আর একখানি গ্রন্থ রচনা করলে বৃন্দাবন-জননী পুত্রের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করেন। কিন্তু, এ বিষয়ে প্রেম-বিলাসের বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় ;—

চৈতন্য-মঙ্গল না চৈতন্যভাগবত ?

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥"

এর একটা সঙ্গত কারণও আছে। বৃন্দাবনদাস বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে-বর্ণিত

১। 'চৈতন্য-চরিতের উপাদান'—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

কৃষ্ণলীলা-পদ্ধতির অনুসরণে চৈতন্য-লীলা বর্ণনা করেছিলেন। তাই, নাম-করণের মধ্যে গ্রন্থটির আদর্শগত পরিচয় স্পষ্টই প্রতিভাত হতে পেরেছে।

চৈতন্য-চরিতকার অপরাপর কবিগণ,—বিশেষকরে জয়ানন্দ ও লোচনদাস, গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় উদ্ধার করেছেন। কিন্তু, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে আত্ম প্রকাশে কুণ্ঠার পরিচয় সমধিক। বার-কয়েক জননী নারায়ণীর নামোল্লেখ ছাড়া, একবার মাত্র নিত্যানন্দপ্রভুর প্রসঙ্গে কবি প্রকাশ করেছেন,—

বৃন্দাবন দাসের ব্যক্তি-পরিচয়

"সর্বশেষ ভৃত্য তান [২] বৃন্দাবনদাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী-গর্ভ-জাত ॥"

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, কবি নিত্যানন্দ-প্রভুর শেষ জীবনের শিষ্য ছিলেন। জননী নারায়ণীর সম্বন্ধে কবি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন,—তিনি ছিলেন 'শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা'। কিন্তু নিজ মাতামহের নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। কবিকর্ণপূর তার রচনায় শ্রীবাসাদি চার ভাইএর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, চৈতন্যভাগবতে কেবল শ্রীবাস ও শ্রীরাম ছাড়া আর কারো নামোল্লেখ নেই। তাই, ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন,—শ্রীরামই ছিলেন কবির মাতামহ। পণ্ডিতগণ এ-সম্বন্ধে নিঃসংশয় নন।

বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি ছিলেন বাল-বিধবা নারায়ণীর সন্তান। নারায়ণী সম্বন্ধে বৃন্দাবন লিখেছেন,—গয়া-প্রত্যাগত চৈতন্যদেবের প্রসাদ গ্রহণ করে তিনি ভাব-বিহ্বল হয়েছিলেন,—

বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব-কাল

"চারি বছরের সেই উন্নত চরিত।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ কান্দে নাহিক সম্বিত ॥"

চৈতন্যদেবের গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে, অর্থাৎ ১৪৩০ শকে নারায়ণীর বয়স চার বছর ছিল। অতএব, ১৩।১৪ বছর বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে অর্থাৎ অন্ততঃ ১৪৪০ শকের আগে নারায়ণীর সন্তান হয় নি, একথা মনে করা যেতে পারে। আলোচ্য সময়ে চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করছিলেন। অতএব, এ সময়ে জন্মগ্রহণ করলে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। শ্রীগৌরাঙ্গের গৌড়লীলা-বর্ণনায় কবিও খেদোক্তি করে এই কথাই বলেছেন,—

২। তান—নিত্যানন্দ প্রভুর।

"হৈল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইয়াও বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥"

অন্যদিকে উদ্ধৃত সময়ের খুব পরেও যে বৃন্দাবনদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা মনে হয় না। কারণ, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও সাহায্য লাভ করেছিলেন। তাছাড়া, নিত্যানন্দের নির্দেশেই তিনি গ্রন্থ-রচনায়ও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন-যে,—সে কথা কাব্যে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। আর, চৈতন্য-তিরোভাবের পর নিত্যানন্দের লৌকিক-জীবন অধিক দীর্ঘায়িত হয়েছিল না,—এরূপ অনুমানের কারণ রয়েছে। এই সকল যুক্তি এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উদ্ধার করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সিদ্ধান্ত করেছেন,—বৃন্দাবনদাস আনুমানিক ১৪৪০ শকের (১৫১৮ খ্রীঃ) নিকটবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু, অপরাপর পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র প্রথমে অনুমান করেন,—১৪২৯ শকে বৃন্দাবনের জন্ম হয়,—সর্বশেষে তিনি ১৪৫৭ শকের পক্ষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,—"ষোড়শ শতাব্দীর দশের কিংবা বিশের কোঠায় বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল, ধরা যাইতে পারে।·········ইনি শ্রীচৈতন্যেরও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন,—তাই বলিয়াছেন,—'সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবনদাস'[৩]।" এখানে 'তান' সর্বনামের উদ্দেশ্যরূপে ডঃ সেন শ্রীচৈতন্যকে বুঝেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি গ্রন্থ-মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় না। চৈতন্য-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বার বার উল্লেখ করেছেন,—

নানা মতবাদ

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

কোথাও কবি চৈতন্যের প্রত্যক্ষ ভৃত্যত্বের দাবি করেন নি, বরং বারে বারেই করেছেন, নিত্যানন্দের ভৃত্যত্ব দাবি।

বৃন্দাবনদাসের কাব্য-রচনাকাল সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য রয়েছে। তবে, গ্রন্থখানি মুরারিগুপ্তের কড়চা'র পরে রচিত হয়েছিল-যে, এ কথা নিশ্চিত করে বলা চলে। বৃন্দাবনের গ্রন্থে মুরারির রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি

৩। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড (২য় সং)

রয়েছে। কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,—বৃন্দাবনদাস মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপদামোদর-কৃত লীলা-সূত্রের ব্যাখ্যা করেন। অতএব, বৃন্দাবনের গ্রন্থ এঁদের পরে রচিত হয়েছিল। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায়' কবিকর্ণপূর বৃন্দাবনদাসের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,—"বেদব্যাসো য এবাসীৎ।" একখানি গ্রন্থের রচয়িতার পক্ষে এই দুর্লভ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার আগে অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর সময় অতিবাহিত হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। তাছাড়া চৈতন্যভাগবত ও গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার অন্যান্য আভ্যন্তরীণ উপাদানের তুলনা-মূলক আলোচনা করে, এবং আরো বহু তথ্য-বিচার করে ডঃ বিমানবিহারী অনুমান করেছেন,—১৫৪৬ খ্রীঃ থেকে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে বৃন্দাবনের কাব্য রচিত হয়েছিল।

চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল

এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত,—"সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বে গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ-পুত্র বীর-চন্দ্রের জন্মের পূর্বেই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।"[৪] কিন্তু, পূর্বে উদ্ধৃত অংশে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার-কৃত নারায়ণীর বয়ঃকাল-বিচার যদি যথার্থ হয়, তাহলে ডঃ সেনের অনুমিত সময়ে বৃন্দাবনদাসের বয়স গ্রন্থ-রচনার পক্ষে অসম্ভাব্য-রূপে অপরিণত হয়ে থাকে।

ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত

চৈতন্যভাগবত আদি, মধ্য ও অন্ত্য,—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর আবির্ভাব থেকে গয়া-গমন পর্যন্ত, মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত, এবং অন্ত্যখণ্ডে নীলাচল গমন ও তথাকার লীলাদির আংশিক বিবরণমাত্র দেওয়া হয়েছে। অন্ত্যখণ্ডটি আকস্মিকভাবে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী দেনুড়ে বৃন্দাবনদাসের পাট-বাড়ি থেকে একখানি পুথি আবিষ্কার করেন।—আপাতঃ দৃষ্টিতে পুথিখানিকে চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের শেষ তিনটি অধ্যায় বলেই অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু, ঐ তিনটি অধ্যায় যে কৃত্রিম, তাতে এখন

গ্রন্থ-পরিচয়

৪। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড (২য়)।

আর সন্দেহ নেই। স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়,—চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ড অসম্পূর্ণই ছিল,—

"নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥" চৈঃ চঃ

তাছাড়া, ব্রহ্মচারীমহাশয়ের আবিষ্কৃত অধ্যায় তিনটিতে তথ্যগত প্রমাদ এত বেশি যে, ঐতিহাসিক চেতনাসম্পন্ন বৃন্দাবনদাসের রচনার প্রামাণ্য অংশের তথ্য-নিষ্ঠার সঙ্গে এর কোন সংযোগই খুঁজে পাওয়া যায় না।

বৃন্দাবনদাস বিশেষভাবে নিত্যানন্দপ্রভুর প্রেরণা ও নির্দেশেই চৈতন্য-চরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন,—

"অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥"

গ্রন্থ-রচনার উপাদান সংগ্রহেও তিনি অপরাপর চৈতন্য-পরিকরদের মধ্যে বিশেষভাবে নিত্যানন্দপ্রভুর 'পরেই সমধিক নির্ভর করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা যে বিশেষ ছিল না, কবি স্বয়ং তা স্বীকার করেছেন।—

"বেদগুহ্য চৈতন্য-চরিত কেবা জানে।
তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে॥"

অন্যান্য একাধিক ক্ষেত্রে কবি বার বার উল্লেখ করেছেন,—

"নিত্যানন্দপ্রভুমুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥"

চৈতন্য-জীবনের যে-সকল ঘটনা-সম্বন্ধে নিত্যানন্দপ্রভুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, সে সব বিষয়ে বৃন্দাবনের বর্ণনা পুংখানুপুংখ এবং যথাযথ। অন্যত্র তা হয় সংক্ষিপ্ত, না হয় কল্পনাশ্রয়ী। তাই, চৈতন্যভাগবতে ধৃত মহাপ্রভুর গৌড়-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিশেষ তথ্য-বহুল ও ঐতিহাসিক। কিন্তু, বাল্যলীলার বর্ণনা ভক্তি-ভাব-কল্পনায় অতি পল্লবিত : আবার অন্ত্যখণ্ডের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহে নিত্যানন্দ-প্রভু ছাড়া আর যাঁদের কাছে বৃন্দাবনদাস ঋণ স্বীকার করেছেন,—তাঁদের মধ্যে রয়েছেন,—নারায়ণী, অদ্বৈত প্রভু ও গদাধর। উপাদান-সংগ্রহ ও বিশেষ করে গ্রন্থের আঙ্গিক-বিভাগ-পরিকল্পনায় বৃন্দাবন মুরারিগুপ্তের 'কড়চা'র 'পরেও নির্ভর যে করেছিলেন, সে কথা

পূর্বে বলেছি। চৈতন্যভাগবতের ক্রম-বিভাগে মুরারির গ্রন্থের প্রভাব স্পষ্ট, তা ছাড়া ঐ গ্রন্থস্থ শ্লোকেরও বহুল উদ্ধৃতি বৃন্দাবনের কাব্যে লক্ষিত হয়ে থাকে।

চৈতন্য-জীবনী কাব্য-সমূহের মধ্যে চৈতন্যভাগবতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য তার তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিকতা। বিশেষভাবে চৈতন্যের গৌড়লীলা বর্ণনার প্রসঙ্গে সম-সাময়িক নবদ্বীপ, তথা পারিপার্শ্বিক বঙ্গভূমির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনেরও একটি উৎকৃষ্ট পরিচয় রেখে গেছেন বৃন্দাবনদাস। তাঁর এই ঐতিহাসিক-চেতনার সর্বোত্কৃষ্ট নিদর্শন চৈতন্য-আবির্ভাব-পূর্ব নবদ্বীপের বর্ণনা :—

চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিকতা

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
বিবিধ বৈসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সভাই মহাদক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক বলি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে॥
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারসে পায়॥

* * * *

রমা-দৃষ্টি-পাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণ নাম ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥

*   *   *   *

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল॥"

বিভিন্ন ও বিচিত্রের সমাবেশে গড়ে-ওঠা নবদ্বীপের সমাজ-সংস্কৃতির এই পুংখানুপুংখ বর্ণনার পেছনে যে তথ্যনিষ্ঠা এবং সত্য-দিদৃক্ষা আত্মগোপন করে আছে, যে-কোন কালের ঐতিহাসিক চেতনার পক্ষে তা নিঃসন্দেহে শ্লাঘনীয়। তাহলেও, বৈষ্ণব-সমাজে চৈতন্য-ভাগবতের শ্রেষ্ঠ সমাদর তার তথাকথিত অনৈতিহাসিকতার জন্যই। বস্তুতঃ, এই অনৈহাসিকতার মূলীভূত ঐকান্তিকী নিষ্ঠার মধ্যে চৈতন্য-ভাগবতের উৎকৃষ্ট কাব্য-মূল্যও নিহিত রয়েছে। 'মহাপুরুষ'—শ্রীচৈতন্যকে ঐকান্তিকী বৈষ্ণবী-নিষ্ঠার প্রভাবে কবি "মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল"—অর্থাৎ কৃষ্ণাবতার নামে স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন। এই স্বীকৃতির স্বাভাবিক মানসপরিণামে বৃন্দাবন-চৈতন্যলীলা-কাহিনীকে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলার আদর্শে ঢেলে সেজেছেন। সমগ্র তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যসজ্জার পেছনে তাঁর যে বিশেষ বিশ্বাসটুকু সক্রিয় হয়েছিল, কবি নিজেই অকুণ্ঠ ভাবে তার উল্লেখ করেছেন,—

চৈতন্যভাগবতের অতিলৌকিক কাহিনী সমূহ

"পূর্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
এবে সেই লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥"

এই লীলার পেছনে শ্রীচৈতন্যাবতারের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসকেও কবি মহাপ্রভুর মুখে তুলে দিয়েছেন,—

"সঙ্কীর্তন আরম্ভে আমার অবতার।
করাইমু সর্বদেশে কীর্তন-প্রচার॥"

এই নিষ্ঠা-বিশ্বাসের আবেগে কবি ভক্তিধর্মী কল্পনার বন্যা মুক্ত করে দিয়েছেন! অবাধ গতিতে তা' ছুটে চলেছে অলৌকিকতার পথে। ফলে, শচীর গর্ভস্থ ভগবানের আরাধনার জন্য স্বর্গের দেবগণ মর্ত্যে নেমে এসেছেন, বালক-চৈতন্যের লীলা-চাঞ্চল্যের বিভিন্ন মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করেছে দত্তাত্রেয়াদি বিচিত্রভাব ও বামন-রাম-আদি বিভিন্ন অবতার-মূর্তির পরিচয়। অসম্ভব-অলৌকিক অতিশয়োক্তির আরো যে কত প্রাচুর্য রয়েছে,—তার উল্লেখ করে শেষ হবে না।

কিন্তু, এই সকল অতিশয়োক্তি, অসম্ভবোক্তির কোথাও কবি-কল্পনার কোন কুণ্ঠা নেই,—নেই কোনো দ্বিধা।—যে অটুট বিশ্বাসের পাথেয় নিয়ে তিনি এই অলৌকিক কল্পনা-লোক-বিচরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন,—কোথাও সে বিশ্বাস বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নি। এই বিশ্বাস-নিষ্ঠার ঐকান্তিকতাই চৈতন্যভাগবতের স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্য-চমৎকৃতির সৃষ্টি করেছে। বস্তুতঃ, আদ্যন্ত গ্রন্থখানির কোথাও কাব্য-ধর্মারোপের সচেতন কোন প্রয়াস নেই। আগাগোড়া রচনা অনাড়ম্বর বর্ণনাধর্মী ভাষায় পয়ারছন্দে লিখিত। যে অল্প ক'টি স্থানে ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেও ভাষার বর্ণনামূলকতাই (Narrative quality) প্রধান। তবু, কেবল বিশ্বাস-নিষ্ঠার প্রভাবেই অনাড়ম্বর বর্ণনা কেমন কাব্যিক হয়ে উঠেছে তা'র একটি পরিচয় দিই,—

চৈতন্যভাগবতের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য

"রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায়॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যোন্যে করেন কৃষ্ণ-কথন-মঙ্গল॥
আপন প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
সভারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর॥
প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥

দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥"

শৈল্পিক মণ্ডন নয়,—ভক্তি-বাৎসল্যের অপূর্ব সমন্বয়েই এই বর্ণনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

একাধারে এই ভক্তি এবং ঐতিহাসিক নিষ্ঠা চৈতন্য-লীলা-বর্ণনার স্থানে স্থানে বৃন্দাবনের রচনাকে কেবল রস-সমৃদ্ধ নয়,—সজীব, সরস-ও করে তুলেছে,—

"বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে হয় হয়।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥
পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয়?॥
যত তত বোলে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানা মত কদর্থেন সে দেশী বচনে॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥
মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায় যায় তর্জিয়া গর্জিয়া॥"

রচনাংশ উদ্ধার করে শেষ হবে না। এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকেই প্রতিভাত হওয়া উচিত,—চৈতন্যভাগবত মহাগ্রন্থের ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি ও সরসতার পেছনে রয়েছে তথ্য-নিষ্ঠ বর্ণনা ও বিশ্বাস-নিষ্ঠ আন্তরিকতা। এই দুর্লভ গুণ-নিচয়ের সমন্বিত-সমাবেশে, ইতিহাসের তথ্যে, ভক্ত হৃদয়-জাত বিশ্বাস-সত্যে,—এবং শৈল্পিক সরসতায় যথার্থই চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণব-ধর্মের ভাগবত হয়ে উঠেছে! যথার্থই,—

"চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস।"—চৈঃ-চঃ—

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল তথ্য-চমৎকারিত্বের জন্য এককালে পণ্ডিত-সমাজে প্রচুর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল। অধুনা সেই উৎসাহের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

কাল-বিচারে জয়ানন্দ এবং লোচনদাস প্রায় সমসাময়িক ছিলেন ;—কার গ্রন্থ যে প্রথমে রচিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। তবে, পূর্ব-সূরিগণের যে তালিকা জয়ানন্দ গ্রন্থমধ্যে উদ্ধার করেছেন,—তাতে লোচনের উল্লেখ নেই।

কবি-প্রদত্ত আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায়,—বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কবির পিতার নাম ছিল সুবুদ্ধিমিশ্র,—মাতা

কবি-পরিচিতি

ছিলেন—রোদনীদেবী। মাতার মৃত-বৎসা দোষ অতিক্রমণের জন্য জয়ানন্দের 'যমের-অরুচি' নাম রাখা হয়েছিল,—গুইঞা। নীলাচল থেকে গৌড়ে যাবার পথে চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি-মিশ্রের অতিথি হন। এক বৎসরের গুইঞাকে কোলে করে রোদনী চৈতন্যদেবের ভোগ রন্ধন করেন। সেই সময়ে স্বয়ং চৈতন্যদেব গুইঞার নামকরণ করেন,—জয়ানন্দ। পণ্ডিতগণের ধারণা,—চৈতন্যদেব হয়ত গৌড় থেকে নীলাচল প্রত্যাবর্তনের পথেই কবি-পিতার আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন! অন্তত: জয়ানন্দের কাব্যে ঐ পথেরই বর্ণনা রয়েছে। কাব্যের মধ্যে কবি নিজেকে 'অভিরাম গোসাঞির দাস' বলে অভিহিত করেছেন। তাই অনেকের ধারণা, জয়ানন্দ হয়ত অভিরামের শিষ্য ছিলেন।[৫] অনেকে আবার কবিকে গদাধর-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলে মনে করেছেন।[৬]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে তা যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতের পরে রচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে জয়ানন্দের কাব্যেই স্বীকৃতি রয়েছে। নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উদ্ধার করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেছেন, ১৫৬০ খ্রীঃ বা তার নিকটবর্তী কোনকালে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয়েছিল।[৭]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকাব্যের উপর প্রথম আলোক-সম্পাৎ করেন ৺নগেন্দ্রনাথ বসু,—১৩০৪-০৫ বঙ্গীয় সালের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)। ৬। চৈতন্য-চরিতের উপাদান। ৭। ঐ।

তিনিই আবার কালিদাস নাথের সহায়তায় ১৩১২ সালে জয়ানন্দের গ্রন্থ-সম্পাদনা করেন। আগেই বলেছি,—আত্মপ্রকাশের প্রথম পর্বে তথ্যাভিনবতার জন্য গ্রন্থখানি পণ্ডিত সমাজের কোন কোন মহলে বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। এঁদের মধ্যে ডঃ দীনেশচন্দ্রের নাম উল্লেখ-যোগ্য। প্রধানতঃ চৈতন্যের তিরোভাব-কাহিনীর অভিনবতাই জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের লোক-প্রসিদ্ধির কারণ। মহাপ্রভুর আত্ম-গুপ্তির মূল কারণ এবং পরিণামী ইতিহাস সংশয়াচ্ছন্ন। তাই, বিভিন্ন জীবনীকার এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। জয়ানন্দের কাব্যেই এ সম্বন্ধে একটি বিশ্বাস্য কাহিনী প্রথম পাওয়া গিয়েছিল,—

কাব্য পরিচয়

"আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পা'এ আচম্বিতে॥
চরণ-বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্য টোটায় শরণ অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥"

কিন্তু, কেবল বিশ্বাসযোগ্য বলেই কাহিনীটি প্রামাণ্য হয়ে ওঠে না। বস্তুতঃ, জয়ানন্দ চৈতন্য-জীবন-কাহিনীতে আরো বহু অভিনব তথ্যসংযোগ করেছেন। সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেই প্রতিপন্ন হয়,—জয়ানন্দের কবি-চেতনায় তথ্য এবং সত্য-নিষ্ঠার গভীর অভাব ছিল। এ-প্রসঙ্গে কয়েকটিমাত্র বিষয়ের অবতারণা করি :—

১। অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি ছিল শ্রীহট্টজেলার ঢাকাদক্ষিণে। ঢাকাদক্ষিণের সন্তান-রূপে এই পুণ্যভূমির মহিমাময় ঐতিহ্যের অংশভাগী হওয়ার অবকাশ বর্তমান লেখকেরও হয়েছিল। কিন্তু, জয়ানন্দ শ্রীহট্টের কোন্ এক জয়পুরগ্রামে চৈতন্যের পিতৃভূমি নির্দেশ করেছেন,—স্বয়ং শ্রীহট্টবাসিগণও গ্রামটির সন্ধান রাখেন না।

২। মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষগণ সম্বন্ধে কবি প্রাচীনতর তথ্য উদ্ধার করেছেন,—

"চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশরে পলাইয়া গেল রাজা ভ্রমরের ডরে॥"

জয়ানন্দের গ্রন্থ-সম্পাদক ৺নগেন্দ্রনাথ বসু এই রাজা ভ্রমরের কাল-পরিচয় নির্ণয়ের চেষ্টাও করেছেন। অথচ যাজপুর কেন,—সমগ্র উড়িষ্যাতেই বাৎস্য-গোত্রীয় বৈদিক-ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না, চৈতন্য ঐ বংশ-সম্ভূতই ছিলেন।

৩। শচীদেবী অদ্বৈত আচার্যের নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন,—এ তথ্য সর্ববাদী-সম্মত। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন,—

"আই ঠাকুরাণী বন্দোঁ চৈতন্যের মাতা।
পণ্ডিত গোসাঞি জাঁর মন্ত্র-দীক্ষা দাতা॥"

আর আলোচনা করে লাভ নেই,—জয়ানন্দের উপস্থাপিত তথ্যের 'পরে কিছুতেই যে নির্ভর করা চলে না,—সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই, আধুনিক ঐতিহাসিকের কাছে তাঁর কাহিনীর অভিনব চাক্‌চিক্যের কোন মূল্যই নেই।

জয়ানন্দ চৈতন্য-জীবনীর পেশাদার গায়েন

মূলকথা, জয়ানন্দ, বৃন্দাবনদাস বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত চৈতন্য-নিষ্ঠা-প্রণোদিত হয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। তাই, চৈতন্য-জীবনীর তথ্যের যথার্থতা রক্ষা সম্বন্ধে পুণ্য কর্তব্য-বোধের কোন প্রেরণা তাঁর ছিল না। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন পেশাদারী পালাগান হিসেবে:—

"ইবে শব্দ চামর সংগীত বাদ্য রসে।
জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গলগান শেষে॥"

এই উদ্দেশ্য-প্রভাবেই চৈতন্য-জীবন-তথ্যের নিষ্ঠাপূর্ণ বর্ণনার পরিবর্তে জয়ানন্দ শ্রোতৃ-সাধারণের চিত্ত-চমৎকারী কৌতূহল-পূর্ণ কাহিনী উদ্ভাবনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিলেন। এই কারণেই সমগ্র গ্রন্থটিও 'পালাগান'-সুলভ নয়টি খণ্ডে বিভক্ত;—আদিখণ্ড, নদীয়াখণ্ড, বৈরাগ্যখণ্ড, সন্ন্যাসখণ্ড, উৎকলখণ্ড, প্রকাশখণ্ড, তীর্থখণ্ড, বিজয়খণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। এই সকল খণ্ডগুলির উপস্থাপনা সংহত অথবা ক্রম-বদ্ধ নয়। এক তীর্থখণ্ডের অবতারণাই গ্রন্থের দুই স্থানে দুবার করা হয়েছে। মূল চৈতন্য-জীবনীর বর্ণনায়ও অনুরূপ ক্রম-বিভ্রম এবং সঙ্গতি-বোধের অভাব সুস্পষ্ট। জয়ানন্দ চৈতন্যের পিতৃ-বিয়োগের পরেই তাঁর গয়াগমনের পরিকল্পনা ও সেখানে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গয়া থেকে ফিরেই চৈতন্য একে একে দুটি বিবাহ করেন। লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর জয়ানন্দ চৈতন্যকে উন্মত্ত অধীর

নৃত্যে প্রবৃত্ত করেছেন। আবার, সন্ন্যাসী চৈতন্যের মুখে তিনি যে সকল সাধন-তত্ত্বের কথা তুলে দিয়েছেন, সেগুলো বাউলের দেহ-সাধন-তত্ত্বের মতই শোনায়। আগেই বলেছি,—জয়ানন্দের কাব্যে ছিল গায়েন-সুলভ চিত্ত-চমৎকার সৃষ্টির চেষ্টা; কবি-চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদনের অভাবে তা অপরিণত পাঁচালীর পর্যায় অতিক্রম করে কাব্য-পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। সার্থক জীবনীর মূল্য-ত সে কিছুতেই দাবি করতে পারে না।

তথ্যের অবলোপ ও কাব্যচমৎকৃতি

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলও বিশেষভাবে আসরে গীত হওয়ার জন্যই লিখিত হয়েছিল,—

"করুণা ভরল সব হেম গোরা গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙ্গা পা॥
সকল ভকত লৈয়া বৈসহ আসরে।
সে-পদ শীতল-বা' লাগুক কলেবরে॥"

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল গীতি-গ্রন্থ

গ্রন্থের মধ্যবর্তী গীতব্য বিভিন্ন সুরের উল্লেখ থেকেও কবির পূর্বোক্ত মূল উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

লোচনদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড—১ম সংস্করণে সিদ্ধান্ত করেছিলেন;—"লোচনদাস আনুমানিক ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং আনুমানিক ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন।" একই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ডঃ সেন সে প্রসঙ্গ পরিহার করে নীরব হয়েছেন। কবির আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায়,—বর্ধমান জেলার কোগ্রাম-নিবাসী বৈদ্য বংশীয় কমলাকর দাস কবির পিতা ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল সদানন্দী,—পাঠান্তরে অরুন্ধতী। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের নিকট কবি শিক্ষালাভ করেন, আর শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু,—

কবি-পরিচয়

"শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর আমার।"

লোচনদাসের কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধেও নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। তবে, এই কাব্যও বৃন্দাবনের কাব্যের পরে রচিত হয়েছিল-যে, তা জানা যায়

কবির নিজেরই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি থেকে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেছেন,—লোচনের কাব্য ১৫৬০ খ্রীঃ—১৫৬৬ খ্রীঃর মধ্যে কোন সময়ে রচিত হয়েছিল।[৮] ডঃ দীনেশচন্দ্রের অনুমান,—১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যখানি লিখিত হয়।[৯]

কাব্যের রচনাকাল

কাব্যের উৎপত্তি এবং পরিকল্পনা সম্বন্ধে কবি স্বয়ং স্বীকার করেছেন,—মুরারিগুপ্তের 'কড়চা' পড়ে বাংলা ভাষায় অনুরূপ একখানি গ্রন্থ-রচনার প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ, লোচন মুরারিগুপ্তের ঐতিহাসিক বর্ণনাকে বর্ণাঢ্য কল্পনার স্পর্শে এক নব-রূপ দান করেছেন।

১। মুরারির গ্রন্থের তিনটি খণ্ডকে ভেঙে লোচন চারটি খণ্ড প্রস্তুত করেছেন। প্রথম,—সূত্রখণ্ড গড়ে উঠেছে, মুরারির গ্রন্থের হরি-নারদ-সংবাদ-কাহিনীকে কৃষ্ণ-রুক্মিণী, হর-পার্বতী, নারদ-ব্রহ্মা-সংবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন কাহিনীর সংগে যুক্ত-পল্লবিত করে।

২। আদিখণ্ডে মুরারি ও বৃন্দাবনের অনুসরণে লোচন মহাপ্রভুর জন্ম থেকে গয়াগমন ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত চিত্রিত করেছেন।

কাব্য-পরিচয়

৩। মধ্যখণ্ডে আছে,—মহাপ্রভুর ভাব-বিকার, সন্ন্যাস, পুরীযাত্রা, সার্বভৌম-উদ্ধার ইত্যাদি কাহিনী।

৪। অন্ত্যখণ্ডটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। মহাপ্রভুর ভাব-জীবনের সুষ্ঠু বর্ণনা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

লোচনের গ্রন্থে বৃন্দাবনের কাব্যের প্রভাবও যে প্রচুর ছিল,—তার প্রমাণ পাই গয়াগমন-পথের বর্ণনা থেকে। এই প্রসঙ্গে মুরারির প্রদত্ত তথ্যকে [illegible]রিহার করে লোচনদাস বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত তথ্যকেই আশ্রয় করেছিলেন। তা ছাড়া, ভাগবত, জৈমিনি ভারত, মহাভারত, ব্রহ্মসংহিতা ইত্যাদি অজস্র সংস্কৃতপুরাণের সাহায্যও কবি গ্রহণ করেছেন। আসল কথা,—জয়ানন্দের মত লোকপ্রিয় পাঁচালী কাব্য-রচনাই লোচনেরও গ্রন্থ-কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু, জয়ানন্দের মত নিছক গায়েন ছিলেন না লোচন,—তিনি ছিলেন নিষ্ঠা-সম্পন্ন বৈষ্ণব। নরহরি-প্রতিষ্ঠিত 'গৌর-নাগরী' মতবাদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ছিলেন তিনি। তাই, কাব্যকে

লোচন চৈতন্য-জীবনাবলম্বনে জন-প্রিয় পাঁচালীকাব্য লিখেছেন

৮। চৈতন্য চরিতের উপাদান। ৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

লোক-প্রিয় করে তোলার চেষ্টায় দায়িত্বহীন কাহিনী-চটক সৃষ্টির 'পরেই নির্ভর করেন নি,—বিভিন্ন পুরাণকার ও চৈতন্য-জীবনীস্রষ্টা পূর্বসূরিগণের সহায়তায় নিজ নিষ্ঠা-বিশ্বাসের সহযোগে চৈতন্যের ভক্তি-রস-সমৃদ্ধ শিল্পালেখ্য গড়ে তুলেছেন। স্বীকার করা উচিত,—এই শিল্প-মূর্তি অংকন-উপলক্ষ্যে লোচন চৈতন্য-জীবনের বহু সত্য-ঘটনার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছেন;—কিন্তু কল্পনা-শক্তির অবাধ-চর্যায় তিনি কোথাও চৈতন্য-জীবন-সম্বন্ধে ভক্ত-হৃদয়ের ঐতিহ্যগত বিশ্বাসকে ক্ষুন্ন করেন নি। পুংখানুপুংখতার বিচারে লোচনের কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য কিছুতেই স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাহলেও, এই গ্রন্থকে ঐতিহ্য-নির্ভর কাব্যরূপে স্বীকার করতে বাধা নেই। ইতিহাস-ঘটনার যাথাযাথ্যের অভাব ঘট্‌লেও, তাঁর কাব্যে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা (Historical Fidelity)-র অভাব ঘটে নি। লোচনের কল্পনা বিশেষভাবে গৌরাঙ্গের 'নাগরীভাবের' সাধন-প্রচেষ্টা দ্বারা প্রভাবিত। দু' একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিই,—চৈতন্যজীবনের ভাব-পরিচয় উদ্ধার-প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বৃন্দাবনদাস বলেন,—

লোচনের কাব্যে গৌরীনাগরী ভাব

"স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বোলে॥"—চৈঃ—ভাঃ—

বৃন্দাবনের এই উক্তির যাথার্থ্য সর্বজন-বিদিত। তবু, গুরু নরহরির মতবাদের অনুসরণে লোচন চৈতন্যের জন্মমুহূর্তের বর্ণনায় লিখলেন,—

"গৌর নাগরিয়া ভাবে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গে রস-রাশি অমৃত অখণ্ড।"

ঐ একই মুহূর্তে লোচনের বর্ণনানুযায়ী নদীয়া-নারীগণের
"অলসল অঙ্গ সবার শ্লথ নীতিবন্ধ।"

লক্ষ্মী এবং বিষ্ণু-প্রিয়ার বিবাহ-বাসরেও কবি 'নাগরী-ভাবের' ছড়াছড়ি কল্পনা করেছেন। সর্বত্রই তাঁর সৌন্দর্য-সৃষ্টি, এবং নাগরী-ভাব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র ছিল যে, তথ্যের অপলাপ কিংবা বর্ণনার পরস্পর-বিরোধিতার প্রতি তিনি লক্ষ্যই করেন নি।—

লক্ষ্মীর সংগে চৈতন্যদেবের গঙ্গার ঘাটে প্রথম সাক্ষাতের চিত্রটিকে পূর্বরাগ-চিত্রণে রূপায়িত করতে গিয়ে বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদটি কবির মনে পড়েছিল—

"সখি হে, অপুরুব চাতুরি গোরি।
সবজন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি।
তঁহি পুন মোতি-হার তোরি ফেঁকল
কহই হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুণি সঞ্চরু
শ্যাম দরস ধনি লেল॥"

তাই গৌর-দর্শন-পিয়াসিনী লজ্জা-বিনম্রা লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও কবি একই চাতুরীর কল্পনা করেছেন :—

"গজমোতি হার ছিল গলায় তাহার।
ছিঁড়িয়া ফেলিল, ভূমে পড়িল অপার॥"

অথচ একবারও তিনি স্মরণ করেননি যে, লক্ষ্মীর পিতা নিঃস্ব ছিলেন। তাঁর পক্ষে গজমোতিহার ছিঁড়ে ফেলার বিলাস অসম্ভবই নয়,—ঐ কল্পনাও অসঙ্গত। চিত্রের পরবর্তী অংশে এই অসঙ্গতি কবি নিজেই স্পষ্ট করে তুলেছেন ;—লক্ষ্মীর বিবাহ-প্রস্তাবের উত্তরে তাঁর পিতা বল্‌ছেন,—

"আমি ধনহীন কিছু দিবারে না পারি।
কন্যামাত্র আছে মোর পরমা সুন্দরী॥"

স্পষ্টই বোঝা গেল,—তথ্যের যাথাযাথ্য লোচন আকাঙ্ক্ষা করেন নি,—সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপও ছিল না,—চৈতন্য-জীবনাবলম্বনে ভক্তি-ভাব-সমৃদ্ধ, লোক-চিত্তহারী কাব্য-চিত্রাংকণই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। আর, এই উদ্দেশ্য-সাধনে লোচন উল্লেখ্য সার্থকতা লাভ করেছিলেন ভক্তি এবং আন্তরিকতাশ্রয়ী কল্পনাপ্রভাবে।—চৈতন্য-সন্ন্যাস-মুহূর্তের পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ বর্ণনা করেছেন কবি লোচনদাস—

লোচনের গ্রন্থের কাব্য মূল্য

"দু' নয়নে বহে নীর ভিজিয়া হিয়ার চীর
বক্ষ বহিয়া পড়ে ধার।
চেতন পাইয়া চিতে উঠে প্রভু আচম্বিতে
ঞ্চুপ্রিয়া পুছে বারবার॥

শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দাও হাত
সন্ন্যাস করিবে না'কি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা স্থির নহে মোর হিয়া
আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥
অরণ্য কণ্টক বনে কোথা যাবে কোন্ স্থানে,
কেমনে হাঁটিবে রাঙা পায়।
ভূমিতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর ভয় তবে
হেলিয়া পড়য়ে পাছে গায়॥
কি কহিব মুই ছার আমি তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাব বিষ খাইয়া
সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥"

লোচনের কাব্যকথা ইতিহাস-বিমুখ, তাঁর কাহিনী পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন। তাই, অখণ্ড আখ্যায়িকা কাব্য বা জীবনী-কাব্য হিসেবে বিচার করলে এই রচনার ব্যর্থতাই কেবল প্রতীয়মান হবে। কিন্তু খণ্ড-বিচ্ছিন্ন এমনি বহু মনোরম চিত্র রচনা করেছেন লোচন,—স্বতন্ত্র ভাবে যাদের মধ্যে গল্প ও জীবন-রস সুনিবিড় হয়ে আছে। জীবনী-কাব্যকার হিসেবে লোচন ব্যর্থ, কিন্তু মর্মস্পর্শী গল্প-রসিক হিসেবে অবশ্য সমুল্লেখ্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

"চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুলিখিত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতেছে 'চৈতন্য-চরিতামৃত'। মহাপ্রভুর শেষ ১২ বৎসরের চরিতকথা কেবল ইহাতেই পাওয়া যায়।"[১০] গ্রন্থকর্তা কৃষ্ণদাসকবিরাজ একাধারে ছিলেন বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, চিন্তাশীল তত্ত্বজ্ঞানী ও পরম নিষ্ঠাবান্ ভক্ত-বৈষ্ণব। পরিণততম বয়সের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বৃদ্ধ কবি এই গ্রন্থে আপন প্রতিভাকে নিঃশেষিত করেছিলেন। ফলে মহাপ্রভুর জীবনের ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর বর্ণনায়, তাঁর প্রবর্তিত

চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্য-জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রমাণ্য গ্রন্থ

১০। বাঙালা-সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)—ডঃ সুকুমার সেন।

ধর্ম-তত্ত্বের দার্শনিক পটভূমি-রচনায় ও তাঁর লীলামাধুর্যের ক্রমানুগত ভাবচিত্রণে গ্রন্থখানি বৈষ্ণব দর্শন-সাহিত্যের ইতিহাসে বেদ-তুল্য মর্যাদা লাভ করেছে।

কৃষ্ণদাসের পূর্বে বাংলা ভাষাতেও যে একাধিক চৈতন্য-চরিত রচিত হয়েছিল, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তবু কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ-রচনার প্রয়োজন-বোধ একান্ত হয়েছিল বিশেষভাবে তিনটি কারণে:—

(১) সন্ন্যাসি-চৈতন্যের 'বহিরঙ্গ' জীবনেরও বহু পুংখানুপুংখ তথ্য-সমাবেশ পূর্বসূরিগণের রচনায় অসম্পূর্ণ ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজ গ্রন্থে এমন একাধিক ঘটনার বর্ণনা করেছেন, যা 'মুরারিগুপ্তের কড়চা', রঘুনাথদাস-গোস্বামীর স্তবাবলী, রূপগোস্বামীর স্তবমালা, কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' বা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যে' উল্লিখিত হয় নি। তা ছাড়া, পূর্ববর্তিগণের বর্ণিত একাধিক ঘটনা কৃষ্ণদাস নবরূপে উপস্থিত করেছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব-নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য

(২) কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বে রচিত চরিতগ্রন্থগুলির সব কয়টিতেই মহাপ্রভুর শেষ বার বছরেব অন্তরঙ্গ-ভাব-লীলার সুষ্ঠু-সম্পূর্ণ বর্ণনা প্রায় অলক্ষ্য ছিল। তাই, বিশেষ করে বৃন্দাবনের ভক্তদের আকূতি নিবারণের জন্যই চৈতন্য-ভাব-জীবনের পূর্ণ-চিত্রাংকণের উদ্দেশ্যে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। এ কথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন।

(৩) কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতম মূল্য নিহিত আছে,— গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বজনগ্রাহ্য ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমিকা রচনায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, 'ধর্মোন্মাদ' মহাপুরুষদের জীবনই তাঁদের বাণী। সেই প্রকটলীলা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সকলকেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। কিন্তু, লীলা-গুপ্তির সংগে সংগেই কোন সঙ্গত-সমন্বিত আদর্শ গড়ে না উঠ্‌লে জন-চিত্তে তার প্রভাব-শিথিলতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই তখন তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে সেই জীবনকে চিরন্তনতা দানের প্রয়োজনে ধর্মশাস্ত্র-রচনা অপরিহার্য হয়ে থাকে। চৈতন্যের যে-ধর্ম সম্পূর্ণরূপে হৃদয়াবেগের মিষ্টিক্ অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়, তাকেই য়ুরোপীয় 'Scholastic Philosophergণের ন্যায়' "যুক্তি-পরম্পরা ও মনস্তত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত"

করেছিলেন 'কবিরাজ' কৃষ্ণদাস [১১]। এইজন্যই তাঁর গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের জীবন-বেদ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

কৃষ্ণদাসকবিরাজের ব্যক্তি-পরিচয় স্পষ্ট কিংবা সম্পূর্ণ নয়। কবির নিজস্ব বর্ণনা থেকে জানা যায়,—নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে ছিল তাঁর বাসভূমি। তাঁর একটি অনুজ ভ্রাতাও ছিলেন। একদা স্বপ্নে নিত্যানন্দ-প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কবি বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে তিনি রূপ-সনাতন গোস্বামীর কৃপা ও রঘুনাথদাস-গোস্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করেন।[১২]

কবি-পরিস্থিতি

এ-পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য পরিচয় অবলম্বন করে নানাজনে নানারূপ অনুমান করেছেন। কবিরাজ-গোস্বামীর জনৈক শিষ্য মুকুন্দদেব গোস্বামীর 'আনন্দ-রত্নাবলী'র 'পরে নির্ভর করে ডঃ দীনেশচন্দ্র অনুমান করেছেন,—বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে আনুমানিক ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়েছিল। আর, তাঁর পিতার নাম ছিল ভগীরথ,—মাতা ছিলেন সুনন্দা; কবির ভ্রাতার নাম ছিল শ্যামদাস। কিন্তু পূর্বেই বলেছি,—কবির রচনা থেকে জানা যায়,—তাঁর জন্মভূমি ঝামটপুর ছিল নৈহাটীর অন্তর্গত,—আর নৈহাটী হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত,—বর্ধমানে নয়।

চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনাকাল সম্বন্ধেও নানারকম মতানৈক্য রয়েছে। গ্রন্থশেষে কালজ্ঞাপক একটি পদ পাওয়া যায়;—

"শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেঽহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

এই শ্লোক অনুসারে ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবার দিনে কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। কোন কোন পুথিতে শ্লোকটির প্রথমাংশের পাঠান্তর আছে,—"শাকেঽগ্নি বিন্দু বাণেন্দৌ······ইত্যাদি।

এই অনুযায়ী গ্রন্থ রচনাকাল হয় ১৫০৩ শক। কিন্তু এই পাঠে ভুল আছে। কারণ, গণনার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে ১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী

রচনাকাল

রবিবার ছিল না। অপরপক্ষে, ডঃ সুকুমার সেন ১৫৩৭ শকাব্দকেও (১৬১৫ খ্রীঃ) গ্রন্থ-সমাপ্তির সঙ্গত কাল বলে

১১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

১২। অধুনা ডঃ সুকুমার সেন প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন,—রঘুনাথ দাসও কৃষ্ণদাসের শিক্ষাগুরু ছিলেন, দীক্ষাগুরু নয়।

মনে করেন না। কারণ, কৃষ্ণদাসের শিক্ষাগুরু সনাতন ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। তাঁর সান্নিধ্য-লাভহেতু কৃষ্ণদাস নিশ্চয়ই ১৫৫০ খ্রীঃ কিংবা নিকটবর্তী সময়ে বৃন্দাবন পৌঁচেছিলেন। সে সময়ে কবি প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এ অনুমান সত্য হলে, ১৬১৫ খ্রীঃ কবির যে বয়স হয়, তা অতবড় গ্রন্থ-রচনার উপযুক্ত নয়। তাই তাঁর ধারণা,—"মোটামুটি এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সাতের আটের কোঠায় বইখানি রচিত হইয়াছিল [১৩]।" ডঃ সেনের মতে, পূর্বোদ্ধৃত পুষ্পিকাটি মূলগ্রন্থের নয়, তার কোন অনুলিখিত পুথির লিপিকাল।

১৫৯২ খ্রীঃ সমাপ্ত জীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ'-গ্রন্থের যে উল্লেখ চৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে ডঃ সেন অনুমান করেছেন,—হয়, 'গোপালচম্পূ'র কালজ্ঞাপক পুষ্পিকাটিও মূলগ্রন্থের কাল-দ্যোতক নয়; নতুবা জীবগোস্বামী হয়ত দীর্ঘগ্রন্থের কিছু অংশ রচনা করে সাময়িক ভাবে খসড়াটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন;—গ্রন্থখানির লিপিসমাপ্তিকাল ১৫৯২ খ্রীঃ হলেও কৃষ্ণদাস হয়ত ঐ অসম্পূর্ণ খসড়াটির উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এক সংগে অতগুলি অনুমান স্বীকার করে নেবার যৌক্তিকতা আছে বলে এখনও মনে হয় না। তার পরিবর্তে, ডঃ দীনেশচন্দ্র, ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার এবং অন্যান্য পূর্বসূরিগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী – ১৫৩৭ শকই কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের রচনাকাল বলে আপাততঃ গৃহীত হ'তে পারে।

সুবৃহৎ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি 'আদি', 'মধ্য' এবং 'অন্ত্য' এই তিনটি 'লীলা'-খণ্ডে বিভক্ত। 'আদিলীলা'র ১৭টি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম ৯টি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্ব-বিশ্লেষণে ব্যয়িত হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলি মহাপ্রভুর জন্ম থেকে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনীর বর্ণনা। এই সংগে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার 'অন্তরঙ্গ' জীবনের পরিচয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। মধ্যলীলায় পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২৫। সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে মহাপ্রভুর ষড়্-বর্ষব্যাপী তীর্থভ্রমণ কাহিনীই এই অংশের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু আলোচ্য অংশেও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে

গ্রন্থপরিচয়

চৈতন্য-ধর্মের মূল দার্শনিক তত্ত্বের বিচার-ব্যাখা বিস্তৃত অংশ অধিকার করেছে। বৃন্দাবন থেকে চৈতন্য-প্রভুর নীলাচল প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে

১৩। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)

এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। অন্ত্যলীলায় বিশেষভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'দিব্যোন্মাদ' বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরূপগোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামি-কৃত কয়েকটি স্তোত্রের মধ্যে যে সামান্য উপাদান নিহিত ছিল, তাকেই ভিত্তি করে কৃষ্ণদাসের ভক্তি-বিনম্র বৈষ্ণব অন্তদৃ'ষ্টি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ লীলা-কাহিনীর একটি সজীব, সম্পূর্ণ আলেখ্য গড়ে তুলেছে।

এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনার পেছনে যে বিশেষ আদর্শ-গত প্রেরণা সক্রিয় ছিল, কৃষ্ণদাস-শিষ্য মুকুন্দদেব তার বিশ্লেষণ করেছেন,—

"কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন।
চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঞির কথন॥"

অন্যান্য মহাজনগণও অনেকে এই মতবাদের সমর্থন করেছেন। বস্তুতঃ, দ্বাপরের দ্বৈত-লীলাকে চৈতন্য-জীবনে অদ্বৈত-লীলারূপে প্রতিফলিত করে 'দ্বৈতাদ্বৈত বাদের' প্রতিষ্ঠাই কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থের দার্শনিক উদ্দেশ্য ছিল;—গ্রন্থারম্ভের চৈতন্য বন্দনা শ্লোক সমূহ থেকেও এ কথা স্পষ্ট প্রতিভাত হতে পারে। এই দুঃসাধ্য-সাধনের পক্ষে যে গভীর এবং ব্যাপক জ্ঞান-সম্ভার, যে তীক্ষ্ণ বিচারবোধ ও অনুভূতি-নিবিড়তা এবং যে অসহ্য-কৃচ্ছ সাধনা অপরিহার্য ছিল,—কৃষ্ণদাসকবিরাজের মত মহা-প্রতিভাধর ব্যক্তিও কেবল প্রৌঢ় বয়সেই তা অধিগত করতে পেরেছিলেন।

বাল্যকালেই কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্তকৌমুদীব্যাকরণ. বিশ্বপ্রকাশ ও অমরকোষ অভিধানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। অলংকার শাস্ত্রের আদর্শ হিসেবে তিনি বিশেষভাবে বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের 'পরেই নির্ভর করেছিলেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, রঘুবংশ, উত্তর-রাম-চরিত, নৈষধ ও কিরাতার্জুন থেকে একটি করে শ্লোক তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এ'সব ছাড়া, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসংহিতা ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্থে কবির গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় চৈতন্য-চরিতামৃতের অজস্র উদ্ধৃতি ও ভাবানুবাদ সমূহ দেখে। কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক উদ্ধার করেছেন ১০১১ বার। তার মধ্যে কোন কোন শ্লোক একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে। তা হলেও, চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত স্বতন্ত্র শ্লোক-সংখ্যা মোট ৭৬৩। তার মধ্যে স্বয়ং কবি ১০১টি শ্লোক রচনা করেছেন;—৬৬২টি শ্লোক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এর থেকেই

লেখকের পাণ্ডিত্য

কৃষ্ণদাসের মহাপাণ্ডিত্যের পরিমাণ অনুভূত হতে পারবে। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামীর এই গভীর এবং ব্যাপক পাণ্ডিত্য তাঁর রচনার প্রাঞ্জলতাকে আচ্ছন্ন করে নি। "প্রেম যে পুরুষার্থ শিরোমণি, নরলীলাই যে শ্রেষ্ঠ লীলা; কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা যে কাম নয়,—প্রেম; আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছাই যে কাম, রাগানুগা অহৈতুকী ভক্তিই যে সাধক-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য, জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই যে ঢের বড়, কেবলা রতি যে ঐশ্বর্য-হীন, ভুক্তি-স্পৃহার মত মুক্তি-স্পৃহাও যে বর্জনীয়[১৪]";—ইত্যাদি বহু জটিল ও দুরূহ তত্ত্বকে উদাহরণ সাহায্যে প্রাঞ্জল ভাব ও ভাষায় কবিরাজ-গোস্বামী স্পষ্ট,—জীবন্ত-প্রায় করে তুলেছেন। কিন্তু, এই অপূর্ব সিদ্ধিও কবিকে আত্মশ্লাঘায় অধীর করে নি। আদর্শ বৈষ্ণবের মত গ্রন্থ-রচনার প্রতি স্তরে তিনি নিজেকে 'তৃণাদপি-সুনীচ' জ্ঞান করেছেন,—

ভক্তি-নিষ্ঠা

"সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা' সভার চরণ-কৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে॥"

এই নিষ্ঠাপূর্ণ বিনয়-বশেই কবি বৃন্দাবনদাস, স্বরূপদামোদর, মুরারি এবং অন্যান্য পূর্বসূরিগণের নিকট অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ঐতিহাসিক জাগ্রত-চেতন এবং নিষ্ঠাপূর্ণ বৈষ্ণব-বিনয়ের মূর্ত প্রতীক কবিরাজগোস্বামী একাধিক স্থলে কবিকর্ণপূরের হুবহু অনুসরণ করেও, তাঁর নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি! এই বিস্ময়কর ব্যাপারের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন,—কবিকর্ণপূরের কীর্তির সংগে কৃষ্ণদাসকবিরাজ হয়ত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত ছিলেন না। অন্যদিকে স্বরূপের যে কড়চা আজও অনাবিষ্কৃত রয়েছে, কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। তাই মনে করা হয়েছে, ঐ 'স্বরূপের কড়চা'ই কৃষ্ণদাস ও কবিকর্ণপূরের সাধারণ আদর্শ ছিল। হয়ত এই কারণেই এই দুই কবির রচনায় পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে।

যাই হোক, গ্রন্থকার হিসেবে কৃষ্ণদাসের ব্যক্তিত্ব ছিল যুক্তি এবং বিচার-নিষ্ঠ,—প্রকাশ ছিল তীব্র, সংহত ও যথাযথ। ফলে, তাঁর কাব্যে শৈল্পিক ভাবাকৃতি দুর্লভ-প্রায় হয়েছে। রসসন্ধানী সমালোচককে তাই স্বীকার

১৪। চৈতন্যচরিতের উপাদান।

করতেই হয় :—"The literary merit of the work, with its epic length, prolixity and prosiness is much inferior to its prototype. The style is terse, but not very elegant or attractive and the versification poor and faulty.[১৫]।" এই মন্তব্যের যথার্থতা অস্বীকার করবার উপায় নেই ; তাহলেও দেখি,—ভক্ত-বৈষ্ণবের নিকট চৈতন্য-চরিতামৃতের বহু অংশ কেবল দার্শনিক-বিচারের আশ্রয় মাত্র হয়েই নেই,—নিত্যপাঠ্য মন্ত্রের মহিমা লাভ করেছে যেন। ভক্তের আবেগ-প্রবাহকে তা স্পন্দিত করে তোলে।—

চৈতন্যচরিতামৃতের রস-মূল্য

"বংশীগানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তা'র মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন; সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী
তা'র প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা কড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তা'র জন্ম হইল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধাসার স্বাদ বিনিন্দন।
তা'র স্বাদ যে না-জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্বমান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ গন্ধ, যা'র নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥

১৫ Vaiṣṇava faith and movement in Bengal—Dr. S. K. De.

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটি চন্দ্র-সুশীতল
তা'র স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সেই যাউ ছারেখার,
সেই বপু লৌহ-সম জানি॥
করি এত বিলপন, প্রভু শচী-নন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক॥"

লক্ষ্য করলেই দেখ্‌ব, উদ্ধৃত রচনায় প্রসাদ-গুণের চেয়ে তথ্য-সমাবেশের দিকে ঝোঁক বেশি। আর, তাও বৃন্দাবনের ভক্তি-রস-শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান-প্রসূত। অর্থাৎ কৃষ্ণদাসের অন্তঃস্বভাবে পণ্ডিত-বোদ্ধার দুর্লভ প্রতিভা থাক্‌লেও, কবিজনোচিত আবেগ-আকূতি সুলভ ছিল না। কিন্তু, তাঁর বৈষ্ণব-চেতনার মধ্যে একটি অহৈতুকী ভক্তি-নিষ্ঠ সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন বৈষ্ণবশাস্ত্রের শিক্ষণের (schooling) দ্বারা সঞ্জীবিত, তেম্‌নি তাঁর প্রাণ ছিল বৈষ্ণব-ভাব-বিশ্বাসে ভরপুর। আর, যেখানে যুক্তি-তথ্য, বিচার-পাণ্ডিত্যকে ছাপিয়ে সেই বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা বারে বারে অনন্যতুল্য দৃঢ়পদক্ষেপে আত্ম-প্রকাশ করেছে, সেখানেই তা বৈষ্ণব ভক্তজনেরও হয়েছে প্রাণস্পর্শী।

তা ছাড়া, বাংলা সাহিত্যের অ-বৈষ্ণব পাঠকের কাছেও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মহিমা অতুলনীয়; এই মহাগ্রন্থ বাংলা ভাষা সাহিত্যের এক মহৎ সম্পদ্। সাহিত্যের ধনভাণ্ডার দ্বিধা বিভক্ত;—এক দিকে রয়েছে সৃজনশীল মৌলিক শিল্প-রচনার ধারা। আর একদিকে আছে ভাষার অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। প্রথমটির উৎস মনের মুক্তিতে, দ্বিতীয়টির পরিণতি মননের গভীরতায়। আবার, এই দ্বিবিধ সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক আপেক্ষিকতার সম্পর্ক। যে কোন ভাষায় মননশীল রচনার সমৃদ্ধি না থাক্‌লে মনোময় সৃষ্টি হয়ে পড়ে দুর্বল এবং ভাবালু। এই কারণেই, দর্শন-বিজ্ঞান, যুক্তি-তর্ক-প্রধান গাঢ়বদ্ধ রচনাও সাহিত্যের শিল্প-সমুন্নতির জন্যও অপরিহার্য। এদিক থেকে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সর্বকালের বাংলা সাহিত্যের এক অতুল্য সম্পদ্।

কিন্তু, তা' হলেও, মৌল স্বভাবে চৈতন্যচরিতামৃত কেবল একটি দার্শনিক মহাগ্রন্থ-ই নয়; বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ;—আভ্যন্তরীণ বৈষ্ণব ভক্তি-বিশ্বাসই এর প্রাণ। সেখানে কবিরাজগোস্বামী কৃষ্ণদাস কেবল, দার্শনিক-ঐতিহাসিক, পণ্ডিতই নন, প্রধানতঃ এবং মূলতঃ তিনি ভক্ত। তাই, বৈদান্তিক সূত্রানুসারে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও শ্রীচৈতন্যের নরলীলা-মহিম দেবত্ব প্রতিপাদনে যে প্রজ্ঞা-ভাস্বর প্রতিভা অতন্দ্র নিরলস, ভক্তির আবেগে সেই কবিরই বৈষ্ণব বিশ্বাস যত্রতত্র অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছে অকুণ্ঠ স্পষ্টতায়। চৈতন্যের প্রকট-লীলার বর্ণনায় কৃষ্ণদাস আদর্শ ঐতিহাসিকের মত প্রতিপদে উৎস-নির্দেশ (authority quote) করেছেন, নৈয়ায়িকের মত তর্ক করেছেন,—বৈদান্তিকের মত করেছেন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ঐ একই কবি আবার চৈতন্যের অপ্রকট মহিমায় একান্ত বিশ্বাস করে আদিলীলায় 'আম্রভক্ষণ', মধ্যলীলায় বৌদ্ধভিক্ষুর মস্তক কর্তন ও পুনঃ-সংযোজন, কাশীমিশ্র ও প্রতাপরুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তিপ্রদর্শন, 'অন্ত্যলীলা'য় ভাবাবিষ্ট প্রভুর একহস্তের দীর্ঘীভবন সর্বদ্বার-রুদ্ধ গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণ ইত্যাদি অতিলৌকিক কাহিনীর জাল বুনে গেছেন। দার্শনিক পাণ্ডিত্যের মধ্যেও এই জিজ্ঞাসাহীন নিষ্ঠাই কবি-চেতনার বৈষ্ণব স্বভাবকে প্রকট করেছে।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "চৈতন্য চরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ব বিচার সব দিক দিয়াই চৈতন্য-চরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।"[১৬] এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করে আমরাও বল্‌ব,—বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ভাগবত-তুল্য হলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার মহাবেদ। আর, এই মৌল বৈষ্ণব ভক্তি-নিষ্ঠ স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে এই মহাগ্রন্থ বাঙালির ঐতিহাসিক-দার্শনিক চেতনার প্রথম সার্থক প্রকাশ।

গোবিন্দদাসের কড়চা

'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে চৈতন্য-চরিতে'র একখানি খণ্ডিত কাব্য ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর বাসী ৺জয়গোপাল গোস্বামী প্রকাশ করেন। স্বয়ং

১৬। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।

গ্রন্থ-সম্পাদক ও তাঁর সমর্থক ডঃ দীনেশচন্দ্র দৃঢ়তার সংগে সিদ্ধান্ত করেন যে, গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম চৈতন্য-চরিত গ্রন্থ। কিন্তু, নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবমহল বা অন্যান্য ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের নিকট গ্রন্থখানি কোন মর্যাদাই খুঁজে পায় নি।

কড়্চা-পরিচয়

গ্রন্থ-প্রদত্ত কবি-পরিচিতি নিম্নরূপ, গোবিন্দকর্মকার ছিলেন বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুর-বাসী শ্যামদাসকর্মকার ও মাধবীর পুত্র। পত্নী শশিমুখীর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে গোবিন্দ মনোদুঃখে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় এসে গোবিন্দ মহাপ্রভুর মহিমা-কথা শুনে নবদ্বীপে যান এবং তাঁর ভৃত্য পদ গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর সংগে গোবিন্দ নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণেও তিনি সঙ্গী হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্য থেকে নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের পথে মহাপ্রভু গোবিন্দকে শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট পাঠিয়ে দেন। 'কড়চা'-টি এখানে খণ্ডিত।

গোবিন্দ কর্মকারের আত্মকথা

কবি-প্রদত্ত এই অপূর্ণ আত্মপরিচয় ছাড়া সুদীর্ঘ চৈতন্য-জীবনী-সাহিত্যের কোথাও গোবিন্দ কর্মকারের উল্লেখ নেই। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি, বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাসকবিরাজ বিশেষ শ্রদ্ধা-বিনয়ের সঙ্গে পূর্বসূরীদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, এঁদের কারো গ্রন্থেই গোবিন্দ কর্মকারের অস্তিত্বের ইঙ্গিতও নেই। কেবল জয়ানন্দের কাব্যে এক গোবিন্দ কর্মকারের উল্লেখ আছে। জয়ানন্দের কাব্যের ঐতিহাসিক ত্রুটির পরিচয় পূর্বে উদ্ধার করেছি। বর্তমান প্রসঙ্গে জয়ানন্দের উল্লিখিত নামটির প্রামাণ্য স্বীকার করে নিলেও গোবিন্দ কর্মকারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না,—'কর্মকার' অর্থে কেবল 'কামার' জাতীয় ব্যক্তিকেই বোঝায় না,– 'কর্ম করে যে'—এই অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও নীলাচল গমনকালে তাঁর সেবক হিসাবে সঙ্গী হয়েছিলেন 'গোবিন্দঘোষ'। জয়ানন্দের কাব্যে শেষোক্ত অর্থে ইনিই গোবিন্দ কর্ম-কার রূপে বর্ণিত হয়েছেন কি না, তা'ও নিশ্চিত করে বলা চলে না। গৌর-পদ-তরঙ্গিণীতে বলরামের ভণিতায় প্রাপ্ত একটি পদে চৈতন্যের নীলাচল ও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী

গোবিন্দ কর্মকারের অস্তিত্বের ঐতিহাসিকতা

হিসেবে এক বৃন্দাবনের উল্লেখ আছে। কিন্তু পদকর্তা বলরাম অথবা পদোদ্ধৃত 'বৃন্দাবন' কারো পরিচয়ই আবিষ্কৃত হ'তে পারে নি।

বিশেষ করে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের দিন-লিপি-আকারে লিখিত একমাত্র ঐতিহাসিক পরিচয়রূপেই 'কড়চা'টি ডঃ দীনেশচন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু, কাব্যখানির গঠন-ভঙ্গী এ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে।

গ্রন্থের প্রামাণিকতা

গ্রন্থের ভাষা প্রায় আদ্যন্ত আধুনিক, যে সকল স্থলে প্রাচীনত্বের পরিচয় আছে, সেগুলিও চেষ্টাকৃত এবং কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে। স্বয়ং দীনেশচন্দ্র স্বীকার করেছেন,—গোস্বামীমহাশয় "অনেক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে শব্দ-যোজনা করিয়াছেন, কোন কোন জায়গায় কীট-দষ্ট ছত্রটি বুঝিতে না পারিয়া সেই ছত্র নিজে পূরণ করিয়াছেন।"[১৭] এই মন্তব্যই সম্পাদকের ঐতিহাসিক নিষ্ঠার অভাবের স্পষ্ট পরিচয় বহন করে। তাছাড়া কড়্চাটির বিভিন্ন স্থানে সন-তারিখ-সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ পৌনঃপৌনিক উল্লেখ দেখে মনে হয়,—লেখক-যেন সচেতন ভাবে গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য অতি-ব্যগ্র। যদিও গ্রন্থারম্ভে গোবিন্দ কর্মকার বলেছেন,—

"কড়চা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে।"—তবু, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের এই কাহিনীটিকে বিশ্বসনীয় এবং ঐতিহাসিক-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তোলার অতি-ব্যস্ততা'ও গ্রন্থ-মধ্যে সুস্পষ্ট।

কিন্তু, এই সকল ব্যাপার ছাড়াও গ্রন্থটির অর্বাচীনতা সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। একজায়গায় কবি বলেছেন,—"জান্‌লা হইতে দেখি এসব ব্যাপার।"—'জান্‌লা' শব্দটি পর্তুগীজ শব্দের বাংলা ভাষায় নবাগত রূপ,—স্বভাবতই ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যে এই শব্দটির ব্যবহার সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। তা' ছাড়া ভ্রমণ কাহিনীটির বিভিন্ন জায়গায় কবি 'রসালখণ্ড' ও 'পূর্ণগরে'র বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এই 'রসালখণ্ড' বর্তমান 'রাসেল-খণ্ডের'ই কবিকৃত ভারতীয় সংস্করণ। আচার্য যদুনাথ প্রমাণ করেছেন,—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাসেল সাহেবের নামে স্থানটির বর্তমান নামকরণ হয়। আবার পূর্ণনগর 'পুণা' নগরীরই চেষ্টা-কৃত প্রাচীনতা-ধর্মী রূপ-বিকৃতি। অথচ, বৃটিশশাসন-পূর্ব-যুগে স্থানটির কোন খ্যাতি কিংবা মর্যাদা ছিল না।

১৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

এই সকল অতি অসঙ্গত তথ্যাপলাপের পর গ্রন্থটির আনুপূর্বিক কৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না, তাই এ বিষয়ের আলোচনা অর্থহীন।

চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গ বিজয়

কবি ও গ্রন্থ-পরিচিতি

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' পুথির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন।[১৮] তিনখণ্ডে সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি-যুক্ত কেবল প্রথম খণ্ডের খণ্ডিত পুথি এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে আছে। ডঃ সেন জানিয়েছেন, গৌরাঙ্গবিজয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের রচনা : পুথিটির লিপিকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে।

চূড়ামণিদাস ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণামূলে ছিল নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ। চৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধে পুথিটিতে কিছু কিছু নূতন তথ্য রয়েছে।

অন্যান্য জীবনী-গ্রন্থ

চৈতন্য-চরিত গ্রন্থাবলীকে উপলক্ষ্য করে বাংলা সাহিত্যে মানব-জীবন-নির্ভর কাব্য-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টাই বিবর্তিত,—ক্রম-বিকশিত হয়েছে অপরাপর বৈষ্ণব মহাপুরুষদের জীবনী-গ্রন্থাবলীতে। চৈতন্যচরিত রচনার ক্ষেত্রে দৈবী সংস্কারের যে তীব্রতা লক্ষিত হয়, এই সকল জীবনী গ্রন্থে তা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে হয়ে অবশেষে বিলুপ্ত হয়েছে।

চৈতন্য-ব্যতিরিক্ত জীবনী গ্রন্থাবলীর ভাবমূল্য

চৈতন্যপ্রভু ছিলেন স্বয়ং "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ।" কিন্তু অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতি ছিলেন অন্যান্য দেবতার অবতার। ক্রমশঃ শ্রীনিবাস-নরোত্তম জীবনীসাহিত্যের উপাদানরূপে আবির্ভূত হলেন,—তাঁরা আর দেবতার নয়, স্বয়ং গৌরচন্দ্রের অবতার। সীতাদেবী এলেন, তিনি আর অবতার নন, নর-চন্দ্রমারূপিণী নারীশ্রেষ্ঠা রূপেই জীবনীকারের নিকট তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। পূর্বেই বলেছি,—'নর-বাদ' নয়,—নর-শ্রেষ্ঠের পূজাই ছিল এই যুগের বৈশিষ্ট্য, জীবনী গ্রন্থগুলিও ক্রমবিবর্তনের পথে নর-দেবের পূজা-পরিণামে নর-শ্রেষ্ঠের শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনা করেছে।

চৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলীর পরেই জীবনীসাহিত্য হিসেবে ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত-প্রকাশ' সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। অদ্বৈতআচার্য সম্বন্ধে লিখিত একাধিক

১৮। দ্রষ্টব্য : বিচিত্র সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)।

জীবনীকাব্য পাওয়া গেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নিত্যানন্দ-জীবনীর কোন পুথি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন,—যেহেতু নিত্যানন্দ-লীলা প্রায় আনুপূর্বিক চৈতন্যলীলার সাঙ্গীভূত ছিল, এবং যেহেতু চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থাবলীতেই নিত্যানন্দ-লীলা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হয়েছে, সেইহেতু পৃথকৃভাবে গ্রন্থরচনার প্রয়োজনবোধ বৈষ্ণবসমাজে দেখা দেয় নি। কিন্তু, অদ্বৈত-জীবন চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে এবং চৈতন্য-তিরোভাবের পরে বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। তাই চৈতন্যজীবন-নিরপেক্ষ এই জীবনীর বিশদ্ আলোচনার অবকাশ এবং প্রয়োজনবোধ যথেষ্ট হয়েছিল।

'অদ্বৈত প্রকাশ'

যাই হোক্, ঈশান-নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র-প্রভাবে বহুল প্রচার লাভ করে। ডঃ দীনেশচন্দ্র অনুমান করেছিলেন গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ। মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ পুথির রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীঃ (১৪৯০ শক)। ডঃ সুকুমার সেন এই তারিখটির যাথাযাথ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[১৯] তিনি এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র উভয়েই মুদ্রিত পুথির তথ্যাদির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অথচ, "আশ্চর্যের বিষয় অদ্বৈতপ্রকাশের এখন কোন পুথি মিলিতেছে না।[২০]" মুদ্রিত পুথি পাঠে জানা যায়,—কবির জন্ম ছিল শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ে। কবির পঞ্চম বর্ষে তাঁর মাতা স-পুত্রক শান্তিপুরে আসেন এবং মাতা-পুত্র দুজনেই অদ্বৈতাচার্যের আশ্রয় ও শিষ্যত্ব লাভ করেন। তিরোধানের পূর্বে আচার্যপ্রভু ঈশানকে জন্মভূমি লাউড়ে ফিরে গিয়ে চৈতন্যলীলা প্রচারের আদেশ দেন। আরো পরবর্তী কালে সীতাদেবীর আদেশে কবি সংসারী হন। তখন তাঁর বয়স নাকি ছিল ৭০ বৎসর। কবি লাউড়ে বসেই কাব্য রচনা করেন। ঈশান মহাপ্রভুর দর্শনলাভ এবং পদ-সংবাহনের সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন।

রচনাকাল ও গ্রন্থ-পরিচিতি

হরিচরণদাস-রচিত অদ্বৈত-জীবনীর নাম 'অদ্বৈতমঙ্গল'। কবি যখন অদ্বৈত আচার্যের সান্নিধ্য লাভ করেন, তখন প্রভু বার্ধক্য-গ্রস্ত। কবি আচার্যের সম্পর্কিত-মাতুল বিজয় পুরীর

'হরিচরণের অদ্বৈতমঙ্গল'

১৯। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।
২০। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।

কাছে তাঁর বাল্যকথা শুনে তা কাব্যে লিপিবদ্ধ করেন। কবি স্বয়ং শ্রীহট্টের নবগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

হরিচরণের গ্রন্থে কিছু কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়,—(১) অদ্বৈত আচার্যের চারজন অগ্রজই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, (২) অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের সংগে মহাপ্রভু শান্তিপুরে দানলীলা অভিনয় করেছিলেন,—ইত্যাদি। মহাপ্রভু কর্তৃক নবদ্বীপে দানলীলাভিনয়ের কাহিনী একাধিক চরিতগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শান্তিপুরের অভিনয়ের কাহিনী অভিনব। হরিচরণের বর্ণনানুযায়ী এই অনুষ্ঠানে অদ্বৈত আচার্য কৃষ্ণ, মহাপ্রভু রাধা এবং নিত্যানন্দ বড়াই'র ভূমিকায় অবতরণ করেন। হরিচরণের কাব্যের উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

নূতন তথ্যাবলী

"নরহরি দাস রচিত কেবল বাল্যলীলা সম্বলিত অদ্বৈতবিলাস সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতকের রচনা বলিয়া মনে হয়।[২১]"

'অদ্বৈত বিলাস'

অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী সম্বন্ধে লিখিত দুখানি ক্ষুদ্রাবয়ব জীবনী-কাব্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন "দুইখানি বইয়েরই প্রাচীনত্ব কৃত্রিম।[২২]" তবে পূর্বে উল্লেখ করেছি,—সীতাদেবী অধ্যাত্ম-শক্তি-সম্পন্না নারী-শ্রেষ্ঠা রূপেই বর্ণিত হয়েছেন,—দৈবী অবতাররূপে নয়। সীতা-জীবনীগুলিতে অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা যদি মাত্রাতিরিক্তও হয়ে থাকে, তবু দৃষ্টিভঙ্গির এই মানবাভিমুখী বিবর্তন ঐতিহাসিকের লক্ষিতব্য।

সীতা-জীবনী কাব্যসমূহ

লোকনাথদাসের 'সীতাচরিত্র'ই সীতা-জীবনী সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ। কাব্য মধ্যে বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী ও তাঁদের রচনার উল্লেখ-উদ্ধৃতি দেখে মনে হয়, 'সীতাচরিত্র' চৈতন্যচরিতামৃতেরও পরে রচিত হয়েছিল। ৺অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মনে করেছিলেন সীতাচরিত্র-লেখক এই লোকনাথ দাস এবং অদ্বৈত-শিষ্য লোকনাথ চক্রবর্তী এক-ও-অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু ডঃ দীনেশচন্দ্র ও ডঃ সুকুমার সেন উভয়েই এই মতের বিরোধিতা করেছেন। গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র এবং উল্লেখ-যোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যও তার নেই। সীতাদেবী এবং তাঁর দুই শিষ্যা নন্দিনী ও জাঙ্গলীর অতিলৌকিক মাহাত্ম্য-কীর্তনেই গ্রন্থটির অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে।

সীতাচরিত্র

২১। ডঃ সুকুমার সেন। ২২। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড (২য় সং)।

সীতা জীবনীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সীতা-গুণ-কদম্ব' রচনা করেন তাঁর শিষ্য বিষ্ণুদাস আচার্য। কুলিয়ার নিকটবর্তী বিষ্ণুপুর ছিল কবির বাসস্থান,—পিতার নাম ছিল, মাধবেন্দ্র আচার্য। গ্রন্থ রচনারম্ভকাল ১৪৪৩ শক ;—কিন্তু এই তারিখটির যাথার্থ্যে সন্দেহ করবার কারণ আছে।

'সীতা-গুণ-কদম্ব'

চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরগণ ছাড়া পরবর্তী কালের বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনকথা নিয়েও সপ্তদশ শতাব্দী ও পরবর্তীকালে একাধিক জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এ সকল গ্রন্থের কয়েকটিরই প্রধান উপজীব্য ছিলেন চৈতন্য-তিরোভাবোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ আচার্য-ত্রয়,—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের বিচার প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস-নরোত্তমের জীবন-কথা'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। শ্যামানন্দের নিবাস ছিল দণ্ডেশ্বর গ্রামে। ইনি সদ্গোপ বংশীয়,—পিতার নাম কৃষ্ণমণ্ডল, মাতা দুরিকা। বৃন্দাবনে ইনি শ্যামানন্দ নামে অভিহিত হন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—সপ্তদশ-শতাব্দীর বাংলা দেশে এই ত্রয়ী লুপ্ত-প্রায় চৈতন্য-ঐতিহ্যকে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দার্শনিক বিচারের আলোকে নবরূপে উজ্জীবিত করে তোলেন। এই তিন পুরুষ-শ্রেষ্ঠের মধ্যে একমাত্র শ্রীনিবাস আচার্যই ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু, অ-ব্রাহ্মণ অপর দুজনেরও বহু শ্রেষ্ঠ-বর্ণ-জাত শিষ্যাদি ছিলেন। নরোত্তমের ব্রাহ্মণ শিষ্য নরহরি চক্রবর্তী গুরুর জীবন-মহিমাকে স্থায়ী রূপ দিয়েছেন 'নরোত্তম-বিলাস' গ্রন্থে। তাছাড়া, ঐ একই লেখকের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি, গৌর-চরিত-চিন্তামণি, গীত-চন্দ্রোদয়, ছন্দঃ সমুদ্র, শ্রীনিবাস-চরিত ইত্যাদি বহু গ্রন্থের মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকর' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ-কথা

পঞ্চদশ 'তরঙ্গে' বিভক্ত 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের গ্রন্থবর্ণন, শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁর পিতার জীবন-কথা, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দাদির ভ্রমণ-কাহিনী, গোস্বামিগণ-কৃত গ্রন্থাবলীর বঙ্গদেশে প্রেরণ, বীরহাম্বীর কর্তৃক গ্রন্থ লুণ্ঠন, বীর হাম্বীরের সদলে বৈষ্ণবী দীক্ষাগ্রহণ, খেতুরীর মহোৎসব ইত্যাদি সমসাময়িক বৈষ্ণব-জীবন ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বহুল

'ভক্তি রত্নাকর'

বর্ণনা বিদ্যমান। তাছাড়া, এই গ্রন্থে রাগ-রাগিনী-বর্ণন এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি লক্ষিত হয়।

'নরোত্তম বিলাস'

'নরোত্তম-বিলাস' দ্বাদশ 'বিলাস' বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। ভক্তি-রত্নাকর অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হলেও এটি তথ্য-সমৃদ্ধ এবং কবির লিপি-কুশলতার পরিচায়ক। অল্প কথায় নরোত্তমের আদ্যন্ত জীবনটি যেন এই কাব্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'গৌরচরিত চিন্তামণি' ও শ্রীনিবাস চরিত

গৌরচরিত-চিন্তামণি অনেকটা সংগীতের আকারে লিখিত এবং বিভিন্ন রাগ রাগিণী-সমৃদ্ধ। 'শ্রীনিবাস চরিত' শ্রীনিবাস-জীবনের কাব্যিক বর্ণনা।

প্রেমবিলাস

নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীনিবাস এবং শ্যামানন্দের জীবন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নিত্যানন্দ বৈদ্যবংশ-জাত,—পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতা সৌদামিনী, বাসভূমি শ্রীখণ্ড। বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্য-জীবনীর ইতিহাসে গ্রন্থটি আদর্শ এবং প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

নানাগ্রন্থ

এইরূপ একাধিক বৈষ্ণব-মহাজনের জীবন-কথা-সম্বলিত ইতিহাস-পঞ্জী-জাতীয় গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীতেই প্রচুর পরিমাণে লিখিত হলেও ষোড়শ শতাব্দীর 'বৈষ্ণব বন্দনা', শাখানির্ণয়-জাতীয় গ্রন্থেই এই শ্রেণীর রচনার সূচনা। এই সকল গ্রন্থ প্রথম পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই নাম-পঞ্জীমাত্রের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। কিন্তু, বৈষ্ণবপদকর্তা এবং মহাজনগণের কাল-নির্ণয়ে এ ধরণের রচনা বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর একখানি প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা'।

উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অনুরূপ একাধিক জীবনীগ্রন্থ ও ঘটনা-পঞ্জী রচিত হয়েছে। শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণবাসী মহাপ্রভুর পিতামহ-বংশ-সম্ভূত জগজ্জীবন মিশ্রের 'মনঃসন্তোষিণী' গ্রন্থে চৈতন্য-প্রভুর শ্রীহট্ট-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অনুরূপ একাধিক গ্রন্থের পরিচয় উদ্ধার না করেই এই আলোচনা শেষ করি;—কারণ, চৈতন্যোত্তর জীবনী-সাহিত্যের ক্রমবিকাশে আমাদের উল্লিখিত সাহিত্য-ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা এবং পরিচায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

চৈতন্যোত্তর যুগের অনুবাদ-সাহিত্য

আগেই বলেছি: সমৃদ্ধতর নানা ভাষা থেকে বিচিত্র-নূতন ভাব ও তথ্য সঞ্চয় করে নিজ ভাষার বহন ও সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার প্রতিই রয়েছে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রাথমিক ঝোঁক। আর, ভাষার ক্ষমতা যত বাড়ে, তার মান হয় তত উন্নত। ক্রমে দূর-প্রসারী মৌল ভাব-কল্পনার প্রতি ভাষার আগ্রহ বেড়ে চলে। অনুবাদ-সাহিত্যের এটি পরিণামী পরোক্ষ ফল।

এ বিষয়ে পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, কৃত্তিবাস ও মালাধর বসুর অনূদিত কাব্য-দুটি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়ে সদ্য-বিকাশমান বাংলা ভাষায় এই ফলাকাঙ্ক্ষাকেই মুক্তি দিয়েছিল। সেদিন অভিজাত পৌরাণিক-ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যকে সংস্কৃত ভাষার আবরণ-মুক্ত করে লোকসমাজে পরিব্যাপ্ত করে দেবার প্রয়াসই ছিল প্রবল।

পূর্ব সূত্র

সেই সংগে ছিল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ-মাধ্যমে বাংলার লোক-ভাষা-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করার পরোক্ষ আগ্রহ। ফলে, কৃত্তিবাস মালাধরের অনুবাদ-সাহিত্য ভাবে এবং ভাষায় ছিল একান্ত মূলানুগত। তাই, বলা চলে, সেকালের বাঙালি জন-জীবনের পক্ষে ঐ কাব্য দুখানি ছিল বাংলার তুলনায় বেশি সংস্কৃত; তাদের ভাব ছিল লোক-চেতনার তুলনায় বেশি অভিজাত। ঐটুকু চৈতন্য-পূর্ব বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু, চৈতন্যোত্তর অনুবাদ-সাহিত্যের মূলে রয়েছে নবতর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। এ-যুগের অনুবাদ সাহিত্য ততটা মূলানুগত নয়, যতটা ভাবানুবাদ। আবার, ঐ ভাবানুগত অনুবাদের প্রয়াস সংস্কৃত মূলের চেয়ে সমকালীন বাঙালি-জীবন-স্বভাবের অনুবর্তন করেছে বেশি করে। বলা বাহুল্য, সেই জীবন-স্বভাব ছিল চৈতন্য-যুগচেতনা প্রভাবিত। আর, এ পর্যন্ত আলোচনায় চৈতন্য-চেতনা ও চৈতন্য-

চৈতন্যোত্তর অনুবাদের ভাবমূল্য

সংস্কৃতির মৌল পরিচয় স্পষ্ট হতে পেরেছে বলে মনে করি। প্রাচীনতম কাল থেকে বাংলা দেশের জীবনে প্রবাহিত হয়েছে অভিজাত-অনভিজাত

দুটি ধারা। এদের মধ্যে সহজ সান্নিধ্য থাকলেও পার্থক্য ছিল আমূল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ পদাবলীতে এই দুটি ধারার সমন্বয় বিধানের অস্ফুট শিল্প-প্রয়াস লক্ষ্য করেছি। চৈতন্যদেব সেই পূর্ণায়ত ভাব-বিগ্রহ, যাঁর জীবন-সাধনায় এই দ্বিমুখী বাঙালি জীবন-ধারা একত্র-বদ্ধ হয়ে অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। চৈতন্যোত্তর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য-মাত্রই, তাই, এই অখণ্ড বাঙালি জীবন-ধর্মের প্রোজ্জ্বল শিল্পমূর্তি।

চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব পদাবলীর কবি-কীর্তির মধ্যে দেখেছি, বড়ু চণ্ডীদাস এবং জয়দেব-বিদ্যাপতির রচনায় যথাক্রমে 'লৌকিক' ও 'অভিজাত' চেতনা-সঞ্জাত রাধাকৃষ্ণ-লীলানুভূতির বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবকবি-চেতনায় এই উভয় ধারার রাসায়নিক মিলন-পরিণাম নবীভূত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনাদর্শ রূপে বিকশিত হয়েছে। জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের কাব্য-প্রচেষ্টায় এই শিল্পসাধন-ভাবই লাভ করেছে সার্থক পরিণতি। বলাবাহুল্য, এই রাসায়নিক সম্মিলনের সংযোজনকারী মাধ্যম (Catalyctic Agent) ছিল চৈতন্য-ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব যে ভাব-শক্তির প্রভাবে সমগ্র যুগ-চেতনার আনুপূর্বিক পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিল,—আগেই বলেছি, - তা দেববাদ-নির্ভর মানবতাবোধ। আর, এই বোধের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ চৈতন্য-জীবনী এবং অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনী-গ্রন্থসমূহ। পূর্ববর্তী আলোচনায় এ কথাও বলেছি যে, চৈতন্য-জীবনাগত এই যুগবাণী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও কাব্য-সাধনার সীমায়িত ক্ষেত্রেই বদ্ধ থাকে নি;—উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে নিখিল বাঙালির জীবন-সংস্কৃতিতে অজস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কারণেই চৈতন্যোত্তর-অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যেও এই 'যুগবাণী' সমধিক প্রকট হয়েছে। ফলে, নৈষ্ঠিক 'মূলানুবাদ' ব্যাহত হয়ে,—ব্যক্তি-কল্পনা-সমৃদ্ধ নূতন ভাবানুবাদ-পদ্ধতি উঠেছে গড়ে।

আরো বলেছি, কৃত্তিবাস এবং মালাধর,—চৈতন্যপূর্ব বাংলা সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ অনুবাদ-কবি দুজন, নিজ নিজ আদর্শ সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব ও ভাষাকেই নিষ্ঠার সংগে অনূদিত করেছেন। স্থানে স্থানে বাঙালি-জীবন-পরিবেশের প্রভাব কিছুটা অভিব্যক্ত হয়েও থাকে যদি, তবু তা কেবল প্রাসঙ্গিক ও অপ্রধান। কিন্তু, চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণ-কাব্যে 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'বাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ইত্যাদি বিভিন্ন-বিচিত্র পৌরাণিক রামায়ণ-

কথার নানারূপ সমন্বয়-সংযোগ সাধন করে নূতন ভাবাবেগ-প্রধান কাহিনী-কাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে। রামায়ণ-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,—"রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রী'তে যে ধর্মের বন্ধন,—যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ,—রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। * * * রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই,—সে যুদ্ধ-ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র।"[১] আমাদের ধারণা,—রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বাল্মীকির রামায়ণ সম্বন্ধে তত সত্য নয়, যত সত্য চৈতন্যোত্তর যুগের বাংলা-রামায়ণ সম্বন্ধে; আর এই মন্তব্য-রচনা কালে রবীন্দ্রনাথের বাঙালি চেতনা বাংলা রামায়ণ সম্বন্ধীয় সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বাল্মীকির রামায়ণের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল,—গার্হস্থ্য ধর্ম-মহিমা নয়,—অনার্য-সংস্কৃতির 'পরে আর্য-সংস্কৃতির বিজয়-অভিযানের সার্থক পরিণতি-চিত্রণ। রামচন্দ্র সেখানে বিজয়ী-শক্তির প্রতিভূ। বস্তুতঃ, সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের ভাব-প্রেরণাই যেন সমধিক প্রবল। আবাল্য রামচরিত্র চিত্রণে 'তাডকাবধ,' 'হরধনুভঙ্গ,' পরশুরামের পরাভব' ইত্যাদি প্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডের সচেতন-প্রস্তুতির আভাস অস্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গান্তরে এই বিচার সমর্থন করেছেন। তাছাড়া, প্রাচীন-মহাকাব্যিক 'শূর-নায়ক' হিসেবে যুযুৎসা-ই রাম-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-যে ছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের যে-পরিচয় উদ্ধৃত-অংশে তুলে ধরেছেন,—বিশেষভাবে তা মানবিক মূল্য-বোধসম্পন্ন আধুনিক মনের আবিষ্কার। বাংলা সাহিত্যে এই মানবিক মূল্য-বোধ প্রথম জাগ্রত হয়েছিল আলোচ্য-যুগে চৈতন্য-প্রভাবে। তাই, এই যুগের রামায়ণকাব্যে দেখি, আদর্শ-মানব রূপে কল্পিত রাম চরিত্রে চৈতন্য-চরিত্রের প্রতিচ্ছবি; বাল্মীকি-রামায়ণের 'ধীরোদাত্ত গুণান্বিত' 'শূর-ধর্মী' মহাকাব্যিক-নায়ক রামচন্দ্র চৈতন্যোত্তর বাংলা রামায়ণে করুণাঘন প্রেম-রসময় মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে, রামায়ণ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

চৈতন্যোত্তর অনুবাদ-সাহিত্যে বাঙালি-জীবন-রস-নিবিড়তা;—
(ক) রামায়ণ

১। প্রাচীন সাহিত্য

যে গৃহ-ধর্মের মহিমাময় প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন,—তাও আলোচ্য-যুগের বাংলা রামায়ণ-কাব্যের বিশেষ ঐতিহ্য বলে মনে করি। সত্য বটে, চৈতন্যদেব স্বয়ং সংসার-বিরাগী ছিলেন এবং তাঁর অনুসরণে চৈতন্য শিষ্য-প্রশিষ্যেরা অনেকে একটা বিরাগি-গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই বৈরাগী জীবনেরও একমাত্র সাধ্য ছিল গার্হস্থ্য-প্রেম-মহিমা। ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-সাধকগণ অনুরাগিজনের উপলব্ধি-সর্বস্ব প্রীতি-প্রশান্তি, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের সেবা-পূর্ণ অনুরাগ, সখার প্রতি সখার সমমর্মিতা, সন্তানের প্রতি মাতার অনন্ত বাৎসল্য এবং দয়িতের প্রতি দয়িতার সর্বস্ব-পণ প্রেমের মূল্যকেই নূতন করে আবিষ্কার করেছেন। ফলে, গার্হস্থ্য-প্রেম নূতন মূল্যে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ, বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমে চৈতন্যোত্তর অনুবাদ সাহিত্যে যে বাঙালি ভাব-প্রাধান্যের উল্লেখ করেছি, তারও প্রধান বৈশিষ্ট্য—সমন্বয়বাদী সর্বজনীন প্রেমাশ্রয়ী মানবিক মূল্য-বোধ ও তাঁর পটভূমিকায় গড়ে-ওঠা গার্হস্থ্য-প্রীতি, অনুরক্তি-প্রধান জীবন-রস-তন্ময়তা। চৈতন্যোত্তর বাংলা রামায়ণের গল্প-রস-প্রাধান্য, ঘরোয়া পরিবেশ, এবং প্রেমাত্মক ভাব-সমৃদ্ধির মধ্যে এই জীবন-রস-তন্ময়তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে আছে। সত্য বটে, এই সকল গ্রন্থ-রচনায় বাল্মীকি-রামায়ণ ছাড়া অন্যান্য সংস্কৃত-পৌরাণিক রাম-কাহিনীর প্রভাবও অনস্বীকার্য! কিন্তু তারও চেয়ে বেশি অনস্বীকার্য এই সৃষ্টির পেছনে সদা-সক্রিয় সেই যুগ-মানসের স্বকীয়তা, যা কাহিনীর আহরণ করেছে,—করেছে তাদের সমন্বয়ী গ্রন্থন। সবশেষে মৌলিক কল্পনার সংযোজনে বিচিত্র ও বিভিন্ন উৎস-জাত কাহিনীসমষ্টিকে দান করেছে জীবন-রস-পূর্ণতা। এই যুগ-মানসের সৃষ্টি হিসেবেই আলোচ্য রচনাবলী অনুবাদ-সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করে ক্রমশঃ সৃজনী-সাহিত্য রূপে গড়ে উঠেছে।

এই মন্তব্যের সার্থকতা খুঁজে পাই বিশেষভাবে ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ-কাহিনীর অনুবাদ-পুস্তকের বিচার প্রসঙ্গে। এই শ্রেণীর অনুবাদ-সাহিত্যকে বিশেষভাবে ভাগবতের অনুবাদ নামে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। কিন্তু, লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে,—এই সকল গ্রন্থের কোনটিতেই ভাগবতের অনুবাদ ত' দূরের কথা, বিষয়বস্তু, এমন কি ভাগবতীয় ভাবাদর্শেরও অনুসরণ করা হয় নি। মালাধর-প্রসঙ্গের বর্ণনায় বলেছি, ভাগবতে কৃষ্ণ-কথা রচনার উদ্দেশ্য,—পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মের সর্বায়ব রূপটিকে সম্পূর্ণ প্রস্ফুট করে তোলা।

কৃষ্ণ সেখানে পরম সত্যের প্রতীক।[২] মালাধর বিশেষভাবে সেই কৃষ্ণ-কথারই শৌর্য-মহিমাময় দিক্‌টিকে যথাযথ অনূদিত করেছেন।

(খ) ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ কথা

কিন্তু, চৈতন্যযুগের কৃষ্ণানুরাগ বিশেষভাবে 'ঐশ্বর্য-শিথিলপ্রেম'-বিমুখ ছিল; ভাগবতের ন্যায় শ্রীভগবানের 'সৎ'-অংশের সাধনা এযুগের একেবারেই কাম্য ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের 'আনন্দ'-স্বরূপেরই মুগ্ধ উপাসক। সেই আনন্দ-মহিমার সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ,—পরমা-'বিকৃতি' স্বয়ং রাধা,—যে রাধার উল্লেখও নেই শ্রীমদ্ভাগবতে। অতএব, ভগবতানুবাদ আখ্যায় প্রচলিত চৈতন্যোত্তর যুগের সাহিত্যে বিশেষ-ভাবে প্রকট হয়ে উঠ্‌ল রাধাকৃষ্ণ-প্রেমানুসারী যুগ-সাধনার ভাবানুবাদ। এই ভাবসাধনা সর্বপ্রথম সার্থক শিল্প-রূপ পরিগ্রহ করেছিল দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদি লৌকিক কথা-কাব্যে। চৈতন্যদেব এই লীলারই অভিনয়-রসে তন্ময় হয়েছিলেন। আর, একই কারণে, চৈতন্যানুসারী বাংলার নবভাগবতে পৌরাণিক ভাগবত-কাহিনীর চেয়ে দানলীলা,নৌকালীলাদি বাঙালি জীবন-কল্পনা-জাত কাব্য-কাহিনী সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে।

মহাভারতকাব্য সম্বন্ধেও একই মন্তব্যের পুনরুক্তি করা যেতে পারে। যদিও মহাভারত কাব্যেই পূর্বকথিত যুগ-সত্যের প্রকাশ তুলনায় সর্বাপেক্ষা স্তিমিত বলে মনে হয়। আলোচ্যযুগের বাংলা অনুবাদ-কাব্যগুলি বিশেষভাবে কৃষ্ণ-কথারূপেই পরিকল্পিত হয়েছিল যে, তা বলাই বাহুল্য। আর সেইজন্যই বাংলা মহাভারতসমূহও বিশেষভাবে কৃষ্ণ-কথা, পাণ্ডববংশের ইতিহাসই নয় কেবল।

(গ) মহাভারত কাব্য প্রবাহ

কিন্তু সংস্কৃত ব্যাস-মহাভারত তা নয়। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—"তিনি (কৃষ্ণ) পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সংগে থাকিয়া যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে ও থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য দুই একটি কথা আছে মাত্র; তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও ঐরূপ কথা আছে।[৩]" বলাবাহুল্য, পাণ্ডব-সখা এবং পাণ্ডব-সহায় মহাভারতীয় কৃষ্ণের প্রধান পরিচয়. তিনি পার্থ-সারথি,—পাঞ্চজন্য-ধারী। এ-অংশ কৃষ্ণ-চরিত্রের বৃন্দাবন-লীলাংশের বিপরীত;—হরিবংশ, ভাগবতাদি পুরাণে

২। দ্রষ্টব্য—'সত্যং পরং ধীমহি' ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ শ্লোক। ৩। 'কৃষ্ণচরিত্র'।

বৃন্দাবন-লীলাকথা চিত্রিত হয়েছে।—মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রের সংগে এই অংশের যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় করা এতই দুরূহ যে, বঙ্কিমচন্দ্র বৃন্দাবন-লীলাংশের ঐতিহাসিকতা স্বীকারেও কুণ্ঠিত হয়েছেন। বঙ্কিম-মতবাদের ঔচিত্য-বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বক্তব্য, কৃষ্ণ-চরিত্রের এই পরস্পর-বিরোধী দুটি দিক্ বাংলা মহাভারতে অপূর্ব সমন্বয়ে বিধৃত হয়েছে। ফলে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-প্রাঙ্গণস্থ গীতামৃত-দোগ্ধা পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণের হাতের 'পাঞ্চজন্য' টেনে নিয়ে পরিবর্তে বাঁশিটি তুলে দিলে রস-চেতনা কোথাও আহত হয় না।—বরং, পাঞ্চজন্য-বাদন ও পার্থ-সারথ্যের চেয়ে বংশীবাদনের দিকেই যেন এ'কৃষ্ণের প্রবণতা সমধিক।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে চৈতন্য-ঐতিহ্যের দান

চৈতন্যোত্তর বাংলা অনুবাদসাহিত্যে এইটুকুই চৈতন্য-ঐতিহ্যের সার্থক দান। এখানে বীর-গাথার নায়কের শূরত্ব ঘুচিয়ে তাকে প্রেমিক করে তোলা হয়েছে,—পৌরাণিক রাম-কৃষ্ণকে চৈতন্য-জীবনাদর্শ প্রভাবে মানব রাম-কৃষ্ণে পরিণত করা হয়েছে। শূর-ধর্মী কাব্যকে করা হয়েছে গৃহ-ধর্মী,—মহাকাব্যকে রূপায়িত করা হয়েছে আবেগ-প্রধান গল্প সমৃদ্ধ গীতিকাব্যে।

চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণকাব্য

অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁর 'বাঙালা সাহিত্য' ২য়খণ্ডে রামায়ণ-কাব্যের ৫১ জন কবির পরিচয় উদ্ধার করে লিখেছেন,—"এখনও রামায়ণ-রচয়িতা অনেক কবির পরিচয় আমরা পাই নাই।" বস্তুতঃ, চৈতন্যোত্তর বাংলা দেশে রামায়ণ-রচয়িতা কবির সংখ্যা-নির্দেশ অসম্ভব,—এঁরা সংখ্যাতীত। অভিজাত আর্য-ঐতিহ্যের 'আদিকবি' বাল্মীকির লেখনী-নিঃসৃত সংস্কৃতকাব্য চৈতন্যোত্তর বাঙালি সংস্কৃতির হাতে নব-রূপ লাভ করে বাংলার সার্থক গণ-শিল্পের মহিমা লাভ করেছে। ফলে, ষোল-সতেরো শতকের সর্বজনীন সাহিত্যেই নয়,—আঠার-উনিশ এমন কি বিশ শতকে সমাজ-বিপ্লবের কল্পনাতীত দ্রুতগতির মধ্যেও বাংলার লৌকিক রস-চেতনার সংগে রামায়ণ-কাহিনী অঙ্গাঙ্গি জড়িত হয়ে আছে। রামায়ণ ও নিখিল বাঙালির রস-চেতনার ইতিহাসকে পৃথক্ করে দেখ্‌বার উপায় আজও নেই। তাই, আমরা সে চেষ্টা পরিহার করব। কিন্তু চৈতন্যোত্তর রামায়ণসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে

দুটি কথা প্রথমেই স্মরণ করে রাখা উচিত। (১) সংস্কৃত রামায়ণ-সাহিত্য সর্বপ্রথম এই যুগেই আপামর বাঙালিজাতির জীবন-কাব্য হয়ে উঠেছিল (২) আর, যুগোচিত ভাবাধিবাসনের ফলে দৃঢ়বদ্ধ মহাকাব্যিক শিল্পকলা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে অজস্র কাহিনীতে ভেঙে পড়েছে। আঙ্গিক-সচেতন সমালোচকেরা বলেন,—লেখন-শিল্প বিকাশের প্রাথমিক অভিব্যক্তি-রূপ মহাকাব্যে কাহিনী-ধর্ম এবং নাট্য-ধর্ম একত্র-সংবদ্ধ হয়েছিল। কাহিনীধর্মের বৈশিষ্ট্য,—বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, নাট্যধর্মের বৈশিষ্ট্য, কর্মদ্রুতি এবং সংহতি। বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনীর অতিব্যাপ্তির মধ্যে এই কর্মদ্রুতি এবং সংহতি দৃঢ়পিনদ্ধ হয়েছিল। কাহিনীর বৈচিত্র্যের মধ্যেও উদ্দেশ্যের সামগ্রিকতাবোধ ছিল তীব্র। কিন্তু, বাংলা সাহিত্যের আলোচ্য যুগের রামায়ণে আবেগাতিশয্য সক্রিয়তাকে মন্দীভূত ও সংহতিকে শিথিল করেছে। তাই, এ যুগের কবিকুল শূরধর্মী কাব্যের সংহতি-তীব্রতার চেয়ে গার্হস্থ্যধর্মী স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ বিচিত্র কাহিনীর রস-সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এই পর্যায়ে এসে বাংলার লেখ্য সাহিত্যে গাল্পিকতার প্রথম প্রামাণ্য উদ্ভব। কেবল অনুবাদ সাহিত্যেই নয়,—এ-যুগের মঙ্গলসাহিত্যেও গল্প-প্রিয়তার পরিচয় সুস্পষ্ট। যুগ-প্রভাবিত গল্প-প্রবণতার ফলেই দেখি, এ যুগের বাংলাদেশে সম্পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচনার তুলনায় লক্ষ্মণদিগ্বিজয়, শত্রুঘ্নদিগ্বিজয়, অঙ্গদ-রায়বার প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক খণ্ড-কাহিনীকে নিয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্যরচনার চেষ্টা প্রবলতর হয়েছে। জীবনের একটি মুহূর্তের খণ্ড অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি বা আবেগপূর্ণ কাহিনীকে পূর্ণতার মর্যাদা দান করে সার্থক ছোটগল্প রচনার বৈশিষ্ট্য আজ আবেগধর্মী বাঙালির কথা-সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম বলে স্বীকৃত হয়েছে। তার প্রথম সার্থক ইঙ্গিত ইতিহাসের এই পর্যায়েই উদ্ভূত হয়েছে কিনা, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সে জিজ্ঞাসারও উত্তর খুঁজে ফিরবে।

রামায়ণ-সাহিত্যের স্মরণযোগ্য দু'টিকথা

এবারে তথ্য-পরিচায়ন উপলক্ষ্যে প্রথমেই বলি,—চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণ-সাহিত্যের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে। কৃত্তিবাস-ভণিতায় প্রচলিত আধুনিক মুদ্রিত বাংলা রামায়ণসমূহের পেছনে অদ্ভুতাচার্যের কাহিনী ও কাব্যের প্রভাব সমধিক। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ সম্বন্ধে আজও কোন

উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নি ; কবির রচিত গ্রন্থের একখানি আদর্শ সংস্করণও আজ পর্যন্ত সম্পাদিত হয় নি। তা হলেও, নানা সূত্রে পাওয়া পুঁথির পাঠ মিলিয়ে নিম্নরূপ কবি-পরিচিতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আত্রেয়ীর উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিমে সোণাবাজু পরগণার বড়বাড়ি বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে কবি অদ্ভুতাচার্য জন্মগ্রহণ করেন।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ, কবি-পরিচয়।

তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল নিত্যানন্দ আচার্য। শ্রীনিবাস আচার্য (মতান্তরে কাশী আচার্য,) কবির পিতা ছিলেন, মাতা মেনকা দেবী। নিত্যানন্দের সাত বছর বয়সে স্বয়ং রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ে তাঁকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ দেন ও হস্তস্থিত শরাগ্রে জিহ্বায় মহামন্ত্র লিখে দেন। এই মহাশক্তির প্রভাবে নিত্যানন্দ অত্যন্ত অল্প বয়সে সমগ্র মহাকাব্য রচনা করে সমাপ্ত করেন এবং এই অদ্ভুত কৃতির জন্য তাঁর নূতন খ্যাতি হয় 'অদ্ভুতাচার্য'। ডঃ সুকুমার সেন কিন্তু এই শেষোক্ত কিংবদন্তীর যাথার্থ্য স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, "অদ্ভুতাচার্য কবির নামও নয় উপাধিও নয়'।[৪]" নিত্যানন্দ বিশেষ ভাবে সংস্কৃত অদ্ভুতরামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন ; বাংলাদেশে 'অদ্ভুত-রামায়ণ' 'আশ্চর্যরামায়ণ' নামেও হয়ত পরিচিত হয়েছিল। এই দুই নামের সংমিশ্রণে নিত্যানন্দের কাব্য 'অদ্ভুতাশ্চর্য' রামায়ণ নামে পরিচিত হতে থাকে। 'অদ্ভুতাচার্য' এই 'অদ্ভুতাশ্চর্য' শব্দেরই রূপ-বিবর্তন। ডঃ সেনের এই সিদ্ধান্তও কিংবদন্তীর মতই অনুমান-নির্ভর যে, তা বলাই বাহুল্য।

কবি নিত্যানন্দের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। ডঃ ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী অদ্ভুতাচার্যকে আকবরের সমসাময়িক ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন[৫]। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন,— "সাঁতোলির রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য। সুতরাং, কবির জীবৎকাল সপ্তদশ শতকের শেষ[৬]।" অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে, কবি-ভ্রাতা দেবানন্দের প্রপৌত্রী শর্বাণীর স্বামী ছিলেন রাজা রামকৃষ্ণ। আবার ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাণী শর্বাণী অন্ধ হওয়ায় রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র কর্তৃক রাজ্যভার গ্রহণের দলিলের কথাও অধ্যাপক বসু উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিন পুরুষে এক শতাব্দী

কাল-পরিচয়

৪। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)। ৫। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (আদিকাণ্ড) ভূমিকা। ৬। বাঙালাসাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।

হিসাব করে তিনি অনুমান করেছেন, কবি নিত্যানন্দ "ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন[৭]।"

অদ্ভুতাচার্যের কাল-পরিচয় সন্দেহাচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও, তাঁর কাব্য কালজয়ী মহিমা অর্জন করেছে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু অংশ যে অদ্ভুতাচার্যের রচনাদর্শে প্রভাবিত, সে কথা পূর্বে বলেছি। আদিকবি কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ-রচনার ঐতিহ্য যে-কোন কারণেই হোক্, জাতির সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। ফলে, দেশের জল-হাওয়া-মাটির মতই

কাব্যপরিচয়

কৃত্তিবাসীকাব্য পরিপার্শ্ব-স্থিত জীবন-রসকে আহরণ করে আত্মস্থ করেছিল। কৃত্তিবাসী কাব্যের এই স্বকীয়-করণ পদ্ধতির ফলে একদিকে যেমন কৃত্তিবাসের মূল রচনা ক্রমেই আত্মগোপন করেছে, অন্যদিকে তেমনি বহু পরবর্তী কবির রচনা মূল স্রষ্টার সংযোগ-বিবর্জিত হয়ে কৃত্তিবাসী কাব্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেছে। কৃত্তিবাসী-কাব্যে এ-ধরণের সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত কবি-কৃতি অদ্ভুতাচার্য-রচিত। কৃত্তিবাসের রচনা বিশেষভাবে বাল্মীকি-রামায়ণ-নির্ভর বলে ইতঃপূর্বে অনুমিত হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুতাচার্য সংস্কৃত 'অদ্ভুতরামায়ণ', 'অধ্যাত্মরামায়ণ', 'রঘুবংশ' ইত্যাদি বিভিন্ন-বিচিত্র রাম-কাহিনী থেকে যথেচ্ছ উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অদ্ভুতাচার্যের কবি-প্রতিভা কেবল 'বিচিত্রে'র সংগ্রাহক-মাত্র ছিল না। সমুচ্ছ্বসিত কল্পনা ও স্বকীয়তার সপ্তবর্ণী আলোক-স্পর্শে তিনি নিজ কাব্যকে সংস্কৃত কাব্যের সংগ্রহ-মাত্রের সীমা-অতিক্রম করে বাঙালির সজীব জীবন-গাথায় পরিণত করেছেন। একদিকে যেমন তিনি পূর্বসূরিগণের রচনা থেকে বাঙালির জীবনাকাঙ্ক্ষার অনুরূপ গল্পের পর গল্প আহরণ করেছেন, অন্য দিকে নিজ কল্পনা-প্রভাবে নিত্যনূতন গল্প-রচনাও করেছেন নিজে। ফলে, তাঁর অনূদিত গল্পাবলীও স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত দেই,—সংস্কৃত-রামায়ণকাব্যের অনুসরণে কৃত্তিবাস সুমিত্রা-বিবাহের বর্ণনা করেছেন। পূর্ব-বিবাহিতা শ্রেষ্ঠা-মহিষী-দ্বয় কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর নিকট মৃগয়ার ছল করে রাজা দশরথ সুমিত্রা-বিবাহে চলে যান। পরে বিবাহের যথার্থ সংবাদ জান্‌তে পেরে কৌশল্যা-কৈকেয়ী—

৭। বাঙালাসাহিত্য—২য় খণ্ড।

"নিরবধি পূজে দোঁহে পার্বতী-শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হোক্ মাগে এই বর॥"

কৌশল্যা-কৈকেয়ীর এই আচরণ অনুদার হলেও নিঃসংশয়ে সপত্নী-জন-সমুচিত স্বাভাবিকতা-মণ্ডিত। অনুরূপ স্বাভাবিক মনোবৃত্তির বশেই কৌশল্যা-কৈকেয়ী সুমিত্রাকে চরুর ভাগ দেবার সময়ে প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন,—চরুভাগ-জাতব্য সুমিত্রার সন্তান তাঁদের অনাগত সন্তানদের করবে দাসত্ব।

অদ্ভুতাচার্য কিন্তু কৌশল্যাকে এক নবতর রূপে চিত্রিত করেছেন। বাঙালির ভাবপ্রবণ স্বভাবের মধ্যে যে অতিলৌকিক মাতৃ-মহিমাবোধ সদা-অনুস্যূত হয়ে আছে, তার সংগে হয়ত যুক্ত হয়েছিল মা-যশোদার ভাবাদর্শের প্রভাবটি। তাই, এযুগের রামচন্দ্র যেমন কানু-কল্পনাদ্বারা প্রভাবিত, তেম্‌নি রাম-জননী কৌশল্যা হয়েছিলেন কানু-জননী যশোদার ঢল-ঢল স্নেহ-সুধা সম্পৃক্ত। অদ্ভুতাচার্য কৌশল্যার মধ্যে এই অকারণ-স্নেহাতুর জননী-মূর্তিই অঙ্কিত করেছেন বর্ণ-সুষমা-সমুচ্ছল-রূপে। নব-বধূ দুর্ভগা সুমিত্রা দেহে-মনে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ লজ্জা বহন করে কৌতূহলী জনতার উপেক্ষিত দৃষ্টির সম্মুখে যখন আড়ষ্ট হয়েছিলেন, তখনই জননী-কৌশল্যা বাঙালি-মাতার অসহায়-মোক্ষণ স্নেহদৃষ্টির সংগে তাকে বরণ করে আন্‌লেন লোক-লজ্জার অতীত বাৎসল্য-মধুর অন্তঃপুরে। স্বামি-কর্তৃক সুমিত্রার নিগ্রহে ব্যথিত-চিত্তা কৌশল্যা প্রতিজ্ঞা করলেন,—

অদ্ভুতাচার্যের সৃষ্ট চরিত্রবৈশিষ্ট্য ; কৌশল্যা

"যদি রাজা নিতে পারি সুমিত্রার স্থান।
তবে সে দেখিব আমি স্বামীর বদন॥
যদি রাজা নাহি শুনে আমার বচন।
ইহ জন্মে স্বামী সঙ্গে নৈব দরশন॥"

সতী নারীর পক্ষে এই আত্মত্যাগের মহিমা বর্ণনাতীত। কেবল নিরুপায়ের প্রতি অকারণ-বাৎসল্য-বশেই রাণী কৌশল্যা অত বড় ত্যাগ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বরণ করেছিলেন। অবশ্য, তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সমর্থও হয়েছিলেন। সেই পরম-মুহূর্তে জননী-কৌশল্যাকে কবি বাঙালিনী কৌশল্যার নবরূপ দান করেছেন। সুমিত্রার প্রতি স্বামি-চিত্তের অনুকূলতা-সম্পাদন করে

কৌশল্যা সুমিত্রাকে নিজ হাতে সাজিয়ে স্বামি-সম্মিলনে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন নি,—বাঙালি নারীর কৌতুক ও কৌতূহল-বশে সপত্নীর বাসর ঘরে চুপি দিতেও গিয়েছিলেন। এম্‌নি ছিলেন বাঙালির কবি অদ্ভুতাচার্য! বাঙালি চেতনার সার্বিক আদর্শ-মহিমাঙ্কনে এবং বাঙালি জীবনের চাপল্য-তরল সাধারণ মুহূর্তের চিত্রণে সমপরিমাণে তাঁর লেখনী ছিল মুক্ত-পক্ষ,—সিদ্ধ হস্ত!

রামায়ণ কাহিনীর আর একটি রূপান্তর,—'শতস্কন্ধ রাবণবধ' নামক কাব্যের পুথিও অদ্ভুতাচার্যের ভণিতায় পাওয়া গেছে।

অদ্ভুতাচার্য ছাড়া আরো যে সকল কবির রচিত রামায়ণ কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে কৈলাস বসু সংস্কৃত অদ্ভুতরামায়ণের মূলানুগত হুবহু অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। কাব্য-রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে, একই কবির ভণিতায় প্রাপ্ত মহাভাগবত পুরাণের রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ স্বীকার করে নিয়ে অধ্যাপক ৺মণীন্দ্র মোহন বসু অনুমান করেন,—কাব্যখানি হয়ত "ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত" হয়েছিল।[৮]

কৈলাস বসু

আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষ অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথমে মৈমনসিংহের মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচিত হয়েছিল। এই চন্দ্রাবতী একাধারে মৈমনসিংহের জনপ্রিয় কবি-দুহিতা, বিখ্যাত কবি এবং সু-প্রচলিত লোক-কাব্যের নায়িকা। মৈমনসিংহবাসী মনসামঙ্গলের বিখ্যাত কবি দ্বিজবংশীদাস ছিলেন চন্দ্রাবতীর পিতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মৈমনসিংহ গীতিকার একটি কাব্য-কাহিনীতে চন্দ্রাবতীর জীবনকথা উদ্ধৃত হয়েছে। চন্দ্রাবতী বাল্যের ক্রীড়া-সহচর ব্রাহ্মণ-কুমার জয়ানন্দের প্রতি পরিণত-যৌবনে প্রণয়াসক্তা হন;—প্রথম পরিণয়াকাঙ্ক্ষা অবশ্য জয়ানন্দের পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। উভয়পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে যথারীতি বিবাহের ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু, শেষমুহূর্তে জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমমুগ্ধ হন, এবং ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার পাণি-গ্রহণ করেন। ব্যর্থ-প্রণয়ের পরিণামে চন্দ্রাবতী আজীবন কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন করেন। অন্যদিকে, জয়ানন্দের রূপ-মোহ কালে কালে প্রশমিত হয়। অনুতপ্ত-চিত্ত জয়ানন্দ

মহিলাকবি চন্দ্রাবতী

৮। বাঙালা সাহিত্য (২য় খণ্ড)

তখন চন্দ্রাবতীর দর্শন-কামনায় অধীর হয়ে ওঠেন। কিন্তু চন্দ্রাবতীর বিক্ষুব্ধ নারীচিত্তের কঠিন বহিরাবরণে আহত হয়ে তাঁর সকল আর্তি ব্যর্থ হয়। সমাধি-মগ্না চন্দ্রাবতী কর্তৃক রুদ্ধ-দ্বার রুদ্রমন্দিরের বাইরে থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে জয়ানন্দ নদীগর্ভে প্রাণসমর্পণ করেন, চন্দ্রাবতী করেন শিবারাধনায় দেহত্যাগ। জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতীর জীবনের এই বেদনা-বিধুর প্রেম-গাথা জনপ্রিয় কবিতার আকারে আজও পূর্ববঙ্গের বহু স্থলে লোক-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে থাকে।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কোন পুথি পাওয়া যায় নি। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পুথিসংগ্রাহক এবং ডঃ দীনেশচন্দ্রের সহায়ক চন্দ্রনাথ দে মৈমনসিংহের মহিলাকণ্ঠ থেকে চন্দ্রাবতীর রামায়ণকাব্য সংকলন করেন। কাব্যখানির ভাষা আধুনিক; বিষয়বস্তুতেও আধুনিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে সীতা-সরমা সংবাদের অনুকরণ প্রচেষ্টায়। তাহলেও কাহিনীবর্ণনায় নারীসুলভ কোমলতাবোধ এবং বাগ্‌বিন্যাসের পরিচয় খুব দুর্লক্ষ্য নয়। অবশ্য, তার কতটুকু মূল গ্রন্থ-কর্ত্রীর রচনা-প্রভাবিত, কতটুকু-বা দীর্ঘকাল মহিলাসমাজে প্রচলনের ফল, আজ আর তা নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই।

কাব্য-পরিচয়

বৈদ্য ('ভিষক্‌') রামশঙ্কর দত্তের রামায়ণ রচিত হয় সপ্তদশ শতকের শেষে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে। কবির বাসস্থান ছিল মাণিকগঞ্জের খোলাপাড়া-সন্নিহিত বায়রাগ্রামে। রামশঙ্কর কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের সমন্বয়ে কাব্য রচনা করেন। অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু আলোচ্য কাব্যখানিতে অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব-নির্দেশ করেছেন।

ভিষক্‌ রামশঙ্কর দত্ত

'গুণরাজখান' আদ্যন্ত ভণিতা-যুক্ত একখানি রামায়ণ কাব্যের খণ্ডিত পুথি পাওয়া যায়। ইনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা গুণরাজখাঁ—মালাধর বসু থেকে পৃথক ব্যক্তি।

গুণরাজ খাঁ

ভবানীদাস বিরচিত লক্ষ্মণদিগ্বিজয়, শত্রুঘ্নদিগ্বিজয়, রামের স্বর্গারোহণ ইত্যাদি বিভিন্ন পালার একাধিক গ্রন্থ পাওয়া গেছে। রামের অশ্বমেধযজ্ঞ উপলক্ষ্যে অশ্বরক্ষী লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের বিজয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যথাক্রমে লক্ষ্মণ এবং

ভবানী দাস-রচিত খণ্ড কাব্য সমূহ

শত্রুঘ্নদিগ্বিজয়ে। কিন্তু, ঐ সব দিগ্বিজয়-কাব্যে কেবল যুদ্ধ-কাহিনী প্রধান নয়,—বিচিত্র অবকাশে যত্র-তত্র ছড়িয়ে আছে সুখ-দুঃখ, প্রেম-মিলন-বিরহপূর্ণ অজস্র গার্হস্থ্য-ধর্মী কাহিনী। ভবানীদাসের রচিত কাব্য-সমষ্টিতেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। কবির পিতার নাম ছিল যাদবানন্দ, মাতা ছিলেন,—যশোদা। বাসস্থান পাতুণ্ডা গ্রাম। ভবানীদাসের ভণিতাযুক্ত কাব্যের পুথি মালদহ, এমন কি সুদূর শ্রীহট্ট অঞ্চল থেকেও আবিষ্কৃত হয়েছে।—কবির জনপ্রিয়তার নিঃসংশয় প্রমাণ এর থেকেই পাই।

দ্বিজ লক্ষ্মণ

দ্বিজলক্ষ্মণের রচিত অধ্যাত্মরামায়ণ আদিকাণ্ড, শিবরামের যুদ্ধ ও অন্যান্য পালার পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি ছিলেন বন্দ্য-ঘটি ব্রাহ্মণ। এঁর লেখা ভারতপাঁচালীর বিভিন্ন খণ্ডের পুথিও পাওয়া গেছে।

'রায়বার' কাব্যসমূহ

এই সময়ে রচিত বিভিন্ন 'রায়বার' কাহিনী-সম্বলিত কাব্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়। 'রায়বার' কাব্যসমূহের মধ্যে আবার লঙ্কাকাণ্ডস্থ 'অঙ্গদরায়বার'-ই সমধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। 'রায়বার' শব্দটি 'রাজদ্বার' শব্দের রূপ-বিবর্তন-জাত। রাবণের রাজদ্বারে উপস্থিত হয়ে অঙ্গদ তাকে যে ভর্ৎসনাদি করেছিল, তারই কৌতুকপূর্ণ, হাস্যরসাত্মক বর্ণনায় পরিপূর্ণ 'অঙ্গদরায়বার' কাব্যসমূহ। বিশেষভাবে হাস্যরস সৃষ্টিই ছিল 'রায়বার' কাব্যসমূহের উদ্দেশ্য। এই ধরণের সরসতার মধ্যে আদি-রসাত্মক রুচি বিকার ও ভাঁড়ামিই সব নয়। গ্রাম্য কবি-রচিত pun-সৃষ্টির সরসতার সংগে 'wit'-এর দীপ্তিও স্থানে স্থানে সমুজ্জ্বল হয়েছে। কতকগুলি 'রায়বার' কাব্যে হিন্দী এবং বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়;—কতকগুলি অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় রচিত। 'রায়বার' কাহিনীর কবিগণের মধ্যে ফকিররাম, কাশীনাথ, দ্বিজতুলসী প্রভৃতি প্রধান।

'কবিচন্দ্র' শঙ্কর চক্রবর্তী

'কবিচন্দ্র' শঙ্কর চক্রবর্তী রামায়ণ কাব্যের অন্যতম বিখ্যাত কবি। রামায়ণ কাব্য ছাড়াও ইনি শিবায়ন, ভাগবতামৃত, মহাভারত, মনসামঙ্গল ইত্যাদি আরো বহুকাব্য রচনা করেন। কবির পিতার নাম ছিল মুনিরাম চক্রবর্তী, বাসস্থান মল্লভূমির নিকট। ইনি একাধিক মল্লরাজের প্রসাদ লাভ করেছিলেন। বাজার-প্রচলিত রামায়ণে 'অঙ্গদ-রায়বার', 'তরণীসেনবধ' ইত্যাদি অংশে কবির সরস রচনার প্রভাব সুস্পষ্ট।

দ্বিজ ভবানীনাথ অধ্যাত্মরামায়ণ অবলম্বনে কাব্যরচনা করেন। রাজা জয়চন্দ্রের আদেশে ভবানীনাথের কাব্য রচিত হয়। গ্রন্থ-রচনা-কালে কবি প্রত্যহ রাজার নিকট থেকে 'দশমুদ্রা' করে পারিশ্রমিক লাভ করতেন।

'দ্বিজ ভবানীনাথ'

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে 'বুদ্ধাবতার' রামানন্দ ঘোষ তাঁর রামায়ণকাব্য রচনা করেন। গ্রন্থখানির উল্লেখ্য কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই বললেই চলে; কিন্তু, ভূমিকাংশে কবির আত্মবিবরণী কৌতুকপ্রদ। কবি নিজেকে 'বুদ্ধাবতার' বলে প্রচার করেছেন।—ম্লেচ্ছাচারের আধিক্য থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য কালীর শাপে 'বুদ্ধদেব' নাকি স্বয়ং রামানন্দ ঘোষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থাংশে কবির ব্যক্তি-পরিচয় প্রায় কিছুই নেই। কোথাও কবি নিজেকে 'দ্বিজ-অংশ'-সম্ভূত, কোথাও বা আবার শূদ্রকুল-জাত বলে অভিহিত করেছেন। কবির বিশ্বাস অনুযায়ী দারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথদেব এবং রামচন্দ্র উভয়ে এক-ও-অভিন্ন; এবং উভয়েই বুদ্ধদেবের রূপান্তর।

'বুদ্ধাবতার' রামানন্দ ঘোষ

রামানন্দ যতি নামক অপর এক ব্যক্তির রামায়ণকাব্যের পুথি পাওয়া গেছে। 'রামানন্দ ঘোষ' এবং 'রামানন্দ যতি' একই ব্যক্তি কি না, বলা যায় না।

রামানন্দযতি

বন্দ্যঘটীয় কবি জগদ্রাম রায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় একটি সুবৃহৎ 'অষ্টকাণ্ড' রামায়ণ রচনা করেন। প্রচলিত রামায়ণের সাতকাণ্ড ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে একটি পুষ্করকাণ্ড যুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থ খানিতে 'কাণ্ড' আটটি হলেও 'খণ্ড' নয়টি,—আদি-কাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, সুন্দরা-কাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, পুষ্করকাণ্ড, রামরাস এবং উত্তরাকাণ্ড। এই বিষয়-সূচীতে, বিশেষ করে নব-সংযোজিত খণ্ড দুটিতে পৌরাণিক ঐতিহ্যাগত কাহিনীর সাহায্যে নূতন বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষ্য করবার মত। বস্তুতঃ, পূর্ববর্তী শতাব্দী থেকেই এই বৈশিষ্ট্য বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে।

জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ রায়

আলোচ্য কাব্যের কবি-যুগ্ম পিতা-পুত্রের বাস-ভূমি ছিল রাণীগঞ্জের নিকটে দামোদরের পরপারে ভুলুই গ্রামে। পঞ্চকোট-রাজ রঘুনাথের রাজত্ব-কালে জগদ্রামের অগ্রজ জিতরামের আদেশে কাব্যখানি সূচিত হয়। জগদ্রাম

প্রথমে আনুপূর্বিক গ্রন্থখানি রচনা করে লঙ্কাকাণ্ড এবং উত্তরাকাণ্ডের বিস্তার সাধনের জন্য পুত্রকে নির্দেশ দেন। রামপ্রসাদের এই বিস্তৃতি-করণ-সমাপ্তির তারিখ বোধ হয় ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ। ইতঃপূর্বেই ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রামের দুর্গোৎসব অবলম্বনে এই পিতাপুত্র 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'-কাব্য রচনা করেছিলেন। এঁদের দুজনের রচনাই ছিল রস-সমৃদ্ধ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য রামায়ণ-কবিদের পরিচয় আর উদ্ধার করব না। ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন গোস্বামী। তাঁর গ্রন্থের নাম 'রামরসায়ন'। 'রামরসায়ন' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একখানি বহু বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কবি রঘুনন্দন ছিলেন নিত্যানন্দ-বংশ-সম্ভূত। তাঁর বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার মাড়গ্রামে। গ্রন্থের শেষাংশে প্রাপ্ত কবি-পরিচিতি থেকে জানা যায়,—ভক্ত-পণ্ডিত কিশোরীমোহন ছিলেন কবির পিতা, তাঁর মাতার নাম ছিল ঊষা। মধুমতী নামে কবির এক বিমাতাও ছিলেন। তাছাড়া, প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে কবি মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত, তথা নিজের গুরু বংশীমোহনের উদ্দেশে ভক্তি-নিবেদন করেছেন।

রঘুনন্দনের রাম-রসায়ন

রামরসায়ন সুবৃহৎ গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী কবিদের রচনার কোন কাহিনীই কবি নিজ কাব্যে বর্ণনা না করে ছাড়েন নি। কাব্যখানি সাতকাণ্ডে বিভক্ত প্রতিটি কাণ্ড আবার বহু পরিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন। রামরসায়নের উত্তরা-কাণ্ডটি বস্তুতঃ নূতন সৃষ্টি:—গতানুগতিক সীতার পাতাল-প্রবেশ এই অংশে বর্ণিতই হয় নি। বিভিন্ন পুরাণ-কাহিনীর অবলম্বনে বৈচিত্র্য এবং চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা এই কাব্যে সর্বত্র প্রস্ফুট। ভাষা এবং ছন্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও রঘুনন্দন কুশলী কলাবেত্তার পরিচয় দিয়েছেন। রামরসায়ন বাংলা ভাষার বৃহত্তম কাব্যগুলির একটি;—অথচ এই বৃহৎগ্রন্থের প্রতিটি ছত্র সুগঠিত,—সুলিখিত। বস্তুতঃ, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাংলা অনুবাদ কাব্যে বাঙালি জীবনানুসরণের চেয়ে ভাব-ভাষা-ছন্দে-কাহিনীতে সংস্কৃত পুরাণ অনুসরণের যে প্রবণতা ক্রমেই স্ফুটতর হয়ে উঠছিল তারই অত্যুৎকৃষ্ট বিকাশ 'রামরসায়ন'। শিল্পের আন্তরিকতা অপেক্ষা 'আকারে' এবং 'প্রকারে' পাণ্ডিত্যের বৈদগ্ধ্যই রামরসায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থপরিচয়

রামরসায়ন ছাড়াও রঘুনন্দন রাধামাধবোদয় এবং গীতমালা নামে দুখানি বাংলা কাব্য রচনা করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ-রচয়িতা কবিদের মধ্যে আর কারো কবি-কৃতি বিশেষ উল্লেখ্য নয়; কেবল ঐতিহাসিক কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য আরো দু-একটি কবি-পরিচিতি উদ্ধার করা যেতে পারে।

কুচবিহার-রাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ-রচয়িতাগণের অন্যতম। কুচবিহার-রাজসভার নির্দেশে রচিত যে নয়খানি রামায়ণ কাব্য কিংবা খণ্ড-কাব্যের উল্লেখ ডঃ সুকুমার সেন করেছেন[৯], তার মধ্যে হরেন্দ্রনারায়ণের নির্দেশে রচিত সুন্দরাকাণ্ডের উল্লেখও আছে। কিন্তু স্বয়ং রাজা কর্তৃক রচিত রামায়ণখানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,—এর প্রতিটি কাণ্ডে মূল সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। রামায়ণ কাব্য ছাড়া রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ক্রিয়াযোগসাগর, বৃহদ্ধর্মপুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের-ও অনুবাদ করেন।

হরেন্দ্রনারায়ণ

রাজকৃষ্ণ রায়

রাজকৃষ্ণরায় আরো প্রায় ৩০ বৎসর পরে রামায়ণ-কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়াস পান।

এই শতাব্দীর রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের নামোল্লেখও করেছেন[১০]। গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ-রচনায় বৃত হন; কিন্তু ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখকের দেহান্তকালের পূর্বে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হতে পারে নি—গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত মূলের আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছিল।

ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এ পর্যন্ত বিচারে চৈতন্যোত্তর বাংলা রামায়ণ-সাহিত্যের তথ্য-পরিচায়ন অসম্পূর্ণ রয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আলোচনা থেকেই প্রাসঙ্গিক যুগের রামায়ণ-সাহিত্যের সাধারণ সামাজিক, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় স্পষ্ট হতে পেরেছে। অদ্ভুতাচার্যের কবি-প্রতিভার বিচার কালে উল্লেখ করেছি,—কাহিনী-বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টায় বিভিন্ন সংস্কৃত রাম-কথা এবং পুরাণাবলী থেকে অজস্র উপাদান আহৃত হলেও, কাহিনীর উপস্থাপন, ভাষার গ্রন্থন, অথবা বাগ্‌ধারার

ঐতিহাসিক পথ-নির্দেশ

৯। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড (২য় সং)। ১০। বাঙালা সাহিত্য—২য় খণ্ড।

বিন্যাস,—সর্বত্রই বাঙালিত্বের ছাপ স্পষ্ট এবং তীব্র। পুরাণ-কথা এক্ষেত্রে পৌরাণিক ঐতিহ্য-বিবর্জিত হয়ে বাঙালি গণ-জীবন-মর্যাদায় বিভূষিত হয়েছিল নূতন ভাবে। বারে বারে বলেছি, এই জীবন-ঐতিহ্য ছিল চৈতন্যাদর্শ-প্রভাবিত, ভাব-ব্যাকুল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে এই ভাব-ব্যাকুলতার স্থান অধিকার করে পাণ্ডিত্য-বৈদগ্ধ্য। পুরাণ-কথা বাংলা কাব্যে আবার পৌরাণিক-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মানব-ধর্মের স্থানে ক্রমশঃ অভ্যুদিত হতে থাকে স্মার্ত আচার-বিচারপরায়ণ পাণ্ডিত্য-সমৃদ্ধি।

তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলা দেশেই ব্রাহ্মণ্য স্মার্ত-বুদ্ধির নব-বিকাশ সূচিত হয়েছিল। বিশেষভাবে, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিবর্ধিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাধিকরণ তুর্কী-আক্রমণ শেষে প্রাচীন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিচ্যুত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ-দেহের নূতন সংগঠনে সেই বিধ্বস্ত ধর্মশক্তির জন্য নূতন প্রতিষ্ঠাভূমি রচনার চেষ্টায় সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য-মনীষা আচার-বিচারের নবীনতর পদ্ধতি বদ্ধ নিগড় রচনায় ব্যাপৃত হয়েছিল। চৈতন্য-পূর্ববর্তী নবদ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস এই আচার-বিচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ্য-মনীষার বর্ণনাই দিয়েছেন। কিন্তু স্মার্ত চেতনার নব-বিকাশ সে যুগের ঘটনা হলেও,—পূর্বেই বলেছি, চৈতন্য-ঐতিহ্যের সর্বগ্রাসী প্রভাবের ফলে তখন তা সমাজদেহের কোথাও ভিত্তি গেড়ে উঠ্‌তে পারে নি। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে চৈতন্য-ঐতিহ্য-বিলুপ্তির সংগে সংগে এই পৌরাণিক স্মার্ত-চেতনা বাঙালির কাব্যের সকল ক্ষেত্রে নবরূপ পরিগ্রহ করে দেখা দিতে আরম্ভ করে। রামায়ণকাব্য-প্রবাহে তার সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ যে 'রামরসায়ন', সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

শেষ কথা

এই ঐতিহাসিক বিকাশ-বিপর্যয়ের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে একটি কথা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়;—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্য-ঐতিহ্য-বিমুক্তিকাল সূচিত হয়েছে মোটামুটি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে। কিন্তু, এই বিলুপ্তি-জনিত বিপর্যয় ধীরপদে অগ্রসর হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। সেই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগ-সম্ভাবনার প্রাণ-বেদনা হয়েছে সঞ্চারিত। এই বিবর্তন, বিপর্যয় ও পরিণামের আলোচনা বিস্তৃতভাবে করা হবে যথাস্থানে,—এখানে ইতিহাসের ইঙ্গিতটুকু লক্ষ্য করে রাখাই যথেষ্ট।

বাংলা মহাভারত

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে মহাভারত কাব্যের রস-চর্যাও যে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডঃ সুকুমার সেন "বৌদ্ধ-মতালম্বী পাল বংশের শেষ সম্রাট্ মদনপালদেবের মহিষী চিত্রমতিকা'র মহাভারত শ্রবণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[১০] বলাবাহুল্য, এইসব রসচর্যার মাধ্যম ছিল দেব-ভাষা সংস্কৃত। বাংলাভাষায় মহাভারত রচনার সূচনা কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে হয়েছিল বলে জানা যায় নি। অথচ, এই সময়ের মধ্যে বাংলা অনুবাদ-কাব্যরূপে রামায়ণ ও ভাগবত জনপ্রিয়তার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মহাভারত কাব্যের সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা বাংলার লোক-জীবনে সম্ভব হতে পেরেছিল সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাসের কল্যাণে। বাংলা ভাষায় মহাভারত-কাব্যের লোক-প্রতিষ্ঠা লাভে এই বিলম্বের কারণ হিসেবে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,—"বাঙালার পুরাতন সাহিত্যে ভারতপাঁচালীর উদ্ভব ও প্রসার প্রধানতঃ রাজদরবারের আওতায়ই হইয়াছিল।[১১]" কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং মালাধর বসুর ভাগবতকাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে দেখেছি,—

বাংলা মহাভারত কাব্য-কথা

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সূচনামাত্রই ঘটেছিল প্রধানতঃ রাজদরবারে আওতায়। কিন্তু, চৈতন্য-পূর্ব আদি-মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যেই সংস্কৃত সংস্কৃতির মধ্যে লোকায়তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছিল। তারই প্রেরণায়, বিশেষ করে চৈতন্যোত্তর জীবনবোধের প্রভাবে রামায়ণ ও ভাগবতকাব্য সংস্কৃত আভিজাত্য ত্যাগ করে বাংলার সার্বিক গণ-জীবনের আকর হয়ে দেখা দিয়েছিল। মহাভারত-কাব্যের পক্ষে যে তা সম্ভব হয়নি, তার কারণ পূর্বকথিত কাব্য-দুটিতে অভিজাত-সংস্কৃতি এবং লোক-সংস্কৃতির সমন্বয়-সম্মিলনের যে সাধারণ সূত্রটি ছিল, মহাভারতকাব্য-কাহিনীতে সেই উপাদানের ছিল বিশেষ অভাব। সদ্য-সমাপ্ত রামায়ণকাব্যের আলোচনায় দেখেছি,—সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বাল্মীকি-রামায়ণ নিঃসংশয়ে ছিল রাজবৃত্ত-কথা এবং আর্য-বিজয়েতিহাস। তাহলেও, এর মধ্যে লোকায়ত গার্হস্থ্য জীবন রসের উপাদানও ছিল প্রচুর।

১০। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)। ১১। ঐ।

আর, প্রধানতঃ এই প্রাচুর্যের সুযোগে বাংলার লোক-চেতনা বাংলা রামায়ণে এই কাহিনীকে নব ভাব-রস-সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।—"রঘুপতি-রাঘব-রাজারাম" সেখানে, দশরথাত্মজ, কৌশল্যানন্দন, লক্ষ্মণাগ্রজ, পতিতপাবন "সীতারাম"-এ পরিণত হয়েছেন। ভাগবতানুবাদের আলোচনাতে দেখ্‌ব,—শ্রীমদ্ভাগবতের 'সত্যং পরং' স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদাদুলাল, রাখাল-গোপাল, গোপিকা-কান্ত, "রাধেশ্যাম"এ পরিণত হয়েছেন বাংলা অনুবাদ গ্রন্থাবলীতে। কিন্তু মহাভারত একান্তভাবেই যেন আর্য বীর্য গাথা; আর্য রাজ-বৃত্তের সংগ্রাম-শীল ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। এই আদর্শ কাহিনীর সর্বত্রই রয়েছে পুরাণের অতিলৌকিক গল্প, নর-নারী নির্বিশেষে আদ্যন্ত প্রতিটি চরিত্রের পেছনে উঁকি দিচ্ছে যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। অন্যদিকে কুরু-পাণ্ডবের ঊর্ধ্বতন কয়পুরুষের বংশগত ঐতিহ্যে শান্ত গার্হস্থ্য-জীবনের উপাদান একেবারেই ছিল অনুপস্থিত। নিতান্ত সাধারণ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে,—ব্যাস-জননী, শান্তনু-পত্নী সত্যবতী, ক্ষেত্রজ-পুত্র ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জনয়িত্রী অম্বা-অম্বিকা এবং তাদের পরিচারিকা,—চারিপুত্রের গর্ভ-ধারিণী, পঞ্চপাণ্ডব-জননী কুন্তী, পঞ্চস্বামীর পত্নী দ্রৌপদী—ইত্যাদি চরিত্রের জীবন-কথায় যত বৈচিত্র্যই থাক্,—বাঙালির সামাজিক আদর্শোচিত গার্হস্থ্য উপাদান তাতে একেবারেই অনুপস্থিত, এ-তথ্য অবশ্য-স্বীকার্য। বাঙালি জনচিত্তের চেয়ে বরং যুদ্ধব্রতী বিজয়-গৌরবাকাঙ্ক্ষী রাজ-বংশীয়দের যুযুৎসার চরিতার্থতা-সাধনে এই কাব্য প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। এই ধরণের এক যুযুৎসু বিদেশি রাজ-প্রতিনিধির কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই বাংলা ভাষায় প্রথম মহাভারতকাব্য অনূদিত হয়েছিল বলে জানা যায়। পরে দেখব,—এই প্রথম মহাভারত অনুবাদের আগেও বাংলার লোক-সমাজে ভারত-পাঁচালীর প্রচলন হয়ত ছিল। কিন্তু, সেই অপূর্ণ গঠিত কাব্যের অনেকাংশই মূল মহাভারত কাব্যের অনুসারী ছিল না—আর, যথার্থ অনুবাদ-কাব্য রূপেও ঐ সকল কাব্যকথাকে স্বীকার করে নেবার সংগতি নেই। সবশেষে স্মরণ করি,—'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'—এই লোক-প্রবচনের ঐতিহ্যকে। কিন্তু, এই ঐতিহ্য বাংলার গণ-চেতনার পক্ষে বহুকাল ধরেই সত্য ছিল না। হয়ত, দীর্ঘদিন ধরে এই প্রবচন বহির্বঙ্গীয় আর্যকৃষ্টি সম্বন্ধেই সার্থক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল,—আজও হয়।

বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম মহাভারত-অনুবাদক কবির পরিচিতি-সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে নানারকম মত-বিরোধ রয়েছে। যে প্রাচীনতম কবির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেছে, তিনি 'পরাগলী' মহাভারতের লেখক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলার বহিরাগত তুর্কী আক্রমণ-কারিগণ তখন এদেশে শাসনকর্তা রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ; একদিনকার 'ভক্ষক'গণ নবরূপ পরিগ্রহ করেছেন রক্ষক হিসেবে। এই সব বিদেশি শাসনকর্তারা সুশাসন-বলে দেশের ধন-প্রাণ-মান রক্ষায়ই কেবল তৎপর ছিলেন না, দেশের সংস্কৃতি-সাহিত্যের পুনর্বিকাশের সহায়তায়ও হয়েছিলেন যত্নশীল। আগেই বলেছি, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিদ্যোৎসাহী বদান্য নবাব হুসেনশাহ (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রীঃ)। হুসেনশাহের জনৈক "লস্কর" পরাগলখাঁ চাটিগ্রাম, অর্থাৎ বর্তমান চট্টগ্রাম অধিকারের পর সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মহাভারতের কৌতূহলাবহ গল্প শুনে পরাগল মুগ্ধ হন, এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর-দাসকে "দিনেকে" শুনে শেষ করতে পারার মত একখানি মহাভারত রচনার নির্দেশ দেন। বলা বাহুল্য, 'দিনেকে' শ্রোতব্য মহাভারত-কাহিনীর মধ্যে পরাগলখাঁ মহাভারতীয় কাব্য-রসাস্বাদনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করেছিল মূল যুদ্ধ-কাহিনীর উত্তেজক উপাদান।—সংহতি-প্রভাবে সেই উত্তেজনাকেই তীব্রতম করে পাওয়ার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ আকাঙ্ক্ষার মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ পরাগলের আলোচ্য নির্দেশ। এই কাহিনী থেকে রাজ-চেতনার 'পরে রাজবৃত্তের-ইতিহাস মহাভারতের প্রভাব-স্বরূপ নির্ণীত হতে পারবে বলে মনে করি।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

পূর্বেই বলেছি, বাংলা মহাভারতের আদিকবির পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নন। ডঃ দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা মহাভারতের আদিমতম তিনজন কবির নামোল্লেখ করেছিলেন,—(১) সঞ্জয়, (২) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, (৩) শ্রীকরণ নন্দী। ডঃ সুকুমার সেন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণে সঞ্জয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে যুক্তি উত্থাপন করেন। একই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ডঃ সেন সঞ্জয়ের প্রসঙ্গটি একেবারেই পরিহার করেছেন। অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু কিন্তু ডঃ সুকুমার সেনের প্রথম

আদি কবিগণ ও সঞ্জয়মহাভারত (?)

সংস্করণে উদ্ধৃত বিচার লক্ষ্য করেও ডঃ দীনেশচন্দ্রের মতকেই সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ-রচনা-কালে সঞ্জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাহলেও, বাংলা মহাভারতের অনুবাদ মধ্যে সঞ্জয়ের রচনাকেই তিনি "নানাকারণে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন" বলে মনে করেছিলেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন এই 'নানা কারণে'র যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করেছেন। ৺মণীন্দ্রমোহনের প্রধান যুক্তি ছিল,—পারগলখাঁ প্রথমে অন্যতর মহাভারত কথা শুনে, তবেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর, সেই আকর্ষণের ফলেই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত রচিত হয়েছিল। কবীন্দ্র নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। মণীন্দ্রমোহনের ধারণা,—পরাগলখাঁ সর্বপ্রথম সঞ্জয়-মহাভারতই শ্রবণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এটুকু অনুমান মাত্র, যুক্তি-নির্ভর প্রমাণ নয়। বরং, বিশেষভাবে 'পরাগলী' মহাভারতের অনুসরণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়;—লোকমুখে মহাভারত কথা অর্থাৎ মহাভারতের গল্প শুনেই পরাগল লিখিত কাব্য-শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যাপক ৺বসু অবশ্য এ বিষয়ে অন্যতর যুক্তি উদ্ধারের চেষ্টাও করেছেন—কিন্তু সেসব আরো দুর্বল, তাই এই প্রসংগে গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করা নিরর্থক। পরিবর্তে এবার সঞ্জয়-পরিকল্পনার উৎস-বিচারের চেষ্টা করা যেতে পারে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র "বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজসাহী প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র" সঞ্জয়ের ভণিতা-যুক্ত মহাভারত কাব্যের প্রসার দেখে সঞ্জয়ের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কৃত-নিশ্চয় হন। এই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কথক মহাভারতীয় চরিত্র-বিশেষ মাত্র নন, একথা প্রমাণ করবার জন্য ডঃ দীনেশচন্দ্র নানারূপ ভণিতার উদ্ধার ও বিচার করেছেন।

"সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়।"
"সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা।" ইত্যাদি।

কিন্তু, এসব ভণিতায় দুই সঞ্জয়ের পার্থক্য প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অতিশায়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাছাড়া, নানা পুথিতে নানা প্রসঙ্গে সঞ্জয়-সম্বন্ধীয় অন্যান্য উল্লেখ অস্পষ্ট এবং পরস্পর সংযোগহীন। কবি সঞ্জয়ের পরিচয় উপলক্ষ্যে লিখিত হয়েছে,—"ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।"—

অন্যত্র আছে—"দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ-কুমার।"

প্রথমটির সহায়তায় ডঃ দীনেশচন্দ্র অনুমান করেছেন, সঞ্জয় ছিলেন বিক্রমপুরে 'অদ্যাবধি বর্তমান' ভরদ্বাজগোত্রীয় বৈদ্য বংশ-সম্ভূত। অনেকে কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির সহয়তায় কবিকে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ বংশ জাত বলে অনুমান করেছিলেন। এই সকল পরস্পর-বিরোধী বাদানুবাদের মধ্যে একটি পুথিতে নিম্নরূপ স্পষ্ট বিবৃতি পাওয়া যায়,—

"হরিনারায়ণ দেব দীন হীন মতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব ভারতী॥
ব্যাসদেব হৈতে মহাভারত প্রচার।
সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঞ্চালী পয়ার॥"

এই বিবৃতি সত্য হ'লে মনে করা যেতে পারে,—হরিনারায়ণ দেব নামে কোন কবি সঞ্জয়-'অভিমানে' অর্থাৎ ছদ্মনামে মহাভারতের একখানি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরিশেষে বলি,—এই সব তথ্য ঐতিহাসিক অনুমানরূপে সিদ্ধ যদি হয়-ও, তবু প্রমাণরূপে কিছুতেই গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া, সঞ্জয়ের যে-সকল রচনার 'পরে নির্ভর করে দীনেশচন্দ্র সঞ্জয়ের অস্তিত্ব-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন, সেগুলিও প্রমাণ সহ নয়। স্বয়ং দীনেশচন্দ্র স্বীকার করেছেন,—"কোন কোন পুথির অধিকাংশই অপরাপর কবির লিখিত, অথচ গ্রন্থের নাম 'সঞ্জয়-মহাভারত'।"[১১]

কিন্তু এই সব বিচার-বিতর্কের পরেও, বিশেষতঃ বাংলাসাহিত্যের প্রাচীন তথ্যাদির স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সঞ্জয়কে 'সন্দেহের অবকাশ' দেওয়াই সঙ্গত বলে মনে করি। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণে সঞ্জয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে যে-সকল তথ্যাদির উপস্থাপন করেছিলেন,—ওপরের বিচারে 'উত্তরপক্ষ' প্রসঙ্গে বিশেষভাবে সেই কয়টিই উদ্ধার করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থে তিনি সঞ্জয়কে আলোচনার অবকাশ পর্যন্ত দিতে চান নি। তাহলেও, দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত নূতনতর প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির বিচার করলে আমাদের সিদ্ধান্তই সমুচিত বলে মনে হয়।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, বাংলা মহাভাবত অনুবাদ-গ্রন্থের এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রমাণ সহ পুথির রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বরদাস। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ এবং

১১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

মোটামুটি রচনাকালের পরিচয়ও পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন কবীন্দ্র পরমেশ্বরের গ্রন্থের এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথির পুষ্পিকা থেকে নিম্নরূপ কবি এবং কাব্য-পরিচিতি উদ্ধার করেছেন,—"ইতি কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস-বিরচিতা পাণ্ডব-বিজয় নাম পঞ্চালিকা সমাপ্তা।"[১২]

কবীন্দ্রপরমেশ্বরের পাণ্ডব-বিজয়

স্পষ্টই বোঝা গেল,—পরমেশ্বরদাস রচিত মহাভারতানুবাদ গ্রন্থের নাম ছিল 'পাণ্ডব-বিজয়'। কবীন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে নানারূপ অনুমান প্রচলিত আছে। কারো কারো ধারণা,—স্ত্রীপর্ব-পর্যন্ত রচনার পরে পরাগলের তিরোভাব ঘটে। ফলে, কবীন্দ্রের রচনা এর পরে অসমাপ্ত থেকে যায়। অনেকে আবার মনে করেন,—গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হলেও সম্পূর্ণ হয়েছিল। কবীন্দ্রের কাব্য সূত্রাকারে লিখিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবু সে রচনার স্থানে স্থানে প্রতিভা-প্রোজ্জ্বলতার পরিচয় আছে।

বাংলাভাষার পরবর্তী মহাভারত কাব্যের অনুবাদ সম্ভব হয় পরাগল-পুত্র ছুটিখাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়। পরমেশ্বরের কাব্যের বস্তু-সংক্ষেপ ছুটিখাঁর তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় নি। তাই, ছুটিখাঁ শ্রীকর নন্দীকে বিস্তৃততর কাব্য রচনার নির্দেশ দেন। বিশেষ করে, জৈমিনি মহাভারতের 'পরে নির্ভর করে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধপর্বের বিস্তৃত কাব্য রচনা করেন;

শ্রীকরনন্দীর 'অশ্বমেধ পর্ব,

পরমেশ্বরের কাব্যের কোন কোন পুথিতে শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধপর্ব অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে। এর থেকে প্রথমে অনুমিত হয়েছিল,—পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু, বর্তমানে এই ভ্রান্তির সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন শ্রীকর নন্দীর ভণিতা উদ্ধার করে দেখিয়েছেন,--ছুটিখাঁর মূল নাম ছিল 'নসরৎখান';—পিতার বিজয়-অভিযানে ইনি সক্রিয় সঙ্গী হয়েছিলেন।

বাংলা মহাভারতের অনুবাদ-গ্রন্থাবলীর আদিম রচয়িতৃ-তালিকায় অন্যতর সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল 'বিজয়পণ্ডিতের' মহাভারত। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু সাহিত্য-পরিষদের সহায়তায় একখানি গ্রন্থ সম্পাদন করে প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু অধুনাতন

বিজয় পণ্ডিত ?

১২। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)

বিশেষজ্ঞগণ এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে,—'বিজয়পণ্ডিত-কথা'—পরমেশ্বর-রচিত 'বিজয়পাণ্ডব কথা'র লিপিকার-প্রমাদ জাত ভ্রান্তি-বিলাস মাত্র।

ষোড়শ শতাব্দী অন্যান্য বাংলা মহাভারত লেখকদের মধ্যে রামচন্দ্র খান এবং দ্বিজ-রঘুনাথ উল্লেখযোগ্য।

রামচন্দ্র খানের রচিত জৈমিনীর অশ্বমেধপর্বের দুখানি পুথি পাওয়া গেছে। কবি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাব্য-রচনা করেন। পুথি দুখানিতে প্রাপ্ত কবি-পরিচিতি পরস্পর-বিরুদ্ধ। একটির মতে কবি রাঢ়ের দণ্ডসিমিলিয়াডাঙা গ্রামের অধিবাসী 'কায়স্থ' কাশীনাথের পুত্র। অপরটির মতে কবির পিতা ছিলেন,—জঙ্গীপুরবাসী ব্রাহ্মণ মধুসূদন। কবি বৈষ্ণব ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন,—কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, এবং যে-জমিদার রামচন্দ্র খান চৈতন্যপ্রভুর নীলাচল-যাত্রার সময়ে তাঁকে গৌড়-উৎকলের সীমা নির্বিঘ্নে পার করে দিয়েছিলেন, তিনি ও আলোচ্য কবি অভিন্ন ব্যক্তি।

রামচন্দ্র খান

রঘুনাথের অশ্বমেধপর্বের একখানিমাত্র পুথি পাওয়া যায়। কবি উৎকলাধিপ মুকুন্দদেবের সভায় নিজ কাব্য পাঠ করেন। মনে হয়, মুসলমানদের হাতে মুকুন্দদেবের পরাভবের আগে ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যখানি রচিত হয়েছিল। রঘুনাথের অশ্বমেধপর্বের সংগে কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে।

রঘুনাথের অশ্বমেধপর্ব

কুচবিহার-রাজ নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজের প্রবর্তনায় কবি অনিরুদ্ধ ভারত-পাঁচালী রচনা করেছিলেন। কবি কামরূপের অধিবাসী ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত ছিলেন। আর, কাব্যের স্থানে স্থানে রাম-সরস্বতী উপাধি ব্যবহার করেছেন।

কবি অনিরুদ্ধ

ষোড়শ শতাব্দীর মহাভারত রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশেষে উল্লেখ করব পিতা-পুত্র ষষ্ঠীবর সেন এবং গঙ্গাদাস সেনের। মহাভারতের কবি ষষ্ঠীবর সেনের সংগে পদ্মাপুরাণের কবি ষষ্ঠীবর দত্তের পরিচয় জড়িয়েছিল। এ নিয়ে দীর্ঘদিন মত-বিরোধও চলেছে। অধুনাতর বিচারে এই দুই কবির পার্থক্য নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে।[১৩] ডঃ দীনেশচন্দ্রের প্রাথমিক ধারণার অনুসরণ

১৩। দ্রষ্টব্য—চৈতন্যোত্তর যুগের 'মনসামঙ্গল কাব্য'—ষষ্ঠীবর দত্ত।

করে মনে করা যেতে পারে, ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার জিনারদি গ্রামের বৈদ্য সেন বংশ-জ ছিলেন আমাদের আলোচ্য কবি-যুগ্ম।

গঙ্গাদাস স্বরচিত অশ্বমেধপর্বের ভণিতায় প্রায় সর্বত্রই পিতামহ এবং পিতার নামোল্লেখ করেছেন:—"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যার যশ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর॥"

গঙ্গাদাস কর্তৃক লিখিত মহাভারত আদিপর্বের পুথি পাওয়া গেছে;—ষষ্ঠীবর সেনের ভণিতায় পাওয়া গেছে স্বর্গারোহণপর্বের পুথি। এই সকল রচনা পূর্ববঙ্গে এককালে জন-সমাদৃত হয়েছিল।

ষষ্ঠীবর-পুত্র গঙ্গাদাস

ষোড়শ শতকের কবি-তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা ত্যাগ করলে সপ্তদশ শতকের মহাভারত-কবিদের মধ্যে প্রথমেই উল্লিখিতব্য কবি কাশীরাম দাস। পূর্বেই বলেছি, কাশীরাম দাসের সাধন-প্রভাবেই রাজসভার কাব্য মহাভারত সাধারণ বাঙালির জীবন-কাব্যে পরিণত হয়েছিল। কাশীদাসের কাব্য মধ্যে নিম্নরূপ কবি-পরিচিতি লক্ষিত হয়,—

কাশীরামদাসের পরিচয়

"ইন্দ্রানী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গীগ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাস-পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস-পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥"

ইন্দ্রানী বা ইন্দ্রাবণী পরগণা বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় অবস্থিত। অন্যান্য ভণিতা হতে জানা যায়,—কবি 'দেব'-উপাধিক কায়স্থ ছিলেন।

কাশীরামেরা তিন ভাই-ই কবিত্ব-গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণদাস পরবর্তী কালে কৃষ্ণকিঙ্কর নাম অথবা উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি শ্রীকৃষ্ণবিলাস কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণদাস সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন। গদাধর জগন্নাথ মঙ্গল বা জগৎ-মঙ্গল নামক কাব্যে বিশেষভাবে নীলাচল-মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন।

গদাধরের কাব্য পড়ে জানা যায়,—তাঁদের পিতা কমলাকান্ত জগন্নাথ-দর্শনে গিয়ে নীলাচলেই বসতি স্থাপন করেন। গদাধরও উড়িষ্যাবাসকালেই তাঁর কাব্য-রচনা করেন। অনেকের ধারণা,—মহাভারত কাব্যের 'বিরাটপর্ব'

রচনার পর কবি কাশীরাম দাস-ও নীলাচল চলে গিয়েছিলেন। কাব্যের পরবর্তী অংশেও জগন্নাথদেবের পৌনঃপৌনিক উল্লেখ লক্ষিত হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

"আদি সভা বন-বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥"

কেউ কেউ 'স্বর্গপুর' অর্থে 'নীলাচল' মনে করেছেন; আবার কেউ কেউ মনে করেছিলেন 'কাশীধাম'। কিন্তু, গ্রন্থের বিভিন্ন পুথি পড়ে এই মতের সংগতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়। বরং, কাশীরাম যে সম্পূর্ণ গ্রন্থ-রচনার পূর্বেই তিন কিংবা সাড়ে তিনপর্ব গ্রন্থ-রচনা করে লোকান্তরিত হয়েছিলেন, বিভিন্ন পুথিতে সেই প্রমাণই সমধিক। এ-সম্বন্ধে কাশীদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম স্পষ্টঃ খছেন :—

"কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা॥
ভ্রাতৃ পুত্র হই আমি তিহঁ খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ!
আত্মত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক॥
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পাণ্ডব-কথা পরম সাদরে॥
আশীর্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেইজন।
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ॥
কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল।
তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল॥"

অন্যত্র আছে,— "নন্দরাম দাসে বলে শুন শ্যামরায়।
আমারে অভয় প্রভু দেহ জম-দায়॥
জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোক-কালে।
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত-অমৃত তুমি করহ রচন॥"

স্পষ্টই বোঝা গেল,—'যম-দায়'-হেতু কাশীরামের মহাভারত কাব্য সমাপ্ত হ'তে পারে নি। নন্দরাম এই অসমাপ্ত কাব্যের কতটুকু অংশ লিখে সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, জানা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন,—কাশীরামের কাব্যের শান্তিপর্ব এবং 'স্বর্গারোহণ-পর্ব' যথাক্রমে কৃষ্ণানন্দ বসু এবং জয়ন্ত দাসের রচিত [১৪]।

কাশীরামদাস সপ্তদশ শতকের একেবারে প্রথমেই কাব্য রচনা করেছিলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাবনীনাথ রাধাদামোদর সিংহের রাজত্বকালে অনুলিখিত একটি পুথিতে আদিপর্ব-সমাপ্তির কালজ্ঞাপক একটি শ্লোক রয়েছে। তাকে অবলম্বন করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সিদ্ধান্ত করেছেন ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশীরামের আদিপর্ব সমাপ্ত হয়। একটি পুথিতে বিরাটপর্ব-সমাপ্তির কাল উল্লিখিত হয়েছে ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

রচনাকাল

কবি কাশীরাম বংশানুক্রমিকভাবে বৈষ্ণব ছিলেন। আর, বলাবাহুল্য,—এই বৈষ্ণব-চেতনার প্রাণকেন্দ্র ছিল চৈতন্য-ঐতিহ্য। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যের উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি কবি-পিতা ও কবি-ভ্রাতাদের নীলাচল প্রীতি ও জগন্নাথ-আনুগত্যের মধ্যে। কিন্তু, কাশীরামের কবি-মানসের বৈষ্ণব-প্রাণতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখ্‌তে পাই তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে। 'দেব'-বংশজাত কবি 'কাশীরাম দাস' নামে নিজ পরিচয়কে অমর করে গেছেন। পূর্বে বলেছি,—কাশীদাস-চেতনার এই চৈতন্যানুগ প্রেম-শরণাগতি রাজ-সভার কাব্য মহাভারতকে বাঙালির জীবন-কাব্যে পরিণত করেছিল;—বীরগাথাকে প্রেম-কথায়, মহাভারতের শূর-নায়কদ্বয় নর-নারায়ণ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়কে নবদুর্বাদল-শ্যামরূপে পরিণত করেছে,—অসম্ভবকে করেছে সম্ভব। বাংলা মহাভারতের ইতিহাসে বাঙালিয়ানার ঐতিহ্যারোপ কাশীরাম-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। অখণ্ড বাঙালি জাতি এই সাধনার দানকে সশ্রদ্ধ,—অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানাতে গিয়ে মূল কবির রচনা-পরিচয়কে যথাপূর্ব বিস্মৃত হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতই কাশীরামের মহাভারত-ও প্রক্ষেপ-বহুল। ফলে, কাশীরামের কাব্যের একখানি নির্ভর-যোগ্য সংস্করণ আজও সম্পাদিত হতে পারে নি। ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী কাশীরামের রচনা অপূর্ণ ছিল, কিন্তু বাঙালির ঘরে ঘরে সুসম্পূর্ণ কাশীদাসী

কাব্য-মূল্য

১৪। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।

মহাভারতের মুদ্রিত-অমুদ্রিত বিচিত্র সংস্করণ আজও বিরাজ করছে। এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করতে গিয়ে কত জ্ঞাত-অজ্ঞাত, খ্যাত-অখ্যাতনামা কবির রচনা যে মূল রচনাকেও বিকৃত করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে অন্ততঃ একটি সত্য ঐতিহাসিকরূপে বিরাজিত রয়েছে :—এই সমস্ত বাঙালি-মহাভারত রচনার বিচিত্র চেষ্টার প্রাণ-সূত্র যে-ঐক্যে বিধৃত, সেই একক-আদর্শের স্রষ্টা কবি কাশীরাম দাস। এই তথ্যটুকু স্মরণ করেই বঙ্গীয়-কবির সুরে সুর মিলিয়ে সাহিত্য-ইতিহাসও ঘোষণা করবে :—

"মহাভারতের কথা অমৃত-সমান,
হে কাশী! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্[১৫] ॥

কাশীরামের পুত্র দ্বৈপায়ন দাসও ক্ষুদ্রাবয়ব ভারত-কাব্য রচনা করেন। সংক্ষিপ্ত রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবি পুনঃ পুনঃ পিতার অতুল কীর্তির প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ভণিতাংশে বার বার স্মরণ করেছেন দুর্লভ পৈতৃক ঐতিহ্য ;—

দ্বৈপায়ন দাস

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥"
"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পাণ্ডবের স্বর্গ আরোহণ ॥" ইত্যাদি

কাশীরামের জ্ঞাতি-সম্পর্কিত (?) ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম-রচিত মহাভারত-কাব্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কবির পিতার নাম নারায়ণ। নন্দরামের ভণিতাযুক্ত উদ্যোগ, দ্রোণ ও কর্ণ-পর্বের পুথি পাওয়া গেছে।

পাঁকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র তাঁর গৌরীমঙ্গল কাব্যে নিত্যানন্দ দাস রচিত মহাভারতের উল্লেখ করে বলেছেন,—

"অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ ॥"

নিত্যানন্দ দাস

কিন্তু, নিত্যানন্দ-রচিত কাব্যের একখানি পুথিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগের আগে অনুলিখিত হয় নি। অন্ততঃ এর পূর্বে অনুলিখিত কোন পুথির পরিচয় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।

১৫। চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মধুসূদন।

ডঃ সুকুমার সেন তাই অনুমান করেছেন,—নিত্যানন্দের গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ কাশীরামের কাব্যের পরে রচিত হয়েছিল। এই অনুমান কতটুকু নির্ভরযোগ্য, বলা কঠিন। নিত্যানন্দের রচনা একদা পশ্চিমবঙ্গে বহুল-প্রচলিত হয়েছিল,—কবির উপাধি ছিল 'কবীন্দ্র'।

সপ্তদশ শতাব্দীর আরো অনেক বাংলা মহাভারত-রচয়িতা কবির অপেক্ষাকৃত অপ্রধান পরিচয় উল্লেখ না করলেও,—ঐতিহাসিক কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য কুচবিহার রাজ-দরবারের পৃষ্ঠপোষিত মহাভারত কাব্যগুলির পরিচিতি-গ্রহণ প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় বাংলা পদ্য-গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে কুচবিহার রাজ-দরবারের দান বহুল ও বিচিত্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় যথাক্রমে গোবিন্দ-কবিশেখরের কিরাত-পর্ব এবং দ্বিজ শ্রীনাথের মহাভারত রচিত হয়। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণে কুচবিহার-রাজদরবারে রক্ষিত মহাভারত কাব্যের বিভিন্ন পুথির বিবরণ সন্নিবিষ্ট করেছেন।

কুচবিহার রাজ-দরবারের দান

অষ্টাদশ শতকে রচিত মহাভারত কাব্যের সব কয়খানি পুথিই এক বা একাধিক পর্বের সমষ্টি মাত্র; আর, প্রায় সব কয়টিই গতানুগতিক রচনা। এর আগে রামায়ণ কাব্যের আলোচনায় বলেছি,—সাধারণভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাঙালি জীবনে চৈতন্য-সংস্কৃতি-প্রভাবিত প্রাণ-স্রোতের সজীবতা ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে অবশেষে স্তিমিত-প্রায় হয়েছিল। ফলে, একদিকে যেমন বর্ণনাবলী নিষ্প্রাণ, গতানুগতিক হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্য-সৃষ্টির চেষ্টা চলেছিল বিভিন্ন পুরাণকথা থেকে ধার-করা গল্পের জৌলুস সৃষ্টি করে। অষ্টাদশ শতকের মহাভারত কাব্য-সমূহ সম্বন্ধেও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাভারতকাব্য

সরস রামায়ণ কাব্য-রচয়িতা শঙ্কর চক্রবর্তী যে একখানি ভারতপাচালীও রচনা করেছিলেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

শঙ্কর চক্রবর্তী

কবি সারলাদাস-রচিত আদি ও বিরাট-পর্বের পুথি পাওয়া গেছে। কবি রাঢ়দেশের অধিবাসী ছিলেন; এবং তাঁর কাব্য রাঢ়-উৎকল-সীমান্তে জন-সমাদৃত হয়েছিল। ফলে, এই গ্রন্থের

সারলাদাস

উৎকল ভাষা ও লিপিতে লিখিত পুথিও পাওয়া যায়। সারলাদাস সপ্তদশ শতাব্দীতেও আবির্ভূত হয়ে থাকতে পারেন।

এছাড়া শ্রীহট্টদেশে সুবুদ্ধিরায়, অম্বষ্ঠবল্লভ, পুরুষোত্তম দাস ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত বিভিন্ন পুথি পাওয়া গেছে।

শ্রীহট্টদেশীয় পুথিসমূহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাভারত কাব্য-সমূহের মধ্যে রাজেন্দ্র সেন-কৃত আদি-পর্বের সূচনা কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রন্থারম্ভে রাজা জন্মেজয় মহর্ষি বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করেন,—মহর্ষির উপস্থিতি সত্ত্বেও কি করে জগদ্‌বিধ্বংসী কুরুক্ষেত্র সমর সম্ভব হ'তে পেরেছিল? মহর্ষির উপদেশও কেন কুরু-পাণ্ডবকে রক্ষা করতে পারে নি? ব্যাসদেব প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর পরিহার করে রাজাকে উপদেশ দেন,—পরবর্তী প্রভাতে রাজ-সমীপে একটি রথ উপস্থিত হবে, কিন্তু রাজা যেন সেই রথে আরোহণ না করেন; যদি করেন-ও বা, তবু যেন মৃগয়ার্থ কোথাও না যান;—যান-ও যদি তবু যেন দক্ষিণাভিমুখী না যান;—গেলেও যেন রাজপুরীতে প্রবেশ না করেন; করলেও যেন রাজকন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন; করেন-ও যদি, তাহলেও যেন তার পাণিগ্রহণ না করেন;—তা'ও যদি করেন, তবু কিছুতেই যেন সেই রাজকন্যাকে পাট-মহিষীত্বে বরণ না করেন। বলাবাহুল্য, পরবর্তী প্রভাতে সমাগত রথাশ্রয় করে রাজা দক্ষিণদেশে মৃগয়ায় গিয়ে সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ করে এনে পাটমহিষীত্বে বরণ করেন। একদা যখন রাজা পাটমহিষী-সহ রাজ-সভায় সুখাসীন, তখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আবির্ভাব ঘটে। মুনির অদ্ভুত রূপদর্শনে রাণী হেসে ফেলেন,—স্বয়ং মুনিও রাণীর অকারণ হাসিকে হাসি দিয়েই অভ্যর্থিত করেন। কিন্তু রাজা জন্মেজয় হাসির কদর্থ করে মুনির অপমান সাধন করেন এবং তাঁর শাপ-ভাজন হন। রোগগ্রস্ত জন্মেজয় ঋষ্যশৃঙ্গের সন্তুষ্টি বিধান করে বর লাভ করেন যে, মহাভারত-শ্রবণে তাঁর রোগ-মুক্তি ঘটবে। এবারে ব্যাসদেব রাজ-সভায় উপস্থিত হয়ে পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন,—দেখা গেল একক রাজা জন্মেজয়ই সামান্য ব্যাপারে তাঁর উপদেশ প্রতিপালন করেন নি। এ অবস্থায় বৃহত্তর ব্যাপারে বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় বীর যে তাঁর সদুপদেশে কর্ণপাত করেন নি, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। যাই হোক্, অতঃপর ব্যাসদেব জন্মেজয়ের নিকট মহাভারত-পাঠের নিমিত্ত শিষ্য বৈশম্পায়নকে নিযুক্ত করেন। মহাভারত-

রাজেন্দ্র সেন

কাহিনীর সূচনা-সম্বন্ধীয় এই গল্প রাজেন্দ্র সেনের কাব্যেই অভিনব নয়। সঞ্জয়-মহাভারত নামে প্রচলিত বাংলা কাব্যের একাধিক পুথিতে অনুরূপ কাহিনী দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক ৺মণীন্দ্র বসু অনুমান করেছেন জৈমিনী মহাভারত থেকেই এই কাহিনী মূলতঃ গৃহীত হয়েছিল[১৬]। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন,—মূল জৈমিনী-মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব ছাড়া অন্য পর্বের পুথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হতে পারে নি।

যাই হোক্, রাজেন্দ্রের কাব্য মূলতঃ শকুন্তলা-উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

ভাগবতের অনুবাদ ও কৃষ্ণলীলা-কাব্য

চৈতন্যোত্তর বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের প্রাথমিক আলোচনাতেই সম-সময়ের ভাগবত-অনুবাদ কাব্যেরও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছি। বর্তমান প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করি,—চৈতন্য-পূর্ব একমাত্র ভাগবত-অনুবাদক মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় একান্তভাবে ছিল ঐশ্বর্য-মহিমা-ভাস্বর। কিন্তু চৈতন্যোত্তর বাঙালির ভাব-চেতনা 'ঐশ্বর্য-শিথিল' সাধনায় নিতান্ত অবিশ্বাসী ছিল, কৃষ্ণ-ভজনার প্রেমানুরক্তিময় পথেই ঘটেছিল তার একান্ত প্রসার। লক্ষ্য করতে হবে, মূল সংস্কৃত কাব্যের তুলনায় এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল একদেশ-দর্শী। মূল শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ চরিত্রের বহু বিচিত্রমুখী সর্বায়ব-সম্পূর্ণ পরিচয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে ঐশ্বর্য-গরিমা ও প্রেম-মহিমা যুগপৎ একত্র-ধৃত হয়েছিল। কিন্তু, সন্দেহ নেই, এরূপক্ষেত্রে চৈতন্য-পূর্ব মালাধরের ভাগবত-অনুবাদ ঐশ্বর্যভাবের একান্ত অনুসরণই করেছে। তা ছাড়া, মালাধরের রচনা, আংশিক অনুবাদ কালেও, যথাসম্ভব মূলানুসরণ করেছে। অন্যদিকে, চৈতন্যোত্তর ভাগবত-অনুবাদ সমূহ গল্পের কাঠামোতে কোথাও কোথাও প্রসঙ্গতঃ মূলের অনুসরণ করলেও, ভাবের দিক্ থেকে পৌরাণিক ঐতিহ্যকে প্রায়ই অস্বীকার করেছে। পূর্বে একাধিকবার বলেছি,—ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক সংস্কারের সংগে লোক-জীবন-চেতনার সম্মিলনে বিমিশ্র-যৌথ নব-বাঙালি সংস্কৃতির সৃষ্টিই চৈতন্য-ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আর, সম-কালীন যুগ-মানসের সহজ আর্তিমূলেই এই

চৈতন্যোত্তর ভাগবত অনুবাদ ও

নব-ঐতিহ্যের সম্ভব। চৈতন্যোত্তর বাংলা ভাগবত-অনুবাদ ও কৃষ্ণ-কথার পুরাণেতর নবরূপায়নে এই সত্য সর্বাধিক উদ্ঘাটিত হয়েছে।

সন্দেহ নেই, ভাগবত-পুরাণে কৃষ্ণের মধুর-লীলা, তথা রাসলীলারও সমুজ্জ্বল বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু মনে রাখ্তে হবে, চৈতন্যোত্তর "বৈষ্ণবদের ধর্মমতে শুধু মধুর সম্পর্কই একমাত্র জিনিস নয়। রাধাভাবও তার মধ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করে।" আগেই বলেছি, রাধা নামের উল্লেখ-মাত্রও নেই ভাগবতে। পরবর্তী কালে ভাগবতের রাসলীলার অন্তর্বর্তী বিশেষ কৃষ্ণ-কৃপা-পুষ্টা গোপীর সংগে রাধার অভিন্নতা কল্পনা করা হয়েছে। রাধার মধ্যে পৌরাণিক ঐতিহ্য আরোপের একটি উল্লেখ্য চেষ্টা লক্ষ্য করি এখানে। তা হলেও, অস্বীকার করবার উপায় নেই, রাধা-কল্পনার উদ্ভব হয়ত বাংলার লোক-চেতনার মূল-দেশে। সেখানে বাঙালি লোক-জীবন-বোধের ভাবাধিবাসনে পৌরাণিক ঐতিহ্যের অভিজাত আবরণ স্খলিত হয়েছে রাধাবাদের সাধন পথে। তাই দেখি, বাংলার লোক-কাব্যে পৌরাণিক রাসলীলার পরিবর্তে নূতন দানলীলা, নৌকালীলাদির মত লৌকিক রাধা-কৃষ্ণ গাথা গড়ে উঠেছে। চৈতন্য-চেতনা, আগেই বলেছি,—রাধা-কথার এই লৌকিক-লোকেতর উভয় ধারাকে রাসায়নিক সম্মিলনে বদ্ধ করেছে। তাই, স্বয়ং মহাপ্রভুর জীবনাচরণে পৌরাণিক ভাগবত-মহিমার অনুস্থিতি যত প্রকট হয়েছে, তার চেয়ে কম প্রস্ফুট হয় নি লৌকিক রাধা-গাথার প্রতি তাঁর মমতার পরিচয়। এমন কি, আগেও বলেছি,—স-পার্ষদ মহাপ্রভু স্বয়ং দানলীলার একাধিক অভিনয়ও করেছিলেন।

পুরাণেতর ভাব-সংমিশ্রণ

চৈতন্যোত্তর যুগের ভাগবত কাব্যানুবাদ, তথা কৃষ্ণলীলা-গাথায়, তাই, পৌরাণিক ঐতিহ্যকে ছাপিয়ে নিতান্ত বাঙালি-স্বভাবিত দানলীলাদি কথাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। ফলে, এযুগের কৃষ্ণলীলা-কাব্যের কোন-কোনটিতে ভাগবতের দশম স্কন্ধের কাঠামোটি আছে; অন্য অনেকগুলিরই উপজীব্য নিছক দানলীলাদি লোক-কথা। যে-সকল কাব্যে ভাগবতের কাঠামোটুকু আছে, সেখানেও দশম স্কন্ধের কৃষ্ণ-জন্ম থেকে ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকা-লীলার অংশটুকুই বর্ণিত হয়েছে। তাতেও আবার মথুরা ও দ্বারকালীলা

ভাগবত অনুবাদে চৈতন্য-চেতনা

সূত্রাকারে মাত্র উল্লিখিত হয়েছে,—জোর দেওয়া হয়েছে ব্রজলীলার মধ্যবর্তী মধুর রসাত্মিকা কাহিনীর 'পরে। আর সেই প্রসঙ্গে প্রায় সর্বত্রই যথারীতি এসে পড়েছে দানলীলাদির লৌকিক কাহিনী। ফলে, ভাগবত অনুবাদের নামে বাংলা ভাষায় রাধাকৃষ্ণলীলার রাগাত্মিক লোক-কাহিনী সমষ্টিই একান্ত প্রধান হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশে চৈতন্য-সংস্কৃতির প্রভাবে 'পরম-সত্যে'র অনুসন্ধিৎসু পৌরাণিক কৃষ্ণ-কথা মধুর-রসোজ্জ্বল বাঙালি-ধর্মী প্রণয় গাথায় পরিবর্তিত হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্য-ইতিহাসের পক্ষে এই ঐতিহ্যটুকু অবশ্য স্মরণীয়।

বলাবাহুল্য, চৈতন্য প্রবর্তিত এই প্রেম রসোজ্জ্বলতার প্রভাবেই এ-যুগে অসংখ্য বাঙালি 'ভাগবতানুবাদ'-নামে মধুরলীলা-ঘন কৃষ্ণলীলা-কাব্য রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র তাঁর অতুল্য ভক্তি-রসানুভূতির সংগে এই শ্রেণীর সাহিত্যের শিল্প-মহিমা প্রকাশ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন এই সব কবি-সম্প্রদায়ের কালানুক্রমিক পরিচয় করেছেন উদ্ধার। অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন ২৪ জন কবি ও কাব্যের বিস্তৃত বিচার করেছেন। অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্র করেছেন নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ ভাগবত-অনুবাদ গ্রন্থাবলীর তুলনামূলক আলোচনা। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা কেবল পূর্বকথিত ঐতিহ্য সূত্রের অনুসরণ করেই ক্ষান্ত হব।

'যশোরাজ খান'

বাংলা কৃষ্ণলীলা-কাব্যসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন হুসেনশাহ্-পারিষদ যশোরাজ খানের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যের কোন-পুথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তবে, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী কাব্যে যশোরাজ খানের একটি 'ব্রজবুলি' পদ উদ্ধৃত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে এই পদটিই বাংলাদেশে লিখিত ব্রজবুলি কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন। আমরা পূর্বে পদটি উদ্ধার করেছি।

গোবিন্দ আচার্য এবং পরমানন্দগুপ্ত

চৈতন্য-পরিকর গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দগুপ্তের রচিত কৃষ্ণলীলা-কাব্যের উল্লেখও পরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু মূল কাব্য দু'টির কোন পুথি পাওয়া যায় নি।

চৈতন্যোত্তর যুগের যে সকল বাংলা ভাগবত-অনুবাদ কাব্যের পুথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে কাল-বিচারে প্রথমেই উল্লেখ্য,—রঘুনাথ-ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী'। ভাগবতাচার্য বরাহনগরের অধিবাসী

ছিলেন। গৌড় থেকে নীলাচল প্রত্যাবর্তনের পথে মহাপ্রভু এঁর আতিথ্য স্বীকার করেন। তখন ভাগবতাচার্যের সুললিত কণ্ঠে মূল সংস্কৃত ভাগবত পাঠ শুনে,—

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

"প্রভুবোলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচর্য।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য॥"—চৈঃ ভাঃ—

বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত এই তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, 'ভাগবতাচার্য' ছিল রঘুনাথের মহাপ্রভু-দত্ত উপাধি। কবি বহুমান্য শিরোভূষণের মত এই উপাধি নিজ গ্রন্থের ভণিতায় প্রায় সর্বত্রই ব্যবহার করেছেন। এর থেকে অনুমিত হতে পারে, চৈতন্যদেবের নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের পর রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণ-প্রেম তরঙ্গিণী' অনুবাদ-কাব্য সূচিত হয়েছিল।

গ্রন্থ-রচনা-প্রসঙ্গে ভাগবতাচার্য পণ করেছিলেন,—"মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা।"—আনুপূর্বিক গ্রন্থটির মধ্যে তিনি এই পণ সম্পূর্ণ রক্ষা করেছেন। সুবৃহৎ অনুবাদ কাব্যটিতে শ্রীমদ্ভাগবতের মোটামুটি বারটি স্কন্ধেরই অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু, এই অনুবাদ মূলের আক্ষরিক অনুসরণমাত্রই নয়; প্রতিটি স্কন্ধের মূল প্রতিপাদ্যটুকু গ্রহণ করে কবি স্বাধীন-ভাবে বাংলা ভাষায় তার রূপায়ন সাধন করেছেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

কোন স্কন্ধে মূলাপেক্ষা অধ্যায় সংখ্যা বেশি, কোথাও বা কম। কোথাও কোথাও মূলের শ্লোকাবলী এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে গৃহীত হয়েছে। মোট-কথা, মূল ভাগবত-কথাকে কবি ইচ্ছামত ঢেলে সেজেছেন: আর এই নবীন রূপ-সজ্জায় উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার পরিচয় প্রায় সর্বত্র সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, রঘুনাথ গদাধরপণ্ডিতের শিষ্য এবং পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মূল সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যায় এই পাণ্ডিত্য বিশেষ সক্রিয়, সার্থক হয়েছিল;—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"

উদ্ধৃত শ্লোকটির ভাবব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাগবতাচার্য সিদ্ধান্ত করেছেন,—

"কৃষ্ণপদে কৃষ্ণ বলি বর্ণপদে নাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জানিহ বিধান॥
ত্বিষা কৃষ্ণ অকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ নিজধাম।
গৌরচন্দ্র অবতার বিদিত বাখান॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র অবতার নিত্যরস রঙ্গে॥
যুগধর্ম সংকীর্তন যজ্ঞ লক্ষ্য করি।
বিচারিয়া সুপণ্ডিত ভজয়ে শ্রীহরি॥
কৃষ্ণ অবতার যদি বলি কলিযুগে।
তবে পূর্বাপর গ্রন্থে বিরোধ না ভাঙ্গে॥
তে কারণে বুধগণে মোর পরিহার।
দোষ দিহ পূর্বাপর করিয়া বিচার॥"

আলোচ্য শ্লোকটির সহায়তায় জীবগোস্বামী পরবর্তীকালে চৈতন্যের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু, এ সম্বন্ধে ভাগবতাচার্যের চেষ্টাই প্রথম-সক্রিয়তার মাহাত্ম্য দাবি করে।

স্পষ্ট বোঝা গেল, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য চৈতন্য-ভক্তি-প্রণোদিত-চিত্তে ভাগবতানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এদিক থেকে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল বিশেষভাবে ভক্তিমার্গী। অন্যদিকে, চৈতন্যোত্তর বাংলা ভাগবতানুবাদ কাব্যের পূর্বকথিত বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রায় একটিও আলোচ্য কাব্যে উপস্থিত নেই।

ইতিহাসের প্রমাণ

দানলীলা-নৌকালীলাদি লৌকিক কাহিনী ত নেই-ই, তাছাড়া আদ্যন্ত কাব্যে পৌরাণিক ভাগবত-ঐতিহ্যই মোটামুটি অনুসৃত হয়েছে। এসম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য,—ভাগবতাচার্য চৈতন্য-সমসাময়িক যুগে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ-রচনাকালে চৈতন্য-ঐতিহ্য সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা লাভের অবকাশ পেয়ে ওঠেনি। ধর্মাদর্শগত বিচারেও দেখি,—ভাগবতাচার্য অবতার-বর্ণনা-প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের উল্লেখ করেন নি। উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও চৈতন্যের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁকে 'বুধগণে'র নিকট 'পরিহার' ভিক্ষা করতে হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা গেল,—ভাগবতাচার্যের গ্রন্থ-রচনা-কালে চৈতন্য-মহাত্ম্যবোধের অঙ্কুর উদ্গত হলেও, সেই ভাব-মাহাত্ম্যের অন্তর্নিহিত মূল বাণী স্পষ্ট-গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি।

সদ্য-উদ্গত চৈতন্য-মহিমার প্রভাবেই ভাগবতাচার্যের কাব্যে ঐশ্বর্যধর্মী বর্ণনার চেয়ে ভক্তি-মার্গী বিশ্লেষণ প্রাধান্য লাভ করেছে।

ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণীতে অভিব্যক্ত চৈতন্যভাবাদর্শের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে দ্বিজ-মাধব রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল চৈতন্যোত্তর ভাগবতানুবাদ কাব্যের পূর্বকথিত সব কয়টি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দ্বিজ-মাধবের ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। নিত্যানন্দদাসের

দ্বিজমাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

প্রেমবিলাসে ইনি বিষ্ণুপ্রিয়ার খুল্লতাত-পুত্ররূপে উল্লিখিত হয়েছিলেন,—তাঁর পিতার নাম উল্লিখিত হয়েছে কালিদাস। আবার বৈষ্ণবাচার দর্পণের বর্ণনা অনুসারে কবি ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সহোদর। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের একটি পুথিতে কবির পিতার নাম লিখিত রয়েছে—পরাশর। অথচ বিষ্ণুরপ্রিয়ার পিতার নাম ছিল সনাতন। পূর্বোক্ত পুথিতে উদ্ধৃত তথ্য প্রামাণ্য হয়ে থাকলে বৈষ্ণবাচার দর্পণের ভ্রান্তি স্বয়ং-প্রকাশ হইয়া ওঠে। অন্যদিকে মৈমনসিংহ জেলার যশোদল-বাসী রাঢ়ী-বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামিগণ কবির উত্তরাধিকার দাবি করে থাকেন।

গ্রন্থরচনার কারণ সম্বন্ধে কবি বলেছেন,—

"স্বপনে পাইল কৃষ্ণ-চৈতন্য আদেশ।
সেই সে ভরোসা আর না জানি বিশেষ॥"

রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তিনি আবার বলেছেন,—

"ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্বজনে।
লোক-ভাষা রূপে কহি সেই পরিমাণে॥"

কিন্তু, গ্রন্থ-মধ্যে এই উক্তির সার্থকতা সর্বাংশে রক্ষিত হয় নি। সংস্কৃত ভাগবত-কথা ছাড়াও হরিবংশ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি বিভিন্ন পৌরাণিক সূত্র থেকে আলোচ্য কাব্যের কাহিনী যথেচ্ছ স্বাধীনতার সংগে

কাব্য-রচনা

আহৃত হয়েছে। তাছাড়া, লোক-দুর্বোধ্য সংস্কৃত কাহিনীর সর্বজন-বোধ্য বর্ণনার চেয়ে লোকপ্রিয় কাহিনীর চিত্রণের প্রকৃতিই শিল্প রচনার ক্ষেত্রে কবি সমধিক নির্ভর করেছেন। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে 'দানলীলা' 'নৌকালীলা'দি লৌকিককাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা লক্ষিত হয়। তাছাড়া, ভাগবতের একচ্ছত্র নায়ক শ্রীকৃষ্ণের পাশে একমাত্র নায়িকা হিসেবে

আবির্ভূতা হয়েছেন ভাগবত-বহির্ভূতা রাধা। ভাগবত-তথ্যোদ্ধারের চেয়ে মধুর রস-সমৃদ্ধ রাধাপ্রেমের আবেগময় বর্ণনার প্রতিই কবির প্রবণতা সমধিক। তাই, কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যের শিল্প-কৃতি পাণ্ডিত্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভাব-নির্ভর। এই ভাবৈশ্বর্যের প্রভাবে স্থানে স্থানে রচনা সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে ;—সে সকল জায়গায় আছে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ। এই ভাব-প্রধান সাংগীতিক সমৃদ্ধির জন্যই দ্বিজ-মাধবের কাব্য বাংলার গণ-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, চৈতন্যোত্তর যুগের ভাব-বৈশিষ্ট্যে সু-সমৃদ্ধ এই কাব্য চৈতন্য-সমসাময়িক কালের খুব পরে রচিত হয় নি। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় কবি দ্বিজমাধবের উল্লেখ দেখে তাঁর প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাছাড়া, প্রেমবিলাস কিংবা বৈষ্ণবাচারদর্পণের বর্ণনা প্রামাণ্য যদি না-ও হয়, তবু কবির রচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য থেকেও বোঝা যায়, তিনি চৈতন্য-সান্নিধ্য-লাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন। তাহলেও, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কাব্য-রচনা কালের পরে যে মাধবের কাব্য রচিত হয়েছিল, এ অনুমানের কারণ আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—রঘুনাথের কাব্য-রচনা কালে চৈতন্যের 'অবতারত্ব' অবিসংবাদি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ফলে, অবতার-বর্ণাংশে কবি চৈতন্যের উল্লেখ করেন নি। গ্রন্থের পরবর্তী অংশে এসম্বন্ধে নিজ মত যুক্তি-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। কিন্তু মাধব-কবি তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভেই চৈতন্য-স্মরণ করেছেন,—

কাব্যরচনাকাল

"সব অবতার শেষ কলি পরবেশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র গুপ্ত যতিবেশ॥"

এর থেকে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন,—রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের গ্রন্থ-রচনাকালে যে চৈতন্য-অবতারবাদ অঙ্কুরিত হয়েছিল, পরবর্তীকালের সমাজে তা সর্বজনীন স্বীকৃতিলাভের পর দ্বিজমাধবের কাব্য রচিত হয়'। গ্রন্থ দুখানির ভাবাদর্শগত পার্থক্যের বিচারেও আমরা এই সিদ্ধান্তের 'পরে জোর দিতে চাই। চৈতন্য-প্রভাব সহজ সংস্কার-রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ভাগবতাচার্যের কাব্য রচিত হয়েছিল বলে, তাতে কেবল ভক্তিমার্গী চেতনার প্রথমোদ্গমটিই লক্ষিত হয়। কিন্তু, দ্বিজমাধবের কাব্য-রচনাকালে চৈতন্য-ঐতিহ্য সমাজে অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাই,

আলোচ্য কাব্যে চৈতন্যোত্তর ভাবাদর্শের পুষ্পিত বিকাশ হয়েছে সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ। পরবর্তী কাব্য-প্রবাহের মধ্যে এই সম্পূর্ণতার অনুবর্তন, বিবর্তন এবং পরিসমাপ্তিটুকু কেবল লক্ষ্য করব।

কৃষ্ণদাসের নামে প্রাপ্ত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের কবি-প্রদত্ত নাম 'মাধব-চরিত' ছিল বলে মনে হয়। কারণ, প্রায়-প্রতি অধ্যায়-শেষের ভণিতায় ঐ নামই উল্লিখিত হয়েছে;—ক্বচিৎ কখনো ভণিতাংশে 'কৃষ্ণমঙ্গল' নাম পাওয়া যায়। কবির পিতার নাম যাদব, মাতা পদ্মাবতী। তাঁর বাসস্থান ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে কৃষ্ণদাস মাধবাচার্যের 'সেবক' ছিলেন। এইজন্যই শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈতপ্রভু, রূপ, সনাতন, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির সঙ্গে তিনি মাধবাচার্যকেও বন্দনা করেছেন।[১৭] কিন্তু, অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে কবি শ্রীনিবাস আচার্যের সেবক ছিলেন। কৃষ্ণদাসের কাব্য বস্তুতঃ ভাগবতের অনুবাদ নয়,—বিভিন্ন পুরাণ-কথা থেকে আহৃত বিচিত্র কৌতূহলাবহ কাহিনীর সমষ্টি। 'হরিবংশ' মতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি, "ভারতের মতে" দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংকলিত কাহিনীর প্রভাবে গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ রচিত হয়েছে। মধুর রসাত্মক কাহিনী বর্ণনার প্রবলতা ও সার্থকতা কৃষ্ণদাসের কাব্যে মাধবের গ্রন্থেরই অনুরূপ। কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য ষোড়শ শতকের শেষ অথবা সপ্তদশ শতকের একেবারে প্রথম ভাগে রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

কৃষ্ণদাসের মাধব-চরিত

ষোড়শ শতকের ভাগবত অনুবাদকদের মধ্যে কবিশেখর অন্যতম বিখ্যাত কবি। আত্ম-বিবরণী থেকে জানা যায়,—তাঁর পিতার নাম ছিল চতুর্ভুজ,—মাতা ছিলেন হীরাবতী বা হারাবতী। কবির পিতৃ-দত্ত নাম ছিল দৈবকীনন্দন সিংহ। ডঃ সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন,—আলোচ্য দৈবকীনন্দন কবিশেখর, এবং পদাবলী-বিখ্যাত 'বাঙালি-বিদ্যাপতি' রঘুনন্দন-শিষ্য রায়শেখর কবিশেখর ইত্যাদি ভণিতার আকর কবি এক ও অভিন্ন।[১৮] অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু বিভিন্ন প্রমাণ উদ্ধার করে এই মতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন;—অধ্যাপক বসুর

কবিশেখর দৈবকীনন্দন

১৭। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়:—খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, ভূমিকা।

১৮। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড।

যুক্তিসমূহ সর্বথা উপেক্ষণীয় নয়। যাইহোক্, কবিশেখর-দৈবকীনন্দনের রচিত একাধিক সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে। সংস্কৃতভাষায় 'গোপালচরিত মহাকাব্য' ও 'গোপীনাথ-বিজয়' নাটক, বাংলা ভাষায় 'গোপালের কীর্তনামৃত' [১৯] রচনার পরেও পরিতৃপ্ত হতে না পেরে তিনি বাংলাভাষায় 'গোপালবিজয় পাঁচালী' রচনায় ব্রতী হন। এই গ্রন্থ-রচনার প্রসঙ্গে কবি নিজে স্বীকার করেছেন,—

> "আর একখানি দোষ না লবে আমার।
> পুরাণের অতিরিক্ত লিখিব অপার ॥"

সমগ্র গ্রন্থটিতে কবি যেন এই উক্তিটিরই সার্থকতা প্রতিপাদন করেছেন। ভাগবত-কাহিনী অপেক্ষা লৌকিক গল্পাদির প্রতিই তাঁর প্রবণতা ছিল সমধিক; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগেই গ্রন্থাদর্শের সাদৃশ্য বেশি। এসব কাহিনীর আহরণে কবি চৈতন্য-প্রভাবিত ভক্তি-ভাবের দ্বারাই আনুপূর্বিক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই জন্যই দৈবকীনন্দনের কাব্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে সহজ কবিত্বের পরিচয়ই অধিক।

'দুঃখী' শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' ঈশানচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় বঙ্গবাসী-কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থানুযায়ী কবির পিতার নাম ছিল শ্রীমুখ ও তাঁর মাতা ছিলেন ভবানী। গ্রন্থ-সম্পাদকের মতে মেদিনীপুর-সহর থেকে ১৬ মাইল দূরবর্তী হরিহরপুর গ্রামে কবি শ্যামদাসের বাস ছিল; কবির গ্রন্থ-রচনার কাল ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী। কিন্তু, অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু অনুমান করেন,—"সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি বর্তমান ছিলেন।"[২০] আবার, ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন,—দুঃখী শ্যামদাসের পিতা ও বিখ্যাত মহাভারতকার কবি কাশীরাম দাসের খুল্ল-পিতামহ শ্রীমুখ ছিলেন এক-ও অভিন্ন ব্যক্তি। এই বিচারে, ডঃ সেনের মতে, শ্যামদাসের কাব্য "ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি"[২১] সময়ের রচনা হওয়া সম্ভব। শ্যামদাসের কাব্যেও লৌকিক কাহিনীর প্রভাব অধিক। মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে লিখিত 'রাধার-বারমাস্যা' অংশ যুগপৎ কৌতুকাবহ ও হৃদয়স্পর্শী।

'দুঃখী' শ্যামাদাসের গোবিন্দমঙ্গল

১৯। ডঃ সুকুমার সেন 'কীর্তনামৃত' অর্থে পদসংগীত বুঝেছেন।

২০। বাঙালা সাহিত্য—২য় খণ্ড। ২১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড।

'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্যের কবি 'কৃষ্ণকিঙ্কর' শ্রীকৃষ্ণদাস মহাভারতের কবি-শ্রেষ্ঠ কাশীরাম দাসের অগ্রজ ছিলেন। কাশীদাসানুজ গদাধর তাঁর জগন্নাথ মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেছেন,—

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণ বিলাস

"প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস কৃষ্ণের কিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গীত অতি মনোহর॥"

কৃষ্ণদাসের ব্যক্তি-পরিচয় কাশীদাস-প্রসঙ্গেই উদ্ধৃত হয়েছে। কাশীদাসের মহাভারত রচনার দু-এক বৎসর পূর্বে কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন, এমন অনুমান সিদ্ধ হলে গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক দু-এক বৎসরের মধ্যে রচিত হওয়া সম্ভব। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের কাব্যগত-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য নয়; দানলীলাদি লৌকিক কাহিনীর প্রভাবও গ্রন্থ-মধ্যে দুর্লভ। কাব্যখানি গতানুগতিক পয়ার ছন্দে রচিত। যদিও একাধিকস্থানে কবি নিজ গ্রন্থকে 'ভাগবত-সার' নামে অভিহিত করেছেন, তবু, বস্তুতঃ গ্রন্থটিতে ভাগবতেতর কাহিনীরও অভাব নেই।

কবি অভিরামদাসের[২২] শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকের কোন সময়ে। এই গ্রন্থেও দানলীলাদি লৌকিক কাহিনীর বর্ণনা বিস্তৃত নয়। অভিরামের কাব্যের কিছু অংশ অষ্টাদশ শতকের কবি কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া গেছে। অভিরাম গ্রন্থারম্ভ করেছেন,—চৈতন্য-বন্দনা করে।

অভিরামদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের-কবি[২৩] ভবানন্দের 'হরিবংশ'কাব্যের সংগে মূল সংস্কৃত-হরিবংশের কোন সংযোগই নেই। প্রধানতঃ দানলীলাদি লৌকিক-কাহিনীই গ্রন্থটির অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছে। ভবানন্দের কাব্যের এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১৬৮৯-৯০ খ্রীঃ। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন, মূল গ্রন্থের রচনাকালও এর চেয়ে খুব প্রাচীন নয়। কবির পিতার নাম ছিল শিবানন্দ। ভবানন্দের গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য,—গ্রাম্য রাধা-কৃষ্ণ-কথাকে তিনি সরস রূপ দান করেছেন।

ভবানন্দের হরিবংশ

দ্বিজ-পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের একখানি আদ্যন্ত-সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কার

২২। মতান্তরে 'দত্ত'। ২৩। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড (২য় সং)

করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কাব্যটিতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদির বর্ণনা লক্ষিত হয়ে থাকে। পরশুরাম বীরভূম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে মনোহর দাসের নিকট কবি 'ভেকাশ্রয়' গ্রহণ করেন।[২৪] ড: সুকুমার সেনের অনুমান,— কবি হয়ত "শ্রীখণ্ডের শিষ্য ছিলেন।"[২৫]

দ্বিজ পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল

সপ্তদশ শতাব্দীর আরো বিভিন্ন কবির উল্লেখ ড: দীনেশচন্দ্র, ড: সুকুমার সেন, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রমোহন বসু করেছেন। কিন্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে সে সকলের বিস্তৃত পরিচায়ন অপরিহার্য নয়। কারণ,—আলোচ্য শতকের একেবারে প্রথম থেকেই এই শ্রেণীর কাব্য-প্রবাহে উল্লেখ্য কবি-কৃতির অভাব সু-প্রকট হয়ে উঠেছে; কাহিনী-বৈচিত্র্য-রচনার অবকাশ-ও গতানুগতিকার মধ্যে হয়েছে আচ্ছন্ন। পূর্ববর্তী আলোচনাতেই উল্লেখ করেছি, - মোটামুটি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে চৈতন্য-সংস্কৃতির বিপর্যয়-সূচনার সংগে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কাব্যিক প্রচেষ্টার সজীবতা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছিল। ভাগবত কাব্য-প্রবাহের পক্ষে এই বিপর্যয় আরো স্বল্পতর সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। কারণ, পূর্বেই বলেছি;—'ভাগবতানুবাদ'-নামধেয় এই সকল বাংলা কৃষ্ণ-কাহিনী-কাব্যের প্রধান উপজীব্য ছিল পদাবলী সাহিত্যেরই মত রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম কথা। আবার, এই রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম কথা বিশেষভাবে পদ-সংগীতের মাধ্যমেই সমধিক রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। ফলে, এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ কবিগণ পদাবলীকেই কাব্য-কৃতির আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে, প্রধানতঃ 'অপূর্ববস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা'র অভাবেই অপেক্ষাকৃত শীঘ্র আলোচ্য শ্রেণীর কাব্য-প্রবাহের শিল্প-সমৃদ্ধি বিনষ্টি লাভ করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণলীলাখ্যান কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য

অষ্টাদশ শতকের 'ভাগবতানুবাদ' কাব্যেও ছিল যথারীতি জীবন-ধর্মের অভাব। কাহিনীর সংহতি ও গভীরতার চেয়ে বিভিন্ন সূত্রাগত বৈচিত্র্য ও 'চমৎকারিত্ব' সৃষ্টির প্রতিই ছিল এ-যুগের প্রধান প্রবণতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাগবতানুবাদ-কাব্য

২৪। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'—খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত।

২৫। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—ঐ।

কবি বলরাম দাসের 'শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত' কাব্য পূর্ব-কথিত বৈশিষ্ট্যের আকর। গ্রন্থখানির কাহিনী-অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের চেয়ে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের দ্বারাই সমধিক প্রভাবিত। কবির নিজের উক্তি থেকেই জানা যায়, ১৬২৪ শক অর্থাৎ ১৭০২—'০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কবি সহজিয়া-পন্থী ছিলেন বলে মনে হয়। তারা-নাম্নী গোপ-কন্যার "কৃপার লেশে" তিনি "রসগান" করতে পেরেছিলেন।

বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত

দ্বিজ রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে মোটামুটি শ্রীমদ্ভাগবতের মূলানুসরণ করা হয়েছে। কাহিনী অংশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাবও একেবারে বাদ পড়ে নি।

রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়

রামায়ণকাব্যের বিখ্যাত কবি শঙ্কর চক্রবর্তী অন্যান্য গ্রন্থের সংগে ভাগবতামৃত-গোবিন্দমঙ্গল কাব্যও রচনা করেন। রামায়ণ কাব্যের আলোচনা-কালে কবির বিস্তৃত ব্যক্তি-পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে। শঙ্কর চক্রবর্তীর কাব্যে ক্রমানুগত ভাবে মূল ভাগবত-কাহিনীর অনুসরণ করা হয়েছিল। নয়টি স্কন্ধের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, বিশেষ ভাবে ভাগবতানুগ রাসলীলা-বর্ণনই অতিদীর্ঘ। শ্রীমদ্ভাগবত ছাড়া শঙ্করের কাব্যে হরিবংশ এবং ভবিষ্যপুরাণের অনুসরণও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়ে থাকে।

শঙ্কর চক্রবর্তীর ভাগবতামৃত

অষ্টাদশ শতকের বাংলা 'ভাগবতানুবাদ' কাব্যের পরিচায়ন আর দীর্ঘায়ত করব না। পূর্বের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে,—নিতান্ত স্থূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এই সব রচনাকে ভাগবতের অনুবাদ বলা চলে না। স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণেই আলোচ্য সময়ের বাঙালি চেতনায় চৈতন্য-প্রভাবিত জীবন-রস শুষ্ক-প্রায় হয়ে আস্‌ছিল। আর, প্রাণশক্তির সেই অভাব পূরণের জন্য কবির পর কবি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ ইত্যাদি অজস্র পুরাণ-কথা থেকে যথেষ্ট কাহিনীর আহরণ ও বিন্যস্ত সংগ্রন্থন করেছেন। ফলে, এ-সব রচনায় ভাগবত-কথা, এমন কি ভাগবত-ঐতিহ্যেরও বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নি ;—আর চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তি-ভাবুকতার কথা ত বলাই বাহুল্য। এই সকল বিমিশ্র-পুরাণ কথার বৈচিত্র্য রচনার পথে অষ্টাদশ-উনিশ শতকের

অষ্টাদশ শতকের ভাগবত-অনুবাদ

কোচবিহার রাজসভা বিশেষ পোষকতা করেন। তাছাড়া, এই বৈচিত্র্য-বুভুক্ষারই প্রভাবে, এ-সময়ে বিভিন্ন বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গোস্বামি-গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল। একাধিক কবি গীতগোবিন্দের অনুবাদও করেছিলেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে এই সব রচনার বিস্তৃত বিচারের প্রয়োজন নেই, কারণ, সাহিত্যিক রচনা হিসেবে এ-সবই প্রায় মূল্যহীন। তবে, চৈতন্য-সংস্কৃতি-বিপর্যয়ের যে ঐতিহাসিক ধারার কথা পূর্বে বলেছি, তার সমুৎকৃষ্ট উদাহরণ পাই এ-সময়ে রচিত বৈষ্ণব-সহজিয়া গ্রন্থাবলীর মধ্যে। চৈতন্য প্রবর্তিত মধুর-রস-ঘন ধর্ম-সাধনা বিপর্যস্ত রূপে দেহাচার সর্বস্বতা প্রাপ্ত হয়েছিল এই সহজিয়া ধর্মাচরণের মাধ্যমে। ভাবাকৃতি-প্রধান ধর্মের নৈতিক বিনষ্টির ইঙ্গিত এই পর্যায়ে সুস্পষ্ট হয়েছে।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত দেহ-কড়চা, চৈত্যরূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি গ্রন্থ এই শ্রেণীর রচনার উল্লেখ্য নিদর্শন। এই জাতীয় রচনার সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নেই। তবে ঐতিহাসিক বিচারে, পূর্ব-কথিত বিপর্যয়ের ইঙ্গিত ছাড়াও,—এই ধরণের রচনাবলীর মধ্যে বাংলা গদ্যের একটা ভগ্ন, অপূর্ণ-রূপের দ্যোতনা স্পষ্ট হয়েছিল। এ কালের সহজিয়া-চেতনার পুনর্বিকাশে বৌদ্ধ-সহজিয়া আদর্শের প্রভাবও যে যথেষ্ট ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে সমসাময়িক বাউল সম্প্রদায়, এবং তাঁদের নামে প্রচারিত গানগুলিতে। এই বাউল সংগীত বাংলার লোক-সাহিত্যের (Folk Literature) জন-প্রিয় নিদর্শন রূপে আধুনিক রসিক-চিত্তকেও মুগ্ধ করে। কৃষ্ণদাসের আত্ম-চিন্তামণি সহজিয়া ভাব-সাধনার আর একখানি উৎকৃষ্ট পরিচায়ক গ্রন্থ। 'আত্ম-চিন্তামণি' কাব্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

সহজিয়া সাহিত্য

এই প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘতর করার যৌক্তিকতা নেই। তবে, সদ্য-আলোচিত অংশের ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। চৈতন্যোত্তর যুগে বাংলার অভিজাত এবং লোক-সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গি-মিলনে এক নূতন সর্বজনীন বাঙালি-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। চৈতন্য-প্রভাবের শিথিলতার সংগে সংগে তা আবার বিভক্ত,—বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতার পরিণামে একদিকে যেমন গড়ে উঠেছিল স্মার্ত-পৌরাণিক আদর্শ-নির্ভর অভিজাত সাহিত্য; আর একদিকে

ঐতিহাসিক ইঙ্গিত

লোক-সমাজের পুনরভ্যুদয়ের সংগে সংগে লোক সাহিত্যেরও ঘট্‌ছিল ক্রমাভ্যুদয় ;—একদিকে ছিল বিভিন্ন পুরাণের অনুবাদ ;—আর একদিকে সহজিয়া কড়চা,—বাউল সংগীত ইত্যাদি। এই বিভেদের ক্রম-পরিণতিতেই আধুনিক যুগ-বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়েছিল, সেটুকু আমাদের বিচার্য নয় ;—কেবল বিপর্যয়ের স্বরূপটিই লক্ষিতব্য।

বিংশ অধ্যায়

চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্য

চৈতন্যোত্তর মঙ্গল কাব্য প্রভাবের যুগগত ঐতিহ্য ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছি, একাধিক অধ্যায়ে। বর্তমান প্রসঙ্গারম্ভে স্মৃতি সহায়তার জন্য সেই পূর্ব-কথার সার-সংকলন করব কেবল।

(১) মঙ্গলকাব্য সমূহের উৎসরূপে পাঁচালী কাব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়ে থাকে। বাংলার আদিমতম অধিবাসীদের ধর্মচেতনা-সম্ভব বিভিন্ন লোক-কাহিনী-কাব্য ছিল এই পাঁচালীর উপাদান।

(২) ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কী আক্রমণোত্তর পুনর্গঠন-যুগে এই অ-পূর্ণগঠিত পাঁচালী সাহিত্য নূতন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সাম্প্রদায়িক কাব্যের রূপ গ্রহণ করে। আগেই বলেছি, এই নব কাব্য-রূপ রচনার প্রেরণা এসেছিল অভিজাত অনভিজাত বাঙালি চেতনার সমন্বয় সাধনের ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষা থেকে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় এটি "মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব যুগ (Age of origin)[১]।" পূর্বেই দেখেছি, এই উদ্ভবযুগে আলোচ্য শ্রেণীর কাব্যের ভাব-রূপে সুবিন্যস্ত শিল্প-সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি। অবশ্য, পূর্ণায়ত, বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির উপযোগী সুস্থ জীবন বোধও সে-কালের মঙ্গল-কবিদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল না। কারণ, তখনও রসাকৃতির চেয়ে সাম্প্রদায়িক অধিকার-বিস্তারের প্রতিই জিগীষামূলক প্রবণতা ছিল একান্ত। বস্তুতঃ, অভিজাত-অনভিজাত সমাজ-সম্মিলনের ব্যাপক পটভূমিকে আশ্রয় করে দৈবী সংস্কারের আদিম অন্ধতাই সেদিন নূতন পৌরাণিক প্রচ্ছদে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল। ফলে দেবতার যথেচ্ছাচারী শক্তির অজস্রতা ও বিভীষণতা প্রতিপাদনের প্রতিই উদ্ভব-যুগের মঙ্গল-কবির আকাঙ্ক্ষা ছিল উদগ্র। তাই, একদিকে দেবশক্তি দৈবী-মহিমাবর্জিত পাষাণী, বিভীষণা রূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন,—আর তাঁর বরাভয়হীন রুষ্টমূর্তির সম্মুখে মনুষ্য চরিত্রাবলীও মানব-গুণ বর্জিত, মেরুদণ্ডহীন নিঃশক্তি যূপবদ্ধ পশুর মত প্রতিভাত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য-স্বভাব ও চৈতন্য-চেতনা

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

(৩) কিন্তু চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যে সাম্প্রদায়িক প্রয়োজন বুদ্ধির তীব্রতা লুপ্ত হয়েছে, দেবতার ভৈরব-রূপ হয়েছে সংহৃত। সংগে সংগে উগ্র ধর্ম-প্রীতির স্থান অধিকার করেছে উদার-ব্যাপ্ত মানব-প্রীতি,—'জীবে প্রেম'। ফলে, লোক জীবন-সম্ভূত প্রাচীন কাব্য-কথা রূপান্তরিত হয়েছে, নব জীবন-গাথায়। সেই জীবন-বোধের প্রভাবে দেবতা গৌণ হয়েছেন, মানুষ গ্রহণ করেছে দেব-প্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের প্রধান ভূমিকা। বস্তুতঃ, চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্য আত্মশক্তি-দীপ্ত মনুষ্যত্বের বিজয়-গাথা। মানুষের প্রতি উদার প্রেম-মূল্যবোধের প্রভাবে শ্রেণি-ধর্ম-নির্বিশেষে গ্রামীন বাংলার সকল জীবন-পর্যায়ের পূর্ণ সামাজিক আলেখ্য স্বত-সমুদ্ভাসিত হয়েছে এই পর্যায়ের মঙ্গল-সাহিত্যে। ফলে, একদিকে জাতীয় জীবন-সম্ভব এই সব কাব্য-সাহিত্যে সমগ্র জাতির প্রাণময় ঐতিহ্য স্থায়ী আশ্রয় লাভ করেছে। অন্যদিকে আবার বহু কবির অকুণ্ঠ ঐতিহ্যানুসরণের প্রভাবে গড়ে উঠেছে এই সব কাব্য-কথা প্রকাশের একটি সংস্কারগত আঙ্গিক (Conventional technique)। ফলকথা, এ-যুগের বাংলা মঙ্গলকাব্য একাধারে জীবন-রসপুষ্ট ও শিল্পাঙ্গিক-সু-সম হয়ে উঠেছিল দিনে দিনে। তাই শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এই যুগকে মঙ্গলকাব্যের 'সৃজন যুগ (Age of creation)' নামে অভিহিত করেছেন।

(৪) আর, সবশেষে স্মরণ করি, এই সৃজনী-প্রেরণা (creative inspiration) বহু কথিত চৈতন্য-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ-প্রভাবে জাত। বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-চেতনার মন্ময় শিল্প-প্রকাশ; আর চৈতন্যোত্তর মঙ্গল-সাহিত্য সেই একই চেতনার বস্তুলীন রসাভিব্যক্তি।

মনসামঙ্গল কাব্য

এবারে, চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গলের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখ্য কবি ষষ্ঠীবর দত্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে এই কবির পরিচয় আচ্ছন্ন হয়েছিল মহাভারত-রচয়িতা ষষ্ঠীবর সেনের অন্তরালে। পূর্বে চৈতন্যোত্তর অনুবাদ-সাহিত্য-প্রসঙ্গে পিতা-পুত্র ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেনের কথা উল্লেখ করেছি।

ডঃ দীনেশচন্দ্রের মতে এঁদের বাসভূমি ছিল ঢাকা জেলার জিনারদি পরগণায়। ডঃ সেন মহাভারতের এই কবিদ্বয়কেই ষষ্ঠীবরের মনসামঙ্গলেরও রচয়িতা বলে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে শ্রীহট্ট বাসীদের দীর্ঘকালের

অভিযোগ ছিল। ষষ্ঠীবর সম্বন্ধে শ্রীহট্টীয়দের সে দাবি এতাবৎ উপেক্ষিতই হয়েছে। *মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক* শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য অধুনা তথ্যবিচার সহযোগে এই দাবির যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন[২]। শ্রীভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত কয়টি নিম্নে উপস্থিত করছি।

১। ষষ্ঠীবরের ভণিতায় আজ পর্যন্ত যত পদ্মা-পুরাণ-পুথি পাওয়া গেছে তার প্রায় সব কয়খানিই শ্রীহট্ট থেকে আবিষ্কৃত। ঐ সকল রচনায় শ্রীহট্টীয় ভাষারও প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

২। শ্রীহট্টের গয়গড়ে কবির আদিনিবাস এবং কবি-পূজিত উমা-মহেশ্বর মূর্তির ঐতিহ্য আজও সর্বজন-শ্রদ্ধেয় হয়ে আছে।

৩। প্রাচীন কুলজী গ্রন্থসমূহে বৈদ্য-দত্ত বংশজাত কবি গুণরাজ খাঁ ষষ্ঠীবরকে শ্রীহট্টবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। আরো জানা যায়, এই কবির একটি কন্যা থাকলেও ইনি অপুত্রক ছিলেন।

শ্রীভট্টাচার্য এই তথ্যাবলী এবং আরো নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন,—

১। মহাভারতের কবি পিতা-পুত্র ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন-বংশজাত,—গঙ্গাদাসের ভণিতায় মনসামঙ্গলেরও কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়।

২। কিন্তু, এই কবি-যুগল মনসামঙ্গলের কবি-শ্রেষ্ঠ ষষ্ঠীবর থেকে পৃথক্।

ষষ্ঠীবর

মনসা মঙ্গলের কবি শ্রীহট্টবাসী অপুত্রক ষষ্ঠীবর দত্ত,—তাঁর কাব্য শ্রীহট্ট-বাসীর জীবন-সম্পদ্।

ষষ্ঠীবরের মনসামঙ্গল কাব্যে সহজ-কবিত্বের চেয়ে সরস পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই বেশি। 'আরবী-ফারসী' ভাষায়ও ষষ্ঠী-কবির পণ্ডিত-জনোচিত অধিকার ছিল,—তার পরিচয় পাই লখিন্দরের বিবাহ যাত্রাকালে কাজিনগরের সরস বর্ণনা থেকে :—

"প্রথমে চলিল কাজি মীর বহর তাজি।
আঠার হাজার পাইক তাহার বামবাজি॥
সতর হাজার পাইক বামবাজ লড়ে।
ধানুকীর ফৈজ সব লড়ে ঘোড়ে ঘোড়ে॥

২। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

মুখে দোয়া করে কাজি হাতেত কোরাণ।
সাহেমানি দোলা আনি দিল বিদ্যমান॥
দোলা-এ চড়ি কাজি খসাইল মজা।
সেই দিন যমাবার পেগম্বরি রোজা॥
ভণে গুণরাজ খাঁনে কাজির বড়াই।
হিন্দুয়ান খণ্ডাইয়া খাওয়াইব গাই॥"

ওপরের ভণিতা থেকে বোঝা যাবে,—ষষ্ঠীবর গুণরাজ খাঁ উপাধিও ব্যবহার করেছিলেন। একই রচনাংশ থেকে এ-কথাও বোঝা যায় যে,—ষষ্ঠীবরের রচনা ছিল বর্ণনা-মূলক (narrative)। যে কোনো অবকাশে সরস গল্প জমিয়ে তোলার দিকেই ছিল কবির প্রধান প্রবণতা।

বংশীদাস

চৈতন্যোত্তর যুগের মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি দ্বিজ বংশীদাসের রচনা অধুনাতন্ কালেও বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'মহিলা-কৃত্তিবাস' নামে বিখ্যাত চন্দ্রাবতী ছিলেন বংশীদাসেরই কন্যা। চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণ কাব্যের আলোচনায় চন্দ্রাবতীর কাব্য-রসাকর জীবন-কথা ও তাঁর জনপ্রিয় কাব্যের পরিচয় দিয়েছি। চন্দ্রাবতীর রোমান্টিক জীবন-কাহিনীর চেয়েও দ্বিজবংশীর জীবন-রস-ঋদ্ধ মনসামঙ্গল পূর্ববঙ্গে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আর, এই সর্বজনীন প্রীতি-শ্রদ্ধার ফলে বংশীদাস-জীবনীসম্বন্ধেও বহু রোমান্টিক্ জন-প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল। তা ছাড়া, কবি-কন্যা চন্দ্রাবতীও পিতৃ-পরিচয় উল্লেখ করেছেন; দ্বিজবংশী নিজেও যৎসামান্য আত্ম-পরিচয় রেখে গেছেন। সব কিছু মিলিয়ে বংশীদাসের একটি আনুপূর্বিক ব্যক্তি-পরিচয় মোটামুটি গড়ে তোলা যায়। —কবির নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহাকুমার পাতুয়ারী গ্রামে। চন্দ্রাবতী নিজের পিতৃ-পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম, অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষী ছাড়ি যায়॥

দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥"

কবি-পিতা যাদবানন্দকে 'লক্ষ্মী' যে কারণে ত্যাগ করে ছিলেন,—সেই একই কারণে স্বয়ং কবির প্রতিও যে তিনি অধিকতর বিমুখ হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। দ্বিজবংশীর দারিদ্র্য-বর্ণনায় চন্দ্রাবতী বলেছেন,—

"ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পাণি ॥"

মনসাগীতি-ই কবির জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। মঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন,—"চৈতন্যের ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর সঙ্কীর্তন করিয়া নাম প্রচারের রীতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিজ বংশীদাসও সংকীর্তনের দল বাঁধিয়া সর্বত্র স্বরচিত ভাসানগান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ইহাতেই তাঁহার সাংসারিক অনটন কোন মতে দূর হইত।" 'ভাসান'-কবি হিসাবে দ্বিজ বংশী বিশ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন,—কিন্তু ভাসান-গায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছিল ততোধিক। সুকণ্ঠ দ্বিজবংশীর ভাসান-গানের অত্যাশ্চর্য মনোহারিতা বিষয়ে অ-পূর্ব লোক-প্রবাদ প্রচলিত আছে;—একদা নাকি ভাসান-গাইতে যাওয়ার পথে 'জালিয়ার হাওর' এ কবি নরহন্তা-দস্যু কেনারামের হাতে ধরা পড়েন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কবি দস্যুর কাছে জন্মের শোধ 'ভাসান-গান' করে নেবার অবকাশটুকু প্রার্থনা করেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রাণের অফুরন্ত আর্তি সুরের মাধ্যমে ঢেলে দিয়ে কবি বেহুলার বেদনা-সংগীত গানে তন্ময় হয়ে গেলেন। পাষাণ-হৃদয় দস্যুও সেই ভাব-তন্ময় সুর-সৃষ্টির মাধুর্যে অভিভূত হয়ে কবি-চরণে লুণ্ঠিত হল;— দস্যু কেনারামের বাকি জীবন নাকি কবি-সহচররূপে অতিবাহিত হয়।

বংশীদাস পরিচয়

বংশীদাসের কাব্যের কোন কোন পুথিতে রচনা-কাল-জ্ঞাপক একটি পদ পাওয়া গেছে,—

"জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজবংশী পুরাণ পদ্মার ॥"

এর থেকে অনুমিত হয়ে থাকে, কবি ১৪৯৭ শকে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু উদ্ধৃত কাল-জ্ঞাপক শ্লোকটির প্রামাণিকতা বিষয়ে পণ্ডিতগণ সন্দেহ

প্রকাশ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন,—কবির "জীবৎকাল সপ্তদশ শতকে হওয়া দুরূহ।"[৩] মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-লেখক গ্রন্থটির আভ্যন্তরীণ এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণ উদ্ধার করে অনুমান করেছেন,—"......দ্বিজবংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করাই সমীচীন বোধ হয়।" ডঃ সুকুমারসেন উদ্ধৃত সংশয় প্রকাশ করার পরেও দ্বিজবংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বংশীদাসের কাব্য রচনাকাল

প্রথমেই বলেছি,—দ্বিজবংশীর 'মনসারভাসান' চৈতন্যোত্তরযুগের মনসা-মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কাব্য। এ-কথাও বলেছি যে,—সাম্প্রদায়িক দৈবী-কাব্যসমূহ এ কালের যুগ-চেতনা-দীপ্ত কবিমানসের স্পর্শে বাঙালির জীবন কাব্যে পরিণত হয়েছে। এদিক থেকে দেখি চৈতন্য পূর্ব প্রাথমিক যুগের মনসামঙ্গল-কাব্যসমূহের সংগ্রামী কাহিনীর কেন্দ্র-ভূমি ছিল 'স্ত্রীলিঙ্গ'-দেবতা মনসার বিরুদ্ধে শিব-সাধক চন্দ্রধরের সাম্প্রদায়িক বিরূপতা। বংশীদাসে এসে চাঁদ-মনসার সেই বিরোধের পটভূমি পরিবর্তিত হয়েছে বাঙালি-ধর্মী বিমাতা ও সপত্নী-কন্যা গৌরী-মনসার পারস্পরিক ঈর্ষার কেন্দ্রভূমিতে। বংশীদাসের চন্দ্রধর 'উত্তরদেশ' থেকে ফিরে এসে সনকার মন্দিরে মনসা পূজা প্রথম প্রত্যক্ষ করে; মনসার সম্মুখে তখন সে প্রণতও হয়েছিল,—

কাব্য-পরিচয়

"পুরীর ভিতরে আসি দেখে পদ্মাবতী।
আপনি সাক্ষাৎ পাত্র নেতার সংহতি॥
তত্ত্ব জানি চান্দ আসি দেখে সন্নিধান।
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী ঘটে অধিষ্ঠান॥
করযোড়ে ভক্তিভাবে করিলেক স্তুতি।
ব্রহ্ম-স্বরূপিনী তুমি আদ্যা প্রকৃতি॥
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা॥
তোমার অনন্ত মায়া কে জানিতে পারে।
লক্ষ বলি দিয়া কালি পূজিব তোমারে॥"

চন্দ্রধরের এই স্বতঃস্ফূর্ত উদার মনোভাব চৈতন্যোত্তর যুগ-চেতনার-ই যে সহজ পরিচিতি-মাত্র, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পদ্মাপূজায় কৃত-সংকল্প

৩। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)

চন্দ্রধরের নৈশ-স্বপ্নে দেবী-চণ্ডিকা আবির্ভূত হয়ে বিবাদের অঙ্কুর বপন করেন,—

"শেষ প্রহর রাতি বলিলাই ভগবতী,
শুন পুত্র রাজা চন্দ্রধর।
কোথা হনে দুরাচার, লক্ষ্মীনাশ করিবার,
সনকা আনিল তব ঘর ॥
দুষ্ট দেবী বিষহরী পূর্বজন্মে তব বৈরি,
ঘরে আইল দুষ্ট মায়া পাড়ি।
যগুপি চাও কল্যাণ, কর তার অপমান,
মারি দড় হেঁতালের বাড়ি ॥"

স্পষ্ট বোঝা গেল, চৈতন্যোত্তরযুগের কবি বংশীদাস মনসামঙ্গল কাব্যের বিবাদের কেন্দ্র-ভূমি রচনা করেছেন শিবের পারিবারিক কোন্দলের মধ্যে। কিন্তু, এই বাঙালি-ধর্মী পরিকল্পনার উৎস-মূলে জাত কাব্য-কাহিনীতে চন্দ্রধর-চরিত্রের পৌরুষ-দৃঢ় মানবী-মহিমাকে বাঙালির কবি বংশীদাস কোথাও বিন্দুমাত্র সংকুচিত বা দুর্বল হতে দেন নি।—বিবাহ-বাসরে সর্পদংশনে লখাইর মৃত্যু-সংবাদ লাভের পর চন্দ্রধর-মূর্তি অঙ্কন করেছেন বংশীদাস—

"হেনকালে চান্দ আইল সর্প বিচারিয়া।
পথে পথে স্থানে স্থানে থানা চৌকি দিয়া ॥
পুরীর মধ্যে শুনিল বিলাপ কান্দা কাটি।
মার মার ডাক ছাড়ে হাতে লৈয়া লাঠি ॥
কিসের ক্রন্দন মোর পুরীর ভিতর।
শুনিয়া বলিবে কানী হৈয়াছি কাতর ॥
ধন্বন্তরীর পুত্র আছে সুষেণ গাডুড়ী।
সেই জিয়াইব পুত্র আন শীঘ্র করি ॥
সম্বাদ পাঠাইয়া আনে ধন্বন্তরী সুতে।
চান্দ বলে লখাইরে জিয়াও ত্বরিতে ॥
তারে শুনি সুষেণ চাহিল খড়ি লেখে।
বিনা পদ্মা পূজিলে জিয়ন নাহি দেখে ॥

কোপ করি বলে চান্দ সেত আমি নই।
ধন্বন্তরীর বেটা দেখি তে কারণে সই॥
শতেক লখাই যদি যায় এই মতে।
তেও না পূজিব কানী পরাণ থাকিতে॥
কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া।
ঢোল মৃদঙ্গ কাড়া আন ডাক দিয়া।

*   *   *

চান্দ বলে বাজুনিয়া লও গুয়া পান।
ঝুলাইয়া বাও বাদ্য বিষরী মুড়ান॥"

গৃহাশ্রম-সর্বস্ব বাঙালি কবির লেখনীও আদিম পৌরুষের বর্বরতা-মিশ্রিত উদাত্ততার পরিচয় অটুট রেখেছে,—বংশীদাসের শিল্প-প্রতিভার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এই রস-পরিমিতি বোধে। যথাস্থানে ঠিক যথাযথ ভাব-রূপটিকে সংযত-ভাষণের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছেন কবি। এই মন্তব্যের সার্থকতর সমর্থন খুঁজে পাই বেহুলার ভাসান-কথায়। কেবল পৌরুষ-প্রাখর্য নয়,—নারীসুলভ বেদনা-বিধুর করুণরস-সৃষ্টিতেও বংশীদাস অতুলনীয়।—বিপদসঙ্কুল জলপথে মৃত স্বামীর গলিত শব সম্মুখে ধরে বংশীদাসের বেহুলা বিলাপ করে চলে,—

"নিরখি নিরখি কান্দে চন্দ্রমুখী,
বসি ত্রিবেণীর ঘাটে।
ত্রিবেণীর চর, দেখি লাগে ডর,
ঠেকিল ঘোর সঙ্কটে॥
চান্দর কোঙর, প্রভু লক্ষ্মীধর,
দেহ হে উত্তর মোরে।
আমি অভাগিণী, কিছুই না জানি,
ভাসিলু একা সাগরে॥
তরঙ্গ যে দেখি, ভয়ে মুদে আঁখি,
কিসে যাই দেবপুরী।
তব অঙ্গ খসি, পড়ে রাশি রাশি
কেমনে পরাণ ধরি॥

জীবন-রস-সাধক বংশীদাস বাঙালি জীবনের প্রতিটি ভাব-বৈচিত্র্য, প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রাণ-স্পর্শী রস-রূপ দান করেছেন বলেই তিনি পূর্ববঙ্গের 'প্রাণের কবি'।

পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গল-কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বিশদ করে কেতকাদাস একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তার থেকে কবি-পরিচিতি আহরণ করা সহজ হয়েছে। বর্ধমান জেলায় কাঁদড়া গ্রামে কেতকাদাসের জন্ম হয়; কিন্তু নানা কারণে স্বদেশে অশান্তি দেখা দিলে তিনি দেশ-ত্যাগ করেন। ফলে, নানা পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে তাঁর বাল্য-শিক্ষালাভ ঘটে। অবশেষে রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্লের নিকট কবি তিনটি গ্রাম দান-রূপে লাভ করেন। সেখানে বাস করবার সময়ে এক সন্ধ্যায় খড় কাটতে গিয়ে মুচিনী বেশ-ধারিণী মনসা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কবি তাঁর গ্রন্থ-রচনা করেন। ক্ষেমানন্দ নিজ কাব্যে মনসাকে বারে বারে 'দেবী কেতকা' নামে অভিহিত করেছেন। যেমন :—'কিয়াপাতে জন্ম হৈল কেতুকাসুন্দরী'—ইত্যাদি। এই দেবী 'কেতুকার' দাস হিসেবে কবি নিজ নামের সংগে 'কেতকাদাস' অভিধা যুক্ত করেছিলেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে রচনাকালের স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। তবে, গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয়,—কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে অবস্থিত ছিলেন।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাসের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আন্তরিকতা অথবা সরলতা নয়,—পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রকাশ-ভঙ্গি, এবং সামাজিক রীতিনীতি ও ভৌগোলিক সংস্থানসমূহের বিশদ বর্ণনা। মনসামঙ্গলের প্রায় সব কয়টি কবিই বেহুলার স্বর্গপুরী গমনপথের মোটামুটি বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করেছেন,—তার মধ্যে ভাসান পথের ঘাটসমূহের অনেক কয়টিতেই কবি-কল্পনার প্রভাব সমধিক। কিন্তু ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথের "যে ২২টি ঘাট বা গ্রামের নাম আছে, তন্মধ্যে ১৪টি ঘাট বা গ্রাম এখনও দামোদর ও তাহার শাখা বাঁকা নদীর এবং বর্তমান বেহুলা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত।"[৪] দেব-সভায় বেহুলার নৃত্যের

কাব্য-পরিচয়

৪। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-রচিত 'মনসামঙ্গল' (ভূমিকা) সম্পাদক—অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

যে-চিত্র কবি ক্ষেমানন্দ অঙ্কন করেছেন, তাতে প্রাচীন কালের নটী নৃত্যের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে পূর্ববর্তী শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ

ক্ষেমানন্দের ভণিতায় মনসামঙ্গলের আরো একটি কাব্যের পুথি পাওয়া গেছে—কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্যের সংগে আলোচ্য কাব্যের পার্থক্য প্রায় আমূল। 'বঙ্গবাসীকার্যালয়' থেকে ৺বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল। কাব্যের আদর্শ-পুথি মানভূম জেলা থেকে সংগৃহীত;—গ্রন্থের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গিতে ঐ অঞ্চলের ছাপ স্পষ্ট। কাব্যটি বৈশিষ্ট্যবর্জিত,—ক্ষুদ্রাকার। ভণিতায় কোথাও 'কেতকাদাস' অভিধা নেই;—এই ক্ষেমানন্দ এবং কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের পার্থক্য সম্বন্ধে আজ আর প্রায় কোন সন্দেহই নেই।

কবি কালিদাস

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতর কবি কালিদাস ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মনসামঙ্গল-কাব্য রচনা শেষ করেন। গ্রন্থখানির কাহিনী অথবা চরিত্র-চিত্রণে মৌলিকতার পরিচয় প্রায় নেই। কিন্তু, ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি সরল, অনাড়ম্বর, অকারণ-পাণ্ডিত্য-বিবর্জিত। কাব্যে উল্লিখিত স্থানসমূহের অনেক কয়টিই বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় আজও অবস্থিত।

সীতারাম

ধর্মমঙ্গলের বিখ্যাত কবি সীতারাম রাঢ়ের ধর্মদেবতাকে মনসামঙ্গল-কাব্যেও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন;—এঁর মনসা-মঙ্গল কাব্যে মনসাকে ধর্ম-পূজায় বৃত থাকতে দেখা যায়।

জীবন মৈত্র

বগুড়াজেলার করোতোয়া-তীরবর্তী লাহিড়ীগ্রামের অধিবাসী কবি জীবন-মৈত্রের মনসামঙ্গলে আর এক ধরণের কাহিনী-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। জীবন মৈত্রের কাব্যের দুটি খণ্ড যথাক্রমে 'দেবখণ্ড' এবং 'বণিক্যখণ্ড' নামে অভিহিত। প্রথমখণ্ডে 'বন্দনাদি' গতানুগতিক বিষয়বস্তুর অবতারণা শেষে মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ প্রোক্ত সর্প ও মনসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে অনুরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা এ যুগের অন্যান্য কাব্যেও সাধারণভাবে লক্ষিত হয়ে থাকে। জীবনমৈত্রের কাব্যের দ্বিতীয়খণ্ড চন্দ্রধর-বহুলা-সম্বন্ধীয় পুরাতন কাহিনীর অনুবর্তনমাত্র।

কবি পরিচিতি বিষয়ে জানা যায়,—জীবনের পিতার নাম ছিল অনন্ত মৈত্র, মাতা—স্বর্ণমালাদেবী। কবি নাটোর-রাজ্ঞী রাণীভবানীর পুত্র রামকৃষ্ণের প্রজা ছিলেন ; এবং সাধারণ্যে 'পাগ্‌লা জীবন' নামে পরিচিত হন। জীবন মৈত্রের কাব্য ১১৫১ বঙ্গাব্দে রচিত হয়েছিল।

কবি-পরিচয়

মনসামঙ্গলকাব্যের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হতে পারে। চণ্ডী-মঙ্গল অথবা ধর্মমঙ্গলকাব্য একদা সাধারণ বাঙালির জীবনাদর্শকে উদ্বুদ্ধ ও পুষ্ট করে কাল-প্রভাবে লুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এসব কাব্যের পূজ্য আসন মন্দিরের অভ্যন্তরে সীমায়িত হয়েছে। কিন্তু, পূর্ববাংলার জনসমাজে মনসামঙ্গলের রসাবেদন বিশ শতকের মধ্যভাগেও ছিল সজীব ও অটুট। তাই দেশ-বিভাগ-পূর্ব পূর্ববঙ্গে বর্তমান শতাব্দীতে লেখা মনসামঙ্গল কাব্যের পরিচয়ও দুর্লভ ছিল না। একই কারণে,—মনসামঙ্গল কাব্যের কবি-সংখ্যাও বর্ণনাতীত। কিন্তু, বর্তমান আলোচনায় অজ্ঞাত-কুলশীল কবি-পরিচিতি উদ্ধারের চেষ্টা স্থগিত থাকতে পারে। কারণ, উদ্ধৃত আলোচনা থেকেই আলোচ্য শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব, সাহিত্যিক বিকাশ ও সর্বশেষ পরিণামের ঐতিহাসিক পদচিহ্ন স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পারবে। বিচার করলে দেখা যাবে,—পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে কথিত চৈতন্য সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ ও বিপর্যয়ের চিত্র এই কাব্য প্রবাহেরও বিবর্তন-পথে নিঃসংশয়ে লক্ষিত হয়ে থাকে। ইতিহাসের এই সংকেত যেখানে উপলব্ধি-গম্য হয়েছে, সেখানেই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য হয়েছে সার্থক।

শেষকথা

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে চণ্ডীমঙ্গল সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। মঙ্গলকাব্যের প্রখ্যাততম কবি শিল্পী মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রতিভা অভিব্যক্তি পেয়েছিল চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকেই অবলম্বন করে। মনসামঙ্গলের মত এই কাব্যের কবি-তালিকা সীমাতিক্রমী নয়। কিন্তু, সিদ্ধ-কাম কবি-সংখ্যা এখানেও একাধিক। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের আর একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। অধুনাতনকালে মনে করা হয়ে থাকে যে, মঙ্গলসাহিত্য ;—সে যে কালেরই হোক—মূলত পাঁচালী কাব্য-সম্ভূত বলেই

আজও তাদের মধ্যে পাঁচালীলক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিতব্য। বলা বাহুল্য, মঙ্গল-কাব্য যখন পাঁচালী-জাতীয় লোক-সংগীতের পর্যায় থেকে 'কাব্য'-পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে,—তখন থেকেই তার রসাবেদন পাঁচালী-কাব্যের রূপ ও ভাব-গত সকল সীমাবদ্ধতাকেই অতিক্রম করেছে। তা'হলেও দেখব চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করে লেখা মঙ্গলচণ্ডীর 'পাঁচালী', 'ব্রতকথা' 'ছড়া' ইত্যাদির সংখ্যাও কম নয়। এর থেকে দুটি অনুমান সিদ্ধ হতে পারে, (১) লৌকিক ব্রত-কথা জাতীয় গাথা-কবিতার সংগে মঙ্গলকাব্যের সম্পর্ক মৌলিক ;—অথবা, (২) অক্ষমতর কিছু কিছু মঙ্গল-কাব্যিক প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ পরিধি ও দুর্বল গঠনভঙ্গির প্রভাবে কোথাও কোথাও পাঁচালীর মত লোক-গাথার নিম্ন স্তরেই আবদ্ধ থেকেছে। চণ্ডীমঙ্গলের এই ঐতিহাসিক সংকেত অবলম্বনে পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি পারম্পরিক সম্পর্কের অনুমান গড়ে তোলা যেতে পারে।

ইতিহসের শিক্ষা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, সুবচনীরকথা, শনি অথবা লক্ষ্মীর পাঁচালী-জাতীয় রচনাকে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। মঙ্গলকাব্য-স্বভাবের পেছনে ইতিহাসাশ্রিত যে প্রাথমিক পূর্ব-পরিকল্পনা অপরিহার্য হয়ে আছে, সেটুকুই এই শ্রেণীর রচনার কাব্যিক সম্পদ। যে-সকল রচনায় সেই প্রাথমিক উপাদানটুকু উপস্থিত নেই,—অথবা, কাব্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও যে-সকল রচনা ঐতিহাসিক বিকাশে কোন স্পষ্ট পথ-সংকেত করে না,—সাহিত্য বা সাহিত্য-ইতিহাসের আলোচনায় সে সকল রচনা বিচার্য নয়। ফলকথা, মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের পেছনে পাঁচালী জাতীয় অপূর্ণ-গঠিত গাথা-কাব্যের প্রাথমিক প্রভাব হয়ত কিছু ছিল,—পরবর্তীকালে অক্ষম হস্তাবলেপের ফলে ঐ একই কাহিনী মঙ্গলকাব্যের শ্রেণী থেকে পাঁচালী কাব্যের পর্যায়ে অধঃপাতিত হয়ত হয়েছে, কিন্তু এইটুকুমাত্র সূত্রকে অবলম্বন করে সব কয়টি মঙ্গলকাব্যকে 'মেয়েলি ছড়া' ব্রতকথার সংগে সম্পৃক্ত করা চলে না। এ ধরণের বিচারের প্রারম্ভে সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক এবং কাব্যাঙ্গিক-সম্মত সংজ্ঞা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন,—'মেয়েলি ছড়া'

মঙ্গল ও পাঁচালীকাব্য

'পাঁচালীকাব্য' সমূহের কাল এবং রূপ-শিল্পগত মান নির্ণয়। আর, ঐসব ঐতিহাসিক মূল্য বিষয়ে অবধানতা রক্ষা করেও দেখব, মঙ্গলকাব্য ও অধুনাতন মেয়েলি ব্রতকথা বা পাঁচালী জাতীয় রচনা-গাথার কাহিনীগত উপাদান অনেক স্থলে অভিন্ন ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংগে চণ্ডীর পাঁচালী বা বিভিন্ন আঞ্চলিক মঙ্গলচণ্ডী ব্রত-কথার তুলনা-বিচার করলে এই সিদ্ধান্তের সূত্র-মূলক পরিচয় অন্তত পাওয়া যেতে পারে।

চৈতন্যোত্তর যুগের চণ্ডীমঙ্গল কবিদের মধ্যে বলরাম কবিকঙ্কণের প্রথম উল্লেখ করেছিলেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর মতে, "বলরাম কবি-কঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।"[৫] বলরামের কাব্যের কোন পুথি দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হয় নি;—কিন্তু বলরাম-কাব্যের অস্তিত্ব অনুমান করার পক্ষে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের একটি উক্তি সহায়ক হয়েছিল। মুকুন্দরামের গ্রন্থের বন্দনাংশে উল্লিখিত হয়েছে,—"বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।"—এই "শ্রীকবিকঙ্কণ" এবং বলরাম-কবিকঙ্কণ অভিন্ন ব্যক্তি বলেই অনুমিত হয়ে থাকেন। কিন্তু 'গীতের গুরু' হিসেবে মুকুন্দরাম কোন কাব্য-রচয়িতারই যে উল্লেখ করেছিলেন, এমন না-ও হতে পারে। এই শ্রীকবিকঙ্কণ একজন অভিজ্ঞ গায়েন হওয়াও অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, মুকুন্দরামের উল্লিখিত 'শ্রীকবিকঙ্কণ' ও বলরাম কবি-কঙ্কণ যে অভিন্ন ব্যক্তি, তারও প্রমাণ নেই। এসব সত্ত্বেও 'গীতের গুরু' অর্থে কোন কবিকেই যদি বোঝানো হয়ে থাকে, তবে মনে করা যেতে পারে,— শ্রীকবিকঙ্কণের রচিত কোন অপূর্ণ-গঠিত চণ্ডী-পাঁচালীকে অবলম্বন করেই মুকুন্দরামের সুগঠিত, পূর্ণাঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল। মুকুন্দরামের কাব্য-প্রকাশের পরে এই পাঁচালীখানি হয়ত ক্রমশঃ লুপ্ত হয়েছে।

বলরাম কবিকঙ্কণ (?)

এইরূপ আর একখানি বহুল-প্রচারিত চণ্ডীর পাঁচালীর রচয়িতা ছিলেন দ্বিজ জনার্দন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এর পাঁচালী কাব্যের বহু-সংখ্যক খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্রের অনুমান,— দ্বিজ জনার্দনের অপূর্ণ-গঠিত পাঁচালীই দ্বিজ-মাধব ও মুকুন্দরামের প্রতিভাধর লেখনীর স্পর্শে সার্থক কাব্য-রূপ লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে দ্বিজ-জনার্দনের গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র একখানি

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

পুথিকে "প্রায় ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন" বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু পুথিগুলির ভাষায় অত প্রাচীনতার পরিচয় লক্ষিত হয় না, এ-বিষয়ে আভ্যন্তরীণ বা বহিরঙ্গ অন্য কোনো প্রমাণও দুর্লভ। তাই, অধুনা পণ্ডিতগণ কেউ কেউ এই কাব্যটির প্রাচীনত্ব স্বীকারে অসম্মত হয়েছেন।[৬] তাহলেও

জনার্দনের চণ্ডীপাঁচালী

চণ্ডীমঙ্গল ও চণ্ডীর পাঁচালী কাব্যধারার অন্তবর্তী পারস্পরিক সম্পর্কের পূর্বকথিত সিদ্ধান্তের একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে দ্বিজ-জনার্দনের পাঁচালীর মূল্য সমধিক। ক্ষুদ্রাবয়ব হলেও এই কাব্যে কালকেতু ও ধনপতির দুটি কাহিনীই নিতান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মঙ্গল ও পাঁচালী কাব্যের কাহিনীগত এই অভিন্ন-সূত্রতা সত্ত্বেও এদের মধ্যবর্তী মৌল পার্থক্যটুকু বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এ সম্বন্ধে মঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য বিশেষ অর্থপূর্ণ,—"পাঁচালীর উদ্ভব প্রাচীনতর হইলেও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ আত্ম-বিলোপ ঘটে নাই। ইহারা ইহাদের নিজেদের পথে কার্য-সাধন করিয়াছে। মঙ্গলগান উচ্চতর সমাজে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের সহিত গীত হইত, পাঁচালী সাধারণ গৃহস্থের নিত্য পূজায় পঠিত হইত; উভয়ের ক্ষেত্র এক নহে, এবং একে-অন্যের স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই। ... ...পদ্মাপুরাণ কাব্যের সংগে সংগে সাধারণ সমাজে (বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজে) স্বতন্ত্র মনসার ব্রতকথার প্রচলনও এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায়।"[৭] চণ্ডীমঙ্গল এবং চণ্ডীর পাঁচালী সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।

এই সকল পাঁচালীজাতীয় রচনার কথা ছেড়ে দিলে, চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দের 'সারদা-চরিত' বা 'সারদা-মঙ্গল'ই[৮] প্রথমে উল্লিখিতব্য। মাধবের কাব্যের এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রায় সকল পুথিতেই যে কবি-পরিচিতি উদ্ধৃত হয়েছে, তার থেকে জানা যায়,—কবি পঞ্চ-গৌড়ের অন্তর্বর্তী সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল পরাশর। কবির জীবৎকালে পঞ্চগৌড় 'একাব্বর' রাজার (আকবর

দ্বিজমাধবের সারদাচরিত

৬। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)। ৭। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং) ৮। কাব্যখানির বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত সংস্করণের নাম 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'।

বাদশাহ) শাসনাধীন ছিল। কিন্তু শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে (২য় সং) দীর্ঘ তথ্য-বিচার সহ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন,—দ্বিজমাধবের পুঁথিসমূহে সাধারণভাবে উদ্ধৃত এই কবি-পরিচিতি মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজমাধবের ব্যক্তি-পরিচয়ই বহন করে থাকে। বিশেষভাবে গায়েনগণ-কৃত "গোলযোগ (Confusion)" প্রভাবেই একের পরিচয় অপরের কাব্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের 'দ্বিজমাধব' সপ্তগ্রাম থেকে মৈমনসিংহ জেলার নবীনপুর,—বর্তমান গোঁসাইপুর গ্রামে বাস-পরিবর্তন করেন। এই গোঁসাইপুর গ্রামে কবি-বংশধরগণ আজও প্রতিষ্ঠা-সহ বিদ্যমান। এঁদের বংশ-পঞ্জী এবং কৌলিক ঐতিহ্য এ'বিষয়ে শ্রীভট্টাচার্যের বিচারের প্রধান উপাদান যুগিয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা থেকেই দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বাধিক সংখ্যক পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে দেখে শ্রীভট্টাচার্য অনুমান করেছেন,—চট্টগ্রামেই হয়ত আমাদের আলোচ্য কবির বাসস্থান ছিল।

দ্বিজমাধবের ব্যক্তি-পরিচয় গোলযোগ

শ্রীভট্টাচার্যের বিচারের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। কবি পরিচিতি সম্বন্ধে স্পষ্ট-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে আরো গবেষণা ও বিচারের প্রয়োজন রয়েছে। তবে, 'মাধুকবি' সম্বন্ধীয় এতাবৎ-প্রচলিত পরিচয়ের গ্রহণ-যোগ্যতা স্বীকৃত যদি না হয়, তাহলে কবির ব্যক্তি-জীবন-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে।[১] সে যাই হোক্, মাধব-কবির গ্রন্থ-রচনার কালসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সাধারণভাবে নিঃসংশয়। কবি-রচিত গ্রন্থের এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রায় সকল পুথিতেই নিম্নরূপ কালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায়,—

গ্রন্থরচনাকাল

"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায় শারদা-চরিত ॥"

এই শ্লোকানুযায়ী কাব্য-রচনাকাল ১৫০১ শক, অর্থাৎ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। একই শ্লোক অবলম্বনে জানা যায়, কবি-মাধবের চণ্ডী-কাব্য 'সারদাচরিত' নামে অভিহিত হয়েছিল। অবশ্য একাধিক স্থলে ভণিতাংশে গ্রন্থের নাম 'সারদা-মঙ্গল'রূপেও উল্লিখিত হয়েছে।

১। দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'—সম্পাদক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য কিন্তু আত্ম-পরিচয় অংশের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

"মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজমাধব একজন প্রথমশ্রেণীর কবি। আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস তাঁহার পূর্বে আর খুব বেশী কবি দেখাইতে পারেন নাই। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্যে তখনও মুকুন্দরামের আবির্ভাব হয় নাই...।"—বলেছেন মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক। ইতিহাসের দৃষ্টিতে মাধবানন্দের কাব্যোৎকর্ষের এই অনন্য-নির্ভরতা বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ, মুকুন্দরামের লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে চণ্ডী-কাব্য অ-পূর্ব শিল্প-সমৃদ্ধ নব-রূপ লাভ করেছিল। ফলে, সেই কাব্যাদর্শকে সম্মুখে রেখে, তারই অনুসরণে অক্ষম-তর কবির পক্ষেও রসোত্তীর্ণ কাব্য-রচনার চেষ্টা সুগম হয়েছিল। মুকুন্দরামের কবি-প্রতিভায় একই-সংগে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অতি-তীক্ষ্ণ বস্তু-দর্শন-ক্ষমতা ও ততোধিক সূক্ষ্ম সৃজনী-শক্তি। এদিক থেকে দ্বিজ-মাধবের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর গভীর তথ্য-সন্ধানী-দৃষ্টি। জীবনের যথার্থ সম্ভাব্য-পরিচয়টি আনুপূর্বিক উদ্ধার করতে পারার,—বাস্তব-সত্যকে অ-মিশ্র রূপে শিল্পে প্রত্যক্ষ করার যে আনন্দ, মাধব-কবির কাব্যে তাই রস-স্ফুরণের একমাত্র কারণ হয়েছে। মুকুন্দরামের প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য বস্তুর শিল্প-রূপায়ন,—তাই তিনি সার্থক স্রষ্টা। কিন্তু মাধবাচার্যের একমাত্র সার্থকতা বস্তুর বাস্তবায়নে,—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে তিনি রূপ-সৌন্দর্যের দ্রষ্টা মাত্র। এই দৃষ্টি-তীক্ষ্ণতা ও চিত্রণ-ভঙ্গির বাস্তবানুসারী যাথাযাথ্যের ফলে মাধব-কবির অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে শৈল্পিক সূক্ষ্মতা-স্পর্শের অভাব যদি ঘটেও থাকে, তবু আনুপূর্বিক সঙ্গতি ও গাঢ়-বদ্ধতা মাঝে মাঝে স্পষ্টতররূপে প্রতিফলিত হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির মৌলিকতায় মাধু-কবি যেন মুকুন্দরামকেও ছাড়িয়ে গেছেন কোথাও কোথাও। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত সহযোগে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে।—

কাব্য-বিচার

দ্বিতীয়বার কলিঙ্গরাজ-সৈন্যের আক্রমণ-সংবাদ শুনে কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ বর্ণনা করেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম,—

"প্রাণনাথ শুনহ জায়ার উপদেশ।
হারিয়া যেজন যায়, পুনরপি আসে তায়,
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ ॥

দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরাম

যদি থাকে প্রাণ-আশ, ত্যজি নিজ দেশবাস,
প্রাণ লয়্যা যাও মহাবীর।
আজি পূরিল কাল, সাজি আইল মহীপাল
তার রণে কেবা রহে স্থির ॥

নখর-রঞ্জিত নরু, নাহি কাটে তালতরু,
ফুল্লরার শুনহ আদ্দাস।
কহি আমি সবিশেষ, যদি না ছাড়িবে দেশ,
রামায়ণে শুন ইতিহাস ॥

সুগ্রীবে জিনিয়া রণে, দয়ায় রাখিয়া প্রাণে,
আরোপিল হৃদয়ে পাষাণ।
বিষম সমরে বীর, কিষ্কিন্ধা আইলা ধীর,
গজঘণ্টা বাজায়ে বিষাণ ॥

সুগ্রীব পলায়্যা যায়, আশ্বাসিল রাম তায়,
সখা ভাবে রহ ঋষ্যমুখে।
সুগ্রীব রামের তেজে, বালীর দুয়ারে গর্জে
ধায় বালী রণ অভিমুখে ॥

কাদিয়া এমত কালে, পড়িয়া চরণ-তলে,
পতিব্রতা বালীর রমণী।
আমি করি নিবেদন, আর না করিহ রণ,
হেতু কিছু মনে আমি গুণি ॥

যেজন তোমার ভয়ে ঋষ্যমুখে স্থির নহে,
সে জন দুয়ারে দেয় ডাক।
হেন লয় মোর মনে, কোন রাজা আসি রণে,
ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক ॥

বালীকে বিড়ম্বী বিধি, না মানে জায়ার সুধী
সমরে পড়িল রাম শরে।
ফুল্লরার কথা রাখ, কতক কাল জীয়া থাক,
না যাইহ রাজার সমরে ॥

ফুল্লরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গুণি,
লুকাইল বীর ধান্য ঘরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান করিল মুকুন্দ,
সুখে থাকি আড়রা নগরে ॥”

বলাবাহুল্য, অব্যবহিত পূর্ব পর্যায়ে ফুল্লরা-কালকেতুর বন্য বর্বরতা-যুক্ত যে ধীরোদাত্ত শূর-মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে, তার সংগে ওপরের ত্রিপদী-বর্ণিত চারিত্র ধর্মের আনুপূর্বিকতা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রামায়ণ কাহিনী উদ্ধারের দ্বারা ফুল্লরার চরিত্রে জ্ঞানিজনোচিত দূরদর্শনের পরিচয় প্রস্ফুট হয়েছে। ফলে, বর্ণনাটি হয়ত হয়েছে মণ্ডন-সমৃদ্ধ (embelished)। কিন্তু “কতক কাল জিয়া থাক” গোছের দুর্বল উপদেশ ফুল্লরার চারিত্রিক পূর্বৈতিহ্যের উপযোগী হয় নি। অন্যদিকে কালকেতুর “ধান্য ঘরে” আত্মগোপন সত্যই অপ্রত্যাশিতের সীমাও অতিক্রম করে রসাভাসই যেন সৃষ্টি করে। এদের চরিত্রগত আনুপূর্বিকতার অভাবের একমাত্র সঙ্গত কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বন্য-জীবনে প্রকৃতির সাহচর্য-প্রভাবে কালকেতু-ফুল্লরার চরিত্রে শূরত্বের যে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল, রাজ-জীবনের বিলাস-কলার মধ্যে তার দৃঢ়তার মূল হয়েছিল স্বতচ্ছিন্ন। কালকেতু-ফুল্লরার এই চরিত্রাঙ্কণে মনোধর্মের বৈচিত্র্য-সৃষ্টি, পুরাণাদির উদ্ধার-জনিত বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ, সর্বোপরি লিখনভঙ্গির মুন্সিয়ানার বন্ধন মুকুন্দরামের লিপি-চিত্রকে কলাকুশল, মণ্ডন-শিল্প-সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বলাবাহুল্য, এর ফলে চরিত্র-দুইটির আদ্যন্ত স্বাভাবিকতা ও সামগ্রিকতা খণ্ডিত হয়েছে। এইরূপই ছিল মুকুন্দরামের প্রতিভা,—স্বাভাবিক বাস্তব-সত্যের 'পরে তিনি সৃজন-শিল্পের রং ফলিয়েছেন। মাধু-কবি কিন্তু সর্বত্রই স্বাভাবিকতার অনুসারী,—স্বভাব-কবি। মুকুন্দরাম-বর্ণিত পূর্বোদ্ধৃত একই প্রসঙ্গে মাধু-কবি লিখেছেন,—

প্রথমাংশে ফুল্লরার কালকেতুর প্রতি উপদেশ

“প্রভু হে কিসেরে লইলা দেবীর ধন।
পাইয়া দুর্গার বর, কাননে তোলাইলা ঘর
সাজে রাজা তথির কারণ ॥

গোলাটে কৈলা নগর না জানালে দণ্ডধর
অল্প বুদ্ধি হল্যা অহঙ্কারী।
না শুনিয়া মোর বাণী ঠগেরে বাড়াইলা পুনি
ভারু হৈলা পরাণের বৈরি॥
তোমারে ভয় না করে জানাইলা দণ্ডধরে
দেবাইরে সাজাইয়া আনে ঠাট।
মারিয়া প্রচণ্ড থানা চারিদিকে দিল হানা,
বেড়িয়া রহিল গুজরাট॥
আমার বচন ধর অহঙ্কার দূর কর
লও গিয়া রাজার শরণ।
তুষ্ট হলে মহাশয় কাররে নাহিক ভয়
দুয়ারে পাইবা সর্বজন॥
লোকে জানে সর্বকাল রাজা অষ্টলোকপাল
বিরোধিতে না আসে যুকতি।
ভূপতিরে কর দিয়া অন্তরে হরিষ হৈয়্যা
নিজপুরে করহ বসতি॥

বলাবাহুল্য, এই বর্ণনার মধ্যে ফুল্লরা-চরিত্রের বাঙালিনী-সুলভ স্বাভাবিক হৃদয়ার্তি অবিমিশ্র প্রকাশ লাভ করেছে। মুকুন্দরামের ফুল্লরার মত মাধু-কবির ফুল্লরা-চরিত্রেও স্বামীর মঙ্গল-কামী শঙ্কাকুল বাঙালি-পত্নীর চিত্ত-ব্যাকুলতাই ফুটে উঠেছে। কিন্তু মুকুন্দরামের ফুল্লরার মত মাধু-কবির ফুল্লরা জ্ঞান-সভ্যতার স্পর্শ-জনিত বিনষ্টি (sophistication) থেকে মুক্ত বলেই স্থূল (rough) হলেও স্বাভাবিক[১০]। আর, এই অতি-স্থূলতার স্বভাব-প্রকাশ সার্থক সঙ্গতি-বোধের সৃষ্টি করেছে কালকেতুর প্রত্যুত্তরের মধ্যে :—

"শুনিয়া ত বীরবর ক্রোধে কাঁপে থর থর,
শুন রামা আমার উত্তর।
করে লৈয়া শরগাণ্ডী পূজিব মঙ্গলচণ্ডী,
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর॥

১০। অন্যান্যের মধ্যে মাধু-কবির রচনার অমসৃণতার প্রসঙ্গেও শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য তন্ত্র-প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য মঙ্গলচণ্ডীর গীত (ভূমিকা)।

অবোধিয়া দণ্ড ধরে এত দণ্ড মোর করে
দেবাই পাঠাইয়া দিছে ঠাটে।
আজ রণে হানা দিব ভুবনে ঘোষিতে থুব
মুণ্ডমালা দিব গুজরাটে ॥"—ইত্যাদি—

দীর্ঘ তুলনা-মূলক এই আলোচনা থেকে প্রতিভাত হওয়া উচিত;—মুকুন্দরামের কবি-প্রতিভা অপেক্ষা মাধু-কবির কবি-প্রতিভা মণ্ডন-কলা-কুশলতার বিচারে অপেক্ষাকৃত ম্লান হলেও, তাঁর রচনাভঙ্গি ছিল অধিকতর স্বভাবানুগ। ফুল্লরার বারমাস্যা, ভাড়ুচরিত্র ইত্যাদির সৃষ্টিতেও প্রতিপদেই মুকুন্দরামের বর্ণনা শৈল্পিক, আর মাধুকবি নিতান্তই স্বাভাবিক।

পূর্বে বলেছি, মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজন-শিল্পী ছিলেন কবি মুকুন্দরাম। দ্বিজমাধবের প্রায় সমসাময়িক কালেই,—হয়ত কয়েক বৎসর মাত্র পরে, মুকুন্দরামের কাব্য রচিত হয়েছিল। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের এক দুঃখাবহ অধ্যায়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসভূমি ছিল। "গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ" রাজা মানসিংহের "কালে" "ডিহিদার মামুদসরিপ্"এর অত্যাচারে সমগ্র দেশ উৎপীড়িত হয়েছিল। ভয়-ত্রস্ত ব্রাহ্মণ মুকুন্দরামকেও তখন বাস্তুত্যাগ করতে হয়। পথে অনেক কষ্ট সয়ে অজস্র বিপদ অতিক্রম করে, অবশেষে কবি "কুচট্যা নগরে" উপনীত হন। সেখানে, কবি লিখ্ছেন,—

মুকুন্দরাম পরিচিতি

"তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিনু উদক পান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥"

ঐ অবস্থাতেই তিনি দেবী চণ্ডীর কাছে মহামন্ত্র লাভ করেন; আর লাভ করেন চণ্ডী-মাহাত্ম্য-গীত রচনার নির্দেশ। দেবীর আদেশ শিরোধার্য করে কবি সপরিবার এসে মেদিনীপুরে আড়রাগ্রামের ব্রাহ্মণ-জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে বসতি স্থাপন করেন। গুণমুগ্ধ বাঁকুড়া রায় কবিকে নিজ পুত্র রঘুনাথের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাঁকুড়া রায়ের দেহান্ত ঘটে এবং

রঘুনাথ 'রাজ্য'-ভার গ্রহণ করেন। এই রঘুনাথেরই সভাসদ্‌রূপে কবি বিখ্যাত 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন,—

"রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সু জান।
তার সভাসদ্ রচি চারু পদ
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান॥"

কাব্যে উদ্ধৃত বিভিন্ন ভণিতাংশ থেকে কবির বংশ-পরিচয়ও উদ্ধার করা চলে,—

"মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

এই বর্ণনা অনুসারে জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন কবির পিতামহ,—পিতা ছিলেন হৃদয় মিশ্র; কবিচন্দ্র নাম অথবা উপাধি-বিশিষ্ট কবির একজন অগ্রজও ছিলেন বলে জানা যায়।' অন্য আর এক ধরণের ভণিতায় পাই,—

"দিবানিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উরিয়া কবির কামে কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশ॥"

শিবরাম-চিত্রলেখা কবির পুত্র-পুত্রবধূ; যশোদা-মহেশ তাঁর কন্যা-জামাতা।

মুকুন্দরামের কাব্য-রচনা-কাল সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ সংশয় রয়েছে। কোন কোন মুদ্রিত পুথির শেষাংশে একটি কাল-জ্ঞাপক পয়ার পাওয়া যায়;—

রচনাকাল

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

'রস' অর্থে '৯' ধরে এই শ্লোকটির সঙ্কেত বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ১৪৯৯ শক, তথা ১৫৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে;— মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন মানসিংহের "গৌড়-বঙ্গ-উৎকলাধিপ" থাকা-কালে। ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৬০৬ খ্রীঃ

পর্যন্ত বঙ্গের সুবাদার পদে অভিষিক্ত ছিলেন। আবার জানা যায়,—১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকল মোগলদের হস্তচ্যুত হয়। অতএব, ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে গ্রন্থ-রচনার কালেই কবি মানসিংহকে 'গৌড়-বঙ্গ-উৎকলাধিপ' নামে অভিহিত করেছিলেন বলে মনে হয়। অপরপক্ষে, রঘুনাথের রাজত্বকাল অনুমিত হয় ১৫৭৩ খ্রীঃ থেকে ১৬০২-০৩ খ্রীঃ পর্যন্ত। অতএব, ১৫৯৪ থেকে ১৬০০ খ্রীঃ পর্যন্ত কোন সময়ে মুকুন্দরামের কাব্য রচিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু পূর্বে অনুমিত রঘুনাথের রাজত্বকাল-নির্ণয় নির্ভুল হয়ে থাকলে, বাঁকুড়া রায়ের সংগে কবির সাক্ষাৎ সম্ভব হয় না। মোটকথা, অন্যান্য বহু প্রাচীন বাঙালি কবির মত মুকুন্দরামের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধেও নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। তবে, পণ্ডিতগণের অনুমান,—মোটামুটি ষোড়শ শতকের শেষপাদে, মুকুন্দরামের কাব্য রচিত হয়েছিল।

মুকুন্দরামের ধর্মমত সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য আছে। কবির নিজস্ব বর্ণনা থেকেই জানা যায়,—তাঁর পিতামহ জগন্নাথ বিশেষভাবে বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করেছিলেন—

মুকুন্দরামের ধর্মমত

"কয়্যরি কুলেতে জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥"

এই সূত্রে ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী-গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেন যে, কবিমুকুন্দরামও পূর্বপুরুষদের মত বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বহু-তথ্য উদ্ধার করে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন,—"Kavikankan Mukunda Ram Chakravarty was neither a Vaiṣṇava, nor a Śākta nor Śaiva, nor Gāṇapata; but he was everything. In other words, he was believer in all the deities of the smārta cult[১১]." শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যও মনে করেছেন, "সেকালের গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য রচনা করিবার মত এত

১১। 'Religion of Kavikankan Mukunda Ram Chakravarty' (Indian Historical Quartely).

ঔদার্য ছিল না[১২]।" কিন্তু, মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত ও কৌলিক ধর্ম-বিশ্বাস যে-কোন সম্প্রদায়-নির্ভরই হয়ে থাক্ না কেন, তাঁর কবি-চেতনায় চৈতন্য-সংস্কৃতির প্রভাব নিঃসংশয়ে একান্ত হয়েছিল। সারাটি কাব্যে সে প্রমাণ যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। পূর্বে বলেছি, বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের ইতিহাসে গোবিন্দদাস কবিরাজ চৈতন্যোত্তর ভাবৈতিহ্যকে আত্মস্থ করে নিয়ে শিল্প-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ঠিক্ একই রূপে মঙ্গল-সাহিত্যের ইতিহাসে মুকুন্দরামের কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ-প্রেরণাও যুগিয়েছিল সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বোধ-নিরপেক্ষ চৈতন্য-সংস্কৃতি-প্রভাবিত সমাজ-জীবন-দর্শন। কাব্য-সূচনা উপলক্ষ্যে বন্দনাংশে কবি চৈতন্য বন্দনা করেছেন,—

"অবনীতে অবতরি চৈতন্য রূপেতে হরি,
বন্দিব সন্ন্যাসি-চূড়ামণি।
সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ কন্দ,
মুকতির দেখাল্য সরণি॥"

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রদর্শিত লোকোত্তর 'মুক্তি-সরণির' প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়েও মানুষ শ্রীচৈতন্য মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-জীবনে সকল বিভেদ-বিরোধহীন মিলনের যে জাতীয় মুক্তি-পথ প্রবর্তন করেছিলেন, তার সত্যস্বরূপটি মুকুন্দরামের কবি-চেতনার মধ্যে ভাস্বর প্রকাশ লাভ করেছিল। দৃষ্টান্ত সহযোগে বক্তব্য স্পষ্ট করা যেতে পারে। মুকুন্দরামের ব্যক্তি-জীবনের শ্রেষ্ঠতম লাঞ্ছনার কারণ হয়েছিল,—'ডিহিদারমামুদসরিপ'; মুসলমান ডিহিদার সেদিন বিশেষভাবে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হল্য অরি।" তবু, জীবনের যে চূড়ান্ত বিড়ম্বনার মধ্যে কবি "বাস্তু-হারা" হয়েছিলেন, তার চরম পর্যায়েও ব্যক্তি-বিশেষের অপরাধের দায়িত্ব একটা গোটা সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার মত বুদ্ধি-বিকার তাঁর কখনো ঘটে নি। বরং, কালকেতুর নগর-পত্তন এবং "মুসলমান-গণের আগমন", "মুসলমানের জাতিবিভাগ" ইত্যাদি প্রসঙ্গে সংবেদনশীল কবিমানসের সহমর্মিতা নিয়েই মুকুন্দরাম মুসলমান সমাজ-জীবনের পুংখানুপুংখ বাস্তব চিত্রায়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মুকুন্দরাম-বর্ণিত গুজরাট-নগরে সমাগত মুসলমান-জীবনের একটি চিত্রাংশ—

মুকুন্দ-কবি-চেতনায় চৈতন্য-ঐতিহ্যের প্রভাব

১২। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—(২য় সং)

"ফজর সময়ে উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটি,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে, পীরের সির্‌নি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানিস-বন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥"

এ বর্ণনা যেমন সরস, তেম্‌নি সজীব ও বাস্তব।—আর, এই সৃষ্টির পশ্চাতে নিহিত কবি-চেতনার দৃষ্টি ছিল যেমন মর্মপ্রসারী, তেম্‌নি তার প্রকাশও নিখুঁত,—সর্বাবয়ব সম্পূর্ণ। তাছাড়া, হিন্দু-সমাজ ও তার অন্তর্বর্তী শাখা-সমষ্টির বর্ণনাতেও যে পুংখানুপুংখতা ও বাস্তব-অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে একদিকে মুকুন্দরামের সমাজ-নিষ্ঠ মানসভঙ্গির বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ব্যক্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, স্মার্ত-পৌরাণিক জাতিভেদ-প্রথা সত্ত্বেও গুণ-কর্ম-বিভাজিত অসম্প্রদায়িক গোষ্ঠি-চেতনার পরিচয় হয়েছে সর্বাধিক প্রকট। মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিক এবং নবশাখদিগের সামাজিক মর্যাদার পরিচয় দিয়েছেন,-দিয়েছেন কালকেতুর নগরে 'ইতরজাতির' আগমন-বার্তার খুঁটিনাটি বাস্তব চিত্র।—কিন্তু ইতর বলেই তাদের উপেক্ষা করেন নি,—গুণ-কর্মানুযায়ী তাদের সামাজিক স্থানটুকু যথার্থরূপে নির্দেশ করেছেন;—

"মৎস্য বেচে চষে চাষ, বৈসে দুই জাতি দাস,
কলুরা নগরে পাতে ঘানী।
বাইতি নিবসে পুরে, নানাজাতি বাদ্য করে,
পুরে ভ্রমে মঞ্জুরী বিকিনি॥

বাগ্‌দি নিবসে পুরে, নানা অস্ত্র ধরি করে,
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে, জাল বুনে মাছ মারে,
কোচগণ বৈসে নানা রঙ্গে॥
নগর করিয়া শোভা, বসিল অনেক ধোবা,
দড়ায় শুকায় নানা বাসে।
দরজী কাপড় সীয়ে, বেড়ন করিয়া জীয়ে,
গুজরাটে বৈসে একপাশে॥
সিউলি নগরে বৈসে, খাজুরের কাটি রসে,
গুড় করি বিবিধ বিধানে।
ছুতার নগর মাঝে, চিড়া কোটে খই ভাজে,
কেহ গঢ়ে শকট বিমানে॥
পাটনি নগরে বৈসে, রাত্রিদিন জলে ভাসে,
পার করি লয়ে রাজ কর।"........ইত্যাদি।

উদ্ধৃত অংশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়,—মুকুন্দরামের পরিকল্পিত জীবন-ব্যবস্থায় তথা-কথিত ইতর-জাতিও সমাজের ভার-স্বরূপ হয়ে ছিল না।—যে-কোন নিকৃষ্ট উৎস থেকেই কারো জন্ম হোক্ না কেন, ব্যক্তি-হিসেবে নিজ নিজ কর্ম-প্রভাবে প্রতিটি লোকই ছিল সমসাময়িক যৌথ সমাজ-সংগঠনের এক একটি সক্রিয়-অঙ্গ (Active Unit)। এই সক্রিয়তার দাবি-মূলেই সমাজ-দেহের কাছে এদের প্রতিষ্ঠা ছিল সর্বজন-শ্রদ্ধেয়। আমাদের ধারণা, মানবজীবন সম্বন্ধে এই মৌলিক শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, চৈতন্য-প্রভাব-সম্ভূত। মধ্য-যুগের বাংলাদেশে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-চেতনার ঐতিহাসিক স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে ডঃ যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন,—The new creed (Bengal Vaishnavism propunded by Chaitanya), like methodism in England born two centuries later,—has opened a new life of knowledge and spirituality to the lower castes, and under its life-giving touch they have produced many Vaishnav saints and poets, scholars and leaders of thought. This was not possible in the old days of orthodox Brahmanic domination over society. Thus

Vaishnavism has proved the saviour of the poor; it has proclaimed the dignity of every man as possessing within himself a particle of divine soul (Jivātmā)."[১৩] ঐতিহাসিকের এই তথ্য-নির্ভর সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষে কত ব্যাপক পরিমাণে প্রযোজ্য, সে জিজ্ঞাসা বর্তমান প্রসঙ্গে নিতান্ত অবান্তর। কিন্তু, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে,—চৈতন্য-ঐতিহ্যের প্রাণ-সত্য আলোচ্য মন্তব্যের মধ্যে সার্থকতম অভিব্যক্তি পেয়েছে। আবার. এই প্রাণ-বৈশিষ্ট্যেরই পুংখানুপুংখ সজীব প্রকাশ মুকুন্দরামের রচনার ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়েছে। তাই বল্‌ছিলাম,—মুকুন্দরামের বংশ কিংবা ব্যক্তিগত আচার-আচরণ নির্ভর ধর্মমতের বিতর্ক পরিহার করেও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা চলে,—মুকুন্দরামের কাব্য ছিল মধ্যযুগের চৈতন্য-সংস্কৃতির জীবন্ত বাণীরূপ। আর, কবি হিসেবে মুকুন্দরাম ছিলেন এই জীবন-বোধের সার্থক বাণীকার।

দ্বিজমাধবের কাব্যপরিচিতি, এবং স্বয়ং মুকুন্দরাম সম্বন্ধীয় এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের কাব্য-বৈশিষ্ট্যের সাধারণ পরিচয় উদ্ধৃত হতে পেরেছে। ৺রমেশ চন্দ্র দত্তের ভাষায় এই সব বিচ্ছিন্ন আলোচনার ফলশ্রুতি ঘোষিত হতে পারে :—

"Its (Mukunda Ram's Chandimangal's) most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are super-human and miraculous, but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature."[১৪]—মুকুন্দরামের কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ঐ Fidelity,—বাঙালি জীবন-চিত্র রচনায় কবি-চেতনার ঐ আনুপূর্বিক বিশ্বস্ততা! ভক্ত-সাধকের ঐকান্তিকতা নিয়ে মুকুন্দরাম-

কাব্য-বিচার

কবিকঙ্কণ বাঙালি জীবন-স্বরূপের আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন;—আর এই সাধন-লব্ধ সত্যানুভূতিকেই গভীরতর বিশ্বস্ততার সংগে বস্তু-রূপ দান করেছেন।—ফলে, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য বাঙালির জীবন-কাব্যে শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে। চৈতন্যোত্তর যুগে সাম্প্রদায়িক তীব্রতার ভারকেন্দ্র-চ্যুত সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্য সমূহ

১৩। History of Bengal Vol. II. ১৪। Literature of Bengal.

স্বভাবতঃই সমকালীন সমাজ-চেতনাকে কাব্য-কাহিনীর আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ফলে, ঐ সকল কাব্যে সমসাময়িক সমাজ-চিত্রের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন-না-কোন বিবরণ প্রাসঙ্গিক অপ্রসাঙ্গিক যে-কোন ভাবে বিশদ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, আলোচ্য সমাজ-চিত্রণ মাত্রই শৈল্পিক সঞ্জীবতা লাভ করে নি।—মুকুন্দরামের কাব্যে যে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণনা-মাত্রেই নিবদ্ধ নেই, বাঙালির জাতীয় জীবন-প্রবাহের শিল্পালেখ্য হয়ে উঠেছে, তার কারণ মুকুন্দরামের সাধকোচিত ধ্যান-দৃষ্টি। জীবনের দুঃখবহুল চরম বিপর্যয়সমূহ অতিক্রম করে কবি একদিন পরম সার্থকতার অধিকারী হয়েছিলেন। ঘটনা-সংঘাত-সমৃদ্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার আধার এই ব্যক্তি-জীবন-উপলব্ধির আলোকেই নিখিল বাঙালি জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আবার সে উপলব্ধি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নব-সঞ্জীবিত হয়ে সমগ্রদেশ, তথা দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ নিখিল-বাঙালির জাতীয়-জীবনের শাশ্বত কাব্য-রূপ লাভ করেছিল। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে।

মঙ্গলকাব্যাঙ্গিক সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনায় উল্লেখ করেছি,—এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রারম্ভিক দেব-খণ্ডাংশে শিব-জীবনের একটি আনুপূর্বিক বর্ণনা উপস্থাপিত হত। বলাবাহুল্য,—এই শিব-দেবতা বৈদিক কিংবা-পৌরাণিক অভিজাত-ঐতিহ্য সম্ভূত নন,—ইনি আদিম বাঙালির মৌলিক কল্পনা-সম্ভূত খাঁটি বাঙালি 'কৃষক-দেবতা'। বাঙালির সুখ-দুঃখ, আশা-আবেগ, দৈন্য-ব্যর্থতা নিয়ে ইনি বাঙালির কৃষক-জীবনের আদর্শ প্রতীক,—সাধারণ বাঙালির ঘরের ঠাকুর,—প্রাণের দেবতা। মঙ্গলকাব্যের শিব-কাহিনী বর্ণনার মধ্যে বিশেষভাবে এই জাতীয় প্রাণবত্তার উদ্বোধনই সমধিক সূচিত হয়ে থাকে বলে মনে করি। মুকুন্দরাম তাঁর শিব কাহিনী বর্ণনায় এই প্রাণ-স্বরূপটিকেই উদ্ধার করেছেন ;—

মুকুন্দরামের কাব্যে শাশ্বত-বাঙালি

ভিখারি শিব বহুদিনের ব্যর্থ চেষ্টার শেষে সার্থকতার প্রাচুর্যে ভিক্ষা-ঝুলি পূর্ণ করে ঘরে ফিরেছেন,—সর্বাঙ্গে তাঁর ব্যাপ্ত হয়ে আছে ক্লান্তি আর আয়াস-কামনা। পরদিন প্রভাতে আলস্য-জড়িমা-গ্রস্ত শিব শয্যাত্যাগ করেন ;—

"রাম রাম সোঙ্‌রেণ্‌ পোহাইল রজনী।
শয্যা হৈতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করি সমাপন।
বসিলেন মহাদেব অজিন আসন ॥
বামদিকে কাতিক দক্ষিণে লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক ছাড়েন শঙ্কর ॥
সম্ভ্রমে আইলা গৌরী করিয়া অঞ্জলি।
কহিছেন শঙ্কর হৈয়া কুতূহলী ॥
কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইলুঁ ধামে ধামে।
আজি সকালে ভোজন করি রহিব বিশ্রামে ॥"

তারপরে চর্ব্যচুষ্যাদি পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের মুখরোচক তালিকা রচনা করে চলেন শিব। বর্ণনা-হিসেবে এর মধ্যে কবি-প্রতিভার সমুচিত তীক্ষ্ণতা ও সরসতা রয়েছে, সন্দেহ নেই। তবু, এটুকু মঙ্গল-কাব্যাঙ্গিকের গতানুগতিক অনুবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্য,—বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন-স্বরূপের যথার্থ সঙ্কেতটুকুর স্পষ্টীকরণ। বাঙালি জন-জীবনের আদিম প্রতিভূ,—আদি জনক-জননী হর-গৌরীর এই জীবন-পরিচায়নে 'ঘরমুখো' বাঙালির শাশ্বত ঘরের মায়াটুকুই নিবিড় হয়ে ধরা পড়েছে। যত দরিদ্রই হোক্‌,—বহির্জীবনে বাঙালির বস্তুগত-উপাদান-স্বল্পতা যতই সমীতিক্রমী হোক, তার হৃদয়কে সে অভাবের দৈন্য কখনো পীড়িত করতে পারে না। 'ছায়েবানুগতা' গৃহাধীশ্বরী গৃহিণীর নিয়ত প্রেম-সংস্পর্শে, সন্তান-সন্ততির নৈকট্য-নিবিড়তায় স্বজন-পরিজনের আত্মীয়তায় পরিপূর্ণ গৃহাঙ্গণ গার্হস্থ্য-সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। নিতান্ত ভিখারিজন-ও সেই গৃহ-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর। কেবল, হৃদয়-ধর্মের ঐকান্তিকতার বলেই সে এই প্রেম-ভক্তি-প্রীতি-ছায়াঘন সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক অধিকারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। লক্ষ্য করা উচিত,—ভিখারি শিবের এই প্রাসঙ্গিক গার্হস্থ্য-চিত্রাঙ্কণ উপলক্ষ্যে জীবনশিল্পী মুকুন্দরাম এই অবিনশ্বর স্নেহ-সাম্রাজ্যকেই শাশ্বত শিল্পমূর্তি দিয়েছেন।

এখানেও শেষ নয়—একই পয়ারের শেষাংশে শিবের লোভাতুর নির্দেশের প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন গৌরী,—

"কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার শুধিনু।
অবশেষে যেবা ছিল রন্ধন করিনু॥
রন্ধনের তরে ভাল কহিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে পাতে দিব সেই ঘরে নাই॥"

পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনের লোভে এক পক্ষের রসনা যখন সিক্ত হয়ে এসেছে,—তখন অপর-পক্ষের মুখে ধ্বনিত হয় এ কী প্রত্যুত্তর! কিন্তু সাধারণ বাঙালি জীবনে এই আশা-প্রলুব্ধতা ও আশাভঙ্গের আঘাত দুই'ই নৈমিত্তিক ঘটনা। কারণ, সুখে-দুঃখে, প্রাচুর্যে ও রিক্ততায় বাঙালি পুরুষ চিরকালই শিবের মত বে-হিসাবী। একদিনের ভিক্ষার প্রাচুর্যের পরিমাপে শিবের কল্পনা সম্ভাব্যতার সীমাকেও ছাড়িয়েছে। কিন্তু, যে দীর্ঘদিন ভিক্ষায় তণ্ডুলকণাও জোটেনি, সেদিন কি কৌশলে নীরবে গৃহিণী গৌরীকে পতি-পুত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, সে খেয়ালটুকুও আত্ম-ভোলা শিবের নেই। ধার সম্বন্ধে ধারণা থাকলে, তবেই ত ধার-শোধের ভাবনা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লেন উদাসী মহেশ্বর আশাভঙ্গের ক্ষোভে,—

"আমি ছাড়িব ঘর যাব দেশান্তর,
কি মোর ঘর করণে
হয়ে স্বতন্তর, তুমি কর ঘর
লয়ে গুহ গজাননে॥
ঘরে যত আনি, লেখা নাহি জানি,
ডেরী অন্ন নাহি থাকে॥
কতেক ইন্দুর ধায় দূর দূর
গণার মুষার পাকে॥

* * *

দেশে দেশে ফিরি, কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিণী দুর্জ্জন, ঘর হৈল বন
বাস করি তরুমূলে॥

আন বাঘ ছাল সিঙ্গা হাড়-মাল
ডুম্বুর বিভূতি ঝুলি।
আইস হে নন্দী আমার সঙ্গী
ঘরে না রহিবে শূলী ॥"

শিব গৃহত্যাগ করছেন ;—ক্ষোভে অভিমানে গৌরী বলেন,—

"কি জানি তপের ফলে হর পায়্যাছি বর।
পাট-পড়সী নাহি আইসে দেখি দিগম্বর ॥
* * *
ময়ূরে মুষিকে হয় সদাই কোন্দল।
এই হেতু দুই ভাইয়ে দ্বন্দ্ব মোর কর্মফল ॥
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই কলকলি।
গণার মুষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি ॥
বাঘ বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীর প্রাণে সদাই উপহত ॥
* * *
দারুণ কর্মের দোষে রইলাঙ্ দুঃখিনী।
ভিক্ষার ধনে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী ॥
জয়া-বিজয়া পদ্মা গুহ-লম্বোদর।
সঙ্গে লইয়া যাব আমি মা-বাপের ঘর ॥"

'শাশ্বত বাঙালি দাম্পত্যজীবনের যথার্থ-চিত্রণ এখানেই পূর্ণতার সর্বোচ্চ-গ্রামে (Climax) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' ক্রোধে অধীর শিব গৃহ-নির্গত হয়েছেন,—পার্বতী হয়েছেন পিত্রালয়াভিমুখিণী,—কিন্তু একি যা দেখা গেল, ঠিক তাই?—অভাব-অভিযোগ পূর্ণ জীবনের সর্বপ্রকার মাধুর্যহীন বিতণ্ডামাত্র, না বিতণ্ডারূপে আলোচ্য চিত্রটি "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার"ই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। "গৃহিণী দুর্জন ···· ···" ইত্যাদি বলে শিব যখন অনুযোগ করেন কিংবা "বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর·········" ইত্যাদি বলে গৌরী যখন সেই তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে খেদ প্রকাশ করেন, তখন মনে হয় না কি,—কবি-মুকুন্দরাম নিত্যদিনের বাঙালি-দম্পতীর কণ্ঠ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়ে সেই জীবন-তথ্যকেই শিল্প-সত্যে পরিণত করেছেন!

মুকুন্দরামের এই কবি-স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে জীবনের যে প্রত্যক্ষরূপ, যে স্বতঃস্ফূর্তি ও প্রচুর জীবন-রস-রসিকতা পাওয়া যায়, তাহা বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহার কৃতিত্ব কেবল বস্তু-সঞ্চয়ে নহে, বাস্তবরসের পরিবেশন-নৈপুণ্যে। তাঁহার কাব্য হইতে কেবল যে সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহা নহে, ইহাতে সমাজ-জীবনের স্বচ্ছন্দ লীলায়িত গতিচ্ছন্দ, ইহার বহির্ঘটনার অন্তরাল-শায়ী মর্মস্পন্দন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[১৫] মুকুন্দরামের কবি-কীর্তির মূল কথা, নিতান্ত গতানুগতিক কাহিনী-বিষয়ের অনুবর্তন করেও তাঁর রচনা অনায়াসে রসোত্তীর্ণ হয়েছে কেবল ঐ "বাস্তবরসের পরিবেশন নৈপুণ্যে।" আর, এই শিল্প-নৈপুণ্যের মূলে রয়েছে কবির জীবন রস তন্ময় মর্মানুসারিতা।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার

কোন কোন আলোচক মুকুন্দরামের এই মর্মানুসারী কবি-দৃষ্টিকে রোমান্টিকতা বলে ভুল করেছেন। বাস্তবতাধর্মী শিল্প-কর্মের লক্ষণ সম্বন্ধে সংশয়ই এই বিভ্রান্তির কারণ। মনে রাখ্‌তে হবে,—বাস্তবতার অর্থ বস্তু স্বরূপের প্রতিফলন;—বস্তুরূপের যান্ত্রিক প্রতিবিম্বন (photography) নয়। বস্তুতঃ, কবি-ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির পরিমণ্ডলেই বস্তু বাস্তব-রসোত্তীর্ণ হতে পারে। আর, আগেই বলেছি, সমাজ ও পরিবেশের প্রতিটি ঘটনাচিত্রকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির ভাবাধিবাসনে মুকুন্দরাম রস-সৌন্দর্যে ভাস্বর করে তুলেছিলেন। এই রসই একাধারে বাস্তবরস এবং জীবনরসও। মুকুন্দরামের কবিস্বভাবের বাস্তবধর্মিতা সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিঃসংশয় ঘোষণা করেছেন—

"মুকুন্দরাম রোমান্টিক কবি ছিলেন না, জীবনের সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ ভাব ব্যঞ্জনা তাহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের কবি এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন।[১৬]" মুকুন্দরামের এই বাস্তবতা দুঃখ বাদী ছিল না,—ছিল না সুখবাদীও! সুখদুঃখ-নির্বিশেষে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন,—তাঁর কবি ও ব্যক্তি-সত্তার সকল ঐকান্তিকতা দিয়ে আনুপূর্বিক জীবনকে করেছিলেন উপভোগ। তাই,

১৫। কবিকঙ্কণচণ্ডী (নূতন সংস্করণ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত। ১৬। ঐ।

নিতান্ত দুঃখময় চিত্রকেও সেই উপলব্ধি-উপভোগের ঐকান্তিক মাধুর্য রসাবিষ্ট করেছে,—মুকুন্দরাম ছিলেন অখণ্ড জীবন রসের কবি।

অধুনা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আর একটি নূতন রসাকর গ্রন্থ আবিষ্কার করেছেন ডঃ আশুতোষ দাস। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস গ্রন্থটিকে সাধারণ্যে পরিচায়িত করেছেন (দেশ—মার্চ, ১৯৫৭)। গ্রন্থের নাম অভয়ামঙ্গল, লেখক দ্বিজ-রামদেব। মূল পুথি দেখার সুযোগ হয় নি বলে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়।

গ্রন্থশেষে পুথিটির রচনা সমাপ্তি সূচক পুষ্পিকায় লেখা আছে:— "ইন্দুবাণ ঋিসিবাণ বেদ সন জিত—অর্থাৎ ১৫৭৫—৪=১৫৭১ শক।" এদিক্ থেকে রামদেব দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরামের উত্তরসূরী,—সপ্তদশ শতকের কবি।

দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গল

এ গ্রন্থের পুথিতে প্রবল বৈষ্ণব আবেগ আছে বলে অধ্যাপক দাস জানিয়েছেন,—"রামদেবের গ্রন্থে শতাধিক উৎকৃষ্ট পদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে রচিত। ঘটনা বিশেষের প্রারম্ভে তদুচিত পদ-সন্নিবেশের এই কৌশলটি রামদেব তৎকাল-প্রচলিত চৈতন্যমঙ্গল গান হইতে পাইয়া থাকিবেন।" কিন্তু এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় যে, দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত-এ অনুরূপ বিষয়ানুগ রাধাকৃষ্ণ-পদরচনার পূর্বৈতিহ্য সহৃদয়-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে আছে। আর, দ্বিজমাধবের অধিকাংশ কাব্য-পুথিই চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গেছে। অতএব, মাধুকবির প্রায় এক শতাব্দীরও বেশি পরে আবির্ভূত হয়ে দ্বিজ রামদেব এ-বিষয়ে তাঁরই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন, এ অনুমান একান্ত সঙ্গত।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস আলোচ্য পদাবলীকে দ্বিজমাধবের রচনার চেয়ে উৎকৃষ্ট বলে দাবি করেছেন। পুথির পূর্ণ পরিচয় প্রকাশের আগে বর্তমান প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। অধ্যাপক দাসের দাবি যদি যথার্থ হয়, তা হলেও বল্ব, রামদেবের সার্থকতা সার্থকতর পূর্বসূরীদের বিশ্রুত কাব্য সাধনারই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি।

দ্বিজ রামদেব চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা অঞ্চলের কবি ছিলেন।

"মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব-প্রণোদিত যে কয়খানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে দ্বিজহরিরামের কাব্যখানি

উল্লেখযোগ্য"।[১৭] ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন,—কবি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। কাব্যমধ্যে শোভাসিংহ নামক একব্যক্তির জন্য কবি চণ্ডিকার প্রসাদ-ভিক্ষা করেছেন। এর থেকে ডঃ সেন আরো অনুমান করেছেন,—"দ্বিজহরিরামের কাব্য লেখা হইয়াছিল দক্ষিণরাঢ়-সীমান্তে চিতুয়াবরদার বিদ্রোহী সর্দার শোভাসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া।"[১৮] শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুমান,—১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাসিংহের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হরিরামের কাব্য রচিত হয়েছিল। দ্বিজহরিরামের কাব্যের পুথি "১০৮০ সালে অনুলিখিত।"[১৯]

দ্বিজহরিরামের চণ্ডীমঙ্গল

চট্টগ্রামের কবি মুক্তারাম সেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-রচয়িতাগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান। কবি বৈদ্যবংশ-সম্ভূত ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন জয়দেব, পিতামহ নিধিরাম। মধুরাম ছিলেন কবির পিতা। মুক্তারামের কাব্যের নাম 'সারদা-মঙ্গল'; রচনাকাল মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। মুক্তারামের কাব্যে ধনপতি-কাহিনী বর্ণিত হয় নি। সরলভাষা এবং সুন্দর প্রকাশ-ভঙ্গির সহায়তায় কেবল কালকেতু-কাহিনীই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মুক্তারাম সেন

রামায়ণ-রচয়িতা রামানন্দ-যতি একখানি চণ্ডী-কাব্যও রচনা করেন। তিনি মুকুন্দরামের কাব্যের সংগে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা নিজ কাব্যের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন।

রামনন্দ-যতি

লালা জয়নারায়ণ দেবের 'চণ্ডিকামঙ্গল' কাব্যে কালকেতু ও ধনপতি-কাহিনী ছাড়াও 'ক্রিয়াযোগ সারে' উদ্ধৃত মাধব-সুলোচনা-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জয়নারায়ণ বিক্রমপুরবাসী বৈদ্য ছিলেন।

জয়নারায়ণ দেব

চট্টগ্রামাঞ্চলের কবি ভবানীশঙ্কর তাঁর সুবৃহৎ চণ্ডীমঙ্গলকাব্য লিখে শেষ করেন ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।

ভবানীশঙ্কর

কিন্তু এ সকল আলোচনার বিস্তারে প্রয়োজন নেই। কারণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-প্রবাহে শিল্প-বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে মুকুন্দরামের পরেই। এই

১৭। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।
১৮। বাঙালাসাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)। ১৯। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়—"দুঃখের বিষয় মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে বঙ্গ-সাহিত্যে যে নূতন বাস্তবতার ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, পরবর্তীদের রচনায় তাহাতে আবার চড়া পড়িয়াছে। চণ্ডী কালিকা ও অন্নদায় রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের কুরুচিপূর্ণ কেলিবিলাসের প্রশ্রয়দাত্রী ও সমর্থনকারিণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ জীবন-যাত্রার বহু-বিসর্পিত বিস্তার সংকুচিত হইয়া রাজসভার কৃত্রিম আদব-কায়দা-ঘেরা সংকীর্ণ গণ্ডীতে, তন্ত্রসাধনার ছদ্মবেশধারী স্থূল ভোগাশক্তির প্রমোদ-কক্ষে আত্মসংহরণ করিয়াছে। প্রথার প্রস্তর-শৈল ভেদ করিয়া বাস্তবতার যে-প্রবাহ নির্গত হইয়াছিল, নূতন প্রথার চড়ায় প্রতিহত হইয়া আবার তাহা স্রোতোবেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে।"[২০] আমাদের পক্ষে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার শেষাংশটুকু বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ইতিহাসের বিবর্তন

চণ্ডীমঙ্গলের বিবর্তন-পথে নির্জীবতার অব্যবহিত শেষ-পাদেই 'কালিকামঙ্গল' কাব্যসমূহ কিংবা অন্নদামঙ্গল কাব্য বিকশিত হয়েছিল কি না,—ধর্মগত বিচারে কালিকামঙ্গলের কালিকা এবং অন্নদামঙ্গলের অন্নদা মুকুন্দরামের চণ্ডীরই অব্যবহিত পরবর্তী 'রূপান্তর' কি না, এসব বিচার পৃথক্ প্রসঙ্গের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত,—সাম্প্রদায়িক প্রথা-সংকীর্ণতার কবল-মুক্ত এক সার্বভৌম জীবনাদর্শের পটভূমিকাতেই লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডীর সংগে যুক্ত হয়ে সর্বজনীন কাব্য-সৃষ্টির উৎস মোচন করেছিলেন। আর, পৌরাণিক সংস্কৃতির সংগে লোক-সংস্কৃতির সমন্বয়ে সর্বজনীন বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা-ভূমিকেই আমরা চৈতন্য-সংস্কৃতি নামে অভিহিত করেছি। এই চৈতন্য-সংস্কৃতি-প্রভাবিত শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-কবি রূপে মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে লৌকিক মঙ্গলচণ্ডীর সংকীর্ণ পরিধি-প্রচণ্ডতা ও পৌরাণিক চণ্ডীর উদাত্ত মহিমাকে একত্র সংগ্রথিত করে বিস্ময়কর সৃজন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু, মুকুন্দরামের পরবর্তী কালে প্রথা-বিমুক্ত সর্বজনীনতার ক্ষেত্র থেকে বিযুক্ত হয়ে চণ্ডীকাব্যের ধারা আবার 'নূতন-প্রথার চড়ায়' আটকে পড়ল। এবারে সেই প্রথা-সীমা রচনায় সক্রিয় হয়েছে পৌরাণিক সংস্কৃতি। তাই, এই পর্যায়ে লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী-গাথা রচনা পরিত্যক্ত হয়ে পৌরাণিক মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আদর্শ-নির্ভর নূতন দুর্গামঙ্গল রচনার নবীন ধারা সূচিত হয়েছে।

২০। কবিকঙ্কণ চণ্ডী (ভূমিকা)—কঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (নূতন সং)।

পূর্বে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি,—মোটামুটি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙালির সাহিত্য প্রায় সকল বিভাগেই পৌরাণিক প্রথার বন্ধনে কেবলই আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল,—জীবন্ত বাঙালি জীবন-গাথার পরিবর্তে নির্জীব পৌরাণিক কথার বিবৃতিই সেদিন হয়েছিল তাদের প্রধান উপজীব্য। এই ঐতিহাসিক ধারারই অনুসরণে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিপর্যয়-মূলক বিবর্তনের চিহ্ন সূচিত হয়েছে, পৌরাণিক চণ্ডী-কথাশ্রিত দুর্গামঙ্গল-কাব্য সমূহে। বলে রাখা উচিত,—এগুলো মঙ্গলকাব্য নয়—চণ্ডীমঙ্গলকাব্য-ধারার রূপ-বিকৃতি,—মূলতঃ পুরাণানুবাদ।

দুর্গামঙ্গল কাব্য

ঐতিহাসিক পরিচয়

দুর্গামঙ্গল কাব্য-প্রসঙ্গের আরম্ভে আবার স্মরণ করি, এই সব রচনা মঙ্গলকাব্য-নামাঙ্কিত হবার যোগ্য নয়,—নিছক শিল্পকর্ম হিসেবেও এরা মূল্যহীন। এমন কি, পুরাণের অনুবাদ হিসেবেও এ-সব কাব্য সাহিত্য-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কেবল চণ্ডীকাব্য সমূহের প্রথা-নিবদ্ধ বিবর্তনের যোগ-সূত্র হিসেবেই এই সব কাব্যের বিকাশ-ধারা উল্লেখ্য। তবে, প্রত্যেক নব-যুগ-সূচনার সন্ধিলগ্নেই পূর্ব যুগ-বিপর্যয়ের স্বভাব-চিহ্ন স্বত-অনুস্যূত হয়ে থাকে। যুগান্তর পথের সান্ধ্য ক্ষণের স্মারক হিসেবে এই রচনাপ্রবাহের একমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য।

দ্বিজ কমললোচন

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-কাহিনী অবলম্বনে রচিত সপ্তদশ শতাব্দীর একটি উল্লেখ্য দুর্গামঙ্গল-কাব্য 'দ্বিজ' কমললোচনের 'চণ্ডিকা-বিজয়'। কবি "দিল্লীশ্বর-সুতের জাগীরে" বাস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। শাহসুজা ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। কাব্যখানি হয়ত ঐ সময়েই সমাপ্ত হয়। রংপুর জেলার চরখাবাড়ী গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল যদুনাথ। কাব্যের মধ্যে যদুনাথের ভণিতা-যুক্ত রচনাংশও রয়েছে। কমল-লোচনের কাব্যের স্থানে স্থানে ভক্তিধর্মের আবেগময় প্রকাশ থাকলেও কাব্যিক সমৃদ্ধি বিশেষ নেই।

ভবানীপ্রসাদ রায়

সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন শ্রেষ্ঠ দুর্গামঙ্গল-রচয়িতা ছিলেন ভবানী প্রসাদ রায়। সম্ভবতঃ ১৬৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপ্রসাদের কাব্য রচিত হয়। কবির পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়,—জাতিতে এঁরা বৈদ্য ছিলেন। কবির কৌলিক-উপাধি ছিল 'কর',—বাসস্থান

মৈমনসিংহ জেলার কাঁটালিয়া গ্রাম। শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন, জ্ঞাতি-পীড়িত, জন্মান্ধ কবির আত্মকথার কারুণ্য কাব্যের অংশবিশেষকে হৃদয়গ্রাহী করেছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে বিশেষভাবে রচিত হলেও রামায়ণোক্ত রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব-কাহিনীও গ্রন্থখানিতে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কাব্য-চমৎকারিত্বের অভাব থাকলেও ভবানীপ্রসাদের রচনা সরল এবং মূলানুগ।

"সকলের বলবীর্য অনন্তরূপিনী।
বিশ্বজীবরূপে তুমি মায়া প্রকাশিনী॥"—ইত্যাদি অংশে

দেবগণকৃত দেবী-স্তুতির অনুবাদ-সফলতা স্বীকৃতব্য।

রূপনারায়ণ ঘোষ

রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। কবির নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার আদাবাড়ী গ্রামে। কবি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং গ্রন্থের স্থানে স্থানে ব্রজবুলি ভাষারও ব্যবহার করেছেন।

হরিশ্চন্দ্রবসু

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হরিশচন্দ্র বসুর কাব্য রচিত হয় ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি রংপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন।

রামশঙ্করদেব

এই শতাব্দীতে রচিত বৃহৎ 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা রামশঙ্কর দেব রামায়ণ ও চণ্ডীকাব্য-রচয়িতা রামানন্দ যতির শিষ্য ছিলেন। কবির নিবাস ছিল হুগলী জেলায়। "গৌতম-পুত্র শতানন্দের আগমশাস্ত্র এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণ অবলম্বন" করে রামশঙ্করের কাব্য রচিত হয়েছিল।

'দ্বিজ' গঙ্গানারায়ণ

এই শতাব্দীর অন্যতম কবি ফুলিয়ার মুখুটি দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের "ভবানীমঙ্গল" কাব্যে উমার জন্ম থেকে আরম্ভ করে দেবী-লীলা এবং কৃষ্ণ-লীলা-কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণিত হয়েছে। গঙ্গানারায়ণের পিতা ফুলিয়া থেকে বীরভূমে বাস পরিবর্তন করেন।

চণ্ডী ও দুর্গামঙ্গল কাব্য-ইতিহাসের আলোচনা এখানে শেষ হতে বাধা নেই, কারণ প্রারম্ভে কথিত ঐতিহাসিক প্রয়োজনের পক্ষে অতি বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

চৈতন্য-পূর্ব ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিচার-প্রসঙ্গে অনুমিত হয়েছে,—ময়ূরভট্টের প্রাথমিক চেষ্টা-মাধ্যমে অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের মত ধর্মমঙ্গল

কাব্যেরও সূচনা ঘটেছিল হয়ত তুর্কী-আক্রোমণোত্তর কালে। কিন্তু ষোড়শ শতকের আগে রচিত কোন ধর্মমঙ্গলের পুথি পাওয়া যায় না। আর, এই কাব্য-প্রবাহের শ্রেষ্ঠ কবি রূপে খ্যাত ঘনরাম ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। ষোড়শ শতাব্দীর জাগ্রত জীবন-বোধের প্রভাবে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য যে শিল্পোৎকর্ষ লাভ করতে পেরেছিল, ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহ তা পারে নি। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, আলোচ্য কাব্য-প্রবাহ সেই জীবন-স্রোতের সীমান্তবর্তী হয় নি। গবেষক-সমালোচকদের কেউ কেউ ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহের চরিত্রায়ণে ঐতিহাসিক ব্যক্তি-পরিচিতির আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত,—ধর্মমঙ্গলের লাউসেন-কাহিনীর মূলে কিংবদন্তী-জাত কোন ক্ষীণ ঐতিহ্য যদি থাকেও, তবু, আজ আর তা আবিষ্কার করে ওঠা কেবল দুষ্করই নয়, প্রায় অসম্ভব। অতএব, এই সব কাহিনী-কাব্যকে সাধারণ লোক-জীবনের ঐতিহাসিক ইঙ্গিতাবহ রূপে স্বীকার করা সঙ্গত নয়। বস্তুতঃ, নিছক যুদ্ধ-বিগ্রহ-জনিত উত্তেজনামূলক ঘটনা-সমষ্টির প্রাচুর্য ছাড়া এ সকল কাব্যে ঐতিহাসিক উপাদানও বড় একটা নেই। অন্যদিকে, কাহিনী-বিচারেও এ-সব কাব্যের রস-মূল্য ডিটেক্‌টিভ গল্পের সীমা অতিক্রম করেছে বলে মনে হয় না। যে ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছে, তাতেও জীবন-রস-নিবিড়তার চেয়ে পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতা-জনিত রূপ-চাকচিক্যই বেশি। অবশ্য, সে রূপ-জৌলুষ চিরাচরিত ডিটেক্‌টিভ্ গল্প-রসকে নূতন উজ্জ্বলতা দান করেছে। বস্তুতঃ এখানেই ঘনরামের কবি-কৃতির সার্থকতা।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

তাছাড়া, মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর প্রাথমিক উদ্ভব আর্যেতর লোক-গোষ্ঠীর প্রাচীন-চেতনা প্রসূত হয়ে থাকলেও মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সূক্ষ্ম রুচিবোধের যে অবলেপ পরবর্তীকালে ঘটেছে,—ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারায় তার পরিচয়ও স্বল্পতর। মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্যে ধর্মমঙ্গল কাহিনীই সর্বাপেক্ষা স্থূলতাধর্মী (crude)। এই কারণেই পণ্ডিতগণের কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, ঐ কাহিনীটিই হয়ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীনকালে পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু, এই অনুমানের পেছনে যুক্তি কিছু আছে বলে মনে হয় না। বরং, এ-কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে,—বিশেষ করে রাঢ়ের ডোমশ্রেণীর পূজিত ধর্মঠাকুরের পক্ষে চণ্ডী বা মনসার মত অনায়াসে আর্য সমাজের অন্তর্বর্তী

হয়ে পড়ার সুযোগ ছিল না। আর তাই, এই দেবতাটির আর্বীভবনে বিলম্ব ঘটেছিল। আবার, তথাকথিত অন্ত্যজ অশিক্ষিত কবি-কল্পনার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকার ফলে আলোচ্য কাব্য-সমূহের সংগঠন স্থূলতা-মুক্ত হতে পারে নি। সজীব কবি-প্রতিভার স্পর্শের অভাবে জীবন-রস-পুষ্টও হয়ে ওঠে নি তেমন।

রাঢ়-প্রত্যন্তে বিভিন্ন ধর্ম-দেবাধিষ্ঠানসমূহের ঐতিহাসিক প্রতিবেশের বিচার করলেও এই মতবাদ সমর্থিত হতে পারে। মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর শিল্প-রূপ বিকাশের মূলে চৈতন্য-প্রভাবিত প্রেম-মিলনাত্মক জীবন-চেতনার উল্লেখ করেছি বারে বারে। রাঢ়-প্রত্যন্তের পক্ষে সেই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি-চেতনার অন্তর্ভূ্ত হতে বিলম্ব যে ঘটেছিল, বীর-হাম্বীরের কাহিনীই তার প্রমাণ। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় যে, রাঢ়ের এই লোক-দেবতার প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ দীর্ঘকাল অশ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন,—সপ্তদশ শতকেও 'ধর্ম'-ভক্তজনকে বর্ণাশ্রম সমাজে 'পতিত' হতে হয়েছে। রূপরাম চক্রবর্তীর জীবন-কাহিনীই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আর্য-সংস্পর্শ থেকে এই সুদীর্ঘ বিযুক্তির ফলেই ধর্মমঙ্গলের কাহিনী, উপস্থাপনা ও পরিকল্পনায় আদিমতার ছাপ সমধিক। আর, অশিক্ষিত লোক-সমাজের মধ্যেই দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকার ফলে এই সুপ্রাচীন কাহিনীর পুথিগত-রূপ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আগে পাওয়া যায় নি।

কাব্যকথায় স্থূলতার কারণ

ধর্মমঙ্গল কাব্য-ধারার সুপ্রাচীন কবি হিসেবে ময়ূরভট্টের উল্লেখ পূর্বে করেছি। ময়ূরভট্টের পরে আর যে প্রাচীন কবির পরিচয় এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে তিনি খেলারাম।

৺হারাধনদত্ত ভক্তিনিধি হুগলী জেলার শ্যামবাজার গ্রামে এক 'জেলে'র ঘরে রক্ষিত পুথি থেকে খেলারামের রচনাকাল-জ্ঞাপক একটি পদ উদ্ধার করেছেন :—

খেলারাম

> "ভুবনশকে বায়ুমাস শরের বাহন।
> খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ॥"

এই পয়ারটির পাঠ শুদ্ধ করে ১৪৪৯ শক অর্থাৎ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া গেছে।

কাব্যারম্ভকালের এই পরিচিতি ছাড়া খেলারাম সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ আহৃত হতে পারে নি। কাব্যের এক স্থানে কবি লিখেছিলেন,—

"তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অষ্ট মঙ্গলায় দিব আত্ম পরিচয় ॥"

কাব্যের শেষাংশ পাওয়া যায়নি,—'গ্রন্থসাঙ্গ' হয়েছিল কি না, তাও জানা যায় না।

রূপরামচক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গলের পরবর্তী উল্লেখ্য কবি রূপরাম চক্রবর্তী। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন,—রূপরামের কাব্যই রচনাকাল-সম্বন্ধে নিশ্চিত তথ্য-জ্ঞাপক প্রথম ধর্মমঙ্গল[২০]। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থরচনার কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি পাওয়া গেছে, তা নিতান্ত দুর্বোধ্য,—লিপিকর-কৃত প্রমাদ যে তাতে প্রচুর রয়েছে, সে কথা স্পষ্টই বোঝা যায়।—

"শাকে সীমে জড় হৈলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারিযুগ বেদে যত রয় ॥
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা করি নেহ ॥"

এই শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করে ৺যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি গ্রন্থ রচনার কাল ১৬৪৮ শক তথা ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে সিদ্ধান্ত করেন। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য শ্লোকটির আনুমানিক শুদ্ধপাঠ নিরূপণ করে লিখেছেন :—

"তিন বাণ চারি যুগে বেদে যত রয়।
শাকে সনে জড় হৈলে কত শক হয় ॥
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কইরা লেহ ॥"[২১]

এই শ্লোক অনুসারে,—শ্রীভট্টাচার্যের মতে,—রূপরামের গ্রন্থ রচনার কাল ১৫১২ শকাব্দ বা ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ।[২২] ডঃ সুকুমার সেন প্রথমোদ্ধৃত কালজ্ঞাপক শ্লোকটি বিচার করে রূপরামের গ্রন্থ রচনাকাল নির্ণয় করেছেন,—১৬৪৯-৫০

২০। অপরাপর ঐতিহাসিকগণ এ সম্বন্ধে মাণিকরামের দাবিকেও উপস্থিত করে থাকেন,—পরবর্তী আলোচনায় এ তথ্য স্পষ্ট হবে।

২১। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (২য় সং)। ২২। ঐ। ২৩। রূপমামের ধর্মমঙ্গল (ভূমিকা)।

রূপরামের জন্মস্থান ছিল মুকুন্দরামের পিতৃভূমি দামুন্যার অনতিদূরে, বর্ধমান-জেলার কায়তি শ্রীরামপুর গ্রামে। কবি পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী পণ্ডিত-অধ্যাপক ছিলেন; শ্রীরামের টোলে বহুসংখ্যক ছাত্র-সমাগম হত। পিতার মৃত্যুর পর অগ্রজ রত্নেশ্বরের কাছে পাঠ গ্রহণের সময় কবি অমনোযোগিতার জন্য ভৎর্সিত হন। পরে আরো একাধিক স্থানে শিক্ষালাভ করতে গিয়েও তিনি বার বার ঝগড়া করে বাড়ি ফিরে আসেন। এমনি করে একবার রঘুনাথ ভট্টাচার্যের কাছে 'বিদায় হয়ে' নবদ্বীপ যাবার আগে কবি মার সংগে দেখা করতে যান। পথে ধর্মঠাকুরের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ধর্মকে দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। বাড়ি পৌছার আগেই রত্নেশ্বরের সংগে কবির সাক্ষাৎ হয় এবং পুনরায় ভৎর্সিত হয়ে তিনি মার সংগে দেখা না করেই গৃহত্যাগ করে যান। পথে বহু কর্ম-ভোগের পর কবি গোপভূমের রাজা গণেশের সভায় উপনীত হন, এবং রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মমঙ্গল রচনায় ব্রতী হন। সে-যুগেও ধর্মঠাকুরের উপাসনার অপরাধে বর্ণশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণ রূপরামকে সমাজে পতিত হতে হয়েছিল।

কবি-পরিচিতি ও গ্রন্থোৎপত্তি

রূপরামের ধর্মমঙ্গল মোটামুটি সরল সাবলীল ভাষায় লিখিত হয়েছে। স্থানে স্থানে শব্দ চয়ন ও বর্ণনায় সংস্কৃত পণ্ডিত-সুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি-কৃতি হিসেবে রূপরামের রচনা খুব উচ্চশ্রেণীর নয়।

শ্যামপণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল কাব্যের একখানি পুথির উল্লেখ করেছেন মঙ্গল-কাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পুথিখানির লিপিকাল ১৬২৫ শক তথা ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ। কবি সম্বন্ধে আর কোন তথ্য জানা যায় না। পণ্ডিত উপাধি দেখে শ্রীভাট্টাচার্য অনুমান করেছেন,—কবি হয়ত ধর্ম-পূজারী ছিলেন। কাব্যখানি বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কবির বর্ণনাতেও বীরভূমের পরিবেশ-প্রভাব দেখে মনে হয়,—কবি ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

শ্যামপণ্ডিত

কবি রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল কাব্য রচিত,—মতান্তরে, প্রথম গীত হয়েছিল ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে। কবি জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রঘু:—নিবাস ছিল ভুরসুট পরগণার হায়াৎপুর গ্রামে।

রামদাস আদক

সীতারামদাস ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস্‌গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। তাঁর পিতৃভূমি ছিল সুখসায়ের গ্রাম। কবির পিতার নাম ছিল দেবীদাস,—জাতিতে এঁরা ছিলেন কায়স্থ। 'গৃহদেবতা' 'গজলক্ষ্মীমা'র স্বপ্নাদেশে কবি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থরচনাকাল ১০০৪ মল্লাব্দ তথা ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।[২৪] সীতারামের রচনা প্রাঞ্জল ও সরল ছিল ; অবশ্য শৈল্পিক উৎকর্ষ খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। কবি সীতারাম একখানি মনসামঙ্গল কাব্যও রচনা করেছিলেন।

সীতারাম দাস

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি ঘনরাম চক্রবর্তী গ্রন্থরচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কাব্যের বিভিন্ন অংশের বিচিত্র ভণিতায় কবি খণ্ডে খণ্ডে আত্ম-পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন,—তার সবটুকু সংকলন করলে মোটামুটি নিম্নরূপ কবি-পরিচিতি পাওয়া যেতে পারে :—বর্ধমান জেলায় কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির বসতি ছিল। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত, পিতামহ ধনঞ্জয়। কবি-জননী সীতাদেবী ছিলেন রাজ-বংশ-সম্ভূতা। কবির চার পুত্রের নাম ছিল :—রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামকৃষ্ণ। কবি বিশেষভাবে রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন ;- পুত্রদের নামকরণের মধ্যেও সেই ভক্তি-নিষ্ঠার পরিচয়ই স্পষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া, ভণিতাংশেও ঘনরাম-কবি বার বার "প্রভু" "কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্‌"-এর উল্লেখ করেছেন।

ঘনরামচক্রবর্তী-পরিচিত

কাব্য-রচনাকাল সম্বন্ধে ঘনরাম বলেছেন,—

"সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপণ ॥
শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর ॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াক্ষ তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥"

কাব্য-রচনাকাল

এই উদ্ধৃতি অনুসারে ১৬৩৩ শক অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লাতৃতীয়া তিথিতে ঘনরামের গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। কিন্তু ৺যোগেশচন্দ্র

২৪। মতান্তরে ১০০৪ বঙ্গাব্দ তথা ১৫৯৭ খ্রীঃ।

রায় বিদ্যানিধি গণনা করে দেখেছেন ঐ শকাব্দের শুক্লাতৃতীয়া তিথি হয়েছিল ১লা অগ্রহায়ণ। অতএব, "যাম সংখ্য দিনে" উদ্ধৃতিতে কোথাও ভুল আছে। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য "যাম সংখ্য দণ্ডে" শুদ্ধ-পাঠ অনুমান করে ঘনরামের রচনা-সমাপ্তির কাল নির্দেশ করেছেন,—১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ শুক্লাতৃতীয়া তিথি শুক্রবার দিন অষ্টম দণ্ডে।

ঘনরাম কাব্য-মধ্যে বর্ধমানাধিপ কীর্তিচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করেছেন। মনে হয়, রাজা কবির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন,—ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্য সর্বাপেক্ষা খ্যাতি সম্পন্ন হলেও, "তাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ ধর্মমঙ্গল কাব্য নয়"[২৫]। তাঁর কাব্য-খ্যাতির প্রধান কারণ "মুদ্রণ-সৌভাগ্য"। কিন্তু ডঃ সেনও ঘনরামের রচনার "স্বচ্ছন্দতা ও গ্রাম্যতাহীনতা"র প্রশংসা করেছেন। পূর্ববর্তী আলোচনাতে বিশেষভাবে বলেছি,—রুচি ও রচনার "গ্রাম্যতা"-বিমুক্তিই ধর্মমঙ্গল কাব্যে ঘনরামের সর্বশ্রেষ্ঠ দান;—বস্তুতঃ ধর্মমঙ্গলের ইতিহাসে কেবল এইজন্যই ঘনরামকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করা উচিত। মনসা অথবা চণ্ডীকাব্যের জীবন-রস-নিবিড়তা ধর্মমঙ্গলে নেই। —আগেই বলেছি,—এ্যাড্‌ভাঞ্চার-কাহিনীর পরিপুষ্টিতেই এই কাব্যের সমধিক রসস্ফুরণ ঘটেছে। রাঢ়ের অন্ত্যজ-জীবনে এই রসোপযোগী উপাদান সুপ্রচুর ছিল;—কেবল পুরুষ-চরিত্রেই নয়, ধর্মমঙ্গলের নারীচরিত্রগুলিও বীর্যবত্তায় এ্যাড্‌ভাঞ্চার কাহিনীর আদর্শ-নায়িকা। কিন্তু রসিক-সমাজে পাংক্তেয় হওয়ার জন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের পক্ষে যে উপাদানটুকু অপরিহার্য ছিল, সেটুকু চিন্তার সংযম, প্রকাশের সৌষ্ঠব ও রুচির শালীনতা। কবি ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন সর্বাধিক সার্থকতার সংগে সাধন করেছিলেন।

কাব্য-বৈশিষ্ট্য

বস্তুতঃ, ঘনরামই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান ও প্রায় প্রথমকবি, যিনি পৌরাণিক পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য ও বর্ণ-হিন্দুর শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই সংগে নিজ প্রতিভার সমন্বয়ে নিতান্ত "গ্রাম্য" লোক-কথাকে তিনি শ্রদ্ধা-যোগ্য কাব্য-রূপ দান করেছিলেন। প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের অভাবে যে-প্রচেষ্টায় বৃত হয়ে রূপরাম চক্রবর্তী সমাজে পতিত

ঘনরাম-প্রতিভার সার্থকতা

২৫। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।

হয়েছিলেন, ঘনরাম-কবি নিজ ক্ষমতাবলে সেই কাব্যকেই পাণ্ডিত্য-বিমুক্ত মহিমাময় আসন দান করলেন। ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগের কবি ছিলেন।—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যে নবজাত পৌরাণিক হিন্দু-ঐতিহ্য বাংলার নব্য-স্মৃতি-শাসিত সমাজে ক্রমশঃ পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠ্‌ছিল, তার পরম প্রকাশ লক্ষিত হয়ে থাকে ঘনরামের কাব্যে। বেদ-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রে কবি বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। কেবল তাই নয়, তাঁর চেতনার সংগে এই শিক্ষার ঐতিহ্য একীভূত হয়ে পড়েছিল। তাই, নিতান্ত লোক-জীবন-সম্ভব লৌকিক কাহিনীর যত্রতত্র তিনি বেদ-পুরাণ-কথার বর্ণাঢ্য সুষমা বিস্তার করেছেন। রঞ্জাবতী-কর্ণসেনের বিবাহ-বর্ণনায় পৌরাণিক হিন্দু-মঙ্গলাচারের বর্ণোজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে কবি সমস্ত চিত্রটির সারসঙ্কলন করেছেন,—

"যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শচীপুরন্দর।
স্বয়ম্ভূ-সাবিত্রী কিবা ভবানীশঙ্কর॥
বেদগান বিপ্রগণ করে উচ্চৈঃস্বরে।
সেইরূপ রঞ্জাবতী কর্ণসেন বরে॥"

এটুকু কেবল, রঞ্জাবতী-কর্ণসেনের বিবাহচিত্রাঙ্কণ-সারই নয়—ঘনরামের কবি-চেতনার ভাব-সার সংকলনও। পৌরাণিক ভাবৈতিহ্যে পরিপূর্ণ-চেতন ঘনরাম এম্‌নি করে যত্র-তত্র পুরাণ-কথার,—পৌরাণিক চিত্রের দীপালি-সজ্জা রচনা করে সেই বর্ণ-সুষমার প্রতি তাকিয়ে ছিলেন যেন তন্ময় দৃষ্টিতে। বিভিন্ন নারীরাজ্যে লাউসেন ও নারীগণের কথোপকথন বর্ণনা-প্রসঙ্গে হর-গৌরী, রাধা-কৃষ্ণ, গোপী-গোপীকান্তের সম্ভোগ-চিত্রণ যে মদবিহ্বল রসাবেশের সৃষ্টি করে, তাতে এই বক্তব্য আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। মনে হয়, এ-যেন কোন 'গ্রাম্যতা'-দুষ্ট লালসা-চিত্র নয়,—মধ্যযুগীয় পুরাণ কিংবা কালিদাসীয় কাব্যের শৃঙ্গাররস-লোকে উত্তীর্ণ হওয়া গেছে।

ঘনরামের সংস্কৃত-পাণ্ডিত্য কেবল রসোজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নি,—অলংকার শাস্ত্রে দুর্লভ অধিকার প্রভাবে আশ্চর্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও সৃষ্টি করেছে। এই বাচন-সৌকর্য, তথা শব্দ-শিল্পায়নের প্রভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'এ্যাড্‌ভাঙ্গার' বর্ণনা কি অপ্রত্যাশিত সজীবতা লাভ করেছে,—লোহটা বজ্জরের সঙ্গে যুদ্ধবর্ণন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—

আলংকারিক
চমৎকারিত্ব

"মাহুতের মুণ্ড মাতঙ্গের শুণ্ড
হানিছে এক এক চোটে।
যতেক জাঙ্গড়া জড়াইয়া জোড়া
ঘোড়া সনে ভূমে লোটে॥
তবু অকাতর ভূপতি লস্কর
দুষ্কর সাহসে লড়ে।
একাকার ধূম দুড়, দুড়, দুড়ুম
ঘোর নাদে গোলা পড়ে॥
হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে টাঙ্গি শেল রাখে
ঝুপ্ ঝুপ্ রাখিছে তীর।
কোটালের ঠাঁট জুড়ে এক কাট,
সমরে না রহে স্থির॥
রাহুত মাহুত হানে যূথে যূথ,
কোটাল যম খণ্ডাতি।
ছাড়ি সিংহনাদ গণি পরমাদ
হুতাশে হটায়ে হাতী॥
শরের নিশান শুনি স্বন সান্
ঝঞ্ঝান ঝাঁকিছে খাঁড়া।
টাঙ্গি টন্ টন্ হানে ঠন্ ঠন্
সেনা গণে দিয়ে তাড়া॥"

শব্দকে নয়,—শব্দালংকারও নয়,—শব্দধ্বনি-মহিমার সার্থক উপলব্ধির এতাধিক উৎকৃষ্ট নিদর্শন আর কি হতে পারে! এই শব্দ-ধ্বনি-সাধনার প্রভাবে ঘনরামের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বহু স্বাভাবিক উক্তিকেও প্রবচন-মহিমা দান করেছে। কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর বিবাহ-যোড়নির সার্থকতা-প্রতিপাদন প্রসঙ্গে কবি এক জায়গায় বলেছেন,—

"নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা।
সহজে হইবে বলে সোণায় সোহাগা॥"

সব দিক্ থেকে বিচার করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঘনরামের যথার্থ-মহিমা কেবল ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবেই নয়,—মধ্য-যুগীয় বাংলা সাহিত্যে

হিন্দু-পৌরাণিক-ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধারক বাহক-উদ্গাতারূপেও। বর্তমান প্রসংগে মুকুন্দরামের কথা অ-বিস্মরণীয়। কিন্তু, পণ্ডিত হলেও মুকুন্দরামের কবি-কৃতি যে মধ্যযুগীয় সর্বজনীন বাঙালি-জীবন-ঐতিহ্যের বাণীরূপ. সে কথার পুনরুক্তি করে লাভ নেই। ভারতচন্দ্র পৌরাণিক শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন,- কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ছিলেন না। ঘনরাম সেই কবি, যিনি পৌরাণিক নিষ্ঠার ঐকান্তিকতায় উপেক্ষিত লোককাব্যকে পুরাণ-কথার মর্যাদা দান করেছেন। ধর্মমঙ্গলের ইতিহাসে তাঁর এই দান অবশ্য-স্বীকার্য।

ঘনরামের ঐতিহাসিক মর্যাদা

দ্বিজরামচন্দ্র তথা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল মল্লরাজ গোপালসিংহের রাজত্বকালে। কবির নিবাস ছিল চামট্ গ্রামে। "এই গ্রাম এখন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার সামিল[২৬]"। কবির পিতার নাম জীবন, মাতা মহামায়া। কাব্যের স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকলেও, শিল্প-কৃতি উল্লেখ্য নয়।

দ্বিজ রামচন্দ্রের ধর্মমঙ্গল

'অনিলপুরাণ'-রচয়িতা সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য সন-তারিখ-যুক্ত একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হয়েছে :—

সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণ'

"দ্বিজ সহদেব গান পূর্বতপফলে।
যাহারে করিল দয়া একচল্লিশ সালে ॥
চৈত্রের চতুর্থী দিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈল যুগপতি ॥"

কিন্তু, জানা গেছে ১১৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা ছিল না,—ছিল কৃষ্ণাচতুর্থী তিথি,—তাই ঐ তিথি সম্বন্ধীয় উল্লেখটি মাত্র ভ্রান্ত মনে করে বাকি অংশ ঠিকই গৃহীত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন কিন্তু মনে করেন ১৭৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ রচিত হয়েছিল।

২৬। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।

হুগলী জেলার অন্তর্গত বালিগড় পরগণার রাধানগর গ্রামে কবির জন্ম হয়। কবির পিতার নাম বিশ্বনাথ,—পিতামহ ছিলেন রাজারাম।

'অনিলপুরাণে' ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান উপজীব্য লাউসেন-কাহিনী নেই। হরিশ্চন্দ্র ও তার পুত্র লুইচন্দ্রের প্রাচীনতম কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া, প্রাচীনতম লোকদেবতা শিবসম্বন্ধীয় নানা লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী, নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত মীননাথ-গোরক্ষ-নাথের কাহিনী ও অন্যান্য পুরাণ কাহিনীর বর্ণনাও পাওয়া যায়। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-ধারার বিপর্যয়-পূর্বকালে জীবনরসের শুষ্কতা হেতু পুরাণাশ্রয়ী বৈচিত্র্যসৃষ্টির যুগানুগ চেষ্টা লক্ষিত হয়েছে। লোক-জীবন-সম্ভব,—লোকজীবন-সীমায় আবদ্ধ ধর্মমঙ্গল কাব্যে একই ধরণের বৈচিত্র্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বিভিন্ন সূত্রাগত লোক-কথাকেই অবলম্বন করা হয়েছিল। সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ এই ঐতিহাসিক সত্যেরই ইঙ্গিত বহন করে। তাছাড়া, সহদেবের কাব্যে শৈল্পিক সমৃদ্ধি কিছু নেই।

অনিলপুরাণ কাহিনী ও ঐতিহাসিক সংকেত

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল রচিত হয় ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। কবির পিতার নাম ছিল ঘনশ্যাম। পাঠ-সমাপনান্তে কবি বীরভূমের নবাব আসাদুল্লা অথবা আসফুল্লা খাঁর 'উকিল' নিযুক্ত হন। খাঁর দেয় খাজনা নিয়ে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে একবার কবি ধর্মঠাকুরের স্থানে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সন্ন্যাসী নরসিংহকে ধর্মমঙ্গল রচনায় প্রবুদ্ধ করেন। মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে কবি সুহৃদ্‌গণের সংগে পরামর্শ করে কাব্য রচনায় ব্রতী হন।

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল

নরসিংহ সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে অকারণ-পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা কোথাও লক্ষিত হয় না। সহজ, সরল গ্রাম্যতা-দোষ-মুক্ত ভাষায় কবি আগাগোড়া গ্রন্থরচনা করেছেন।

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের খ্যাতিমান্ কবি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর লেখা একখানি ক্ষুদ্রাবয়ব ধর্মমঙ্গল কাব্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচয়িতা মাণিকরাম গাঙ্গুলির গ্রন্থ-

শঙ্কর চক্রবর্তী

রচনার কাল নিয়ে মতানৈক্য আছে। একটি পুথিতে কালজ্ঞাপক নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায়,—

মাণিকরাম গাঙ্গুলি

"শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগপক্ষ যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃত।
শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হৈল পুথি॥

এই শ্লোক অনুসরণে নানাজনে নানা কথা বলেছেন। ৺যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সিদ্ধান্ত মতে ১৭০৩ শকাব্দ তথা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকরামের কাব্য রচিত হয়েছিল। মাণিকরামের পিতার নাম গদাধর, মাতা কাত্যায়নী, পত্নী শৈব্যা। কবির নিবাস ছিল হুগলী জেলার বেলডিহা গ্রামে। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ প্রসংগে ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশ-কথা এক বিচিত্র কাহিনী। মাণিকরামের কাব্যের প্রধান উপজীব্য লাউসেন উপাখ্যান। তাহলেও, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী-বর্ণনায় বৈচিত্র্যও লক্ষিত হয়ে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কাহিনী-বৈশিষ্ট্য-মূলক আরও একখানি অনিল-পুরাণের সন্ধান দিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন।[২৭] কাব্যখানির সর্বত্রই নানারূপে রামাই পণ্ডিতের ভণিতা উদ্ধৃত রয়েছে। কেবল একটিমাত্র স্থানে লক্ষ্মণের ভণিতা আছে। ডঃ সেন মনে করেন, ইনিই মূল কবি। কাব্য কাহিনী পূর্বোদ্ধৃত 'অনিলপুরাণের' অনুরূপ বৈচিত্র্যে মণ্ডিত। ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন,—"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এবং তাহার পরেও কিছুকাল ধরিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচনায় একটুও ভাটা পড়ে নাই।"[২৮]—তবু আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ হবে। কারণ, এই প্রসংগের সূচনায় ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক মূল্য নির্দেশ করেছি,—তার প্রতিপাদন এপর্যন্ত পরিচায়নের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করি।

শিবায়ন কাব্যপ্রবাহ

পূর্বে একাধিক প্রসংগে উল্লেখ করেছি,—শিব ছিলেন প্রাচীন বাংলার আদিম লোক-দেবতাদের একজন। ফলে বিভিন্ন লোক-দেবতার প্রাচীন পাঁচালিকাব্যে, নানারকম ছড়া-গাথায় বিচিত্র ধরণের শিব-কথা বাংলার

২৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)। ২৮। ঐ।

নানা অঞ্চলে সুপ্রচলিত ছিল। কিন্তু, শিব-মহিমাত্মক পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-কাব্য রচনার পরিচয় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের আগে বড় একটা পাওয়া যায় না। তাছাড়া, উদ্ভব-উৎস ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের বিচারে এই শ্রেণীর কাব্যকে ঠিক মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ভুক্ত হয়ত করা চলে না ;—যদিও মনসা, চণ্ডী, এমন কি, ধর্মমঙ্গল কাব্য-কথাতেও শিব-দেবতার প্রাধান্য কোন না কোন উপায়ে স্বীকৃত ও প্রকাশিত হয়েছেই। অবশ্য, এই সিদ্ধান্তের পরিপোষণের জন্য বাংলা সাহিত্যে শিব-সাধনার ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজনীয় ;—যদিও অনেকাংশেই তা হবে অনুমান-নির্ভর।

শিব-কথার প্রাচীনতা

শিব সম্বন্ধীয় আলোচনার সূচনাতেই শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন,—"ভারতীয় যে সকল প্রাগ্‌বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দুসমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শিবই প্রধান।"[২৯] প্রাগ্‌বৈদিক শিব-দেবতার মূল রূপাবয়ব স্পষ্টভাবে নির্ণীত হতে পারেনি। তাহলেও, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, শিব-দেবতার কালজয়ী সর্বজনীন প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে তাঁর প্রতিরোধহীন রূপ-ব্যাপ্তির সম্ভাবনা। বৈদিক রুদ্র, ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্তি ও জৈন-তীর্থঙ্কর পরিকল্পনার দ্বারা বিচিত্র পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে, এবং হয়ত এদের উপর নিজের প্রভাবও অল্পাধিক বিস্তার করে শিব ব্যাপক লোক-প্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশে এসে হয়ত প্রাচীনতর তান্ত্রিক লোক-দেবতার সংগে যুক্ত হয়ে ইনি এক বিমিশ্র নবরূপ লাভ করেন। ক্রমে নাথ-ঐতিহ্যও এই সংগে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু, এই সব সমন্বয়-বিবর্তনের পরেও শিবের একাধিক পৃথক্ রূপ-পরিণাম আজও লক্ষ্য করবার মত। বৈদিক কিংবা অন্যান্য ঐতিহ্য-সম্ভূত রূপ-বিভিন্নতার কথা ছেড়ে দিলেও, বাংলা-ভাষা-সাহিত্যে এই দেবতার স্পষ্ট-লক্ষিতব্য দুটি পৃথক্ রূপ রয়েছে। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত উন্নততর কল্পনা-জাত পৌরাণিক স্বরূপ ; দ্বিতীয়টি নিতান্ত লৌকিক,—বহুলাংশে রুচিহীন, আদিরসাশ্রিত। সন্দেহ নেই, এই বিভিন্ন মূলোদ্ভূত কাহিনী দুটি পরবর্তী-কালে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তবু, এই দুই দেব-

শিব-দেবতার স্বরূপ

২৯। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)।

রূপের মধ্যে আগাগোড়াই পার্থক্যের মৌল সূত্রটি রক্ষিত হয়েছে। পৌরাণিক ধ্যানী শিব-মূর্তি ও "শৃঙ্গারাদি-রসোল্লাস"-স্বরূপ তান্ত্রিক শিবের ধ্যান-কল্পনায় তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়তর ধ্যানের সংস্কৃত ভাষা-প্রয়োগ ভঙ্গি থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, এই ধ্যান-কল্পনা মূলতঃ লৌকিক শিব-স্বরূপের প্রভাবে পুষ্ট। বাংলাদেশের লৌকিক শিব প্রধানতঃ কৃষি-দেবতা, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত গৃহধর্মের ভিক্ষা-জীবি অধীশ্বর। চিরায়ত দারিদ্র্যের মত কোচ-রমণী-সংগে ব্যভিচার ও মাদকাসক্তিও তাঁর নিত্যসঙ্গী। একদিনকার বাংলাদেশে "ধানভানতে" এই 'শিবের গীত'ই গাওয়া হত। মঙ্গলকাব্য-সমূহে,—মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের মুখবন্ধেও এই লোক-জীবনাধীশ্বর গৃহাশ্রয়-সর্বস্ব বাঙালি শিবের গৃহধর্মের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য, আলোচ্য পর্যায়ে লৌকিক শিবের মধ্যে মঙ্গল-সাধন-ক্ষমতার পৌরাণিক ঐতিহ্যও এসে যুক্ত হয়েছিল।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে শিব-দেবতার আদিমতার সংগে তাঁর সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা ও তার কারণ বিশেষ লক্ষ্য করবার মত। শিবের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্ভাবনা (Flexibility) এত বহু-বিচিত্র ছিল যে, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-অহিন্দু, জৈন-বৌদ্ধ-নাথ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই তিনি স্বীকৃতির শ্রেষ্ঠ আসনটি অনায়াসে অধিকার করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে মঙ্গলকাব্য সমষ্টির উদ্ভব-মূলে বিভিন্ন লোকদেবতার আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় দ্বান্দ্বিক পটভূমিতে জাত মঙ্গলকাব্যের রূপাবয়ব ও ভাব-বিষয়ের সংগে আত্মপ্রসরণশীল শিব-দেবতার মাহাত্ম্য-কথার কোন সাদৃশ্যই কল্পনা করা চলে না। তাই বলেছি, শিবায়ন লোক-দেব-গাথা হলেও, যথার্থতঃ মঙ্গলকাব্য-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্য

শিবায়নের বিভিন্ন কাহিনী থেকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাংলা শিব-কাব্য সমষ্টিকে গল্পের দিক্ থেকে দুভাগে ভাগ করা চলে:—(১) মৃগলুব্ধ কাহিনী এবং (২) শিবায়ন কাব্য। প্রথম শ্রেণীর কাব্য-পর্যায়ের গল্পাংশে পৌরাণিক আদর্শ প্রধান; দ্বিতীয় পর্যায়ে অল্পাধিক পুরাণকথার সংমিশ্রণ থাকলেও লৌকিক কাহিনীই শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে।

মৃগ-লুব্ধ কাব্যের এ-পর্যন্ত জ্ঞাত প্রাচীন কবি রতিদেবের কাব্য-কথা নিম্নরূপ :—প্রথমে দেব-দেবী-বন্দনা ও আত্ম-পরিচয় বর্ণনার পরে 'মধুকৈটভ-বধোপাখ্যান' বিবৃত হয়েছে। তারপরে, শিব-কর্তৃক মুনি-পত্নী লঙ্ঘন, মুনি-শাপে লিঙ্গ-চ্যুতি, ভ্রষ্ট-লিঙ্গের প্রভাব ইত্যাদি ঘটনা হরগৌরী-সংবাদে ব্রতকথার আকারে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে রাজা মুচুকুন্দ এবং রাণী রুক্মিণীর কথোপকথনের মাধ্যমে প্রধান কাহিনীটি উপস্থাপিত হয়েছে। পার্বতী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে শিব নিজ পূজা প্রচলনের কথা বিবৃত করেছেন,—একদা রাজা মুচুকুন্দ শিব-চতুর্দশীর উপবাস-পূজা সমাপ্ত করে রাণী রুক্মিণীর কাছে নিম্নরূপ ব্রতকথা শ্রবণ করেন। বিদ্যাধর চিত্রসেন একদিন ইন্দ্রসভায় নৃত্য কালে হরিণ শিকারের দৃশ্য দেখে তাল ভঙ্গ করেন। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তাকে নরলোকে ব্যাধ-জীবন যাপনের অভিশাপ দেন। ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাৎ লাভ করলে চিত্রসেনের শাপ-মুক্তি ঘট্‌বে,—ইন্দ্রের এরূপ নির্দেশ ছিল। সারাদিন ব্যর্থ মৃগান্বেষণে শ্রান্ত, অবসন্ন, উপবাসক্লিষ্ট চিত্রসেন এক শিবচতুর্দশীর রজনীতে আত্মরক্ষার জন্য বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করেন। সেই সময় একটি সজল বিল্বপত্র বৃক্ষতলের শিব-লিঙ্গোপরি পতিত হয়। তখন পরিতুষ্ট শিব ব্যাধকে বর দিতে আসেন। ব্যাধ শিবের কাছ থেকে পরদিন পশুলাভের বর আদায় করে নেয়। সেই অনুযায়ী ভদ্রসেন মৃগ ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়। মৃগী কিছুতেই স্বামীকে ত্যাগ করে যাবে না—নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও সে স্বামীর উদ্ধারে কৃত-সংকল্প। এমন সময় ব্যাধ চিত্রসেন এসে উপস্থিত হল। মৃগী তাকে অনেক ধর্মোপদেশ দিলে—যথা :—জীবহত্যাসম পাপ নেই, কেবল শিবরাত্রি ব্রতে সেই পাপ মোচন সম্ভব ইত্যাদি। মৃগীর বাক্যে চিত্রসেনের জ্ঞানোদয় হল, এবং মৃগ-মৃগীকে পরিত্যাগ করে সে চন্দ্রভাগাতীরস্থ শিবমন্দিরে আরাধনা করে পাপ-মুক্ত হল।—ভদ্রসেন মৃগও সপত্নীক শিব-লোক প্রাপ্ত হয়। রুক্মিণীর এই কথা শ্রবণ করে মুচুকুন্দের শিব ব্রতের রাত্রি উদ্‌যাপিত হল। প্রাতঃকালে তিনিও চন্দ্রভাগাতীরস্থ শিবমন্দিরে শিবপূজা করে লোকান্তরিত হন।

মৃগলুব্ধ-কথা

অন্যদিকে, লৌকিক শিবায়ন কাব্য-সমূহের গল্পাংশে দেব-মাহাত্ম্য-কীর্তনের

চেয়ে লোক-জীবনাশ্রিত কাহিনী-রস রচনার নিবিড়তাই যেন সমধিক। প্রাথমিক অংশে অবশ্য পৌরাণিক মুখবন্ধটুকু ঠিক আছে। ইন্দ্রসভায় শিব কর্তৃক নমস্কৃত না হয়ে দক্ষ-প্রজাপতির ক্ষোভ, শিবহীন দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের বিড়ম্বনা, গৌরীরূপে হিমালয়-মেনকার ঘরে সতীর পুনর্জন্মগ্রহণ, পার্বতীর সাধনা ও শিবকে পতিলাভ ইত্যাদি অংশের শেষেই আরম্ভ হয়েছে বাঙালি-ধর্মী লোক-গাথা। অবশ্য এই অংশে মৃগলুব্ধানুযায়ী ব্যাধ-কথা ও শিবরাত্রিমাহাত্ম্য বর্ণনাও আছে। কিন্তু শিবায়নের মূল গল্প নিম্নরূপ :—

লৌকিক শিবায়ন-কথা

গার্হস্থ্য-জীবনে পার্বতীর বড় দুঃখ,—ভিক্ষান্নে সংসার যেন আর চলে না। পার্বতী তাই মহাদেবকে চাষ-কর্মে বৃত হতে পরামর্শ দেন। বিশ্বকর্মা চাষের জোয়াল, লাঙল, মই, তৈরী করে দিলেন; কুবেরের ভাণ্ডার থেকে ধার করা হল বীজ ধান। শিবানুচর ভীম দুরন্ত বর্ষায় করল হল-চালনা। ক্রমে শিবের কৃষিকর্ম সার্থক হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল,—বসুন্ধরা হয়ে উঠ্‌ল শস্য-পূর্ণা। নারদের ঢেঁকি দিয়ে ভীম ধান ভানে,—শিবের আনন্দ আর ধরে না। আনন্দের আতিশয্যে ভোলানাথ পার্বতীর দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত সংসারের কথা ভুলে গেলেন। শিব ঘরে আসেন না,—পার্বতীর দুঃখদুর্দশার শেষ নেই। নারদের পরামর্শে পার্বতী শিবকে উত্ত্যক্ত করবার জন্য একে একে ডাঁশ মাছিদের পাঠিয়ে দিলেন।—শিব ঘৃতাক্ত-কলেবর হয়ে তাদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করলেন। শিবের পাকা ধানে পোকা পড়ল, তবু শিব নির্বিকার। অবশেষে নিরুপায় বিশ্বেশ্বরী বাগ্‌দিনী-রূপ ধরে চললেন মহাদেবকে বিভ্রান্ত করতে। শিবের মন টল্‌ল,—বাগ্‌দিনীর রূপে তিনি যখন উন্মাদ-প্রায়, তখনই পার্বতী ঘরে ফিরে এলেন। শিবও অতদিন পরে আবার এলেন। পার্বতী এবারে নারদের পরামর্শে এয়োতির ভূষণ শাঁখা দাবি করলেন স্বামীর কাছে;—শাঁখা পরলেই স্বামী আর বিমুখ হবেন না। কিন্তু ত্রিদশেশ্বর যে ভিখারী,—তিনি শাঁখা পাবেন কোথায়! আরম্ভ হল হর-গৌরীর কোন্দল। ক্ষোভে-দুঃখে পার্বতী পিত্রালয়ে চলে গেলেন। হিমালয়-গৃহে তখন দুর্গোৎসব। নিরুপায় শিব শঙ্খ-বণিকের বেশে শ্বশুরালয়ে উপনীত হলেন। হর-গৌরীর সাক্ষাৎ হল, কথোপকথনচ্ছলে পতি-পত্নীর মধ্যে বাদানুবাদ চলল কিছুক্ষণ। তারপর বিশ্বেশ্বরী বিশ্বনাথের কাছে নারীর

শ্রেষ্ঠ ভূষণ শঙ্খ পরিধান করে শক্তিরূপা মহাকালীরূপে আবির্ভূতা হলেন। হরপার্বতী ফিরে এলেন কৈলাসে।

আলোচ্য গল্প-দুটির এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকেই প্রতিপন্ন হবে,—শিবায়ন মঙ্গলকাব্য-ধর্মী কাহিনীর আধার নয়। বস্তুতঃ, প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ-মূলে উদ্ভূত "আত্ম-প্রতিষ্ঠার লড়াই"এর মধ্যেই মঙ্গলকাব্যিক কাহিনী-সমূহ শক্তি সঞ্চয় করেছে। এমনকি, পরবর্তীকালের সাহিত্যিক মঙ্গলকাব্য-সমষ্টির শিল্পাঙ্গিক এই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ভিত্তিমূলেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, পূর্বোদ্ধৃত শিব-কাব্য-কাহিনীতে সেই প্রতিরোধ-স্পৃহা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সমাজ ও কাব্যে শিব-দেবতার প্রতিষ্ঠা ছিল নির্বিরোধ, অবিসংবাদিত। এই কারণেই দেবমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্য-হিসেবে এই শ্রেণীর রচনাবলী বরং কৃষ্ণমঙ্গল-চৈতন্যমঙ্গলের মত নির্বিরোধ সাংগীতিক কাব্য-সমূহেরই স-গোত্র।—অবশ্য রুচি এবং রচনা-পদ্ধতি, ভাব-এবং-বিশ্বাসের স্থূলতা ও অশালীনতাই শিবায়ন কাব্য-সমূহকে পূর্বকথিত কাব্যাদি থেকে পৃথক্ করেছে। আরো লক্ষ্য করা যেতে পারে যে,—শিবায়ন কাহিনী দু'টির মধ্যে পারস্পরিক অনুপূরক-পরিপূরকতার সম্পর্ক কিছু পরিমাণে থেকেও যদি থাকে,—তবু মূলতঃ এরা দু'টি স্পষ্ট-দৃষ্ট পৃথক্ সূত্র থেকে উদ্ভূত। প্রথমটিতে অভিজাত-পৌরাণিক শৈব-সংস্কার প্রবল,—দ্বিতীয়টিতে লৌকিক শিব-কথার মধ্যে বাংলার কৃষি-জীবি সমগ্র লোক-জীবনটি যেন নবজন্ম লাভ করেছে। এটি দেবগাথা তত নয়,—যত লৌকিক বাংলার জীবন-কথা।

ইতিহাসের সংকেত

মৃগলুব্ধ কাব্যের পরিচায়ক মুন্সী আব্দুলকরিম সাহিত্য-বিশারদ এই পর্যায়ের যে পুথিখানিকে প্রাচীনতম বলে অনুমান করেছেন, তার রচয়িতার নাম জানা যায় না। তবে কবি যে চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, সে কথা মনে করবার কারণ আছে।

অপরিজ্ঞাত-নামা কবি

মৃগলুব্ধের সর্বাধিক প্রচারিত কাব্যের লেখক রতিদেবের কাব্যে নিম্নরূপ কাল-জ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায়,—

"রস অঙ্ক বায়ুশশী শাকের সময়।
তুলামাসে সপ্তবিংশতি শুক্রবার হয়॥"

—অর্থাৎ ১৫৯৬ শক তথা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে কার্তিক বৃহস্পতিবার কবি কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। চাটিগাঁ চক্রশালা পরগণার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে কবির জন্ম হয়। গোপীনাথ এবং মধুমতী ছিলেন যথাক্রমে তাঁর পিতামাতা। রাম ও নারায়ণ নামে কবির আরো দুটি ভাই ছিলেন। কবির গুরুর নাম ছিল মোক্ষদা ঠাকুর। রতিদেবের মৃগলুব্ধ-কাহিনী নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার,—পাঁচালীর মত লেখা। কিন্তু রচনার মূলে রচয়িতার অটুট্ নিষ্ঠার পরিচয় প্রকাশ-ভঙ্গিতে প্রস্ফুট হয়েছে। বিশেষ করে মৃগী-কণ্ঠে শিবরাত্রি-মাহাত্ম্য-কথনের 'পরেই জোর দেওয়া হয়েছে। হরিণীর বিলাপ অংশে করুণ-রস-নিবিড়তার পরিচয় আছে।

রতিদেবের মৃগলুব্ধ

রতিদেবের মৃগলুব্ধের মুদ্রিত পুথির পরিশিষ্টে উদ্ধৃত মনসা ধূপাচার অংশটিও হয়ত একই কবির রচনা।

মৃগলুব্ধ কাব্যের অপর কবির নাম রামরাজা। মুন্সী আব্দুলকরিম সাহিত্য-বিশারদ মনে করেন,—কবি চট্টগ্রামবাসী মগ ছিলেন; কারণ সাধারণতঃ চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগদের মধ্যে নামের সঙ্গে 'রাজা' উপাধি সমধিক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কাব্য মধ্যে,—"শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গায়"······ইত্যাদি ধরণের ভণিতা দেখে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন কবির নাম হয়ত 'শিশুরাম'ও হয়ে থাকতে পারে। লিঙ্গ-পূজা-প্রচার-প্রকরণ ছাড়া অন্য অংশে সর্বত্র রতিদেব ও রাজারামের কাব্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কে-যে কার কাছে ঋণী, বলা দুষ্কর।

মৃগলুব্ধকার রামরাজা

চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত এই সব মৃগলুব্ধ কাব্য ছাড়া বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্তেও পৌরাণিক শিব-কাব্য রচিত হয়েছিল। মল্লাবনী-মহীন্দ্র বিষ্ণুপুরপতি বীরসিংহের রাজত্বকালে (১৬৫৬-১৬৮২ খ্রীঃ) কবিচন্দ্র নাম বা উপাধি-বিশিষ্ট কবির রচনাই এ-বিষয়ের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ডঃ সুকুমার সেনের ধারণা,—এই 'কবিচন্দ্র' এবং সুবৃহৎ শিবায়নকাব্যের রচয়িতা রামকৃষ্ণ (রায়) দাস একই ব্যক্তি। কারণ, রামকৃষ্ণের কাব্যের একাধিক স্থলেও ভণিতাংশে 'কবিচন্দ্র' 'কবিচন্দ্র দাস' ইত্যাদি উল্লেখ লক্ষিত হয়ে থাকে।

কবিচন্দ্র

রামকৃষ্ণের কাব্য-পরিচয় থেকে জানা যায়,—তিনি কাশ্যপগোত্রীয় কায়স্থ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কৃষ্ণরায়, মাতা রাধাদাসী। রামকৃষ্ণের কাব্যের যে সকল পুথি পাওয়া গেছে, তার প্রাচীনতমটির লিপিকাল '১০৯১ সাল'; অনেকে এটি মল্লাব্দ বলে মনে করেছেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন বলেন,—এই 'সাল'কে "মল্লাব্দ মনে করিবার কারণ নাই।"[৩০] রামকৃষ্ণের কাব্য বিভিন্ন পুরাণ-কথার সমষ্টি।

রামকৃষ্ণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়ন-রচয়িতাদের মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীই প্রধান। কবির পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, মাতা রূপবতী। কবির এক ভাইও ছিলেন, তাঁর নাম শম্ভুনাথ। এঁরা কেশরকোণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় বরদাবাটি পরগণার যদুপুরে পৈতৃক বাসভূমি ছেড়ে কবি একই জেলার অযোধ্যা নগরে বাস-স্থাপন করেন। সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী নামে তাঁর দুই পত্নী ছিলেন।

শ্রেষ্ঠ শিবায়ন-কবি রামেশ্বরচক্রবর্তী

যদুপুর বাসকালেই কবি একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। কিন্তু, তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য শিবায়ন রচিত হয় কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ও তাঁর পুত্র যশোমন্ত সিংহের আশ্রয়ে। রচনাকাল—

গ্রন্থ রচনাকাল

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বামে হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥"—অর্থাৎ ১৬৩২ শক তথা—১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দ।

রামেশ্বরের কাব্যের নাম 'শিব-সংকীর্তন';—'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নি। কীর্তনোদ্দেশ্যে রচিত বলেই গ্রন্থখানি 'অষ্টমঙ্গলা'র আকারে লেখা। আট দিন-রাত ধরে গীতব্য বিভিন্ন পালায় ভাগ করে মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর নাম দেয়া হয়েছিল 'অষ্টমঙ্গলা'। রামেশ্বরের গ্রন্থের "অষ্টমঙ্গলা" কিন্তু কেবল অনুরূপ সাংগীতিক পালাবিভাগেরই সংকেত সূচক। তাছাড়া, শিব-কাব্য যে কোনো অর্থেই মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ভুক্ত নয়; সে-কথা পূর্বে বলেছি।

রামেশ্বরের কাব্য-পরিচয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠকবিদের মধ্যে রামেশ্বর অন্যতম। শাব্দিক প্রতিভার বিকাশে ভারতচন্দ্রের মত প্রথমশ্রেণীর চমৎকৃতি হয়ত তিনি প্রদর্শন

৩০। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।

করতে পারেন নি,- তাহলেও তাঁর কাব্যের আলংকারিক সমৃদ্ধি, ও শাব্দিক-সম্পদ সুপ্রচুর; এবং উপভোগ্যও। রামেশ্বর তত্ত্বদর্শী, সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই, লৌকিক শিব-কাহিনীর মধ্যেও তত্ত্বদৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যের গভীর পরিচয় দিয়েছেন। স্থানে স্থানে কিছু কিছু চিত্র স্বাভাবিক ভাব-নিবিড়তায় হৃদয়গ্রাহীও হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে হিমালয়-গৃহে গৌরীর বাল্যক্রীড়ার কথা বলা যেতে পারে। রামেশ্বরের রচনার একাধিক অংশ লোক-প্রবচনে পরিণত হয়েছে,—রচনার বহুলাংশে হাস্য-সরসতাও কম নয়।

রামেশ্বরের কবি-প্রতিভা

শঙ্কর-বিরচিত শিবায়ন

দ্বিজ হরিহরের পুত্র শঙ্কর-বিরচিত একখানি লৌকিক শিবায়নকাব্যের পরিচয়ও পাওয়া গেছে।

শিব-কাব্য-সম্বন্ধীয় এই যৎসামান্য উপাদান নিয়ে আলোচ্য শ্রেণীর সাহিত্যের ঐতিহাসিক মর্যাদা-নির্ণয় সহজ নয়। তবে কোন প্রকার অ-তথ্য-কথনের ঝুঁকি না নিয়েও বলা যেতে পারে,—মঙ্গল-দেবতাদের তুলনায় শিব গুণ-চরিত্রে বিশেষ ভাবেই ছিলেন পৃথক্। ফলে, যে প্রয়োজন-বোধ ও সমাজ-পরিবেশের মধ্যে মঙ্গলকাব্য ধারার উদ্ভব ঘটেছিল, শিব-কাব্যসমূহ সে-যুগে রচিত হয়নি। বরং, সমাজের সকল স্তরেই নিষ্ঠা-বিশ্বাসের সংগে পূর্বাবধি সুপ্রতিষ্ঠিত এই দেবতাকে আশ্রয় করেই "নিজ পূজা-প্রচারের জন্য উৎকট ও অশোভনরূপে আগ্রহশীল" মঙ্গল-দেব-দেবীগণ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ঐ প্রয়োজন-বোধের তাড়নাতেই মঙ্গলদেবতাগণ শিব দেবতার সংগে সম্পৃক্ত,—একথা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে প্রসঙ্গতঃ শিব-কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে। এইসকল কাহিনী-বর্ণনার উপাদান ছড়া-পাঁচালী আকারে প্রচলিত লৌকিক শিব-কথা ও অভিজাত-পৌরাণিক শিবোপাখ্যান থেকে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন পরিমাণে আহৃত হয়েছিল। অবশ্য, ছড়া এবং পাঁচালীর আকারেও ঐ সকল কাহিনী পৃথক্,—বিভিন্নভাবে প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন মধ্যযুগীয় জীবন-প্রবাহে ভাঁটার শিথিলতা দেখা দিয়েছিল,—যখন জীবনীশক্তির অভাব পরিপূরণের জন্য বিভিন্ন পুরাণ-কথা এবং লোক-গাথার আহরণ করে চলেছিল কাহিনী-বৈচিত্র্য-সৃষ্টির চেষ্টা, তখনকারই বহু অভিনব কাহিনীকাব্যের মধ্যে প্রাচীন শিব-গাথা নূতন আর একটি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি

শেষ কথা

করেছিল। ধর্মগত বিচারেও সেকালে বিশেষ করে পৌরাণিক-চেতনা এবং বিভিন্ন লৌকিক-সহজিয়া চেতনা আবার বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হচ্ছিল। আর, শিব-কাব্যসমূহের অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত প্রকাশ এই উভয় চেতনারই বিকাশ ও পুষ্টি-সাধনের দ্যোতক বলে গৃহীত হতে পারে।

কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গল কাব্য-সমষ্টি বিশেষভাবে অষ্টাদশ শতকের যুগগত সৃষ্টি,—(Product of the age)। ষোড়শ শতকে রচিত একখানি এবং সপ্তদশ শতকে রচিত তিনখানি কালিকামঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহলেও, কাব্য-সাহিত্য-শিল্প যদি যুগ-যুগান্তরের দ্বারে যুগ-জীবন-স্বরূপের ধারক ও বাহক হয়ে থাকে,—তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-জীবনালোকেই এই শ্রেণীর কাব্যসমূহ বিচার্য। কারণ, শ্রেষ্ঠ কালিকামঙ্গল কাব্যসমূহে এই যুগের জীবন-বাণীই সমধিক বিকশিত হয়েছে। কিন্তু, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বাঙালির জীবনাকাঙ্ক্ষা এ-পর্যন্ত অবলম্বিত ঐতিহাসিক বিচার-সূত্রকে অতিক্রম করে স্পষ্ট এক নব-যুগ-সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। ফলে, চৈতন্য-প্রভাবিত সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই শ্রেণীর সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার সম্ভব নয়। সে জন্য নূতন বিচারের মান-স্বরূপ নবযুগ-সম্ভাবনার পটভূমিকা রচনা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়,- এই শ্রেণীর সাহিত্যকে মঙ্গলকাব্য-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না,—এমন কি, শিব-কাহিনী-কাব্য-প্রবাহের মত এদের দৈবী-কাব্যও বলা চলে না।—বস্তুতঃ, এ সকল কাব্য দেব-বাদ-বিনির্মুক্ত মানবিকতার পথে অগ্রসর হয়েছে। হতে পারে, সে মানবিকতা-বোধ অসুস্থ এবং অপূর্ণ;—তবু তার ঐতিহাসিক স্বীকৃতিরূপেই এই শ্রেণীর কাব্যকে কালিকামঙ্গল অপেক্ষা বিদ্যাসুন্দর-কাব্য নামে অভিহিত করা অধিকতর সঙ্গত। অতএব, নূতন আলোচনার উপযুক্ত নূতনতর সুযোগ-রচিত হওয়ার অপেক্ষায় মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিচারের সমাপ্তি এখানেই চিহ্নিত হতে পারে।

সাহিত্য-ইতিহাসের মূল্যমান

একবিংশ অধ্যায়

যুগান্তরের পথে

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ-সমাপ্তির সন্ধিলক্ষণ সূচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকেই। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, বিশেষভাবে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রত্যেক ধারাতেই অভিনবতর বৈচিত্র্য তথা নূতন পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরিবর্তনের এই প্রবাহ প্রাচীন ধারার নবায়নেই নিঃশেষিত হয় নি, নব-স্বভাব-

যুগসন্ধি

যুক্ত সাহিত্য-কৃতির উৎসারে পরিণতি লাভ করেছে। লোক সাহিত্য, আরাকান রোসাঙের ইস্‌লামী সাহিত্য, শাক্ত সংগীত ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যধারার আলোচনায় অতঃপর সেই নবায়িত ঐতিহাসিক লক্ষণ সমূহেরই সন্ধান করব। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে, আলোচ্য রচনা প্রবাহের নবীনতা একটি নূতন যুগের সম্ভাবক তত ছিল না, যত ছিল পূর্ব যুগ-লক্ষণের বিপর্যয় সূচক।

অতীত থেকে বর্তমানের মাধ্যমে অনাগতের পথে নিয়ত চলেছে ইতিহাসের অনাহত ধারা। বর্তমান যেখানে নিঃশেষিত, সেখানেই যুগপৎ অঙ্কুরিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ। কিন্তু, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই বিনষ্টি ও নব-অভ্যুত্থান একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়; একটি স্বতো নিয়ন্ত্রিত ব্যাপক পদ্ধতি। প্রথমে যুগ-মানসের অসংজ্ঞান চেতনায় এই

যুগান্তরের পথে

ধারা সূচিত হয় অজ্ঞাত-গোপনে। ক্রমশঃ তার প্রভাব স্পষ্ট-স্ফুট হয়ে হয়ে, বর্তমানের বিনষ্টি-লক্ষণকে ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ করে তোলে। তারপরে প্রস্ফুট হতে থাকে ভবিষ্যতের স্বভাব-চিহ্ন। এই ঐতিহাসিক পদ্ধতির সহজ বিবর্তনে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বিলুপ্তির শেষে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল আধুনিক যুগ। সেই যুগ-ধর্ম 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র পৃথক্ পর্যায়ের আলোচ্য হবে। বর্তমান আলোচনা মধ্যযুগ লক্ষণের বিপর্যয়-বিলোপ-সম্ভাবনার পরিণতি মুখেই হবে নিঃশেষিত। বলাবাহুল্য, এই সন্ধিমুখেই আধুনিক যুগের অসংজ্ঞান অঙ্কুরোদ্গমও ঘটেছে

বলে আমাদের বিশ্বাস। এই অর্থেই পরবর্তী অধ্যায় সমূহে আলোচ্য রচনা-প্রবাহ যুগান্তরের পথ প্রদর্শক।

এ-পথের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে প্রথমেই স্মরণ করি,—মধ্যযুগীয় সাহিত্য-স্বভাবকে আমরা এতাবৎ চৈতন্য-চেতনা নামে অভিহিত করে এসেছি। ডঃ সুকুমার সেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই চেতনার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন,—"[চৈতন্য-পূর্ব যুগে] বাঙালি ছিল অপদেবতার পূজারী ও উপদেবতার উপাসক। এখন [চৈতন্য যুগে] হইল দেবতার লীলা সহচর ও দেবকল্প মহাপুরুষের ভক্ত। বাংলা সাহিত্য উপকথার পর্যায় হইতে কাব্যের স্তরে উন্নীত হইল।"[১] চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ আলোচনায় এ-পর্যন্ত আমরা এই সত্যের উদ্ঘাটনেই প্রয়াসী হয়েছি। এই প্রসংগে পুনঃপুনঃ বলেছি,—(১) শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করে বাংলার বৃহত্তর সমাজ-জীবনে ধর্ম-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এক আবেগাত্মক প্রেমমিলনাকাঙ্ক্ষা হয়েছিল সুতীব্র। (২) এই ভাবপ্রধান প্রেমানুরক্তির চর্যার ফলে চৈতন্য জীবন প্রভাবেই দেখা দিয়েছিল দেবায়িত মানব-মহিমাবোধের,—নরচন্দ্রমা-প্রীতির এক মহৎ-বলিষ্ঠ আদর্শ। (৩) ভগবৎ-বিশ্বাসের নিষ্ঠানুরাগে ভাবতন্ময় এই মানব-প্রেম-সাধনার একান্ত পটভূমি ছিল সমষ্টি চেতনাশ্রিত গ্রামীণ সমাজ।

অতীত যুগ-স্বভাব ও বিপর্যয়

এই ত্রিবিধ উপাদানকে আশ্রয় করে মধ্যযুগের নব-উদ্বোধিত জীব'নাচ্ছ্বাস চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রাণ-স্পন্দিত ত্রিবেণীসংগম রচনা করেছিল। স্বভাবতঃই, ভাটার টানে বিপর্যয় যখন অনিবার্য হল, তখনও জাতীয় জীবনে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই ত্রিপথ বেয়ে। প্রথম ভেঙেছে মধ্যযুগীয় বাঙালি-চেতনার জীবন পটভূমি গ্রামীণ সমাজ। তার সংগে সংগে শিথিল হয়েছে ঐতিহ্য-সচেতনতা। সবশেষে লুপ্ত হয়েছে প্রাচীন মূল্যবোধ।

এই বিপর্যয়-পদ্ধতির উৎস-মূলে রয়েছে বাংলা দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন-ব্যবস্থার পরিবর্তন। ষোড়শ শতকের শেষে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ প্রথম মোগল-অধিকার ভুক্ত হয়; আকবর তখন দিল্লীশ্বর। এর আগে উত্তরাপথের ব্যাপক অঞ্চলে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও, বাংলাদেশে

ইতিহাসের নব পটভূমি

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (২য় সং)।

পাঠান অধিকারই কোন-না-কোন রূপে প্রচলিত ছিল। সন্দেহ নেই, বিরোধ, বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্যের ফলে বাংলাদেশ ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা তখন প্রায় দুর্ভর হয়েছিল। তা হলেও, বাঙালির সাংস্কৃতিক, এমন কি অর্থনৈতিক জীবনেও তা সর্বব্যাপক হতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের জীবন-বৃত্তান্তের উল্লেখ করতে পারি। বঙ্গীয় জনপদের এক অংশের বিধ্বংসী বিপর্যয় থেকে পলায়ন করে সন্নিহিত অপর অঞ্চলে গিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা ও কাব্যচর্চা নির্বাহ করতে পেরেছিলেন। মোগল অধিকার তখন বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তখনো রাজশাসনের সেই নাগ-পাশ জাতির জীবনকে সম্পূর্ণ বেঁধে ফেলে নি। মুকুন্দরামের যুগেও পাঠান যুগের ঐতিহ্যই অল্পাধিক প্রচলিত ছিল বলে মনে করি। পাঠান অধিকারের সময়ে বৃহত্তর বাঙালি জীবন রাষ্ট্রনীতি-নির্ভর অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের আপেক্ষিকতা বর্জিত ছিল। মোগল আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থা একদিকে যেমন ক্রমেই কেন্দ্রাভিমুখী হয়েছে, অন্য দিকে তেম্‌নি বাঙালির সমাজ-জীবন হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত।

মোগল শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৃহত্তর বাঙালি জীবনের পক্ষে তার বিজাতীয়তা। তুর্কী আক্রমণের বিপর্যয় যুগের শেষে পাঠান শাসকেরা যে ক্রমশঃ মনে-প্রাণে বাঙালি হয়ে উঠেছিলেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।[২] কিন্তু বাংলার মোগল শাসকদের সম্বন্ধে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত :—"...Mughal rule in Bengal preserved its character of a foreign conquest. The Viceroys and officers came and went without taking any real interest in the life of the Province[৩]". মোগল শাসকদের এই বিজাতীয়তার প্রধান কারণ, এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সকলেই ছিলেন দিল্লীবাসী। দিল্লীর বাদ্‌শাহীর সংগে রক্ত-সম্বন্ধ

এবং মোগল রাষ্ট্রাধিকারের বৈশিষ্ট্য

বা অন্যান্য কর্মসূত্রে এঁদের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বলা-বাহুল্য, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবার ও সমাজ-বিন্যাস, এমন কি, নৈতিক রুচি-বুদ্ধির দিক্ থেকেও দিল্লীর পরিবেশ ছিল বাংলাদেশের তুলনায় আমূল বিভিন্ন। মোগল ভারতের আর্থিক সম্পদ্ সম্বন্ধে ইতিহাসের

২। দ্রষ্টব্য—'বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ'
৩। Bengal under Akbar and Jahangir—তপনকুমার রায়চৌধুরী।

কোন সংশয় নেই। তেম্‌নি, কাঞ্চন-কৌলীন্য-দীপ্ত বাদ্‌শাহীর বিলাস-ব্যসন-প্রিয়তাও সুখ্যাত; সেই সংগে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অভাব-জনিত অখ্যাতিও কম ছিল না। যে মোগল শাসকেরা বাদ্‌শাহের প্রতিনিধি হয়ে বাংলা দেশে এসেছিলেন, বাদ্‌শাহীর রুচি, মেজাজ এবং চরিত্রকেও তাঁরা সংগে এনেছিলেন। ফলে, মোগল অধিকারের প্রারম্ভ থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনাধিকারকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে একাধিক নগর-সহর গড়ে উঠেছে। তাছাড়া, বাদ্‌শাহী শাসনের কল্যাণে বঙ্গভূমি সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফলে, ব্যবসা বাণিজ্যের আদান-প্রদানের সম্ভাবনা হয়েছিল ব্যাপক। সেই সংগে বিদেশী বণিক্‌দের বাণিজ্যের প্রায় অবাধ অধিকার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন স্বয়ং আকবর ও তাঁর পরবর্তীরা। ফলে, বাংলার নানা অঞ্চলে বাণিজ্যিক সহর-বন্দরও গড়ে উঠ্‌ছিল দ্রুতগতিতে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গাধিকার লাভ করে, পর বছরই আকবর পর্তুগীজ বণিক্‌দের হুগ্‌লিতে বাণিজ্যকুঠি গড়ে তোলার ফরমান দিয়েছিলেন। ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী বণিক্‌দের বাণিজ্যনগরী নদী-মাতৃক বাংলার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র মাথা তুলছিল। বাংলাদেশের আর্থিক সমুন্নতি এই সব বাণিজ্যিক আদান-প্রদান থেকে কম হয় নি। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে এক ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিই বাংলাদেশ থেকে তখনকার ১৮½ লক্ষ, তথা এখনকার ৩½ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানি করেছিলেন।[৪]

একদিকে এই সব বাণিজ্য-নগরী, অন্যদিকে মোগল শাসন-কেন্দ্রাশ্রিত নগর-সহরে অর্থের দীপ্তি ও বিলাসের চাকৃচিক্য বাঙালিকে অভিভূত আচ্ছন্ন করেছিল। বাঙালির ঘরে পুকুরভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, গোলাভরা ধানের অভাব মোগল-পূর্ব যুগে ছিল না হয়ত, কিন্তু অত প্রচুর কাঁচা পয়সা এর আগে বাঙালি দেখেনি। আর, সেই পয়সার কল্যাণে উপার্জনের উপায়ও হয়েছিল সেদিন বহুধাব্যাপ্ত। ফলে, অর্থ-বিলাস-ব্যসনের চাকৃচিক্য-মুগ্ধ গ্রামীণ বাঙালি-শ্রেষ্ঠরা সহর-নগরের অভিমুখী হলেন;—বাদ্‌শাহী প্রসাদ অথবা বণিকৃজনের আর্থিক আনুকূল্যের লোভে। মধ্যযুগীয় সমাজ-জীবনের ভিত্তি ছিল যে গ্রামীণ সমাজ, এইরূপে তার বিনষ্টি সূচিত হল।

অর্থ সর্বস্ব বাণিজ্য-নগরীর প্রসার

৪। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য:—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়) ২য় অধ্যায়

মোগল শাসন বাংলার গ্রামীণ সমাজের ভাঙনকেই সূচিত করে নি, গ্রামীণ বাংলার সংস্কৃতি-চেতনার বিনাশ সাধনেও এর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। পূর্বে লক্ষ্য করেছি, পাঠান যুগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার শাসক-প্রজা সকলেই ছিল মনে প্রাণে বাঙালি। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালি জীবন-কথাকে আস্বাদন করে সেকালের পাঠান শাসকেরাও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু, মোগল যুগে রাষ্ট্রের ভাষা হল আরবী-ফারসী। তাই, রাজপ্রসাদ-লোভী বাঙালি-শ্রেষ্ঠরা আর্থিক প্রয়োজনে ও রাজদপ্তরে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় প্রাণপণে আরবী-ফারসী শিখ্‌তে আরম্ভ করেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনে শিক্ষিত বাঙালির এই বৈষয়িক বুদ্ধিজাত রুচি-পরিবর্তনের কৌতুকপ্রদ চিত্র রয়েছে। অল্পবয়সে সংস্কৃত বিদ্যায় শিক্ষিত ও সংস্কৃত পণ্ডিত বংশের কন্যার সংগে বিবাহিত হয়ে বাড়ি ফিরে ভারতচন্দ্র অগ্রজদের হাতে তীব্র ভর্ৎসনাই লাভ করেছিলেন। ফলে, তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়। কিন্তু, আরবী-ফারসী শিখে আবার যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন পরিবারে তাঁর সম্মান আদরের অবধি ছিল না। বলাবাহুল্য, এ-অবস্থায় শিক্ষিত সম্পন্ন জনের মধ্যে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি দিনে দিনেই অনাসক্তি, এমন কি বিরূপতাও বেড়ে উঠ্‌ছিল।

গ্রামীণ সাহিত্য-সংস্কৃতির বিনষ্টি

অন্যদিকে দিল্লীর বাদশাহী ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট মোগল শাসকেরাও আরবী-ফারসী ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য-পিপাসা চরিতার্থ করতেন। আর, বহুলাংশে সে সাহিত্য ছিল ওঁদের রুচি-সমুচিত অশালীন লঘুতার উত্তেজনায় ভরা। ফলে, কি রাজ-সভায়, কি রাজ-পৃষ্ঠপোষিত শ্রীমান্ বাঙালিজনের বৈঠকে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা ও প্রগতির পথ রুদ্ধ হল। কোন কোন ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে রাজ্যশাসকদের বিদেশীয়তার 'পরে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য একান্তভাবে রাজ-পোষকতা-নির্ভর ছিল। আর, এই জন্যই রাজশক্তির সমর্থন হারিয়ে মোগল যুগে বাংলা সাহিত্য অনাথ হয়েছিল। কিন্তু, পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীর জন্য পরাগল ও ছুটিখাঁর সমর্থন স্বীকার করে নিলেও কাশীরাম দাসের রাজ-কৃপালাভের তথ্য সন্ধান করব কোথায়? বিদ্যাপতির পক্ষে কীর্তিসিংহ, শিবসিংহ ইত্যাদি একাধিক রাজা-রাণীর

'যাবনী মিশাল' সংস্কৃতির বৈচিত্র্য

পৃষ্ঠপোষকতা ছিল,—এমন কি হয়ত নসরত্ সাহ-ও ছিলেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের কে ছিলেন; এমন কি, জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের-ও! আসল কথা, গ্রামীণ সমাজ-শ্রেষ্ঠরাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করেছেন:-- আর, সেই সাহিত্যরসকে প্রাণের রসদ যুগিয়েছে বাংলার আদর্শ-সুপরিবদ্ধ গ্রামীণ সমাজ। সেই সমাজ ভেঙেছে, ভেঙেছে সেই সমাজপতিদের আশ্রয়। ফলে, মোগল আমলে মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের প্রাণ-উৎস ক্রমেই শুকিয়ে এসেছে, তার অভিব্যক্তির ভিত্তি হয়েছে ক্রমেই শিথিল-দুর্বল। এখানেই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিপর্যয়ের মূল কেন্দ্র।

তাছাড়া, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস, এঁরা মোগল আমলের সুরুতেই কাব্য রচনা করে গেছেন। এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য রাজবৃত্ত-প্রভাবিত ছিল না।

মোগল শাসনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য-কর্মের

এ-বিষয়ে অধ্যাপক তপনকুমার রায়চৌধুরীর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ:—"Krishnadasa Kaviraja, Kasiram Dasa and Mukundarama, the only outstanding products of the age, are men of the old rather than of the new epoch, judged by the generation they belong to.[৪]" আমাদের বক্তব্য, কেবল বয়সের পর্যায়েই নয়, ভাব-চেতনার ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যানুসারেও এঁরা ছিলেন পূর্ববর্তী চৈতন্য-জীবন-স্বভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক তপনকুমার মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে চৈতন্য-চেতনার সর্বজনীনতাকে স্বীকার করতে পারেন নি। তাই, নিছক্ বয়সের বিচারের 'পরে নির্ভর করেই তাঁকে মুকুন্দরাম-কাশীদাসের অনন্যতুল্যতার ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। কিন্তু, সেই বয়স-বিচারের আওতায় পড়েন না বলে গোবিন্দদাস কবিরাজকে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর নিকৃষ্ট, এমন কি জ্ঞানদাসের চেয়েও নিকৃষ্টতর কবি বলে ঘোষণা করেছেন।[৫] বাংলা সাহিত্যের নিরপেক্ষ সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এই তথ্য যে কদাপি গ্রাহ্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রত্যেকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজ নিজ ধারার মুকুটমণি। আর, তার একমাত্র

৪। Bengal under Akbar & Jahangir. ৫। ঐ।

কারণ, এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মধ্যযুগীয় বাঙালিচেতনার,—তথা চৈতন্য-ঐতিহ্যের সার্থকতম বোদ্ধা-ব্যাখ্যাতা-বাণীকার। বস্তুতঃ, চৈতন্য-ঐতিহ্যের স্বভাব-ধর্মকে যথার্থ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করে না দেখলে, মধ্যযুগের বাঙালি সাহিত্য-সংস্কৃতির সত্য মূল্যায়ন অসম্ভব। আবার, চৈতন্য-প্রতিভার নিরপেক্ষ স্বরূপ অবধারণের জন্য তাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একান্ত কুক্ষিবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে দেখ্‌তে হবে। চৈতন্য-ব্যক্তিত্ব প্রধানতঃ ধর্মাশ্রয়ী হলেও কোনো পর্যায়েই সাম্প্রদায়িক ছিল না। আর, কেবল এই কারণেই মধ্যযুগের প্রত্যেক ধর্ম-পর্যায়ভুক্ত সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে চৈতন্য-চেতনার প্রেমানুরক্তি-মূলক আবেদন ছিল সর্বজনীন।

যাই হোক্‌, মোগল শাসনের প্রবর্তনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই এই চৈতন্য-ঐতিহ্যের বিনষ্টি সম্ভাবিত হতে পারে নি। কারণ, সুস্থিত একটি সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তে, নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ছাপ বৃহত্তর জীবনে প্রবর্তিত হবার আগে কিছুকাল অপরিহার্য ভাবেই অতিবাহিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে মোগল রাষ্ট্রাধিকার সূচিত হয়ে থাকলেও সপ্তদশ শতকের আগে তা সুস্থিত হতে পারে নি। এর মধ্যে আকবরের রাজত্বে মানসিংহের শাসনে একবার, আর জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ইব্রাহিম খাঁর শাসনে আর একবার বাংলাদেশ স্বল্পস্থায়ী শান্তির সম্মুখীন হয়েছিল। তাছাড়া, মোগল বাংলায় অব্যাহত শান্তি দীর্ঘস্থায়ী কখনো না হলেও, শাজাহানের রাজত্বের আগে বাঙালি জীবনের গভীরে মোগল-শাসন-সংস্কারের প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে নি। জাহাঙ্গীরের জীবনাবসান ঘটে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব, সপ্তদশ শতকের প্রথম তিন দশকের পরেই বাংলা দেশে মধ্যযুগীয় জীবনধারার পূর্ব-কথিত বিপর্যয় সূচিত হয়। বাংলা সাহিত্যে মোটামুটি ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই বিপর্যয়-চিহ্ন স্পষ্টব্যক্ত হতে আরম্ভ করেছে।

সবকয়টি মোগল-প্রভাব-বিচ্ছিন্ন

মোগল বাংলায় সমাজ-বিপর্যয়ের প্রথম সূত্রপাত বাঙালি জীবনের বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে। পূর্বকথিত তথ্যাদির অনুসরণেই দেখ্‌ব, সেদিনকার বাঙালি সমাজ সহর ও গ্রামের দুটি মোটা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। শহরে জীবনযাত্রার চারপাশে ঘিরেছিল অর্থোন্মাদনা ও কাঞ্চন-কৌলীন্য। এখানকার আচার-ব্যবহারেও দিনে দিনে দেখা দিচ্ছিল নূতন জৌলুস ও বিলাস-ব্যসনের

চাকচিক্য। অন্যদিকে, দারিদ্র্য-অশিক্ষার অন্ধকার গ্রামে এসে ক্রমেই ভিড় করছিল। কিন্তু, উভয় পর্যায়ের জীবনধারাতেই পুরাণো মূল্যবোধ ও আদর্শ-বুদ্ধি হয়েছিল লুপ্ত। সহরের নূতন নাগরিকেরা নবীন লাভের লোভে পুরাতনকে স্মরণ করবার অবকাশ পান নি; গ্রামীন লোকেরা চর্চা ও চর্যার অভাবে গ্রামীন আদর্শ থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল,—তাদের 'চিত্ত জলাশয়ের জল' আসছিল শুকিয়ে। তাছাড়া, আরো একটি বিষয়ে নাগরিক ও গ্রামীন বাঙালির মধ্যে সেদিন সমতা দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছিল। সে তাদের লজ্জাকর নৈতিক দীনতায়। সেদিনকার তথ্যাভিজ্ঞ বিদেশি বিশেষজ্ঞরা এ-বিষয়ে সকলেই একমত; আর এই প্রসঙ্গে তাঁদের মন্তব্য বাঙালির লজ্জাকে ঐতিহাসিক স্থায়িত্ব দিয়েছে।[৬]

মোগল রাজত্বে সমাজ-ভেদ

এ-অবস্থায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য-কৃতি প্রত্যাশা করাও অন্যায়। বারে বারে বলেছি, সাহিত্যের ভিত্তি জীবনের মূলে। জীবনের বনিয়াদ যখন ভেঙেছে, সমাজ-সংস্থান হয়েছে বিস্রস্ত; জাতির জীবনের পক্ষে সে এক অবক্ষয়ের যুগ। এ-যুগে নবীন সৃষ্টি অসম্ভব। তাই, নাগরিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরাতনের পুনরাবৃত্তিই চলেছে সাহিত্য-জগতে। সেই গতানুগতিকতার মধ্যে ভাবের দীনতা পূরণ করার প্রয়াস চলেছে জ্ঞানের সমৃদ্ধি দিয়ে।

মধ্যযুগের জীবন-চেতনা ছিল ভাব-নিষ্ঠা প্রধান;—ভক্তিযোগ। জ্ঞান-কর্মের চর্যা সে যুগে হয় নি, এমন কথা বলা চলে না। জ্ঞান-হীন নিষ্ঠা অন্ধ; কর্মহীন ভক্তি বন্ধ্যা। চৈতন্য-প্রতিভা জ্ঞান-প্রদীপ্ত ছিল। তাছাড়া. একাধিকবার ভারত পর্যটন ও নানা দেশে ধর্মপ্রচার, সংকীর্তন ইত্যাদির মধ্যে তাঁর কর্মবহুল জীবনের বলিষ্ঠ রূপটিই প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্য-সহচরেরাও জ্ঞান-কর্মের সাধনায় অকুণ্ঠ ছিলেন। কিন্তু, জ্ঞান ও কর্ম দুইই ছিল নিষ্ঠা-বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে, চৈতন্য ঐতিহ্য-প্রভাবিত মধ্যযুগের বাংলা দেশেও জ্ঞান-কর্মের সাধনা হয়েছিল প্রেম-মিলনের আকাঙ্ক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু, ঐ একই সময়ে বিচার-তর্কমূলক স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী চর্যা ও যুক্তি-বিচার-নির্ভর আচার-অনুষ্ঠানের ধারাও সমান্তরাল ভাবে প্রচলিত ছিল।

স্মার্ত অভিজাত সমাজ

৬। দ্রষ্টব্য—Bengal under Akbar & Jahangir.

বাংলা দেশে, একেবারে নবদ্বীপেই নব্যন্যায়ের নূতন বিদ্যাপীঠ সূচিত হয় চৈতন্য-সমকালীন যুগেই। বিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌম (১৪৫০—১৫২০ খ্রীঃ) মিথিলা থেকে ঐ সময়ে গঙ্গেশের তত্ত্ব চিন্তামণি নবদ্বীপে নিয়ে আসেন। তারপরে, নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ শিরোমনির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার-আলোচনাকে আশ্রয় করে সেই নৈয়ায়িক ঐতিহ্যের সূত্র দিনে দিনে দৃঢ় বলিষ্ঠ হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষে গদাধর ভট্টাচার্যের কাল পর্যন্ত। আবার ষোড়শ শতকেই স্মার্ত-পৌরাণিক বিদ্যাকেন্দ্রও নবদ্বীপেই গড়ে উঠেছিল। নব্যস্মৃতির আচার্য রঘুনন্দন এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। শতাব্দীর ত্রিপাদব্যাপী চলেছে এই বিচার আলোচনার ধারা। সন্দেহ নেই, বৃহত্তর বাংলার প্রাণচেতনা প্রেমমিলনমূলক জীবন-বাসনার দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছিল, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে। কিন্তু, সেই সংগে সমাজের বিশেষ এক অভিজাত রক্ষণশীল অংশে ন্যায়-স্মৃতির চর্চা, তন্ত্রাদি আনুষ্ঠানিক ধর্ম চলেছিল সমভাবে। এই রক্ষণশীল আভিজাত্যের প্রভাব-প্রাচুর্যও মহাপ্রভুর নবদ্বীপত্যাগ ও নীলাচলবাসকে কতদূর অপরিহার্য করেছিল, সে কথা নিশ্চিত করে জানা আজ সম্ভব নয়। যাই হোক্, চৈতন্য-প্রভাব সমাজের 'পরে যতই লুপ্ত হয়েছে, অন্যদিক থেকে আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক-পৌরাণিক চেতনার প্রয়োগ ততই হয়েছে প্রত্যক্ষ। ফলে, প্রাচীন মঙ্গল-বৈষ্ণব-অনুবাদ কাব্যে পৌরাণিক জ্ঞান-বিমণ্ডনের প্রয়াস দিনে দিনে প্রবল হয়েছে; জীবন-দীপ্ত কাব্যসৃষ্টির পরিবর্তে একালের কবিরা পৌরাণিক জ্ঞান-প্রাচুর্যের সাহায্যে রচনা করেছেন বৈচিত্র্য, অভিনবতা ও বৈদগ্ধ্য। এই ঐতিহ্যের স্বরূপ পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রত্যেক পর্যায়ের সৃজন-প্রবাহেই লক্ষ্য করেছি। আলোচ্য কাল-সীমায় ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে এই জ্ঞানমার্গী স্মার্ত-পৌরাণিক কাব্য সাধনার চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। অবশ্য, অপরিহার্য রুচিবিকারও সেই সৃষ্টির একান্ত সংগী হয়েছিল।

এটুকু যুগান্তর-পথের অভিজাত নাগরিক জীবন-কথা। কিন্তু, বৃহত্তর বাংলার গ্রামীণ বিনষ্টির অন্ধকারে সেদিন সুবৃহৎ জনজীবন আরো বিপর্যস্ত হচ্ছিল। অভিজাত সমাজের পাশে আবার দেখা দিল লোক-সমাজ। আগেই বলেছি, এই সমাজে শিক্ষা ও সম্পদের অভাব তীব্র হয়েছিল। এমন অবস্থায় অশিক্ষিত দুর্বলজনের

অনভিজাত লোক-সমাজ

চিত্তের আশ্রয়রূপে গড়ে উঠ্‌ল নূতন লোকসাহিত্য। চৈতন্য-চেতনা সমৃদ্ধ মধ্যযুগের বাংলাদেশে লোকসাহিত্যের চিহ্ন লুপ্ত হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র বলেছেন:—"মহাপ্রভু ভগবদ্‌ভক্তিতে দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। পার্থিব সুখদুঃখ ও প্রেম-সম্বলিত সাহিত্যের মূল্য তিনি কমাইয়া দিলেন; তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান দিনরাত্র করিতেন,—তাঁহারাই এদেশের লোকের প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইলেন। হিমালয় যেমন সুবিশাল চীন মহাচীনকে আমাদের চোখের আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে, মহাপ্রভুর কীর্তন-মহিমা-ঘোষী খোলের বাদ্যে আমরা সেইরূপ দৃষ্টিহারা হইয়া পূর্ববর্তী বিরাট পল্লীসাহিত্য ভুলিয়া গেলাম। এইভাবে এক বিশাল সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইল।"[৭]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকেই বাঙালি জীবনে চৈতন্য-মহিমার প্রভাব-পরিমাণ অনুভব করতে পারি। কিন্তু, এই উপলক্ষ্যে স্মরণ রাখ্‌ব, লোকসাহিত্যের বিলোপ চৈতন্যযুগে ঘটেছিল কীর্তন-গানের শ্রেষ্ঠতার জন্যই নয়। উৎকৃষ্টতর বৈষ্ণব-সংস্কৃতির প্রভাবে আমরা লোকসংস্কৃতি বিস্মৃত হয়েছিলাম, এ-অনুমান যথার্থ নয়। উনিশ শতকের বাঙালিই বরং প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। আগেই বলেছি, বৈষ্ণব-সংস্কৃতি ও চৈতন্য-সংস্কৃতিকে আমরা সমার্থবাচক মনে করি না। চৈতন্য ব্যক্তিত্বের ভাব-প্রভাব ছিল সর্বজনীন। আর, তার প্রধান কারণ ছিল, চৈতন্যদেব বাংলার লোক-মানস ও অভিজাত-মানসের রাসায়নিক সম্মিলনে এক অখণ্ড বাঙালি সমাজ-মানস গড়ে তুল্‌তে পেরেছিলেন। এমন কি, বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের বিদগ্ধ রচনাতেও রাধাবাদের লৌকিক চেতনা দুর্লক্ষ্য নয়। আর পরকীয়াদি রসতত্ত্বের লোকায়ত উৎস সম্বন্ধেও সংশয় থাক্‌বার কারণ নেই। চৈতন্য-প্রভাবে লোক-জীবন-সম্ভবা রাধা পৌরাণিক কৃষ্ণ-প্রিয়া বিশেষ গোপীর সংগে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য; বৃহত্তর বাঙালি জীবনেও তেম্‌নি লোকচেতনা ও পৌরাণিক-দার্শনিক-চেতনার সমন্বয় সম্মিলন হয়েছিল সম্পূর্ণ। মঙ্গল ও অনুবাদ সাহিত্যাদিতেও, তাই, এই উভয় চেতনার সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করে থাকি।

চৈতন্যযুগের মিলনাত্মক-সাহিত্য

৭। পূর্ববঙ্গগীতিকা—৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যা:—ভূমিকা।

অতএব, চৈতন্যযুগে লোক-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়েছিল, লোক-সমাজেরই বিলুপ্তির ফলে। এতে দুঃখিত হবার কারণ নেই, যে কোন লোভেই হোক্, সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে অনগ্রসর করে রাখার মোহ সমর্থনীয় নয়। ইংলণ্ডের জীবনে Langland এর সাহিত্যধারা লুপ্ত হয়েছে বলে ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই। বাংলাদেশে মধ্যযুগ-বিনষ্টির আলোচ্যযুগে অভিজাত সমাজের বিচ্ছিন্নতার ফলে একটি অনগ্রসর লোক-সমাজও পৃথক্ হয়ে পড়েছিল। তাঁদের অমার্জিত মনের অনাবৃত প্রকাশ ঘটেছে সে-কালের লোক-সাহিত্যে। সন্দেহ নেই, এই প্রসঙ্গে বাউল, মুর্শিদী, মারিফতি ইত্যাদি কিছু পরিমাণ উৎকৃষ্ট সংগীত-কাব্য বাংলাসাহিত্যে সঞ্চিত হয়েছিল, যাদের আবেদন মর্মস্পর্শী। কিন্তু, কেবল এই মোহেই আলোচ্য সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে কামনা করা যেতে পারে না। এই বিপর্যয়ের কুফলও অবশ্য স্মরণীয়। বাউল গানের সংগে এই একই লোক-সমাজ-মানস মহাকবি রামপ্রসাদের লেখনীকেও বিদ্যা-সুন্দরের কদর্য কাহিনী রচনায় প্রলুব্ধ করেছিল। ইতিহাস এ-কথা বিস্মৃত হতে পারে না। আনুষঙ্গিক আরো বহু দুর্ঘটনার আলোচনা বর্তমান উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক নয়। কেবল বল্ব, এই সাহিত্য প্রবাহের সাধারণ উপাদান ছিল নর-নারীর দেহ-নির্ভর ধর্মাচরণের লোক-ঐতিহ্য।

বিপর্যয় যুগের-আলোচনা

যাই হোক্, আলোচ্য বিপর্যয়ের মধ্যে একদিকে যেমন অভিজাত নাগরিক সাহিত্য গড়ে উঠ্ছিল, তেম্নি আর একদিকে দেখা দিয়েছিল নব-অভ্যুদিত লোকসাহিত্য। এই দুই ধারার সংগে ছিল শাক্ত সংগীতাবলী। আলোচ্য-যুগের অবক্ষয়ের অদৃশ্য নিম্নভূমিতে জাতীয় মানসের যে বিক্ষোভ দিনে দিনে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, তারই একটি অসংজ্ঞান বেদনার্তিকে প্রকাশ করেছে যেন শাক্তসংগীতের এই অভিনব নূতন ভাব-স্রোত।

বিচ্ছিন্ন-বিচিত্র সাহিত্য

সবশেষে সব কিছুর বাইরে এই যুগে দেখা দিয়েছিল চট্টগ্রাম-রোসাঙের নূতন ইস্লামী সাহিত্য কর্ষণের ধারা। চৈতন্য-যুগ অথবা চৈতন্য-চেতনা-বিলুপ্তি যুগের সংগে এর কোন যোগ ছিল না। মধ্যযুগীয় বাংলার চৈতন্য-ঐতিহ্য প্রভাবসীমার বাইরে রচিত হয়েছিল আলোচ্য সৃজন-কর্মের মহাপীঠ।

কিন্তু, পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে এই ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। এই কারণেই যুগান্তরের পথ-পরিচয় প্রসঙ্গে এই ধারা অবশ্য আলোচ্য।

পূর্বে একাধিকবার বলেছি, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-চেতনার শ্রেষ্ঠ দান দেববাদ-নির্ভর মানবতা-বাদ! আলোচ্য বিনষ্টির যুগে দেব-স্বভাবের মহিমায় নিষ্ঠা বিশ্বাস ক্রমেই কি করে লুপ্ত হয়েছিল, ওপরে তার ইঙ্গিত করতে চেয়েছি। পরবর্তী যুগে দেখ্‌ব,—নবীন জীবন-চেতনা গড়ে উঠেছে দেববাদ-বিনির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধের প্রভাবে; সাহিত্য-ইতিহাসের আধুনিক পর্যায়ের কথা এ'টি। কিন্তু এই বিশুদ্ধ মানব-ধর্মের স্বভাব বাংলা ভাষায় প্রথম অভিব্যক্ত হয়েছে আরাকানের মুসলমান কবিদের দ্বারা। আরবী-ফারসী ভাষায় রচিত ইস্‌লামিক সাহিত্যে মানব-প্রেমের একটি মর্মস্পর্শী রূপ স্বপ্ন-মদিরতায় ঘন নিবিড় হয়ে আছে। আরাকানের মুসলমান কবিরা সেই সূত্র থেকেই স্পর্শকাতর মানব-প্রেম-গাথার অবতারণা করেছেন বাংলা ভাষায়। আর, এই বিপর্যয় যুগেও চৈতন্যোত্তর বিনষ্টির ছাপ তাতে লাগে নি। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীর চৈতন্য-পূর্ব যুগ থেকেই ব্রহ্মদেশ আরাকান-প্রত্যন্তগত চট্টগ্রামকেও বৃহৎ বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল।

বিপর্যয়-মূলে অনাগতের সংকেত

"A Burmese King of Arakan had wrested the Chatgaon district from the independent Sultan of Bengal in 1459. In Jahangir's reign the Mughals had recovered the country up to the Feni River, which henceforth formed the south-eastern boundary of Bengal; but the tract near the mouths of Ganges and Brahmaputra knew no peace, on account of the Mughal Govt. at sea, the settlement of the Portuguese adventurers in Arakan and their practice in piracy under the shelter of the Arakan ruler.[৮]

পরবর্তীকালে, চট্টগ্রাম-রোসাঙ্‌ আবার যখন বাংলা দেশে ফিরে এসেছে, তখন এই বিশুদ্ধ মানব-প্রেম-গাথা বাঙালি মানসকে আবার উদ্বোধিত করেছে। পূর্ব-বাংলার মানব প্রেম-মূলক লোক গাথায় এই ইস্‌লামী সাহিত্য-চেতনার প্রভাবও ঐতিহাসিকেরা অস্বীকার করতে পারেন না।

৮। History of Bengal—Vol II.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

লোকসাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বভাব

লোকসাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বভাব সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা সংশয় মুক্ত নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে, ইংরেজি 'Folk Lore' কথাটিকে সীমায়িত অর্থে বদ্ধ করে, তারই প্রতিশব্দ রূপে গৃহীত হয়েছে 'লোকসাহিত্য' কথাটি। এই অর্থে 'লোকের' বা 'লোকসমাজের' সাহিত্যকেই লোকসাহিত্য বলা যেতে পারে। 'লোক সমাজ' বা 'Folk' শব্দের একটি অর্থ নির্দেশ করেছেন Shorter Oxford Dictionary—"An aggregation of people in relation to a superior।" ঠিক অনুরূপ অর্থচেতনা সম্বন্ধে অবধানতা নিয়েই 'Folk Lore' কথাটির প্রথম ব্যবহার করা হয় ;—"The word [Folk Lore] was coined by W. J. Thoms in 1846 to denote the traditions, customs and superstitions of the uncultured classes in civilised nations.।[১]

লোকসাহিত্য

লক্ষ্য করা উচিত, Folk lore কথাটির এই মৌল পরিকল্পনাতেও 'Folk'—অর্থাৎ একটি উন্নততর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অনুন্নত জন-সমষ্টির আপেক্ষিক সম্পর্ক-সচেতনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে 'Folk lore' শব্দের অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে ; কিন্তু Folk-এর আপেক্ষিক-অস্তিত্ব (Relative pattern of existence) সম্বন্ধীয় ধারণা কখনো শিথিল হয় নি। এই অর্থব্যাপ্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"......to day the scope of Folk Lore includes......popular arts & crafts in the material, as well as the intellectual culture of the peasantry.......The general usage is towards restricting the province of Folk lore to the culture of the backward elments in civilised societies.।"[২]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, 'Folk lore' অর্থে সর্বাবস্থাতেই 'লোক-সাধারণ' নামক অনুন্নত-জন-গোষ্ঠির জীবন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ও শিল্পগত সর্বাত্মক সমাজ-

১। Encyclopaedia Brittanica Vol 8। ২। ঐ।

রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। আর, লোক-সাহিত্যও সাধারণভাবে সেই সর্বাত্মক সমাজ-স্বভাবের একটি অঙ্গরূপেই বিবেচিত হয়েছে। এদিক্ থেকে লোকসমাজের অন্যান্য উপাদান-লক্ষণের সংগে লোক-সাহিত্য পারস্পরিক সম্পর্কান্বিত (Inter related)। বস্তুতঃ, এই দৃষ্টি কোণ থেকেই লোকসাহিত্যের অনুসন্ধান-গবেষণা প্রথম সুরু হয়েছিল য়ুরোপ-খণ্ডে। লোকসাহিত্য সেখানে সামাজিক নৃতত্ত্বগত (Social Anthropology) অনুসন্ধানের অঙ্গ হিসেবেই বিশেষভাবে সংগৃহীত ও আলোচিত হয়েছে। ঐ সবক্ষেত্রে লোকসাহিত্য প্রধানতঃ লোক-সমাজ-স্বভাব বিচারের প্রামাণ্য নিদর্শন রূপেই গৃহীত। ফলে, লোকসাহিত্যে শিল্পদৃষ্টি এবং সামাজিক নৃতত্ত্বগত উদ্দেশ্যের পারস্পরিক অবলেপের প্রভাবে কিছু কিছু সংশয়েরও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসকে লোক-সাহিত্যের শিল্প-স্বভাব নির্ণয়ে নিঃসংশয়, প্রাঞ্জল হতে হবে। এর জন্য আবেগ-বাহুল্যের সংগে বৈজ্ঞানিক অতিসচেতনতা থেকেও আত্মরক্ষা করা প্রয়োজন।

লোকসাহিত্য ও লোকসমাজ

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে,—লোকসাহিত্য লোক-জীবন-সম্ভব। এদিক থেকে, এই সাহিত্য লোক-জীবন-স্বভাব দ্বারা একান্ত চিহ্নিত। আর আগেই বলেছি, লোক-জীবন অর্থে সভ্য সমাজের সমীপবর্তী অনগ্রসর গোষ্ঠি জীবন (community life)-এর কথাই মনে করা হয়ে থাকে। আবার, সমাজ-জীবন যতই উন্নত হয়, সমাজের অন্তর্বর্তী অঙ্গ হিসেবে ব্যক্তি-স্বভাব ততই হয় স্পষ্ট-দৃষ্ট। এদিক্ থেকে ব্যক্তিত্ব-প্রাধান্য বা ব্যক্তি-মূলকতা প্রাগ্রসর সমাজের একটি স্বভাব-লক্ষণ; অপরপক্ষে ব্যক্তিত্ব-সচেতনাহীন গোষ্ঠি-সংসক্তিই অনগ্রসর লোক-সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই,—অর্থাৎ, অখণ্ড সমাজ-লক্ষণ ব্যক্তিত্ব-প্রাধান্য দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলেই,—সাধারণভাবে লোক-সাহিত্যে একটি সর্বাবয়ব গোষ্ঠি-মানসের পরিচয় প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে। এই সত্যকেই ব্যক্ত করে ভাষান্তরে বলা হয়েছে,—লোকসাহিত্য কোন একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়; একটি গোষ্ঠিবদ্ধ সমগ্র সমাজের সৃষ্টি। এই চিন্তাধারার অনুসরণ করে একদল প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক অতি দূরগামী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মতে লোকসাহিত্য মাত্রই অনেকের সৃষ্টি:—বিভিন্ন ব্যক্তি এক বা

লোকসমাজের স্বভাব, তথা লোকসাহিত্যের লক্ষণ

বিভিন্ন সময়ে মিলিত হয়ে এক একটি লোক-কবিতার বিভিন্ন ছত্র রচনা করেছে। এরূপ অনুমান সিদ্ধ করতে পারলে সামাজিক নৃতত্ত্ব-বিদ্-এর সন্ধানের সুবিধা হয়। অন্ততঃ গোষ্ঠিজীবনের (Community life) অন্তর্বর্তী জনমনস্তত্ত্ব ("psychology of crowds")-কে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ফলে লোকসাহিত্যের শিল্প-বৈশিষ্ট্যকে প্রায় অস্বীকার করা হয়েছে; কারণ সৃষ্টি মাত্রই স্রষ্টার হৃদ্-বৃত্তি-সাপেক্ষ। এদিক থেকে, "How a ballad, or indeed any work of art, could actually be evolved by this committee process was never satisfactorily explained।[৩]"

বাংলা ভাষায় লোকসাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাতেও এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার লক্ষণের 'পরে অবাস্তব পরিমাণ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এমন কি, কোন কাব্যে লেখকের নামোল্লেখ থাকলেই তাকে লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করা হয়। এ বিষয়ে, সাহিত্যের পাঠককে মনে রাখতেই হবে, জীবনের যে-কোন অভিজ্ঞতা-উপাদান শিল্প হয়ে ওঠার জন্য স্রষ্টার মানস-পরিস্রুতির অপেক্ষা রাখে। আর স্রষ্টা মাত্রই ব্যক্তি-মানব। অতএব, ব্যক্তি-চিত্তের মাধ্যমে ভাব-পরিস্রুতি শিল্প কর্মের পক্ষে অপরিহার্য। তবে, লোকসাহিত্যের স্রষ্টার ব্যক্তিমন সচেতন-ব্যক্তিত্ব (Personality) বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (Individuality)-এর উপাদানে উদ্বুদ্ধ হয় না; একান্ত গোষ্ঠিজীবনের ভাব-ভাবনার মধ্যে তদাত্ম হয়ে থাকে। এই অর্থেই লোকসাহিত্য গোষ্ঠি-মানসের প্রতিফলন; স্রষ্টার ব্যক্তিমানস ও অখণ্ড সমাজ-মানস সেখানে অভিন্ন লক্ষণান্বিত। অর্থাৎ, এই প্রসঙ্গে একমাত্র স্মরণীয়,—লোকসাহিত্য মূলতঃ ব্যক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকলেও, লোক-সমাজ-মানসেরই অখণ্ড-একান্ত প্রতিফলন। এই প্রতিফলন যেখানে সহজ-স্বাভাবিক হয়েছে, সেখানে স্রষ্টার নামোল্লেখের প্রসঙ্গ অবান্তর।

লোকসাহিত্যে Community বনাম Personality

এবারে লক্ষ্য করব, লোক-সমাজও আপন স্বভাবে সজীব জীবন-ধারারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব, লোক-জীবন সভ্য সমাজ-জীবনের মতই নিয়ত সচল; কোন পর্যায়েই সে স্থাণু নয়। কেবল, সভ্যসমাজের তুলনায়

৩। Encyclopaedia Brittanica Vol 8।

লোক-জীবনের গতির পরিমাণ ও প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। কিন্তু তা হলেও, যে-কোন সজীব সত্তার মতই লোক-জীবনও পারিপার্শ্বিক বিচিত্র প্রাণ-বস্তুকে অবলম্বন ও আয়ত্ত করে কেবলই পরিবর্ধিত, পরিব্যাপ্ত ও সুপরিণত হয়ে উঠ্‌ছে। সভ্য জীবনের মতই লোক-জীবনেও ক্রম বিবর্তনের ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমপরিমাণেই সত্য। এ দিক থেকে লোক-জীবন-স্বভাব দেশ-কাল-পাত্রের বিভিন্নতা অনুযায়ী পৃথক পরিণতি লাভ করে থাকে। তাই, কোন বিশেষ দেশ-কাল-প্রবর্তিত নিয়ম পদ্ধতিকে লোক-সাহিত্য-লক্ষণের বিচারে একান্তভাবে প্রয়োগ করা ইতিহাস-সম্মত নয়।

লোক সাহিত্যে জীবন-বিবর্তন

এদিক থেকে য়ুরোপীয় লোক-সাহিত্যের সংগে, এমনকি, বৃহত্তর ভারতের নানা উপজাতি-(Tribe)-সম্ভব লোক-সাহিত্যের সংগেও আলোচ্য যুগের বাংলা লোক-সাহিত্যের পার্থক্য মৌলিক। য়ুরোপে সুদীর্ঘ কাল ধরে লোক-গাথা-সাহিত্য-সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হয়.—য়ুরোপে এমন সব বিচ্ছিন্ন ছোট-ছোট কৃষি-নির্ভর দেশ ও জাতির অস্তিত্ব ছিল, যারা কোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই য়ুরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির আলোকদীপ্ত হতে পেরেছে। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির মূল ভূখণ্ড থেকে এই পরিচ্ছিন্নতা দীর্ঘদিন ধরে লোক-সংস্কৃতির সংগঠন-ব্যাপ্তিতে সহায়তা করেছে। ভারতবর্ষেও, এমনকি, রাঢ়-প্রত্যন্তে সাঁওতাল পরগণায় আজও লোক-সাহিত্য-গীতি-নৃত্যাদির প্রচুর উপাদান আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। এখানেও অপেক্ষাকৃত সভ্য ও প্রাগ্রসর সমাজ থেকে লোক-সমাজের অবস্থান, আচার-আচরণ, এমনকি ভাষাগত উল্লেখ্য দূরবর্তিতা এই সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিপোষণে সহায়তা করেছে। কিন্তু, অন্ততঃ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্য বৃহত্তর বাঙালি জীবনেরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র ছিল। বঙ্গ সংস্কৃতির থেকে এই লোক-সংস্কৃতির দূরবর্তিতা অন্ততঃ আমূল ছিল না। পূর্বের আলোচনায় দেখছি, চৈতন্য-প্রভাবিত বাংলার সমাজের সর্বস্তরে অভিজাত অনভিজাত ভাব-সংস্কৃতির একটি সমন্বিত পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। স্বভাবতই সমাজের আক্ষরিক জ্ঞান-(Literacy)-হীন পর্যায়েও এই বলিষ্ঠ সংস্কৃতির নৈতিক আদর্শ সুপরিচিতিলাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে

বাংলার লোক সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

মুকুন্দরামের ফুল্লরার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রূপসীর ছদ্মবেশ ধারিণী চণ্ডীকে সতীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত করতে গিয়ে ফুল্লরা নানা পুরাণ কথার অবতারণা করেছে। ঐ প্রসঙ্গে সে নিজেই জানিয়েছে যে, ঐ সব জীবনাদর্শের তথ্য সে 'শুনেছে পণ্ডিত স্থানে'। অর্থাৎ সমাজের নিরক্ষর পর্যায়েও জ্ঞান-সিদ্ধ পৌরাণিক আদর্শ-বুদ্ধির পরিচয় সেকালে অজ্ঞাত ছিল না। পরবর্তী যুগে আমাদের আলোচ্য কাল-সীমায়, সমাজ-দেহ যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, তখনও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর গ্রামীন লোক-সমাজ পুরাতন পৌরাণিক ঐতিহ্যকেও নিজেদের লোক-চেতনার সংগে একাত্ম করে নিয়েছে। এ বিষয়ে স্মরণ করা উচিত,—"Culture is affected by foreign contacts of all kinds, whether peaceful or warlike, and within a single society, the learning of one generation has a way of becoming the folk lore of another. Much that is handed down eventually by oral tradition, perhaps in a debased and distorted form, has its origin in literature.[৪] ।

সামাজিক-নৃতত্ত্বের অনুসন্ধান গবেষণায় লোকসাহিত্যের এই বিমিশ্রতা অনেক সময় তথ্য নির্ধারণের বাধা স্বরূপ হয়ে থাকে। তাই এই বিমিশ্রতা-মোচন বৈজ্ঞানিক বিচার-সিদ্ধান্তের জন্য হয়ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

লোক সাহিত্য-বিচার বনাম সামাজিক নৃতত্ত্ব

কিন্তু, ইতিহাসের দৃষ্টিতে লোক-জীবনের ক্রমপুষ্টি ও ক্রমানুগত জ্ঞানপরিণতি-(Sophistication)-র সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা চলে না। এই কারণেই, কোন-রচনায় পৌরাণিক-ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখমাত্র লক্ষ্য করেই তার লোক-সাহিত্য-লক্ষণ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠার কারণ নেই। লোক-সাহিত্য, বারে বারে বলেছি, লোক-জীবন-সম্ভব। আর, লোক-জীবন যেখানে স্বীয় ক্রমাগ্রস্থতির পথে প্রাচীনতর অভিজাত-চেতনাকে আয়ত্ত,—সাত্মীভূত করে ফেলেছে, সেখানে তা লোক-সংস্কৃতিরই সম্পদ। অবশ্য, সেই গ্রহণ ও সাত্মীকরণ পদ্ধতিতে লোক-জীবন-স্বভাবিত স্থূলতা (crudity)ও অপরিহার্যভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। এ দিক্ থেকে, আলোচ্য যুগে

৪। Encyclopaedia Brittanica Vol 8।

উদ্ভূত বাউল, মারিফতী, মুর্শিদী ইত্যাদি কাব্যে অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী যুগের অভিজাত-তর ভাবনার স্থূল অবলেপ দুর্লক্ষ্য নয়। চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমানী বাংলা সাহিত্যেও একাধারে হিন্দু-মুসলমানের অভিজাত তত্ত্বচিন্তার স্থূল হলেও, প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। কিন্তু. এই তত্ত্ব-চিন্তা সর্বত্রই লোক-স্বভাবান্বিত হয়ে উঠেছে বলে এই সব রচনাকে সার্থক লোক-সাহিত্য বলে স্বীকার করে নিতে বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের কোন দ্বিধা নেই।

আলোচ্যকালের লোক-সাহিত্য

এই মূল্যমানকে স্বীকার করে আলোচ্য যুগের লোক-সাহিত্যকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করে বিচার করা যেতে পারে:— (১) চাটিগাঁ রোসাঙের মুসলমানী সাহিত্য, (২) পূর্ব-বঙ্গাঞ্চলে প্রাপ্ত গীতিকা (ballad) সাহিত্য, এবং (৩) বাউল, মুর্শিদী-মারিফতী জাতীয় লোক-গীতি সাহিত্য।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমানী সাহিত্য

পূর্বে বলেছি, মধ্যযুগ বিপর্যয়ের সন্ধিলগ্নে স্বতন্ত্রভাবে বিশুদ্ধ মানব-বিষয়ক কাব্যের অবতারণা প্রধানতঃ করেছিলেন চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমান কবিরা। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "রোমান্টিক্ কাহিনী কাব্যে পুরাণো মুসলমান কবিদের বরাবরই একচ্ছত্রতা ছিল। কিন্তু কাব্যের বিষয় সর্বদা ফারসী সাহিত্যের অনুগত ছিল না।"[১] তাহলেও, মানব-মানবীর প্রেম-বিরহ-মিলনের রস-নির্যাসরূপ এই রোমান্টিক চেতনার উৎস তাঁরা আরবী ফারসী ভাষার প্রণয়-কথার মাধ্যমেই আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা ভাষায় এই ঐতিহ্য-সম্পদ্ প্রত্যক্ষভাবে হয়ত সর্বদাই ঐসব বিদেশি ভাষা থেকে আহৃত হয়নি। অন্ততঃ, চট্টগ্রাম রোসাঙের কবিকুল-শিরোমণি দৌলতকাজি এবং আলাওল-এর কাব্য-প্রেরণা সমধর্মী হিন্দী-কাব্য থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল যে, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু, ঐ সকল হিন্দী কাব্য-মূলের কেন্দ্রে আবার ফারসী ভাষা-সাহিত্যের প্রভাব সংশয়াতীত হয়ে আছে।

মুসলমানী কাব্য-ভাবের উৎস

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই প্রথম মুসলমান সংস্পর্শ সাধিত হয়েছিল; আর এর সূচনা ঘটে "অন্ততঃ পক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ দশক থেকে।"[২] বাংলাদেশেও প্রথম মুসলমান সংযোগ তুর্কী আক্রমণের পূর্ব থেকেই প্রারব্ধ হয়েছিল বলে মনে হয়। এমন কি, মোহম্মদ্ বিন্ বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ বিজয়ের সময়েও তাঁর অশ্বারোহিদলকে তুর্কী ঘোড়সওয়ার মনে করেই নির্বাধে পুরী প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। যাইহোক্, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাঠান বিজয়কে উপলক্ষ্য করে বৃহত্তর বঙ্গে মুসলমান সংস্পর্শের সুযোগ ব্যাপ্ততর হয়ে ওঠে। কিন্তু, ঐ সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত কোন মুসলমান কবির কাব্য-কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্বে দেখেছি, বাংলার পাঠান শাসকেরা দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকেই একান্ত নির্ভরে

মুসলমানী সংস্কৃতি ও মুসলমানী বাংলা কাব্য

১। ইসলামি বাংলা সাহিত্য। ২। ঐ।

বরণ করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ভাষা-সাহিত্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে মুসলমান রস-বিদগ্ধ কবির হস্তাবলেপ ঘটেছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীকালে মুসলমান কবি রচিত হিন্দী ছড়া গাথারও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। দিনে দিনে এই রচনা-প্রবাহের প্রসার ও সমুন্নতি অবারিত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই জনপ্রিয় প্রশস্ত কাব্যধারার মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। কোন অবস্থাতেই ভারতবর্ষীয় ভাষার এই মুসলমান কবিরা সাম্প্রদায়িক অথবা সংকীর্ণ সংস্কৃতির উপাসক ছিলেন না; ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় এঁরা স্বভাবত-ই ছিলেন,—"ফারসী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় সাহিত্যের রস সন্ধানী।"[৩] ফারসী সাহিত্যের সৌন্দর্য মাধুর্যের সংগে ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের জীবন-রস-উৎসকেও এঁরা অনুধাবন করে-ছিলেন। ফলে, ফারসী সাহিত্যের মানবিক প্রেমানুরক্তির ধারার সংগে এঁদের রচনায় কালে কালে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্য-জ্ঞানের প্রতীতি;—হিন্দু-মুসলমানের ভাব-চেতনার মধ্যে রচিত হয়েছে নবীন মিলন-সূত্র। বাংলা ভাষায় মুসলমানী কাব্যধারার পথিকৃৎ রোসাঙের কবিকুলও আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই ভাব-চেতনার ঐতিহ্যকেই অনুবর্তন করেছেন।

আগেই বলেছি, বৃহত্তর বাংলার জীবনযাত্রার সংগে চাটিগাঁ রোসাঙের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; এই অঞ্চল তখন আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরাকান পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ব্রহ্মদেশের নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ। আরাকানীরা বর্মী, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের ভাষা-সাহিত্য ও আচারআচরণের মধ্যে বৃহত্তর ব্রহ্মের তুলনায় আজও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে,—বিশেষ করে চট্টগ্রামের সন্নিহিত অঞ্চলে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বঙ্গভূমির অন্তর্গত হলেও, আজও পর্যন্ত তার ভাব-ভাষা-সংস্কৃতিতে আরাকানী প্রভাব রয়েছে অজস্র। অতএব, বলা যেতে পারে, সেদিনকার আরাকানে,—রোসাঙ রাজসভায় বর্মী ও বাঙালি সংস্কৃতির সম্মিলনের এক সহজ পরিবেশ প্রথমাবধি গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে আরাকান অঞ্চলের বৌদ্ধ রাজারা

মুসলমানী বাংলা কাব্য ও চট্টগ্রাম-রোসাঙ

৩। ইসলামি বাংলা সাহিত্য।

যেমন পালি-প্রাকৃত ভাষার সংগে অন্ততঃ ধর্মসূত্রেও জড়িত ছিলেন, তেমনি তাঁদের রাজসভাসদ্ এবং প্রজাপুঞ্জের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এমন কি, দীর্ঘদিন ধরে আরাকানের বৌদ্ধমগ রাজারা সিংহাসনে আরোহণ করে একটি করে মুসলমান নামও গ্রহণ করে থাকতেন বলে জানা যায়।[৪] অতএব, রোসাঙ্ রাজসভাতে একাধারে আর্য ভারতীয় এবং মুসলমানী সংস্কৃতির চর্চা ও চর্যা যে সুপ্রচলিত ছিল, তাতে সংশয় নেই।

তাছাড়া, ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সম্পর্কে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও, ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য এবং ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকেও রোসাঙ্ রাজসভা বঞ্চিত ছিল না। দৌলত কাজীর জীবন-কথা সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। কিন্তু, রোসাঙ্ রাজসভার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল যে ঐ রাজ্যসীমার বাইরে থেকেই রোসাঙে গিয়ে পৌঁচেছিলেন, তাতে প্রায় কোন সংশয় নেই। তাছাড়া, স্বয়ং দৌলতকাজির বর্ণনা থেকেও জানা যায়, রোসাঙ্ রাজসভায় বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল, আর তার প্রেরণা যুগিয়েছিল বৃহৎ বঙ্গ, তথা বৃহত্তর ভারত। আশরফ খানের 'রাজসভা' বর্ণনা করে কবি লিখেছেন :—

রোসাঙ্ ও বৃহত্তরবঙ্গ

"সৈয়দ শেখ আদি মোগল পাঠান।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর॥"

ঐ সভায় বিবিধ ভাষা-সাহিত্য-জ্ঞানেরও ব্যাপক চর্চা হত :—

"আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ॥
গুজ্রাতী গোহারী ঠেট্ ভাষা বহুতর।
সহজে মহন্ত সভা আনন্দ সায়র॥"

অতএব, চট্টগ্রাম-রোসাঙের সপ্তদশ শতকের সাহিত্য সাধনায় বৃহত্তর ভারতের বিচিত্র ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাব যে পড়েছিল, তাতে সংশয়

৪। দ্রষ্টব্য—'সাহিত্য প্রকাশিকা' ১ম খণ্ড (বিশ্বভারতী)—সতী ময়নামতীর ভূমিকা।

নেই। কিন্তু, সেই বৈচিত্র্য-বিভিন্নতার মধ্যেও বাংলাই ছিল রোসাঙের দেশি ভাষা-সাহিত্য। দৌলৎ কাজিকে বাংলা কাব্য রচনার নির্দেশ দিয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক আস্রফ্ শা বলেছিলেন :--

রোসাঙ ও বাংলা ভাষা-সাহিত্য

"ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে॥"

ওপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে, চট্টগ্রাম-রোসাঙের মুসলমানী কবিদের রচনায় বিচিত্র ভাব-ভাষাগত ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটেছিল। বলাবাহুল্য, তার মধ্যে হিন্দু-পৌরাণিক সংস্কৃতির উপাদানও কম ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাংলার সমন্বয়ী চৈতন্য-চেতনার প্রভাব তাতে ছিল না। বরং এই ভাব-সমন্বয়ের ধারা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানী লোক-সাহিত্যের ভেতর থেকে। আগেই বলেছি, দৌলৎ কাজির সতী ময়নামতী ও আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের উৎস-প্রেরণা ছিল হিন্দী ভাষায় রচিত অনুরূপ কাব্য-কথা। তাই, ঐ সকল কাব্যে মুসলমানী ধর্ম-সংস্কৃতির সংগে হিন্দু-পৌরাণিক প্রসঙ্গেরও বহুল অবতারণা রয়েছে। কিন্তু, তাতে দেববাদ-নির্ভর মানব-চেতনার প্রভাব নেই। দৌলৎ বরং উদাত্ত কণ্ঠে মানব-মহিমারই জয়গান করেছেন ;—আর সেই প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন নিরঞ্জন বিস্‌মিল্লার সৃজন-কীর্তিকে :—

মুসলমানী সাহিত্য বনাম চৈতন্য-চেতনা

"নিরঞ্জল-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান॥
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।
নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান॥
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর॥
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল।
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল॥"

এই বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের ঐতিহ্যই মধ্যযুগান্তরের বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রাম-রোসাঙের মুসলমানী কবি-কীর্তির শ্রেষ্ঠ দান। আর, দৌলৎ কাজি এই ভাবধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ।

দৌলৎ কাজি একখানি মাত্র কাব্য রচনা করেছিলেন; সেই কাব্যখানিও সম্পূর্ণ করে যাবার মত আয়ুষ্কাল তিনি পান নি। তা সত্ত্বেও, চট্টগ্রাম-রোসাঙের রাজসভার তিনি অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি। দৌলতের ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত তথ্য জানা যায় না। কাব্য শেষে আত্মপরিচয় দেবার আকাঙ্ক্ষা কবির ছিল কিনা, আজ তা জানবার উপায় নেই। রচনাকাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি খবর অবশ্য কবি দিয়েছেন। রোসাঙ্গরাজ শ্রীসুধর্মার "ধর্মপাত্র" ছিলেন "শ্রীযুক্ত আশরফ্ খান।"

রোসাঙের কবিশ্রেষ্ঠ দৌলৎ কাজি

"মহারাজ আয়ুশেষ জানি শুদ্ধমন।
তান হস্তে রাজনীতি কল্য সমর্পণ॥
মহাদেবী অনেক ভাবিল সুনিশ্চিত।
রাজপুত্র হস্তে অধিক সুপাত্র পণ্ডিত॥
নৃপতিহ পুত্রভাবে হরিষে সাদরে।
মহামাত্য করিলেন আশ্রফ্ খানেরে॥"

এই মহামাত্য আশরফের নির্দেশেই কবি-দৌলৎ তাঁর সতী ময়নামতী রচনায় প্রবৃত্ত হন। জানা গেছে, "শ্রীসুধর্ম তাঁহার ষোল বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে প্রায় বারো বৎসর কাল রাজা থাকিয়াও রাজা হন নাই, অর্থাৎ অনভিষিক্ত নরপতি ছিলেন।"[৫] কারণ, কোন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেছিলেন, সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার একবৎসরের মধ্যে তাঁর দেহান্ত ঘটবে। দ্বাদশ বৎসরের অন্তে শ্রীসুধর্মা নরবলি প্রভৃতি বিভীষণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজপদে অভিষিক্ত হন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, দৌলৎ কাজির উদ্ধৃত বর্ণনাতেও এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, দৌলতের কাব্য রচনা কাল শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালের অনভিষিক্ত সময়ের মধ্যে বলে মনে করা যেতে পারে। এই সময় ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

সতী ময়নামতী কাব্যের রচনাকাল

৫। দ্রষ্টব্য—'সাহিত্য প্রকাশিকা' ১ম খণ্ড (বিশ্বভারতী)—সতী ময়নামতীর ভূমিকা।

দৌলৎ কাজির কাব্য রচনার মূলে কবি সাধন রচিত লৌকিক হিন্দী ("ঠেটা চৌপাই") কাব্যের প্রভাব ছিল। পূর্বে উদ্ধৃত আশ্‌রফ্‌ খানের নির্দেশের মধ্যে এ-বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সাধনের কাব্যের নাম "মৈনা সত"। এই কাব্যের একখানি পুথি অধুনা পাওয়া গেছে।[৬] তাতে দৌলৎ কাজির বাংলা রচনার স্থানে স্থানে মূল হিন্দীর হুবহু বঙ্গানুবাদ পর্যন্ত লক্ষিত হয়ে থাকে। এর থেকে দৌলতের রচনার পেছনে সাধনের কাব্য-প্রেরণার ইতিহাস স্পষ্ট ব্যক্ত হয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, দৌলতের কাব্যকে হিন্দী কাব্যের হুবহু অনুকৃতি মনে করলে অন্যায় হবে। বস্তুতঃ, সাধনের কাব্য-কাঠামোকে আশ্রয় করে দৌলৎ কাজির কবিমানস ভাব-কল্পনার সৌন্দর্যলোকে অবাধ সঞ্চরণ করেছে। এমনকি, নিছক বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে "দৌলতে এমন বহু অংশ আছে যাহা সাধনের কাব্যে নাই।"[৭]

দৌলৎ কাজি ও হিন্দী-কবি সাধন

দৌলৎ কাজির 'সতী ময়নামতী' বা লোর চন্দ্রানী' কাব্যের কাহিনী-সংক্ষেপ মোটামুটি নিম্নরূপ :—"নৃপতিনন্দন" "দুর্জয়" লোরক "সর্বকলাযুতা" সতী ময়নামতীকে বিবাহ করেছিল। অপূর্ব-সুন্দরী পতিব্রতা ময়নার সান্নিধ্যে লোরকের দিন আনন্দে কাটে। কিন্তু, হঠাৎ একদিন লোরকের কানন বিহারের ইচ্ছা হল। রাণী ময়না এবং বৃদ্ধ পাত্রদের 'পরে রাজ্যভার সমর্পণ করে সকল "যুবাপাত্র" সংগে নিয়ে রাজা বনে চলে গেলেন। সেখানে এক অকস্মাৎ-আগত যোগীর কাছে গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রানীর অপূর্ব রূপ-সৌন্দর্যময় প্রতিকৃতি দেখে লোর বিমুগ্ধ হন। চন্দ্রানীর বিবাহ হয়েছিল দুর্দণ্ড প্রতাপ বামনের সংগে। বামনের অমিত বীর্য বৃদ্ধ গোহারি-রাজের রাজ্যকে সর্বশঙ্কামুক্ত করেছিল; তাঁর নিশ্চিত রাজ্য-উপভোগ হয়েছিল নির্বাধ। কিন্তু রাজকন্যার যৌবন-উপভোগের পথে বামন ছিল এক দুরপণেয় বাধা :—

কাব্য-কাহিনী

"মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি।
নারী সংগে রতিরসহীন মূঢ়মতি॥"

চন্দ্রানীর রূপে মুগ্ধ এবং তার দুর্ভাগ্য-কথায় প্রলুব্ধ হয়ে লোরক চললেন

৬। দ্রষ্টব্য—'সাহিত্য প্রকাশিকা' ১ম খণ্ড (বিশ্বভারতী)—সতী ময়নামতীর ভূমিকা পরিশিষ্ট (খ)। ৭। ঐ।

গোহারি দেশে। সেখানে চন্দ্রানীর সংগে প্রথম দর্শনেই উভয় উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অবশেষে দুঃসাহসী প্রচেষ্টায় লোরক গভীর রাত্রিতে অন্তঃপুরে চন্দ্রানীর সংগে মিলিত হলেন। কিন্তু তাঁদের গোপন মিলন-সুখ দীর্ঘস্থায়ি হল না। মৃগয়া থেকে বামনের প্রত্যাবর্তন সংবাদ জেনে লোর-চন্দ্রানী সকলের অজ্ঞাতে পলায়ন করলেন। গভীর বনে বামন তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। উভয়পক্ষের প্রাণপণ সংগ্রামের পর লোরকের হাতে বামনের জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু গভীর বনে চন্দ্রানী তখন সর্পাহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। চন্দ্রানীর শোকে লোর যখন বিহ্বল, তখনই এক ঋষি এসে তার পুনর্জীবন দান করেন। তখন গোহারি রাজার দূত এসে স-চন্দ্রানী লোরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। ক্রমে লোর-চন্দ্রানী গোহারি রাজ্যের রাজা-রাণীরূপে সুখে দিনাতিপাত করতে থাকেন।

দৌলৎ কাজীর রচনাংশ

এদিকে ময়নামতী-সতীর দুঃখ-বিরহের অবধি নেই। হরগৌরী, দেব-ধর্ম পূজা করে সে স্বামিবর মাগে, স্বামীর অভাবে দুর্ভাবনার তার অন্ত নেই; সেই সংগে বিরহ-জনিত আর্তিও বেড়ে ওঠে দিনে দিনে। মালিনীকে ডেকে সে বলে :—

"মালিনি কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর॥"

রতনা মালিনী কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতিনী। "নরেন্দ্র নৃপতি সুত" "ছাতন কুমার"-এর কাছে সে প্রসাদ গ্রহণ করেছে সতী ময়নামতীকে ছাতনের কাম-সংগিনী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আষাঢ় মাসের ঘন বর্ষা থেকে গ্রীষ্মতপ্ত 'জ্যৈষ্ঠমাস-পরবেশ" ঘটে একের পর এক। প্রকৃতিতে যৌবন-জীবন-তরঙ্গের ছটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রতি মাসে নিত্য-নবরূপে; যৌবনে যোগিনী সতী ময়নার চিত্তে বিরহ-বেদনা হয় প্রতপ্ত। আর সেই চরম মুহূর্তে মালিনী চোখের 'পরে তুলে ধরে ছাতন-মিলন প্রস্তাবের লালসাতুর সম্ভাবনা। প্রতিপদে ময়নামতী প্রদীপ্ত সতীত্বের শক্তি বলে সেই কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে দ্বাদশ মাসান্তে মালিনীর অসদুদ্দেশ্যের কথা অনুভব করে রূঢ় আঘাতে ময়না তাকে বিদায় করেন, চরম শাস্তি দিয়ে। কিন্তু ময়নামতী-মালিনী সংবাদে 'বারমাস্যা' টুকুও কবি দৌলৎ শেষ করে যেতে পারেন নি। জ্যৈষ্ঠ মাস বর্ণনার সুরুতেই তাঁর লেখনী হঠাৎ স্তব্ধ হয়েছে।

বহুবর্ষ পরে রোসাঙ রাজ-সভার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল এই অসম্পূর্ণ কাব্য-কথা সমাপ্ত করেন। সেই অংশে প্রথমে রয়েছে ময়না কর্তৃক মালিনীর শাস্তিবিধানের কাহিনী। তারপরে বিরহার্তা ময়না সখী সংগে পরামর্শ করে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লোরকের কাছে প্রেরণ করেন। গোহারি দেশে গিয়ে সে বিমলা নাম্নী সারি'র কৌশল-বাচনের মধ্য দিয়ে রাজা লোরকে ময়নার বিরহার্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সতী ময়নার স্মৃতি মনে করে লোর ক্রমে অধীর হয়ে পড়েন। এদিকে লোর-চন্দ্রানীর এরই মধ্যে একটি ছেলে হয়েছিল। তারই 'পরে গোহারি রাজ্যের ভার দিয়ে লোরক চন্দ্রানীকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে এলেন। দুই রাণীকে নিয়ে লোরের জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বৃদ্ধ বয়সে রাজার মৃত্যু ঘটলে তাঁর দুই নারীই অনুমৃতা হন।

আলাওলের রচনাংশ

দৌলৎ কাজির রচনাংশের তুলনায় আলাওলের কবি-ধর্ম,—অন্তত: সতী ময়নামতী কাব্যে—অনেক নিষ্প্রভ। আলাওলের সকল রচনারই শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর ব্যাপক পাণ্ডিত্য। দৌলৎ কাজিও অ-পণ্ডিত ছিলেন না। মুসলমান ধর্মে তাঁর জ্ঞান ও নিষ্ঠা অটুট ছিল; সূফী সাধন-পদ্ধতিতেও অনুরক্তি ছিল সুগভীর। তা' সত্ত্বেও তাঁর রচনাংশে হিন্দু বেদ-পুরাণ সম্বন্ধীয় ঐতিহ্যের সহজ জ্ঞানও অনায়াস-ব্যক্ত হয়েছে। আর, জয়দেব, বিদ্যাপতি, এমন কি, কালিদাসের কাব্যেও কবির প্রবেশাধিকার ঘটেছিল,—এমন অনুমানের পোষকতাও তাঁর রচনায় দুর্লভ্য নয়।[৮] কিন্তু, সকল ক্ষেত্রেই দৌলৎ কাজির পাণ্ডিত্যকে অতিক্রম করেছে তাঁর গভীর নিষ্ঠানুরক্তি পূর্ণ উপলব্ধি। এই উপলব্ধির সহজ প্রকাশ তাঁর রচনাকে করেছে সরল, প্রাঞ্জল এবং সরস-ও। দৌলৎ কাজির রচনার এই স্বতো-বিকশিত সারল্য ও অনায়াস-সরসতা তাঁর কাব্যকে লোকজীবনের সার্থক রোমান্টিক প্রণয়গাথার শিল্পমূল্য দান করেছে। লক্ষ্য করা উচিত, কাব্য-কাহিনীর মধ্যে লোকজীবন-সম্ভব অসামাজিক প্রণয়-সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সমর্থ হয় নি। 'লোর-চন্দ্রানী'র যৌথ প্রণয় মাধুর্যের চেয়েও সতী ময়নামতী একা উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত হয়েছেন দৌলতের কাব্যে। দৌলৎ কাজির বিশ্বাসী কবি-কল্পনা রোমান্টিক প্রণয়-সৌন্দর্যকে ত্যাগ-

দৌলৎ-এর কবি-স্বভাব

৮। দ্রষ্টব্য—'সাহিত্য প্রকাশিকা' ১ম খণ্ড (বিশ্বভারতী) সতীময়নামতীর ভূমিকা।

তিতিক্ষাপূর্ণ বেদনার রঙে অনুরঞ্জিত করেছে; যৌবন-প্রেম সাধনার মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই সব-কিছুর পেছনে ছিল দৌলতের প্রেম-সাধক কবি-মানস। আগে একাধিক বার বলেছি, দৌলৎ নিজে নিষ্ঠাবান্ স্থফি-সাধক ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক আসরফ্ খান-ও ছিলেন,—"হানাফী মোঝাব ধরে চিশ তি খান্দান।" 'বিসমিল্লার' বন্দনা এবং 'মহম্মদের সিফত্' প্রসঙ্গে ইস্লামি ধর্মাদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধানুরক্তি প্রকাশ করেছেন কবি। আর এই ভাবাদর্শের সারসংকলন প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

কবি-ধর্ম ও স্থফি-ধর্মের সমন্বয়

"সরিয়ত নাও কর ইমান প্রদীপ ধর
রসুল সহায়ে হইমু পার॥"

আবার:—"আল্লার হুজুরে হায় যুয়ায়ে দর্শন পায়
প্রেম ভাবে সর্বাঙ্গে নয়ান॥"

এই প্রেম এবং সত্য (ইমান্)-ই মুসলমান,—স্থফী মুসলমানের শ্রেষ্ঠ সাধ্য। দৌলৎ কাজি ময়নার প্রেমানুরক্তির মধ্যেও ভক্তিনত চিত্তে সেই সত্যের স্বরূপকেই প্রত্যক্ষ করেছেন;—কবি-দৃষ্টিতে ময়নার 'সতীত্ব' সেই 'সত্যের'ই অভিনবতম রূপপ্রকাশ:—

"ভারত পুরাণে সত্য, সত্য সে বাখানে।
চন্দন তিলক সত্য উগে সর্বস্থানে॥
প্রাণান্ত করিয়া সত্য পালে মহাজন।
রাজ্য-পাল ত্যজি করে সত্যের পালন॥
সত্য বলে রাজা হৈল পাণ্ডব নন্দন।
সত্য সে পরম সিদ্ধি বিজয় কারণ॥
যত জাতি শাস্ত্ররীতি বৈসয় সংসারে।
আগ্নে সত্য ধরি পাছে বড়াই বিচারে॥
ইস্থপ সিদ্দিক শাহা রসুল আল্লার।
সত্য বলে মিসিরের হৈল অধিকার॥
সত্য বলে মহাপাত্র বাড়িল উন্নতি।
কোন্ মতে হৈলা ময়না পতিব্রতা সতী॥"

এ-জিজ্ঞাসার উত্তর অনুক্ত থাকলেও স্বতঃপ্রকাশ। কিন্তু কাব্যাংশে কবি তার নিঃসংশয় উত্তরও দিয়েছেন :—

"দরিদ্র দুঃখিত জন, ধন দিয়া তোষে মন,
তৎপরে পূজে অভ্যাগত।
ভাগ্যবতী ময়নারাণী, সত্যের প্রতিষ্ঠা শুনি
প্রশংসন্তে সকল জগত॥"

অন্যত্র ময়না প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :—

"বিপরীত বায়ু বলে সত্য ঘট নাহি টলে
সতীত্বকে টলাইতে নারে॥"

লোক-জীবনে নারীর প্রেম-সতীত্বের সাধনা কবির অনুরক্তির মধ্যে যেখানে শাশ্বত সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই বাংলা মুসলমানী সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও ঘটেছে দৌলৎ-কবি-প্রতিভার অতুল্য সত্য-প্রতিষ্ঠা।

দৌলৎ কাজির পরেই, আগেই বলেছি, রোসাঙ্ রাজ-সভার দ্বিতীয় কবি-শ্রেষ্ঠ আলাওল। আলাওল-প্রতিভা বিচিত্র কাব্য-রচনায় সদা-ব্যাপৃত হয়েছিল। কিন্তু, এইসব বিচিত্র কাব্য-গাথার তুলনায় স্বয়ং কবির জীবন-কথাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। "মুল্লুক ফতেহাবাদ"এর জামালপুর গ্রামে কবির আদিনিবাস ছিল। কিন্তু, ফতেহাবাদ মুল্লুকের নির্ণয় প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহলে মত-পার্থক্যের অবধি নেই। কেউ কেউ মনে করেছেন, ফতেহাবাদ চট্টগ্রামের অন্তর্গত ছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্রের মতে ফতেহাবাদ অর্থে প্রাচীন ফরিদপুরকেই বোঝায়; ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন, স্থানটি "পশ্চিম বা মধ্যবঙ্গে হওয়াই সম্ভব।" যাই হোক্, ফতেহাবাদ চট্টগ্রামের অন্তর্গত ছিল না, এ-কথা অন্ততঃ মনে করা যেতে পারে।

আলাওল

আলাওলের পিতা নবাব কুতুবের সভাসদ্ ছিলেন। একবার জলযাত্রার সময়ে আলাওল ও তাঁর পিতার নৌকা পর্তুগীজ জলদস্যুদের কবলগত হয়। কবি-পিতা প্রবল যুদ্ধ করে 'সহিদ্' হন; আলাওল বহু দুঃখ ভোগ করে রোসাঙে এসে হন উপনীত। এখানে তিনি প্রথমে অশ্বারোহী রাজসৈনিকের কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু

জীবন-কথা

আলাওলের বিদ্যোৎসাহিতা গোপন থাকল না, তাঁর কবিখ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে রোসাঙের "মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন" মাগনঠাকুর কবির প্রতি অনুরক্ত হন। মাগনের পৃষ্ঠপোষকতাতেই কবির বিখ্যাত কাব্য পদ্মাবতী রচিত হয়।

আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুল্‌মুলুক্ বদিউজ্জমাল'-এর রচনাও মাগনের আশ্রয়েই সূচিত হয়। কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্তির আগেই মাগন লোকান্তরিত হন। কবি তখন রাজা শ্রীচন্দ্রসুধর্মার অমাত্য-শ্রেষ্ঠ সোলেমানের আশ্রয় লাভ করেন। এঁরই নির্দেশে আলাওল দৌলৎ কাজির অপূর্ণ-কাব্য সতী ময়না-মতীর পূর্ণতা বিধান করেন। তারপর, প্রধান রাজ-সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ-এর অনুরোধে রচিত হয় হপ্তপয়কর কাব্য।

এই সময়ে আলাওলের জীবনে নূতন দুর্যোগ দেখা দেয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আকাশ তখন শাজাহানের পুত্রদের মস্‌নদ্-লোলুপতার সংগ্রামে ঘনঘটাচ্ছন্ন। শাহ্-সুজা এই সময়ে ঔরংজীব-এর ভয়ে রোসাঙ্ রাজ-সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময় কবির সংগেও সুজার হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু, কিছুদিন পরে রোসাঙ্ রাজের বিরাগভাজন হয়ে শাহ্-সুজা সপরিবারে বিড়ম্বিত হন। ঐ সময়ে 'মৃজা' নামে কোন দুর্বুদ্ধি লোক শাহ-সুজার সংগে যুক্ত করে আলাওলের নামে রাজদরবারে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করে। বিনাপরাধে আলাওল কারারুদ্ধ হন। "পঞ্চাশ দিবস" ধরে "গর্ভবাস"-যন্ত্রণা ভোগ করার পর 'মৃজার' দুরভিসন্ধি ধরা পড়ে। কবি তখন মুক্তিলাভ করেন এবং মৃজা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তারপরেও দুর্ভাগ্য কিছুকাল কবি আলাওলের পেছনে ধাওয়া করে ফেরে। অবশেষে রোসাঙের কাজি সৈয়দ মামুদ শাহার কৃপালাভ করে আবার কবির ভাগ্যোদয় ঘটে। মামুদ্ শাহার আশ্রয়ে আলাওল তাঁর অপূর্ণ পুরাতন কাব্য সয়ফুলমুলুক্ বদিউজ্জমাল্-এর পূর্ণতা বিধান করেন। নিজামীর 'দারা সেকেন্দর নামা' অবলম্বনে নূতন কাব্য রচিত হয় স্বয়ং রাজা চন্দ্রসুধর্মার আদেশে।

আগেই বলেছি, পদ্মাবতী আলাওলের শ্রেষ্ঠকাব্য ; রোসাঙ্ রাজ-সভায় রচিত তাঁর প্রথম কাব্য-ও এটি। কিন্তু এই রচনার মৌলিকতা কবি নিজেও দাবি করেন নি। সূফী সাধক ও বিখ্যাত হিন্দী কবি মহম্মদ্ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যকে

'পদ্মাবতী' বনাম 'পদুমাবৎ'

আদর্শ করেই আলাওল তাঁর বাংলা কাব্য রচনা করেছিলেন ;—কাব্য মধ্যে এ-কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। জায়সী অযোধ্যার জায়েস্ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন ; তাঁর পদুমাবৎ রচনার কাল ষোড়শ-শতকের প্রথমার্ধে।

পদ্মাবতী কাহিনীর মূল কাঠামো আলাউদ্দিন-পদ্মিনীর ইতিহাস-সূত্র থেকে নেওয়া। কিন্তু তাতে কল্পনার রং ফলানো হয়েছে ব্যাপক পরিমাণে।

'পদ্মাবতীর' কাব্য-কাহিনী

চিতোরের রাজা ছিলেন রত্নসেন ; তাঁর পত্নীর নাম নাগমতী। সিংহল রাজ-দুহিতা পদ্মাবতীর রূপগুণের খ্যাতি শুনে রত্নসেন মুগ্ধ হন এবং সুশিক্ষিত শুকপাখি নিয়ে যোগির বেশে সিংহল যাত্রা করেন। শুকের সাহায্যে সিংহলে রত্নসেনের পদ্মিনীলাভ ঘটে। দেশে ফিরে দুই স্ত্রী নিয়ে রত্নসেনের সুখে দিন কাট্‌তে থাকে। এরই মধ্যে উপদ্রবের সৃষ্টি করেন দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দিন। পদ্মিনীর রূপমুগ্ধ হয়ে তিনি চিতোর আক্রমণ করেন এবং পরাজিত রাজাকে বন্দী করে দিল্লী ফিরে যান। কিন্তু রাজার প্রাণতুল্য সুহৃদ্ গৌরী ও বাদিনা দুই ভাই কৌশলে রত্নসেনকে উদ্ধার করে আনেন। অন্যদিকে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে রাজা দেওপাল পদ্মাবতীকে বিপথগামিনী করার চেষ্টা করেন। ফিরে এসে রত্নসেন দেওপালকে যুদ্ধে নিহত করেন। কিন্তু নিজেও আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করেন। পদ্মাবতী ও নাগমতী স্বামীর সংগে অনুমৃতা হন। চিতার আগুন তখনও নিভে নি ; আলাউদ্দিন এসে চিতোরে পুনঃ-প্রবেশ করলেন। কিন্তু সতী পদ্মাবতীর পরিণতি লক্ষ্য করে চিতায় প্রণতি নিবেদন করে নিজ রাজধানীতে ফিরে যান।

জায়সী ইতিহাস-কথাকে আশ্রয় করে জনপ্রিয় লোক-কাব্যই কেবল রচনা করেন নি। আগেই বলেছি. তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ সূফী সাধক।

জায়সী ও আলাওল

তাই সুপরিচিত কাহিনীর অন্তরালে তিনি সূফী সাধনার গুহ্য সংকেত-ধারাকে রূপকাবয়বে আভাসিত করে তুলেছেন। এই রূপক অনুসারে চিতোর অর্থে মানবদেহকে বোঝায় ; রত্নসেন অর্থে জীবাত্মা। আবার পদ্মিনী হচ্ছেন বিবেক ; শুকপাখি ধর্মগুরুর প্রতীক। আলাওল নিজেও সূফী মতের উপাসক ছিলেন। তাই, জায়সীর কাব্য-ভাবনাকে তিনি শুশ্রূষা করেছেন। কিন্তু, তাহলেও আলাওলের কাব্য জায়সীর কাব্যের অনুকরণ-মাত্রই নয়। জায়সীর লোক-জীবনানুভূতি

ছিল ঘন-নিবিষ্ট; তাই তাঁর কাব্যের ধর্মনিরপেক্ষ একটি ব্যাপক লোক-জীবনাবেদন রয়েছে। আর, আলাওলের ছিল, আগেই বলেছি,—দীপ্ত-পাণ্ডিত্য। কেবল আরবী-ফারসী ভাষা-সাহিত্যেই নয়, সংস্কৃত ধর্ম-অলংকার-পুরাণ-শাস্ত্রাদিতেও তাঁর অধিকার ছিল ব্যাপক। এই পাণ্ডিত্যের প্রসারকে আলাওল সচেতনভাবে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বহুল ব্যবহার করেছেন। ফলে, তাঁর কাব্য অনুভূতির চেয়েও বৈদগ্ধ্যে সমুজ্জ্বল। পদ্মাবতী কাব্যের প্রারম্ভিক বন্দনাংশেই আলাওল-প্রতিভার এই পরিচয় সুব্যক্ত:—

"বিসমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম।
আদ্যমূল শির সেই শোভিত উত্তম॥
প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥
করিল পর্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তারপরে প্রকটিল সেই কবিলাস॥[১]
সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি।
নানা রঙ্গ সৃজিলেক করি নানা ভাতি॥
সৃজিল পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার॥
সৃজিলেক সপ্ত মহী সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
চতুর্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড॥
* * * *
আপনি সৃজক সেই না হয় সৃজন।
যেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন॥
* * * *
বিনি জীবে জীয়ে বিনি করে সর্ব কর্ম।
জীবহীন কর্তা সেই কে জানিব মর্ম॥
অঙ্গ হিয়া বিনে প্রভু কর্ণ বিনে সুনে।
হিয়া বিনে ভূত ভবিষ্যৎ সব গুণে॥

১। কৈলাস।

চক্ষু বিনে হেরে পন্থে পাখা বিনে গতি।
কোন রূপ সম নহে অনন্ত মূরতি॥
স্থান বিবর্জিত মাত্র আছে সর্বঠাম।
রূপরেখা বহির্ভূত নিরমল নাম॥"

এই অংশে মুসলমানী সৃষ্টিতত্ত্বের সংগে বৈদিক-পৌরাণিক চেতনা-সমন্বয়ের প্রয়াস সুস্পষ্ট।

কিন্তু এই পাণ্ডিত্য-দীপ্তিই আলাওলের সাহিত্য-কৃতির একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। আদর্শ সূফী ভাবুকের মত তিনিও ছিলেন প্রেম-সত্যের চরম মূল্যে বিশ্বাসী। পদ্মাবতীর কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে তিনি নিজেই বলেছেন:—

আলাওলের কবিধর্ম

"এ বেদ পুরাণ আদি যত মহামন্ত্র।
বচনে সুরস পুনি যত যন্ত্র তন্ত্র॥
বচন অধিক রত্ন যদি সে থাকিত।
স্বর্গ হন্তে বচন ভূমিতে না লামিত॥
তার মধ্যে প্রেম কথা মাধুর্য অপার।
প্রেমভাবে সংসার সৃজন করতার॥
প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ॥
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর।"

* * * *

যার ভাব রস দেশ সূক্ষ্ম মোক্ষ কাম।
প্রেম হন্তে সকল যতেক হৈল নাম॥
প্রেম হন্তে পুত্রদারা প্রেম গৃহবাস।
প্রেমেতে ধৈর্যতারূপ প্রেমেতে উদাস॥
প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেমতুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর।
প্রেম কবি আলাওল প্রভুর ভাবক।
অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রভুর আসোক॥

* * * *

প্রেম পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশায়।
অসাধ্য সাধন মোর গুরু কৃপাময় ॥

প্রেম-পুথি রচনায় প্রেমানুরক্ত সুফী কবি প্রায় অসাধ্য সাধনই করেছেন। বাঙালি জীবন-ধর্মের প্রতি প্রেম ছিল তাঁর সুগভীর। ফলে, জায়সীর রচিত চরিত্রাবলীর মধ্যে বাঙালি জীবন-লক্ষণ অনায়াসে অনুস্যূত হয়েছে সর্বত্র। পাণ্ডিত্যের ফাঁকে ফাঁকে সেই সহজ জীবনরূপ মাঝে মাঝে মর্মস্পর্শী হয়েছে।

পদ্মাবতীর তুলনায় আলাওলের অন্যান্য কাব্য দুর্বলতর। আগেই বলেছি, পদ্মাবতীর পরে মাগন ঠাকুরের নির্দেশেই কবি সৈফুল মুলুক্ বদিউজ্জমাল রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পীরজাদা সৈয়দ্ মুস্তাফার কাছে মূল ফারসী কাহিনী শুনে মাগন কাব্যটি বাংলায় অনূদিত করাতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। কাব্যের দুই তৃতীয়াংশ শেষ হতে-না-হতেই মাগনের দেহান্ত ঘটে। আগেই দেখেছি, দীর্ঘ দিনান্তে সৈয়দ মুসার আশ্রয়ে কাব্যটি সমাপ্ত হতে পেরেছিল। কিন্তু প্রথমাংশের তুলনায় এই অনুবাদ কাব্যের শেষাংশে শিল্পোৎকর্ষ দুর্বলতর; যৌবনের সৌন্দর্যবোধ ও কল্পনা-প্রসার কবির বৃদ্ধ বয়সে হয়ত অনেকটাই শিথিল হয়েছিল।

সৈফুল্ মুলুক্

সতী ময়নামতী কাব্য আলাওলের হাতে সমাপ্ত হয়েছিল ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে—শেখ সুলেমানের পৃষ্ঠপোষকতায়।

সতী ময়নামতীর সমাপ্তি

ফারসী কবি নিজামীর 'হপ্তপয়কর' কাব্যের অনুবাদ হয়ত শেষ হয়েছিল শাহ্ সুজার রোসাঙ্ রাজসভায় আশ্রয় লাভের পর। কাব্যে 'দিল্লীশ্বর বংশের' শরণাগতির উল্লেখ রয়েছে।

হপ্তপয়কর

'দারা সেকেন্দর নামা'-ও নিজামীর ফার্সী কাব্যের ভাবানুবাদ। এই কাব্যে গ্রীক্-সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের বিজয়-কাহিনীর কিছু কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে।

দারা সেকেন্দর নামা

আলাওল রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক কিছু কিছু পদ-কবিতাও লিখেছিলেন। তাঁর আগে দৌলৎ কাজির সতী ময়নামতী-তেও প্রণয় বর্ণনা উপলক্ষ্যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম পদের প্রাসঙ্গিক অবতারণা রয়েছে। কিন্তু, এতাবৎ আলোচনা থেকেই

রাধাকৃষ্ণ পদ ও মুসলমান কবিগোষ্ঠী

বোঝা যাবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনা, তথা বৈষ্ণব পদাবলীর সংগে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ ভাব-সাযুজ্য এ-সব রচনার নেই। সৈয়দ মুর্তাজার রচিত রাধাকৃষ্ণ পদ বৈষ্ণবপদাবলীর অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু, দৌলৎ কাজি, আলাওল অথবা অনুরূপ মুসলমান কবিদের রচিত এই ধরণের কবিতা রাধা-কৃষ্ণ-কথার সর্বজনীন আবেদনেরই ঐতিহাসিক পরিচয় সূচিত করে। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত প্রেম মিলনের আদর্শ মধ্যযুগের নিখিল বাঙালি-চেতনাকে প্রবুদ্ধ করেছিল। আর, মহাপ্রভুর ধর্মাশ্রিত প্রেম-মূল্যবোধ রাধাকৃষ্ণ-কথার ভাব-ব্যাঞ্জনাকেই আশ্রয় করেছিল। তাছাড়া, চৈতন্যপূর্ব কাল থেকেও এই প্রেম-কথার একটি লোক-জীবন-সম্ভব মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রসার ছিল। এই দুয়ের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ধর্ম-নিরপেক্ষ, অথবা সর্বধর্মাশ্রিত প্রেম-মূল্যবোধের প্রতীক মর্যাদা লাভ করেছিল। দৌলৎ-আলাওলের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ-কবিতায় বাঙালি প্রেম-স্বভাবের এই সর্বজনীন স্বরূপটি প্রকট হয়েছে। অন্যান্য বহু কবিও এই সাধারণ ভাব-ধারায় রস-সংযোজন করেছেন। "বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি"-দের আলোচনা প্রসঙ্গে সে-কথা পূর্বেও বলেছি।[১০] এই পদ-গীতি-সমষ্টি প্রকাশভঙ্গি ও ভাব-কল্পনার অমসৃণতায় লোক-সংগীতের স্বভাব-যুক্ত।

সৈয়দ সুলতান

কবি সৈয়দ্ সুলতান-ও এই ধরণের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাত্মক লোক-সংগীতের একজন উল্লেখ্য শিল্পী ছিলেন। চট্টগ্রামের পরাগলপুরে তাঁর বাসভূমি ছিল, কবি ছিলেন সুফি ধর্মাবলম্বী সাধক। সুফি-সাধনার গোপন ইঙ্গিতাবহ রাধাকৃষ্ণ-প্রেম কবিতা ছাড়াও সৈয়দের রচিত দুখানি কাব্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথমটি 'জ্ঞানপ্রকাশ' তান্ত্রিক যোগ-সাধনা বিষয়ক গ্রন্থ। দ্বিতীয়টি নবীবংশ;—নবীদের আবির্ভাব ও জীবন-কথা বর্ণিত হয়েছে এতে। এই গ্রন্থখানির সমাপ্তিকাল,—১৬৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মুক্তালহুসেন

মহম্মদ খানের 'মুক্তাল হুসেন' আরবী কারবালা যুদ্ধ-কথার মোটামুটি কাব্য-অনুবাদ। নবীবংশ-সম্বন্ধীয় আলোচনাও এতে আছে। কাব্যের শেষে কবি নিজেই পিতামাতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুবারিজ খান, পিতামহ ছিলেন জালাল খান,—প্রপিতামহ নসরৎ খান। শাহ্ সুলতান ছিলেন কবির গুরু।

১০। দ্রষ্টব্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ অধ্যায়।

সাবিরিদখানের লেখা একখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য-প্রবাহের আলোচনা উপলক্ষ্যে পরবর্তী এক অধ্যায়ে সাবিরিদ্-এরও পরিচয় উদ্ধার করা যেতে পারবে। বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল স্মরণ করি, বাংলার লোক-সাহিত্যের নব-অভ্যুদয়ের সূত্রকে আশ্রয় করে চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমান কবিরা লোক-জীবন-পর্যায়ে মানব-প্রেমানুভূতির এক নূতন ধারাকে অবারিত করেছিলেন। বাংলার লোক-সাহিত্য সুপ্রাচীন। তাতে মানব-প্রেমকলার অবতারণাও অজ্ঞাত ছিল না। ডঃ দীনেশচন্দ্র এই প্রসংগে "অষ্টম শতাব্দীতে কালিমপুরের অনুশাসনে উৎকীর্ণ লিপি"র প্রমাণ উদ্ধার করেছেন।[১১] তাছাড়া, রূপকথার মানবিক প্রণয়াবেদনের কথাও এই উপলক্ষ্যে আলোচিত হয়েছে। এইসব অনুমান-নির্ভর তথ্যাদির আশ্রয়ে এ-কথা প্রায় নিঃসংশয়ে অনুভব করা চলে যে, বাংলার প্রাচীন লোক-কথাতে আদিম প্রণয়-স্বভাব সু-পরিব্যক্ত-ই হয়েছিল। কিন্তু, সেই মানব-প্রেম-গাথাতে মানব-লক্ষণ কতটুকু প্রকট ছিল, তাতে সংশয় রয়েছে। চৈতন্যদেব এসে বাংলার লোক-জীবনের প্রেমাকৃতি এবং অভিজাত চিন্তা-প্রসূত মহিমাবোধকে একত্র-বদ্ধ করে এক দেববাদ-নির্ভর নব-মানবতা বোধের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চৈতন্য-ঐতিহ্যের বিলুপ্তি হেতু বাংলার লোক-সমাজ আবার বৃহত্তর বাঙালি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সম্ভাব্য শক্তি-দীনতার যুগে রোমান্টিক মানব-স্বভাবকে বাংলার লোক-কাব্যে অনুস্যূত করে মুসলমান কবিরা এক নূতন সজীবতার পথকে অবারিত করেছিলেন। এ-পথে সত্য (ইমান্) এবং প্রেম-এর ফারসী সাহিত্য-প্রভাব ও সূফী-ধর্ম-চেতনা যুগপৎ তাঁদের কবি-মানসকে উদ্বোধিত করেছে। এই সব কাব্যে কেবল লোক-জীবনগত অমসৃণ প্রেম-কথাই নয়, মানব-প্রেমের রোমান্টিক স্বভাবও ব্যক্ত হয়েছে। এই বিশুদ্ধ-মানব-স্বভাবের পরিকীর্তনই আলোচ্যকালের বাংলা লোক-কাব্যের যুগগত বৈশিষ্ট্য। পূর্ববঙ্গের গাথাকাব্য কিংবা বাউল-মুর্শিদী মরমী কাব্য-সংগীতেও এই বৈশিষ্ট্যই দিনে দিনে বিকশিত হয়েছে। চট্টগ্রামের মুসলমান কবিরা স্বতন্ত্রভাবে এই যুগ-ধর্মের মুক্তিতে সহায়তা করেছিলেন। এখানেই তাঁদের কবি-কর্মের ঐতিহাসিক মর্যাদা।

ইতিহাসের ফলশ্রুতি

১১। দ্রষ্টব্য—পূর্ববঙ্গ গীতিকা—৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা—ভূমিকা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গীতিকাসাহিত্য এবং লোক-সংগীত

পূর্বেই বলেছি, মধ্য-যুগান্তর-পথে রোসাঙের মুসলমানী কাব্যধারার পরেই লোক-সাহিত্য হিসেবে প্রধানতঃ স্মরণীয় (১) পূর্ববঙ্গের গাথা-গীতিকা এবং (২) বৃহৎ বঙ্গের বাউল-মারিফতী ইত্যাদি লোক-গীতি সাহিত্য। লোক-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য চেতনার বিমিশ্রতায়। অভিজাত চেতনার তুলনায় লোক-মানসে সুকর্ষিত তত্ত্ববুদ্ধি অথবা সচেতন জ্ঞান-প্রকর্ষ (sophistication) প্রায় অনুপস্থিত। দেহ-মনের অপেক্ষাকৃত সহজাত (Instinctive) বৃত্তি-সমূহের 'পরেই লোক-চিত্তের প্রধান নির্ভর। তাই, বাংলা লোক-সাহিত্য প্রায় সকল পর্যায়েই 'সহজিয়া' পন্থানুসারী। বৌদ্ধ সহজিয়া, জৈন সহজিয়া, নাথ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, সুফী সহজিয়া, এমন কি বাউল প্রভৃতি লোক-সংগীতও সহজিয়া রাগাত্মক। এই সহজিয়া চেতনা লোক-জীবনের একটি সাধারণ স্বভাব, আর এই কারণেই সকল লোক-সাহিত্যেরও সাধারণ উপাদান। কিন্তু, এই সহজ সাধারণ মৌল বৃত্তি সমূহের একান্ত আকর্ষণের সীমাতেই লোক-সমাজ ও লোক-মানস স্থানুত্ব-বদ্ধ হয়ে থাকে নি। আগেই বলেছি, লোক-চেতনাও চির-সচল, বিবর্তনশীল। এ-পথে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর কালের অভিজাত জ্ঞান-বুদ্ধিকে সাঙ্গীকৃত করে লোক-বুদ্ধি ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।[১] অবশ্য, অভিজাত জীবন-সম্পদ যখন লোকায়ত হয়েছে, তখন তার বৌদ্ধিক দীপ্তি স্থূলতা প্রাপ্ত হয়ে লৌকিক জ্ঞান-বিশ্বাসের স্বাভাবিকতার দ্বারা পরিস্রুত এক নব রূপ লাভ করে। ফলে, অভিজাত আদর্শবাদ এবং লৌকিক মানস-পরিস্রুতির সহযোগে লোক-সংস্কার ক্রমশঃই বিমিশ্রতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, আত্মব্যাপ্তির প্রকৃতি-জ প্রবণতার বশে এক একটি লোক-সমাজ সমধর্মী, মৌল জীবন-বৃত্তি-নির্ভর অন্যান্য লোক-সমাজ-স্বভাবেরও নানা উপাদানকে বিচিত্ররূপে আয়ত্ত করে থাকে। এইভাবে, লোক-সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ও ক্রমাগ্রস্থতির সংগে সংগে তার বিমিশ্রতার পরিধি এবং বৈচিত্র্যও

লোকসাহিত্যের মৌল-স্বভাব

১। দ্রষ্টব্য—দ্বাবিংশ অধ্যায়।

দিনে দিনে বর্ধিত, বলিষ্ঠ হয়েছে। রোসাঙ্-রাজ-দরবারের আওতায় রচিত মুসলমানী কাব্য-প্রবাহ-ও এই সংস্কৃতি-বিমিশ্রতার লক্ষণ-চিহ্নিত লোক-সাহিত্য।

দৌলৎকাজির লোর-চন্দ্রানী কাব্যের কাহিনী অংশে এই স্বভাব-লক্ষণ সহজে প্রস্ফুট। আগেই বলেছি, লোর ও চন্দ্রানীর প্রেম-কথা লোক-সমাজের 'সহজ' দেহ-মন-বুভুক্ষারই একটি স্বাভাবিক চিত্ররূপ;—লোক-সাহিত্যের স্বভাবগত অমসৃণ স্থূলতা-বহুল হলেও, লোক-সাহিত্যেরই মত সহজে মর্মস্পর্শী। তারই পাশে রয়েছে ময়নামতীর সতীত্ব-সাধনার মহিমান্বিত কাহিনী। স্পষ্টই বোঝা যাবে, এই কাহিনী-কল্পনার উৎস ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক পতিপরায়ণতার আদর্শকে কেন্দ্র করেই প্রথম জাগ্রত হয়েছিল। এমন কথা অবশ্য বলা হয়ে থাকে যে, লোকসমাজেও সতীত্বের আদর্শ যদি না-ও থাকে, তবু সহজ মানব-স্বভাব-বশেই সেখানে এক-পতিপরায়ণতার আদর্শও অনায়াস প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু, কেবল দৌলৎ-কবির উপাখ্যান থেকেই বোঝা উচিত যে, চন্দ্রানী ও ময়নামতীর নারী-স্বভাব দুটির পার্থক্য আ-মূল। আর, এই পারস্পরিক আদর্শ-গত প্রতিস্পর্ধিতার হেতু আলোচ্য চরিত্র দুটি একই সমাজ-মানসে যুগপৎ সমান শ্রদ্ধা-স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। এদের উৎস সহজেই স্বতন্ত্র। অবশ্য, ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক সতীত্বাদর্শও ময়নামতীর জীবনে সহজে লোক-ধর্মান্বিত হয়ে উঠেছে বলেই, ময়না লোক-সাহিত্যেরই নায়িকা; সাহিত্যিক চরিত্র হিসেবে সে সীতা-সাবিত্রীর সমগোত্রীয়া নয়। অভিজাত-চেতনার সহজ লোকায়তির এই প্রক্রিয়া স্পষ্টতর হয়েছে দৌলৎকাজি কর্তৃক প্রাচীনতর বৈষ্ণব ঐতিহ্যের অনুসরণ প্রচেষ্টায়। আষাঢ়ের বিরহার্তির ছবি অঙ্কন করে মালিনী প্রোষিতভর্তৃকা ময়নাকে ছাতনের প্রলোভন রচনা করে বলেছে:—

লোকসাহিত্যিক দৌলৎকাজি

দেখ ময়নাবতী প্রবেশ আষাঢ়
চৌদিকে সাজয় গম্ভীর।
বধূজন প্রেম ভাবিয়া পন্থিক
আইসয় নিজ মন্দির॥

যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী
পূরে মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী রজনী
নির্জন সংকেত-ঠাম ॥
দারুনী ডাউক দাদুরী ময়ূর
চাতক নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবণ বিদরে
না সহয় মনে মদন ॥
যাবৎ বয়স কেলি কলারস
পুরয় মনোরথ জানি।
হঠ পরিপাটি মান উপরোধ
চাতুরি তেজ কামিনী ॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী যুবকের বৈরী
ফিরি তাকে না পুছারি।
যাইব যৌবন নিশির স্বপন
জীবন দিবস চারি ॥
হরি মধুপতি আনম্ রসবতি
মতি ভোর তেরা সাঁই।
অবধি অন্তরে ফিরি না পুছারে
আর কি তোর বড়াই ॥
শুনহ উকতি করহ ভকতি
মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেম
যেন কালার কোলে রাই ॥

এই কবিতাংশের মধ্যে বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিতার প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট। তা সত্ত্বেও, দৌলৎ কাজির এই কবিতাকে বৈষ্ণব-পদাবলীর পর্যায়ভুক্ত কিছুতেই করা চলে না। বৈষ্ণব-চেতনার মূল-ভূমিতে সূক্ষ্ম মনন ও অনুভূতির যে অনন্যতুল্য স্পর্শ-কাতরতা রয়েছে, এই কবিতার ভাব-পটভূমি তার থেকে বহু দূরবর্তী,—অনেক স্থূল এবং অমসৃণ। এইরূপে দৌলৎ কাজির রচনার

মধ্যে পূর্ববর্তী এক পর্যায়ের ভাবচেতনা ("The learning of one generation") অন্ত পর্যায়ের লোক-কাব্য ("Folk lore of another") হয়ে উঠেছে।[২]

আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে পূর্বতর পর্যায়ের 'জ্ঞান-সমৃদ্ধি'র প্রভাব আরো স্পষ্টতর। বস্তুতঃ বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক এবং মুসলমানী পূর্বৈতিহ্যের উদ্ধার ও অনুস্মৃতির বাহুল্য হেতু পণ্ডিতজনের কেউ কেউ পদ্মাবতীর লোক-কাব্যত্বে পর্যন্ত সন্দিহান হয়েছেন। কিন্তু, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত 'পদ্মাবতী' কাব্যের প্রারম্ভিক বন্দনাংশ থেকেই বোঝা যাবে, আলাওলের রচনায় তত্ত্ব-কথার অবতারণা কালেও অভিজাত মননের জ্ঞান-কর্ষণের (Sophistication) ছায়া সম্পাৎ ঘটে নি; সর্বত্রই সকল জ্ঞান লোকায়ত সহজ অনুভূতির পর্যায়েই অনায়াস-বিচরণ করেছে। আর, এই পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে অভিজাত চিন্তা ও লোক-মানসাশ্রিত অনুভূতির স্বাভাবিক বিমিশ্রতার বৈশিষ্ট্য। পদ্মাবতীর হিন্দী মূল জায়সীর পদুমাবৎ-এও রয়েছে এই লোক-সাহিত্য-স্বভাব। পদ্মিনী-আলাউদ্দিনের ঐতিহাসিক উপাখ্যান অভিজাত সমাজের স্বদেশভক্তি ও নারী-মহিমার আদর্শকে যুগপৎ উদ্বুদ্ধ করেছিল। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর কালের সেই আভিজাত্য মহিম কাহিনীকে সুফী-প্রণয়াদর্শের সূত্রে গেঁথে জায়সি তাকে লোক সাহিত্যের রস-সৌন্দর্যে ভাস্বর করেছেন। মনে রাখ্‌তে হবে, আলাওলের বাংলা কাব্যও সেই ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছে। বস্তুতঃ এই সংস্কৃতি-বিমিশ্র সহজ-অনুভূতিময় জীবন-বোধই রোসাঙ্‌ রাজ-সভার মুসলমানী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আর আমাদের ধারণা,—পূর্ববঙ্গের গীতিকা-কাব্য এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের লোক-গীতি-কবিতাবলীও এই ঐতিহ্যধারাকেই অনুসরণ করেছে। মূলতঃ এই কারণেই আলোচ্য অধ্যায়ের পূর্বসূত্র রূপে রোসাঙের লোক-সাহিত্যের এই সাধারণ অবতারণা।

লোকসাহিত্য ও পদ্মাবতী

অবশ্য, পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহ-গীতিকা রোসাঙ্‌-এর মুসলমানী কাব্যের প্রত্যক্ষ-প্রভাব-জাত, এমন কথা কখনোই আমাদের বক্তব্য নয়। "যুগান্তরের পথে"র আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি,—সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত বাংলা

২। দ্রষ্টব্য—দ্বাবিংশ অধ্যায়।

লোক-সাহিত্যের ধারা চৈতন্য-যুগে এসে অভিজাত সাহিত্য সংস্কৃতির সংগে সাযুজ্য লাভ করে এক সম্মিলিত সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙালি সাহিত্য-চেতনার সৃষ্টি করেছিল। বলাবাহুল্য, এই পর্যায়ে লোক-চেতনা বিলুপ্ত হয় নি; বৃহত্তর জাতীয়-চেতনার হাতে নিজের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে সমর্পণ, তথা, আপন পৃথক্ অস্তিত্বের ব্যাপকতাকেই কেবল নির্মূল করেছিল। চৈতন্য-সংস্কৃতির বিলুপ্তির সংগে সংগে জাতীয় জীবন-সংস্কৃতি আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন অনগ্রসর লোক সমাজের সংগে লোক-সাহিত্য-ঐতিহ্যেরও পুনরভ্যুদয় ঘটে। বলাবাহুল্য, লোক-সমাজের জ্ঞান-প্রকর্ষ-হীন (Unsophisticated) সহজাত ভাবানুভূতির (Instinctive feeling) চিরন্তন প্রাবল্য এই পর্যায়ের লোক-সাহিত্যেও অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু, নিখিল বাংলা দেশের মত পূর্ববঙ্গের লোক-সমাজও ইতিমধ্যে চৈতন্য-প্রভাবিত যুগে সাধারণভাবে সর্বজনীন বৃহৎ-বঙ্গের সংস্কৃতির সংগে একান্তবদ্ধ হয়েছিল। তাই, উচ্চতর পর্যায়ের সূক্ষ্ম-ভাবানুভূতির সংগে পূর্বযুগের এই সান্নিধ্যের প্রভাবকে আলোচ্যকালের লোক-সমাজের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে, পূর্ববঙ্গ-গীতিকার কাব্যাংশে নর-নারী-নির্ভর সহজ প্রেমের সংগে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে বৈষ্ণব প্রেমাকূতির বিহ্বলতা এবং স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সমাজের সতীত্বাদর্শ। মনে রাখতে হবে, এই গীতিকা-সাহিত্যও রোসাঙ্-সভার মুসলমানী সাহিত্যের মত স্বভাব-বিমিশ্র। তাছাড়া, এই লোক-সাহিত্যের মধ্যেই দেববাদ-নিরপেক্ষ নিরাবরণ, নিরাভরণ মানুষের প্রেমানুভূতি একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। পূর্বে দেখেছি, বাংলা সাহিত্যের একেবারে আদিযুগেও বিশুদ্ধ মানবিক প্রেম-গীতিকার অস্তিত্ব ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন। কিন্তু, যৎসামান্য উপাদান থেকে ঐসব সাহিত্য-কৃতির স্বভাব-নির্ণয় সম্ভব নয়। সে যাই হোক্, সপ্তদশ শতকের আলোচ্য লোক-সাহিত্যে বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের এই উদ্বর্তন যে সেই পুরাতন অনুমান-সর্বস্ব ধারার সংগে যুক্ত নয়,—এ-কথা বলাই বাহুল্য। এবারের এই সর্ব-নির্মুক্ত মানব-চেতনার উৎস প্রথম উৎসারিত হয়েছিল মুসলমানী-হিন্দী সাহিত্যের সূত্রকে আশ্রয় করে। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার কাহিনী-প্রবাহে সেই ঐতিহ্যই স্পষ্টায়ত, সুসংজ্ঞক-তর হয়েছে;—এই অর্থেই রোসাঙের সাহিত্য পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংগে ঐতিহাসিক পূর্ব-সূত্রে বদ্ধ।

পূর্ববঙ্গের গীতিকা সাহিত্য

কিন্তু, এই গীতিকাবলীর লোক-সাহিত্য-স্বভাব নির্ণয়ে পূর্ব মৈমনসিংহের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামাজিক তত্ত্ব বিষয়ক প্রত্ন-তথ্যের 'পরে অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে। নদী-পর্বত-সীমায়িত পূর্ব মৈমনসিংহ সাধারণভাবে বৃহৎ বঙ্গ থেকে ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রিক কারণে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ছিল বলে ডঃ দীনেশচন্দ্র অনুমান করেছেন।[৩] তাঁর মতে প্রাচীন ছড়া-রূপকথা-পাঁচালির মত ঐসব গীতিকা-কাহিনীও বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে (দশম থেকে দ্বাদশ শতকে) বৃহৎ বঙ্গের লোক সমাজে প্রথম কল্পিত হয়েছিল। পরে, কালে কালে নানা পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু, পূর্বমৈমনসিংহ বৃহৎ বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলেই সেখানে সংস্কৃত প্রভাবের বিনষ্টি-পদ্ধতি সক্রিয় হতে পারেনি। ডঃ দীনেশচন্দ্রের ধারণা, এই কারণেই ঐ সকল প্রাচীন লোককাব্য কালের সীমা পেরিয়ে কেবল পূর্বমৈমনসিংহে গিয়ে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। এই উপলক্ষ্যে মনে রাখতে হবে,—দীনেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তে তথ্যের চেয়ে অনুমানের পরিমাণ বেশি ; আর সে অনুমানও সর্বত্র পূর্বাপর সংগতি-সিদ্ধ নয়। প্রথমতঃ, পূর্ব মৈমনসিংহের ঐতিহাসিক পূর্বাবস্থার বর্ণনায় তাঁর সকল তথ্য-নির্দেশ প্রামাণ্য নয়।[৪] অন্যদিক থেকে গীতিকা-কাহিনীর আদিম উদ্ভব-সম্বন্ধীয় কল্পনারও কোন নির্ভর-যোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র নেই। অতএব, ঐ সকল প্রাচীন লোক-কথার রক্ষণে পূর্ব-মৈমনসিংহের বিশেষ প্রভাব সম্বন্ধীয় উদ্ধৃত তথ্য নির্বিচারে গ্রহণীয় নয়।

গীতিকা সাহিত্য ও পূর্বময়মনসিংহের ভৌগোলিক বিবরণ

এ-কালে, পূর্ব মৈমনসিংহের ঐ সব লোকগাথার 'পরে স্থানীয় পার্বত্যজাতি [গারো, হাজং ইত্যাদি] গুলির সংস্কৃতি-প্রভাবের বিষয়ে অতিরিক্ত জোর দেওয়া হচ্ছে। সন্দেহ নেই, লোক-সাহিত্য মাত্রই অনুন্নততর লোক-সমাজ সম্ভূত। আর, বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সমাজ-স্বভাবের খুঁটিনাটিতে পরিবেশ-জাত প্রভাব-জনিত পার্থক্যও লক্ষিত হয়ে থাকে। পূর্ব মৈমনসিংহে প্রাপ্ত গীতিকা-সাহিত্যও বিশেষ স্থানীয় লোক-সমাজ-আচারের দ্বারা সুপুষ্ট। আর আঞ্চলিক পার্বত্য জাতিরা যে সেই সমাজ-আচারের সংগঠনে প্রধান স্থান

৩। দ্রষ্টব্য—মৈমনসিংহ-গীতিকা (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)—ভূমিকা।
৪। দ্রষ্টব্য :—বাংলার লোক-সাহিত্য—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

অধিকার করেছিল কোন-না-কোন পর্যায়ে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকা আমাদের হাতে যে কালে এসে পৌঁচেছে, সে-যুগ পর্যন্ত কাল-পরিক্রমায় পূর্ব-মৈমনসিংহের লোক-মানস ক্রম-বিবর্তিত হয়ে হয়ে সংস্কৃতি বিমিশ্রতা জনিত নবাবয়ব লাভ করেছিল। তাতে গারো-হাজংদের জীবনাচার-জাত মৌল প্রভাব যত ছিল, পরবর্তী কালের আর্য-ব্রাহ্মণ্য অভিজাত-সংস্পর্শের ছাপও তার চেয়ে কম ছিল না। এই গীতিকাগুলির প্রায় কোনটিই সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী কালের রচনা নয়। আর, ঐ সব কাব্য দু তিনশ বছর মুখে মুখে ফেরার পরে মাত্র বিশ শতকের প্রথমভাগে আমাদের হস্তগত হয়েছে। অনেকে আবার সংগ্রাহক-সম্পাদকের হস্তাবলেপের কথাও উল্লেখ করে থাকেন। সে-কথা ছেড়ে দিলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কাব্য-কথা ও কাব্যরূপ বিশ শতক পর্যন্ত লোক-মুখে ফিরে ফিরে লোক-জীবনের সংগেই যে নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তাতে সংশয় নেই। তাছাড়া, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে মূল কাব্য রচনার সময়েও পূর্ব-মৈমনসিংহের লোক-সমাজে সংস্কৃতি-বিমিশ্রতা যে ঘটেছিল তাতে সংশয় নেই। এই গীতিকা কাব্যগুলোর প্রায় সব কয়টিই নারী-প্রধান কাহিনীযুক্ত। এই প্রসঙ্গে পূর্ব-মৈমনসিংহের আঞ্চলিক পার্বত্য জাতির মাতা-প্রধান সমাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু নারী-প্রাধান্য, তথা মাতা-প্রধান জীবন-ব্যবস্থা ত নিখিল বাঙালির সর্বজনীন ঐতিহ্য সম্পদ্। বৈষ্ণব-কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই বাঙালির সাহিত্য নারী প্রধান। মঙ্গল-সাহিত্যের মধ্যে বীর্যদীপ্ত দুটি পুরুষ চরিত্র রয়েছে,—চন্দ্রধর এবং কালকেতু। কিন্তু বেহুলা-সনকার পাশে চন্দ্রধর, ফুল্লরার পাশে কালকেতু অনেক নিষ্প্রভ, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরিকল্পনায় কৃষ্ণই 'পূর্ণ শক্তিমান্'—রাধা তাঁর হ্লাদিনী শক্তিমাত্র। কিন্তু বাংলা বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে শক্তিমানের চেয়ে শক্তিই যে সর্বদা উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত হয়েছেন, তাতে সংশয় কোথায়? 'অভিসার'—কল্পনায় আলংকারিক বলেছেন,—যে নায়িকা নিজে অভিসার করেন, অথবা নায়ককে দিয়ে অভিসার করান, তিনিই 'অভিসারিকা'। কিন্তু সমস্ত বৈষ্ণবকাব্য-প্রবাহ নায়িকার অভিসার কথাতেই অশ্রুসিক্ত হয়ে রয়েছে। চণ্ডীদাস-কবি কৃষ্ণের একটি উজ্জ্বল অভিসার চিত্র অংকন করেছেন :—

পূর্ব মৈমনসিংহে আর্যেতর সূ-তথ্য

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥"

কৃষ্ণের অভিসার চেষ্টাতেও 'পরাণ' যাঁর 'ফাটে', তিনি রাধা। নারী-হৃদয়ার্তির অশ্রুদীপ্তি এখানে পুরুষের প্রসঙ্গে উজ্জ্বলতম হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গানটি 'কল্যাণী' নারীকে নিবেদন করেছেন; শরৎচন্দ্র তথাকথিত 'পতিতা' নারীর প্রতি অসংগত সামাজিক নির্যাতনের যূপকাষ্ঠে বেদনার অঞ্জলি দিয়েছেন; মধুসূদন-বঙ্কিমের সাহিত্যেও নারী-মহিমা ভাস্বরতম। এই সর্বজনীন নারীপ্রাধান্যের জন্য দায়ি কর্‌ব কোন্ মাতা-প্রধান পার্বত্য সমাজ-আচারকে? আসল কথা, বাংলার আর্যপূর্ব আর্যেতর মাতা-প্রধান সমাজের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার রক্তসম্পর্ক ও ঐতিহ্যসূত্রে নিখিল বাঙালির চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। সেই মূল উৎস থেকে এদেশে মাতৃকা-পূজা ও তন্ত্রসাধনার জন্ম;—সেখান থেকেই আর্য-ব্রাহ্মণ্য দেব-কল্পনাতেও দেবী-প্রাধান্য। নানা স্থানীয় প্রভাব-প্রতিবেশকে আশ্রয় করে সেই মৌলিক-স্বভাব বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজে বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্ব-মৈমনসিংহ গীতিকায় স্থানীয় পার্বত্য আর্যেতর লোক-সমাজের প্রেরণা-ঐতিহ্যও হয়ত অস্পষ্ট নয়; কিন্তু ঐটুকুর 'পরে অতিরিক্ত জোর দেওয়া ঐতিহাসিক তথ্য নির্ধারণের পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়ে ওঠে।

গীতিকা-সাহিত্যে 'সতীত্ব' (?)

এই প্রসঙ্গে মনে রাখ্‌তে হবে, আঞ্চলিক পার্বত্য লোক-সংস্কার স্থানীয় অভিজাততর সমাজ-মানসের সান্নিধ্যে এসে যে বিমিশ্র লোক-সংস্কৃতির অভ্যুদয় সম্ভাবিত করেছিল, পূর্ব-মৈমনসিংহ গীতিকা সেই বিমিশ্রতা-ধর্মী লোক-মানসেরই প্রতিফলন। এই সব গীতিকা-কথার একটি সাধারণ অথচ সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য নারী-প্রেমের একনিষ্ঠতার মর্মস্পর্শী রূপায়ন। 'সতী ময়নামতীর' প্রসঙ্গে বলেছি, ঐটুকু সমকালীন স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের সতীত্ব-কল্পনার প্রভাব-জাত। কেউ কেউ মনে করেছেন সতীত্ব নারীত্বের একটি সহজাত বৃত্তি। আদর্শবাদ, বিশেষভাবে ভ্রান্ত আদর্শবাদই বরং নীতি-শিথিলতার

কারণ হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, যেখানে কোন আদর্শ নেই, সেখানে যথার্থ মনুষ্যত্ব বিকাশের কোন বাধা হয় না। কিন্তু দেহ-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব কিংবা সমাজ-তত্ত্ব কোন বিজ্ঞানের পক্ষেই এ-সব সিদ্ধান্ত যুক্তি-যুক্ত নয়। নারীর সতীত্ব-বোধ যে একটি সামাজিক আদর্শ-চেতনার ফল, এক সর্বজনীন দেহ-মনোগত সহজ বৃত্তি নয়,—এ তথ্য কেবল সামাজিক পরিসংখ্যান্-এর সাহায্যেই প্রতিফলিত হতে পারে। অন্যদিকে আদর্শবাদ ছাড়াই যদি 'যথার্থ মনুষ্যত্ব'-বিকাশ সম্ভব হয়, তবে 'আদর্শবাদ' নামক অবান্তর বস্তুকে মানুষের ইতিহাস থেকে পরিহার করাই ত সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কারণ, আদর্শবাদ থাকলেই, তার সংগে "ভ্রান্ত আদর্শবাদ" গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও ত থাকে সুপ্রচুর।

মূল কথা, নারীর সতীত্ব নামক গুণের (Property) 'পরে বিশ শতকের পূর্ববর্তী কালে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ, পুরুষের প্রয়োজনে, বিশেষ করে, মধ্য যুগের স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য পুরুষ-প্রধান জীবন-যাত্রার স্বার্থরক্ষার জন্য নারীকে জননী-জায়া-কন্যার সামাজিক মূল্যের মধ্যে একান্ত ভাবে বদ্ধ করে রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস চলেছে। এই উপলক্ষ্যে সতী-নারীকে 'দেবী' বলে পূজা করা হয়েছে, তথাকথিত 'অ-সতী'কে ঘৃণার সংগে পিশাচী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সে-কালের জীবন-ব্যবস্থায় মানুষ হিসেবে নারীর কোন মর্যাদাই ছিল না ; নারীর মূল্য সেদিন নির্ণীত হয়েছে তার সতীত্বের সামাজিক মূল্যের মাপ কাঠিতে। বাংলা দেশে মোগল-প্রতিষ্ঠা-সমুত্তর হিন্দু-মুসলমান সমাজে দুর্নৈতিকতা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, পুরুষ প্রধানেরা ততই সামাজিক স্বার্থরক্ষার জন্য নারীর পবিত্রতা রক্ষায় অতি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে পুরুষের ব্যভিচার মাত্রা অতিক্রম করেছে, অন্যদিকে পারিবারিক নারীকে বিশুদ্ধ রাখবার চেষ্টায় কড়াকড়ি নিষ্ঠুরতার সীমায় গিয়ে পৌঁচেছে।[৫] ক্রমশঃ এই সামাজিক দুর্লক্ষণ অভিজাত ও লোক-জীবনের সর্বস্তরে সংক্রমিত হয়েছে। লক্ষ্য করতে হবে, পূর্ববঙ্গ গীতিকাতেও সতীত্ব মহিমার নামে এই দুষ্প্রবৃত্তিই প্রকটতর হয়েছে। আলোচ্য গীতিকা-কথার প্রত্যেকটিতেই একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় নারীর দেহ-মন-বিদারী রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে ; তার পাশে পাশে রয়েছে শক্তিমান

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—২য় পর্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা থাকবে।

বলিষ্ঠ পুরুষের লালসা ও ব্যভিচারের মর্মান্তিক ঘৃণ্য প্রয়াস। একে 'যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ' বলে মেনে নেব কি করে?

এই গীতিকা-সাহিত্যের সতীত্ব-কথার প্রসঙ্গ-মাত্রেই আমরা গলদশ্রু হয়ে থাকি। এর পেছনে যুগ যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের একান্ততা প্রবল হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর কাব্যের একটি সার্বজনীন শ্রেষ্ঠ শিল্পাবেদনও রয়েছে। তার উৎস আদর্শের জন্য, সে আদর্শ যতই ভ্রান্ত হোক্, —মানবাত্মার, তথা নারী-প্রাণের চরম আত্মোৎসর্জনের বেদনা-মহিম কারুণ্যের মধ্যে। এই আদর্শের নামই সে কালের স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাষায় সতীত্ব। কিন্তু, মধ্যযুগের এই সতীত্ববাদকে একটি ভারসম সামাজিক আদর্শ বলে কিছুতেই স্বীকার করা চলে না। কারণে-অকারণে সমাজের এক অংশ কেবল ব্যভিচার-উৎপীড়ন করেই যাবে,—অপরপক্ষ কেবল নীরবে সেই সর্বাতিক্রমী অত্যাচারকে সহ্য করে চরম আত্মদান করবে। এতে এক পক্ষের বেদনা যতই অপরিসীম হোক্, কোন পক্ষেরই কোন গৌরব নেই। একটি বিপর্যস্ত সমাজ-মানসের অবক্ষয়-চিহ্নই এই আদর্শবাদের সর্বত্র প্রস্ফুট হয়ে আছে। আর, পূর্বে বলেছি, এই অবক্ষয় আমাদের আলোচ্য 'যুগান্তর পথের'ই বিশেষ লক্ষণান্বিত। কেবল সমকালীন অভিজাত-সমাজে যে আদর্শ শাস্ত্র-নির্দেশের বহিরাগত অনুশাসনরূপে প্রতিপত্তি অর্জন করেছে, লোক-সমাজে তাই অনায়াসে সাঙ্গীভূত হয়েছে জ্ঞান-প্রকর্ষ-(Sophistication)-হীন সহজ বিশ্বাস-নিষ্ঠার মধ্যে।

অবক্ষয় যুগের আদর্শ-ভ্রান্তি

নারী-প্রেমের একনিষ্ঠ ত্যাগ-বিধুরতার সংগে এই গাথা-কথার সজীবতাকে পুষ্ট করেছে নারীর স্বেচ্ছাবৃত প্রণয়-সাধনের স্বাধীনতার কাহিনী। এটুকু আঞ্চলিক নারী-প্রধান লোক-সমাজের মৌল-ঐতিহ্য-পুষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে। মোট-কথা, একাদকে মাতা-প্রধান লোক-সমাজের নারী-স্বাধীনতা ও 'সহজ' প্রণয়-ব্যাকুলতার সংগে সতীত্ববাদের স্থূল, অমসৃণ লোকায়ত আদর্শ যুক্ত হয়ে যে ভাব-বিমিশ্রতার সৃষ্টি করেছিল, তারই সার্থক লোক-শিল্পরূপ পূর্ববঙ্গগীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকার গীতিকাবলী। অবশ্য, প্রণয় কথার রোমান্টিক্ মাধুর্য সম্পাদনে মুসলমানী লোককথার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

গীতিকা-সাহিত্যে লোক-চেতনার বিমিশ্রতা

প্রভাবও অন্ততঃ কিছু কিছু ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমাংশে সেই প্রভাব-সম্ভাবনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ স্বভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এবারে পূর্বকথার প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে মূল কাব্যাংশের উদ্ধার করি।

শিল্প-পরিচয়

পূর্ব মৈমনসিংহের মহুয়া-মলুয়া-চন্দ্রাবতীর কথা লোক-বিশ্রুত। তাই অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত অথচ সমপরিমাণে মর্মস্পর্শী পূর্ববঙ্গ গীতিকার ভেলুয়া সুন্দরীর পরিচয় দিচ্ছি। ভেলুয়ার প্রেম গাথা ৺চন্দ্রনাথ দে শ্রীহট্টের বাণিয়াচঙ্-অঞ্চল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। গল্পটির সারাংশ নিম্নরূপ,—শঙ্খপুরের মদনসাধু কাঞ্চন-নগরে বাণিজ্য করতে গিয়ে ভেলুয়াসুন্দরীর প্রণয়াসক্ত হন। সুন্দরী-ভেলুয়াও মদনসাধুর নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রণয়ী-যুগলের বিবাহ মিলনে পারিবারিক বাধা দেখা দেয়। মদনসাধু ভেলুয়াকে নিয়ে পলায়ন করে। পথে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগ। সুন্দরী-ভেলুয়ার রূপমুগ্ধ আবুরাজা আর মদনের বন্ধু হিরণসাধু তাদের পলায়ন-পথে বাধা সৃষ্টি করে। মদন আর ভেলুয়া হয় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। নির্বাসিত যক্ষের বিরহ-বেদনার নির্বাক্ বার্তাবহ হয়েছিল 'মেঘদূত',—মদন এবং ভেলুয়ার বিরহার্তির দিনে পরস্পরের মধ্যে স-বাক্ দৌত্য-সাধনা করেছে পোষা সারী—

"নিশাকালে মদনসাধু শারীরে বুঝায়।
কও কও প্রাণের পঙ্খী কও সমুদায়॥
ভেলুয়া সুন্দরী তোমায় কিবা শিখাইল।
আসিবার কালে কন্যা কিবা না কইয়া দিল॥
যে গান গাইল শারী ভেলুয়ার শিখান।
শুনিয়া মদন সাধু আরাইল গিয়ান॥
একে একে গাইয়া শারী আবুরাজার কথা।
পলাইয়া আইল কন্যা জান্যা এ বারতা॥
পবন ডিঙ্গা বাইয়া কন্যা আইল জিতাশ্বরে।
হীরণ সাধু পাগল হইল দেইখ্যা কন্যারে॥
তোমারে মারিতে সাধু বন্ধু তোমার আসে।
পরাণ লইয়া তুমি যাও নিজ দেশে॥

আমি যে বন্দিনী প্রিয়া ঐ জিতাশ্বরে।
বনেলা পক্ষিনী যেমন পইরাছি পিঞ্জরে ॥
দুঃক্ষিনী ভেলুয়ার কথা না ভাবিও আর।
আগুনে পুড়াইয়া তনু করবাম ছারখার ॥
গলে দিবাম হীরার কাতি ডুবিবাম সাগরে।
বাঁচিলে না আইস বন্ধু এই জিতাশ্বরে ॥
এখানে আসিলে তোমার অবশ্য মরণ।
রূপ হইল বৈরী আমার কাল হইল যৈবন ॥"

পোষা সারী, হিরণের বোন মেনকা এবং পরিতুষ্ট দৈবের সহায়তায় নির্যাতিত-প্রেম-সাধনা বিবাহ-মিলনে সার্থক হয়েছে, দুঃখের গাথা সমাপ্ত হয়েছে স্বস্তির আনন্দে।

ভেলুয়া-সুন্দরীর প্রণয়গাথা বিশ্লেষণ করে ডঃ দীনেশচন্দ্র বলেছেন,—এই কাহিনীটির মধ্যে মুসলমানী প্রভাব একেবারেই নেই,—কাহিনীর বিভিন্ন অংশে তাঁর মতে বৈদিক-পৌরাণিক হিন্দু সমাজ-মানসের প্রকাশ সুস্পষ্ট। পূর্বেই বলেছি,—মুসলমান-পূর্ব যুগের বাংলাদেশে লৌকিক প্রেম-গাথার অপ্রচলন ছিল না, হয়ত প্রাচুর্যই ছিল। কিন্তু, চৈতন্যযুগের সমন্বিত প্রেম-ভক্তির ঐকান্তিকতায় মানবীয় প্রেম-চেতনার পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল। চৈতন্য-চেতনা-শিথিলতার যুগে এই মানবী প্রেমানুভূতি লোক-সমাজে নূতন প্রেরণা-সঞ্চার করে আবির্ভূত হয়। আর, এই নবাবির্ভাবের ক্ষেত্রে মুসলমানী প্রেম-কাব্য, এবং বাঙালি মুসলমান কবি-রচিত বাংলা প্রেম-কথা এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করি,—এই সকল লোক-সাহিত্যের ধর্ম ছিল যৌথ-বিমিশ্রতা এবং জ্ঞান-কৃত্রিমতা-হীন,—unsophisticated সরলতা। এই সহজ গ্রাম্য সরলতা আলোচ্য লোক-সাহিত্যকে এক অকৃত্রিম মানবতা-রসে মণ্ডিত করেছিল, আর সেইখানেই এই জাতীয় সাহিত্যের সর্বজনীন রসমূল্য। দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। প্রথম গোপন প্রণয়-পর্ব-শেষে মদনসাধু কাঞ্চননগর ছেড়ে যাওয়ার সময়ে ভেলুয়ার আর্তিচিত্র—

"তোমারে ছাড়িতে বন্ধু প্রাণ নাহি ধরে।
চল যাইরে প্রাণের বন্ধু আপন মন্দিরে ॥

কেউ না দেখিব তোমায় চাইপ্যা রাখ্ব কেশে।
তোমারে লইয়া আমি ফিরবাম নানা দেশে॥
বাপ ছাড়বাম মাও ছাড়বাম ছাড়বাম পঞ্চভাই।
তোমার সঙ্গে যাইবাম আমি অন্য চিন্তা নাই॥
কেমন কইরা ছাইড়া দিবাম বুক কইরা খালি।
প্রাণের বন্ধু ছাইড়া গেলে হইবাম পাগলী॥
নিতান্ত যাইলে বন্ধু ডিঙায় কইরা লও।
আমারে ছাড়িয়া গেলে মোর মাথা খাও॥
তুমি যদি ছাড়িয়া যাও প্রাণে নাহি বাঁচিব।
চুম্বিয়া হীরার বিষ পরাণ ত্যজিব॥"

বাংলার লোক-মানসাশ্রিত অনাবিল প্রেম-রস-পরিচায়নে আরও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে করি।

বাউল-মুর্শিদী-মারিফতী ইত্যাদি লোক-গীতিরও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য চেতনার সহজ বিমিশ্রতা। বাউলেরা শাস্ত্র, আচার, বিগ্রহ মানেন না; চেতনার গভীরতলশায়ী প্রাণশক্তিকেই তাঁরা মর্মে মর্মে সাধনা করেন। তাই, তাঁদের একমাত্র সাধ্য "মনের মানুষ।" ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "In the conception of the 'Man of the heart' of the Bāuls, we find a happy mixture of the conception of the Paramātman of the Upaniṣads, the Sahaja of the Sahajiyās, and Sufi-istic conception of the Beloved।[৬] আবার, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন বাউলদের 'মরমী' সাধনার পূর্বৈতিহ্যকে অনুসন্ধান করেছেন 'বেদ-সংহিতায়',—'সন্ত'-গীতিতে; নানা জাতি ও সমাজের আরো নানা পর্যায়ে। অথচ, বাউল-সাধকেরা স্বভাবতঃ নিরক্ষর, এ-কথাও তিনি বারে বারে স্বীকার করেছেন।[৭] অতএব, উপনিষদ্ অথবা সুফী ধর্মাদির প্রকর্ষিত জ্ঞান সম্পদের পূর্বৈতিহ্য বাউল-সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু সুদীর্ঘ ব্যবহার-আচরণের মধ্য দিয়ে বেদ-উপনিষদ্ থেকে বিভিন্ন লোকাচারের বহু উপাদান বৃহত্তর লোক-জীবনের সহজ সম্পদে পরিণত

বাউল-মুর্শিদী-মারিফতী

৬। Obscure Religious Cults of Bengal. । ৭। দ্রষ্টব্য :—বাংলার বাউল।

হয়েছিল। সহজে-জীবনাঙ্গীভূত ঐ সব পূর্ববর্তী উপাদানসমূহ বাউল-সূফী-মুর্শিদী সাধনার বিমিশ্র লোক-ঐতিহ্যকে গড়ে তুলেছে। এ-দিক থেকে, আলোচ্য লোক ধর্মাবলী একে অন্যের পরিপূরক ;—এরা প্রত্যেকেই পরস্পর-প্রভাবিত। আর, বিমিশ্র যৌগিক লোক-স্বভাবের প্রভাবে, এই সব ধর্মাচরণে হিন্দু-অহিন্দু, মুসলমান-অমুসলমানের ভেদ থাকে নি। এক কথায়, বহিরঙ্গ আচার-নিয়ম-পদ্ধতি বিমুখ বিশুদ্ধ মর্মানুসারী সাধনার সকল প্রকার পূর্বৈতিহ্যকে স্বাধীনভাবে সংগ্রহ ও মিশ্রিত করে গড়ে উঠেছিল আলোচ্য মরমিয়া ধর্মাবলী। এদের মধ্যে মৌল স্বভাবগত অভিন্নতা বিদ্যমান। পার্থক্য যে-টুকু তা গুণগত নয়, বিমিশ্রণের পরিমাণগত।

"বাউল শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে।"—বলেছিলেন ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ;—"কেহ বলেন বাউল শব্দটি 'বায়ু' শব্দের সহিত 'আছে'—এই অর্থ-দ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বোঝায়। অর্থাৎ ইঁহাদের মতে যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সঞ্চয় করিবার সাধনা করে, তাহারা বাউল। কেহ বলেন বায়ু অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং এই শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবন-ধারা। সেই শ্বাস-প্রশ্বাস সংরোধ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবার সাধনা যাহারা করে তাহারা বাউল।"[৮] বাউল শব্দটির ব্যুৎপত্তি আর এক দিক্ থেকে বাতুল শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হতে পারে। এই অর্থই অবশ্য আজ সর্বজনস্বীকৃত হয়েছে।

'বাউল' শব্দের তাৎপর্য

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন এ-সম্বন্ধে বলেছেন,—"বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতিপংক্তির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভারমুক্ত মানবধর্মই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তপুরুষ, তাই সমাজের কোনো বাঁধন মানেন নাই। তবে সমাজ তাঁহাদের ছাড়িবে কেন? তখন তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোনো দায়িত্ব নাই।' বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, অর্থাৎ পাগল। আর তাঁহারা বলেন, 'মনে করিও যেন সামাজিক হিসাবে আমরা মরিয়াই গেছি।' মৃতের কাছে তো কোনো সামাজিক দাবি চলে না। তাই বাউলদের সাধনার আর-এক অঙ্গ

৮। বাউল—প্রবাসী ১৩৩৯ বাং।

হইল 'জ্যান্তে মরা'।"[৯] অধ্যাপক সেন এই প্রসঙ্গে সুফী সাধক 'দিরানা' '(পাগল) সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যেও 'ফিলা-ফনা' বা 'জ্যান্তে মরা' রয়েছে। বাউলেরা শাস্ত্র-নিয়ম-বিগ্রহ মানেন না; তাঁরা জীবনের মূলীভূত 'সহজ' সত্যকে সহজানুভূতির মাধ্যমে আয়ত্ত করতে চান। এ বিষয়ে শাস্ত্রের পরিবর্তে তাঁরা উপলব্ধি-সমৃদ্ধ গুরুর ওপর নির্ভর করে থাকেন। মুসলমানী মতে এই গুরুবাদী সহজ-সাধকের একটি দলই মুর্শিদী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। বাউলদের মধ্যেও মুসলমানদের নানা মত-গোষ্ঠী রয়েছে। এঁদের মধ্যে 'দরবেশী', 'সাঁই', 'খুশিবিশ্বাসী' ইত্যাদি মতের সাধকেরা উল্লেখ্য। তাছাড়া, বাউলদের 'আউল', 'কর্তাভজা' ইত্যাদি আরো বহুমত ও গোষ্ঠীর প্রচলন রয়েছে।

এই সাধনার সব কয়টি ধারাই অন্তরে মর্মানুসারী,— 'মরমিয়া'; বাহিরে 'সহজিয়া' অর্থাৎ নর-নারীর দেহ-সম্পর্ক নির্ভর। "বাউলিয়া মতেও জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ। ইহা উপনিষদে বেদান্তেও পাই। বেদান্ত বলেন, জ্ঞান বিনা জীব-বদ্ধ থাকে, জ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়।"[১০] কিন্তু বাউলেরা মনে করেন জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই কাম্য,— "জ্ঞান হইতে প্রেম মহত্তর।" আর, একক নর অথবা নারীর মধ্যে প্রেম সুপ্ত,— লুপ্তপ্রায়। নর-নারীর পূর্ণ সংযুক্তির মধ্যেই প্রেমের সম্পূর্ণতা। অতএব, নর ও নারীর মধ্যে আকর্ষণ-অনুরক্তিমূলক দেহ-মনোগত সকল প্রভাবই এঁরা স্বীকার করেছেন। বরং, দেহের বিচারে বাউল-সাধকেরা 'পরকীয়া' সাধনারই অনুরক্ত। 'স্বকীয়া' সাধনাকে বৈষ্ণব-ভাষায় বৈধী অনুরক্তির পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু বাউলেরা কোন বিধির বন্ধনই মানেন না। পরকে আপন করার প্রেম-সাধনাতেই তাঁরা 'পরকীয়া'র সন্ধান-রত। এদিক থেকে প্রেমের আধার হিসেবে দেহ-ভাণ্ডকে বাউলেরা অস্বীকার করেন নি; বরং দেহের পূর্ণ ব্যবহার করেই দেহ-মূলীভূত 'মরম'-লোকে অনুপ্রবেশের প্রয়াস করেছেন। অতএব, বাউল-সাধনায়ও সহজ-সাধনার সাধারণ রীতি অনুসারেই 'চারি চন্দ্র ভেদ'-এর গোপন প্রক্রিয়া কোন-না কোন প্রকারে সর্বত্রই উপস্থিত।

বাউল সাধনার বৈশিষ্ট্য

আর, বাউলের গীতি অপরিহার্যভাবে বাউল সাধনারই অঙ্গ। স্বভাবতঃ

৯। বাংলার বাউল। ১০। ঐ।

ঐ সকল সংগীতের মধ্যেও গুপ্ত সাধন-প্রক্রিয়ার সংকেত-আভাস বহুলাংশে ছড়িয়ে রয়েছে। এদিক্ থেকে বহু বাউল সংগীত রুচিমান্ জনের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত দেহগন্ধী। কিন্তু, আগেই বলেছি, বাউলের সাধনায় 'দেহ' উপায় মাত্র ;—পরিণাম নয়। 'মরম-পরশ' তথা 'মনের মানুষ'-এর সংস্পর্শই এঁদের একমাত্র পরিণামী কাম্য। এই কারণেই বাউল-সংগীতের মধ্যে সন্নিহিত হয়ে আছে সহজ মর্ম-স্পর্শিতার এক সাধারণ উপাদান। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের এই 'মরমিয়া' অনুভূতির মূলে অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালের রাগাত্মিক চৈতন্য-ধর্ম-সাধনার প্রভাবও স্বল্প নয়। 'কর্তা-ভজা' সম্প্রদায়ের মধ্যে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন 'চৈতন্য-মত'-এর বিশেষ পরিচয় লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু চৈতন্যধর্মী রাগ-লক্ষণের ছাপ বাউল-মুর্শিদী ধারায় সাধারণভাবেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

বাউলের সংগীত ও সাধনা

বাউল-মুর্শিদী গানের যে সব পদ বহিরঙ্গ দেহভাণ্ডকে ছেড়ে একান্ত ভাবে মর্মাভিমুখী হয়েছে তাদের অনায়াস মর্ম-স্পর্শিতা এক ধরণের সহজ, অথচ সর্বজনীন শিল্পাবেদন রচনা করেছে। এই শ্রেণীর অতল-স্পর্শ গভীর হৃদয়ার্তিপূর্ণ গীতি-কবিতা বিশ শতকের শিক্ষিত মানস-গোচর হয় প্রথমে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের আনুকূল্য ও প্রচেষ্টায়। আগেই বলেছি, এই শ্রেণীর লোক-সংগীত একান্তভাবে লোক-ধর্মাত্মক দেহ-সম্পৃক্ততার সংগে যুক্ত। আর, বাউলেরা এই সব রচনার পৃথক্ সাহিত্য-মূল্য স্বীকার করেন না ; তাঁদের কাছে এই সব রচনা সাহিত্য নয় ;—গোপন-কঠিন ধর্মাচরণের একান্ত প্রেরণা-উৎস। এদিক থেকে শিক্ষিত, রুচিমান নাগরিক-জনের কাছে এই সব লোক-সংগীত উপেক্ষণীয় ত ছিল-ই ;—নৈতিক বিচারেও ছিল একান্ত পরিহার্য। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন কাশীতে প্রথমে নিতাই বাউলকে দেখে আকৃষ্ট হন। বিখ্যাত বাউল গীতিকার ছকুঠাকুরের সংগেও অধ্যাপক শাস্ত্রীর পরিচয় ঘটে কাশীতেই। পরে বাংলা দেশের পূর্ব-পশ্চিমাঞ্চলেও তিনি বাউল-গীতির বহুল অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করেছেন। বাউল সংগীতের প্রকাশ ও প্রচারের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের। ভারতীয় দর্শন সভার অভিভাষণ ও বিলাতে Hibbert Lecture-এ তিনি বাউল

বাউল গীতির মরমিয়া স্বভাব এবং শিল্প-স্বভাব

গীতির ব্যাপক অনুবাদ-উদ্ধার ও বিচার-ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের সংগৃহীত বাউল-গীতি প্রচারের জন্যও কবিগুরুর আশীর্বাদ-প্রেরণাই একান্ত দায়ি ছিল ;—একথা সংগ্রাহক নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক সেনের প্রকাশিত সংগীতাবলীর সমুচ্চ ভাবাদর্শ ও বাক্-বিন্যাসের অতি সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মর্মস্পর্শী বহু কবিতা-সংগীতের সম-ধ্বনিই যেন ঝংকৃত হয়েছে। এই কারণে অনেকেরই মনে হয়েছে, "এইগুলি এত ভাল যে তাহা কখনো নিরক্ষরদের রচনা হইতে পারে না। ইহা এখন-কার শিক্ষিত লেখকের রচনা।"[১১] এই জন্য-ই বাউল-গীতিকে ইতিহাসের দৃষ্টিতে কেউ কেউ বিশ শতকের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। এ-বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা নিরাপদ নয়। অধ্যাপক সেনের ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব-সাত্ত্বিকতা সর্বজন-শ্রদ্ধেয়। এদিক্ থেকে জ্ঞাতসারে তথ্যাপলাপের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু, বাউল-সংগীতাবলী নিরক্ষর কবি-সাধকদের রচনা,–একাধিক শতাব্দী ধরে মুখে মুখেই এদের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। এই কারণে কালে কালে আলোচ্য সংগীতাবলীর ভাষা ও রূপগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা উপেক্ষণীয় নয়। তাই, বাউল-সংগীতকে আজ আমরা যে-ভাবে পেয়েছি, তাতে বিশশতকীয় ভাষা-ভঙ্গি ও প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব রয়েছে ; এমন অনুমান একেবার অস্বীকার করা চলে না। তা হলেও বাউল-সংগীতের প্রাচীনতার ঐতিহ্যও অবশ্যস্বীকার্য।

বাউলদের ধর্ম-ইতিহাসের ধারা আজও নিঃসংশয়ে আবিষ্কৃত হয়নি। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন অনুমান করেছেন,—"বাংলা ভাষা আরম্ভ হইতেই বাউলের পরিচয় মেলে। তবে গুরু পরম্পরা একবার খোঁজ করিয়া (১৮৯৮ সাল) ১২।১৩ পুরুষ পর্যন্ত কোনো মতে পাইয়াছিলাম।"[১২] চারপুরুষে এক পর্যায় ধরলেও এই গুরু পরম্পরা সূত্রে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিন শতাব্দী আগে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষে গিয়ে পৌঁছানো যায়। আবার 'জগমোহণী' বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্তয়িতা জগমোহনের আবির্ভাবকাল অনুমিত হয়েছে "প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে।"[১৩] তাতেও অন্ততঃ ঐ ষোড়শশতাব্দীরই ঘোষণা রয়েছে। বাউলেরা অনেকে তাঁদের পন্থার আদিগুরু হিসেবে চৈতন্য-মহাপ্রভুকে স্মরণ করে

বাউল-এর ইতিহাস

১১। দ্রষ্টব্য—বাংলার বাউল। ১২। ঐ। ১৩। ঐ

থাকেন। বাউল-সাধনার সংগে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ কোন সংযোগের প্রমাণ নেই। তবে বৈধী সাধনা ও স্মার্তব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রাচারের গণ্ডিবন্ধন অস্বীকার করে রাগাত্মিক প্রণয় মার্গানুসরণের মহত্তম ঐতিহ্য যে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মহাপ্রভুরই দান, একথা বারে বারে বলেছি। এদিক্ থেকে বাউল ও সমধর্মী সাধন-ধারায় চৈতন্য-চেতনার প্রভাবের কথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি। সে যাই হোক্, বাউল সংগীতের ধারা অত প্রাচীন কাল অবধি টেনে না নিতে চাইলেও, সপ্তদশ শতকের কোন সময় থেকে লোক সাধনা এবং লোক-সংগীত হিসেবে বাউল-গীতি-সাহিত্যের স্পষ্ট প্রসারের কথা অনুমান করা যেতে পারে। বর্তমান 'একতারা'শ্রয়ী বাউল গীতির ঐতিহ্য অনেক সময় বাউল-গুরু আউলচাঁদ থেকে অনুসৃত হয়ে থাকে। আর আউলচাঁদ "প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে" জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[১৪] এই সব অনুমান সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেও বাউল-গীতির ইতিহাস নিয়ে সপ্তদশ শতক-সীমায় পৌছানো অসম্ভব হয় না। আর, 'যুগান্তর পথে'র পূর্বালোচনায় আমরা লোক-স্বভাব ও লোক-সমাজের পুনর্জাগৃতির কাল-চিহ্ন হিসেবেও ঐ সময়কেই গ্রহণ করেছি।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনিশ শতকের বাউল গীতিকারদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যাঁদের গীতিকর্ম একালের শিক্ষিত-মর্মকেও অনায়াসে স্পর্শ করে। এঁদের অন্ততঃ একজনের সংগে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তিনি শিলাইদহের বাউল কবি গগন হরকরা ;—কবিগুরুর জমিদারিতে এই সহজ-কবি ছিলেন ডাক-হরকরা। গগন ছিলেন কুষ্টিয়ার বিখ্যাত লালন ফকীরের শিষ্য ধারার অন্তর্ভূত। স্বয়ং কবিগুরু গগনের গান সংগ্রহ করে তাঁর হিবার্ট-বক্তৃতায় ব্যবহার করেছেন :—গগনের যে গানটি আজ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার কয়েক ছত্র :—

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে !
আমি হারায়ে সেই মানুষে,
ঘুরে মরি দেশ বিদেশে ;"

রবীন্দ্রনাথের আরো একজন অতিপ্রিয় বাউল গীতিকার ছিলেন শ্রীহট্টের হাসন-রজা চৌধুরী। ইনি শ্রীহট্টের লক্ষ্মণশ্রীর দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ

১৪। বাংলার বাউল।

করেছিলেন। জন্মকাল ১২৬১ বঙ্গাব্দ, এবং মৃত্যু সন ১৩২৯ বাংলা। হাসনের পিতার নাম ছিল আলি রজা চৌধুরী। এঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দু-কায়স্থ। হাসন রজার একাধিক রচনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায় ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় দর্শন সভার সভাপতির অভিভাষণে কবি হাসন রজা সম্বন্ধে লিখেছেন,—"পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই, সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্ব-সত্য। তিনি গাহিলেন :—

'মন আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন।
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম,
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুস্‌বয়, বদ্‌বয়।'

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে-পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্য মণ্ডলে অধিষ্ঠিত :—

'রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝ্‌ত বাহির হৈয়া দেখা দিল আমারে।' "

পরিশেষে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহ থেকে দুটি একান্ত মর্মস্পর্শী বাউল-গীতি উদ্ধার করি।

১। ধন্য আমি বাঁশিতে তোর
আপন মুখের ফুঁক্।
এক বাজনে ফুরাই যদি
নাইরে কোন দুখ॥
ত্রিলোক ধাম তোমার বাঁশি
আমি তোমার ফুঁক্।
ভাল মন্দ রন্ধ্রে বাজি,
বাজি নিশুইত রাত।
ফাগুন বাজি, শাঙন বাজি
তোমার মনের সাধ॥

একেবারেই ফুরাই যদি
কোন দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলেম বাজি
আর কি আমি চাই॥

২। আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা বল্‌গো ঘ্রাণে বল্‌, বল্‌রে শ্রবণে
সে এসেছে সে এসেছে পূরব গগনে।
তোরা বল্‌গো ঘ্রাণে বল্‌, বল্‌রে শ্রবণে—
তোর বন্ধু এসেছে, সে এসেছে পূরব গগনে।
কমল মেলে কি আঁখি
তারে সংগে না দেখি,
তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে।
আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তায় আমার প্রথম চাওনে॥

মুর্শিদী-মারিফতী গানেও প্রায় একই মোল ভাবনাকে মুসলমানী সাধনার পরিভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে; এই সব রচনায় স্বভাবগত পার্থক্য বড় একটা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। 'সাঁইপন্থী' বাউল বলে প্রখ্যাত লালন ফকিরের লেখা একটি বাউল গান নিম্নরূপ :—

কোথা আছে রে দীন দরদী সাঁই।
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই।
চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কি রঙ্গ সাঁই দেখ্‌ছে সদাই বসে নিগম ঠাঁই।
এখানে না দেখ্‌লাম তারে,
চিন্‌ব তারে কেমন করে,
ভাগ্যেতে আখেরে তারে চিন্‌তে যদি পাই।
সমঝে সবে সাধন করো
নিকটে ধন পেতে পারো
লালন কয় নিজ মোকাম ঢোঁড়, সাঁই বহু দূরে নাই॥"

এর পাশেই শ্রীহট্টের মুসলমান কবি জহুরুল হুসেনের একটি মারিফত মুর্শিদ[১৫] বিষয়ক পদ উদ্ধার করি :—

"আমি পাইলাম না রে ভাও—
মনাই সাধুর নাও—
পবনেতে ভর করিয়া নৌকা বাইয়া যাও। ধুয়া।
২৮ গিরা নৌকাখানি ৩২ গিরা তার—
ভেদ করিয়া চাইয়া দেখ জোড়ার নাই পার।
আব আতস খাক বাদ ৪ তক্তা দিছে,
মধ্যখানে মনুরায় মাস্তুল খেচিছে।
পবনেতে ভর করিয়া বৈঠা মার ভাই,
ইয়াহু ইয়াহু ছাড়া জান আর কিছু নাই।
নাছুতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কুঞ্জি,
দুওমে মলকুত সাগর ইল্লাল্লাহু পুঞ্জি।
তৃতীয়া জবরুত জান খাছ নাম ধরি—
চারমে লাহুতের খেওয়া হুহু নামতরী।
একে একে চারি খেওয়া শেষ কর ভাই,
মনাই সাধুর নৌকা বাইতে আর ভয় নাই।
জহুরুল হুছনে কয় মুর্শিদ বড় ধন,
সেই বাজারে গেলে মিলে অমূল্য রতন।"

মন্তব্য দীর্ঘ করে লাভ নেই; এই ধরণের সব সংগীতের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধি-নিরপেক্ষ একই চেতনার বিমিশ্রতা ও ভাবনার মর্মস্পর্শিতা রয়েছে—লোকসাহিত্যের পক্ষে এই গুণ দুটি পরম সম্পদ্।

১৫। মারিফৎ—পন্থা; মুর্শিদ—গুরু।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শক্তি বিষয়ক গীতি-সাহিত্য

'শাক্ত গীতি-সাহিত্য' নামে পরিচিত কবি-কর্মের আলোচনার প্রারম্ভে ইতিহাসের কালগত গ্রন্থিমোচন প্রয়োজন। এই শ্রেণীর গীতি-সাহিত্যের জন্ম অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদের হাতে। কিন্তু ঐ একই শতকে পূর্ণ বিকশিত কালিকা-মঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কাব্যের উদ্ভব ঘটে তারও চেয়ে প্রাচীনতর কালে। বিদ্যাসুন্দর কাব্য-ধারার কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু, তার আগে ষোড়শ শতকে রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিচয়ও পাওয়া গেছে। এদিক্ থেকে কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কাব্য শাক্ত সংগীতাবলীর অগ্রজ। তাহলেও, বর্তমান ঐতিহাসিক আলোচনায় শাক্ত-সংগীতের বিচারই আমরা প্রথমে করব। ঐতিহাসিক ফলশ্রুতির দিক্ থেকে রামপ্রসাদের শাক্ত-গীতি ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য দুই স্বতন্ত্র-পৃথক্ ধারায় অষ্টাদশ শতকে 'যুগান্তর পথের' দুটি স্পষ্ট পরিণাম-পরিচয়কে ধারণ করে রেখেছে। তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কাব্য অব্যবহিত-ভাবে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের দুই সাহিত্য-যুগের অপরিহার্য সংযোগ-সেতু রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। এদিক্ থেকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের উদ্ভব প্রাচীনতর হলেও, শাক্ত-গীতির তুলনায় তার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি পরিণততর। অতএব, অপরিণত ঐতিহাসিক স্বভাব-পরিচয়ের আলোচনা থেকে ক্রম-পরিণতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছি,—বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পূর্বে শাক্ত গীতি-আলোচনার বর্তমান উপস্থাপনা বিষয়ে এইটুকুই আমাদের যুক্তি।

ইতিহাসের কৈফিয়ৎ

এই শ্রেণীর সাহিত্য-আলোচনার সূচনাতেই আলোচ্য গীতি-সমষ্টির নামকরণগত অব্যাপ্তি দোষের উল্লেখ করতে হয়। শাক্ত-সংগীত অর্থে ইতিহাস ও সাহিত্য-নীতির বিচারে কেবল সেই সকল গীতি-সাহিত্যকেই বোঝানো উচিত যাদের মধ্যে একান্ত অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে শাক্ত-দার্শনিক মনোভাব অথবা শক্তিবাদ-সম্বন্ধে বিশেষ শাস্ত্র-সম্মত ভক্তি-নিষ্ঠা।

শক্তি বিষয়ক গীতি
বনাম
শাক্ত পদাবলী

সন্দেহ নেই, শাক্ত ধর্মচেতনার কেন্দ্রভূমি শক্তি দেবতার সংগে একান্তবদ্ধ। কিন্তু, শক্তি-বিষয়ক উল্লেখযুক্ত যে-কোন সাহিত্যিক রচনাই শাক্ত সাহিত্য নয়। তাহলে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটককেও শাক্ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। অথচ, বিস্ময়ের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের একটি গান, মধুসূদনের একটি বিজয়া সংগীতও আমাদের দেশে শাক্ত-পদাবলীর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আরো বিচারনিষ্ঠতা প্রয়োজন। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, রাধাকৃষ্ণলীলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধানতম উপজীব্য হলেও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক যে-কোন সংগীত কবিতাই বৈষ্ণবপদ হতে পারে না। বৈষ্ণব পদ-সৃষ্টির পেছনে বৈষ্ণব দর্শন ও শাস্ত্র নির্দেশের নৈষ্ঠিক সচেতনা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়, তেম্‌নি শক্তি-বিষয়ক যে-কোন সংগীতই শাক্ত-গীতি নয়। যে সাহিত্যের পশ্চাতে শাক্ত ধর্ম-চেতনা ও শাস্ত্রাচারের নৈষ্ঠিক উদ্বর্তন নেই, তা কখনো শাক্ত-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না।

শক্তি-বিষয়ক ধর্মচেতনার প্রাচীনতম পরিচয় পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তে। কিন্তু পণ্ডিতেরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, বৈদিক আর্য-সমাজ স্বভাবতঃ শক্তি-সাধনার পরিপন্থীই ছিলেন। পুরুষ-প্রধান (Patriarchal) বৈদিক আর্যজাতির মৌল ধর্মগ্রন্থে দেবতার স্ত্রীমূর্তি পরিকল্পনা স্বভাব-বিরোধী। এদিক্ থেকে স্ত্রীদেবতা, তথা শক্তি-সাধনার সাধারণ ঐতিহ্য মাতা-প্রধান (Matriarchal) আর্যেতর সমাজের মৌল পরিকল্পনা বলেই গৃহীত হয়ে থাকে। এ-বিষয়ে প্রাথমিক প্রচেষ্টার গৌরব প্রধানতঃ তন্ত্র শাস্ত্রেরই প্রাপ্য। তন্ত্রের উৎস বিষয়ে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেছেন—"দ্রাবিড়াদি বিভিন্ন অনার্য জাতির মধ্যে তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীন কালেই ভারত এবং তৎসমীপবর্তী দেশে প্রচলিত ছিল। মনে হয়, তাহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় আর্যগণ উহা গ্রহণ করিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন।"[১] ভারতের আর্যপূর্ব যুগের ধর্ম-সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রামাণ্য পরিচয় বিনষ্ট হয়েছে; তাই তান্ত্রিক শক্তি-সাধনার প্রাচীনতম বিশুদ্ধ রূপটি হয়েছে আজ অপ্রাপ্য। বেদে, সংহিতায়, আরণ্যকে সেই শাক্ত ঐতিহ্যের আর্যকুল-পরিগৃহীত রূপটির আভাস-সংকেতই নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে বলে মনে হয়।

শক্তি সাধনার উৎস

১। তন্ত্রকথা।

আগেই বলেছি, শক্তি-সাধনা, তথা স্ত্রী-দেবতার আরাধনা-মাত্রই পুরুষ-প্রধান আর্যজাতির মৌল সমাজ-চেতনারই পরিপন্থী। কিন্তু, ভারতে প্রবেশ করে এখানকার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম-সংস্কৃতি ও জীবনাচারের প্রভাবে বৈদিক আর্যরাও শক্তি-সাধনার ধারাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই কারণেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের বেদ-সংহিতাদিতেই শক্তি-সাধনার প্রকটতম উল্লেখ লক্ষিত হয়। অথর্ব-বেদ-সংহিতা এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ্য। পৌরাণিক যুগে ঐতিহাসিক কারণেই যখন আর্যেতর মূল অধিবাসীদের সংগে আর্য-বৈদিক সমাজের ঘনিষ্টতা অপরিহার্য হয়েছে, তখন স্ত্রী-দেবতার মর্যাদা ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু শাস্ত্রাচারে ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব লাভ করে। পুরাণে পুরুষ ও স্ত্রী-দেবতা প্রায় সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। শক্তিপুরাণগুলিতে বরং স্ত্রী-দেবতার প্রতিষ্ঠা সমধিক। এদিক্ থেকে আর্যেতর তন্ত্র-সাধনার ঐতিহ্য আর্যসমাজের সাঙ্গীভূত হয়ে বেদে-পুরাণে আর্য-ব্রাহ্মণ্য শক্তিবাদের নবীনতর ধারার প্রবর্তন করেছে। বৌদ্ধ, জৈন এমন কি, বৈষ্ণবধর্মেও অনুরূপ তন্ত্রপ্রবর্তিত শক্তিবাদের স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। এর কারণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে ভারতের প্রাচীনতম জন-জীবনের মাতৃকা-সাধনার সাধারণ ঐতিহ্য পরবর্তী আর্য-ধর্মাবলীর সকল পর্যায়েই কোনো-না-কোনো উপায়ে অনুস্যূত হয়েছিল। কিন্তু, আর্য-পৌরাণিক শক্তিবাদ, অথবা বৌদ্ধ জৈন-বৈষ্ণবাদি তন্ত্রবাদের ধারাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকলেও মূল শক্তি-তন্ত্র-সাধনার পন্থা আজও নিজ অনন্যপর স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। শক্তিতন্ত্রবাদ আজ হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও পৌরাণিক শক্তিবাদ এবং তান্ত্রিক শক্তিবাদ হিন্দু শক্তি-সাধনার দুটি আমূল পৃথক্ ধারা। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য প্রথম শ্রেণীর শক্তি-চেতনা-প্রভাবিত সাহিত্য। রামপ্রসাদের সংগীত-সাহিত্যে শক্তি-শাস্ত্রাচার (Sakti-cult)-এর প্রভাব সর্বব্যাপক নয়। ধর্মচেতনার প্রেরণা যতটুকু এই সাহিত্যে আছে, তা, কিন্তু, একান্তভাবে শক্তিতন্ত্রাশ্রিত। এদিক্ থেকে ধর্ম প্রবুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামপ্রসাদের কবি-কীর্তি অনন্যতুল্য।

শক্তিবাদের দুটি রূপ

বঙ্গাঞ্চলে পৌরাণিক শক্তিবাদের প্রভাব এ-দেশে ব্রাহ্মণ্য-আর্য চেতনার অনুপ্রবেশের কাল থেকেই অনুমিত হতে পারে। তুর্কী আক্রমণোত্তর

সামাজিক সমন্বয়ের যুগে বাংলার অনভিজাত আদিম-সমাজের লোক-দেবতারাও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফলে, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবতার সংগে বাংলার লোক দেবতা মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, সুবচনী এবং আরো অনেকে পৌরাণিক শক্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। এই সকল দেবতাদের নিয়ে মধ্যযুগের প্রথমাবধিই মঙ্গলকাব্য-শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ঐ সকল কাহিনী-কাব্যে ভাবাকৃতির প্রাচুর্য থাক্‌লেও শক্তিমত্তা, তথা শৌর্যের একটি দৃপ্ত রূপানুভূতিই প্রধানতঃ প্রকটিত হয়েছে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মনে করা হয়,—বৈষ্ণব-পদাবলীর হৃদয়ানুভূতি-ঘন রসধারায় পরিস্রুত হয়ে মঙ্গলকাব্যের এই বলদৃপ্ত শক্তি-সাধনার ঐতিহ্যই কালে কালে ভাবাশ্রুপ্লুত রামপ্রসাদী সংগীতে বিগলিত হয়েছে। এই তথ্যের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হিসেবে ডঃ সুশীলকুমার দে লিখেছেন :—"Not only does he (Ramprasad) imitate in places the Characteristic diction and imagery of Baiṣṇab Padābalis but he deliberately describes the Gosṭha, Rās, Milan of Bhagabati in imitation of the Bṛndāban Lila of Srikṛṣṇa.[২]।" আর, এই কারণেই হয়ত বাংলা দেশে যথেচ্ছ আহৃত শক্তি-বিষয়ক সংগীত মাত্রকেই একত্র-বদ্ধ করে 'বৈষ্ণব পদাবলী'র আদর্শে 'শাক্ত পদাবলী' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, রামপ্রসাদী সংগীত-প্রবাহের মধ্যে বৈষ্ণব পদ-সংগীতের পূর্বৈতিহ্যগত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের ছাপ রয়েছে। এদিক থেকে রামপ্রসাদ তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে স্বীকার এবং সাধারণভাবে ব্যবহার মাত্র করেছেন। তা ছাড়া, শক্তি-বিষয়ক সংগীতে বৈষ্ণব-পদাবলীর একান্ত অনুসৃতির সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার আগে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি অবধানতা প্রয়োজন :--

বঙ্গে পৌরাণিক শক্তিবাদ

১। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবানুরক্তি-প্রধান রাগাত্মিক সাধনার ঐতিহ্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন-রসে সঞ্জীবিত। মহাপ্রভুর আত্মগুপ্তির পরে ষোড়শ শতকের শেষ, সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বৃন্দাবনের গোস্বামি-ঐতিহ্যের মহিমায় সেই প্রেমময় জীবনস্রোত পুনরুদ্দীপ্ত হয়েছিল। ফলকথা, ষোড়শ

শক্তি-গীতি বনাম বৈষ্ণব-পদাবলী

২। History of Bengali Literature during the Ninteenth Century.

শতাব্দী ও সপ্তদশ শতকের স্বল্পকাল বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাণ-প্রদীপ্তির স্বর্ণযুগ। ঐ একই সময়ে পৌরাণিক স্মার্ত সম্প্রদায়ভুক্ত দ্বিজমাধব-মুকুন্দরাম পৌরাণিক শক্তি মঙ্গলচণ্ডীকে নিয়ে যুগশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। আর, মঙ্গল-কাব্যের এই শ্রেষ্ঠ দুই কবি প্রত্যক্ষভাবে চলমান চৈতন্যানুরক্তির প্রবাহে আমূল অবগাহন করেছিলেন। তবু, চৈতন্য-চেতনতার এই পরম ভাব-পরিস্রুতিও শাক্ত-সাহিত্যে গীতিপ্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে নি কেন? শক্তি-বিষয়ক সংগীতে বৈষ্ণব-পদাবলীর একান্ত অনুসৃতি-বাদের সমর্থকদের এ জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে হবে।

২। অষ্টাদশ শতক বাঙালির জীবন-চেতনার সর্বাত্মক অবক্ষয়ের যুগ। চৈতন্য-চেতনা এবং বৈষ্ণব-প্রেমানুরক্তির সাধনাও ঐ সময়ে দেহ-সাধক সহজিয়াদের ইন্দ্রিয়-চারণের মধ্যে চরম বিপর্যস্ত হয়েছে। মূল বৈষ্ণব সাহিত্যের এই মহাবিনষ্টির যুগে তা শক্তি-বিষয়ক সংগীতের জীবন-রস-নিঃস্যন্দী নবীন ভাব-স্রোতকে প্রভাবিত,—উৎসারিত করতে পেরেছিল,—এ-কথা মেনে নেব কী করে? ইতিহাসের জগতে কোন ঘটনাই কাকতালীয়বৎ হঠাৎ সংঘটিত হয় না; সকল ঐতিহাসিক ঘটনার পেছনেই রয়েছে জীবন-মূলোদ্ভূত কার্য-কারণ-বদ্ধতার সহজ সম্পর্ক; এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে ত আজ আর উপেক্ষা করবার উপায় নেই।

৩। তৃতীয়তঃ পরবর্তী আলোচনায় দেখ্‌ব, রামপ্রসাদী সংগীতের সব কয়টিতেই অপরিহার্য শক্তিবাদ ও শাক্ত দর্শনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবলেপ ঘটে নি। কিন্তু যে-সকল সংগীতে শক্তি-চেতনা অনুস্যূত হয়ে আছে,—তার প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অবিমিশ্র শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মাচরণের স্পষ্ট, অনন্যনির্ভর পরিচয়-প্রতিপত্তি। আগেই বলেছি, হিন্দু পৌরাণিক অথবা, বৌদ্ধ-জৈন-বৈষ্ণবাদি সমাজের শক্তি-চেতনা তান্ত্রিক শক্তিবাদের দ্বারা বিচিত্র ও বিভিন্ন পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু, শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মাচরণ কি জ্ঞানকাণ্ড, কি কর্মকাণ্ড;—কি দর্শন,—কি ক্রিয়াপদ্ধতি উভয়তঃই অনন্য-নির্ভর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে আবহমান কাল। এদিক্ থেকে বাংলা মঙ্গলসাহিত্যে প্রকটিত পৌরাণিক শক্তিবাদকে তান্ত্রিক শাক্তধর্মের একটি আংশিক অভিব্যক্তি বলে স্বীকার যদি করেও নিই, তবু রামপ্রসাদী গীতে অভিব্যক্ত বিশুদ্ধ তান্ত্রিকতার আদর্শকে কিছুতেই মঙ্গলকাব্যিক শক্তিবাদের

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি বলে স্বীকার করে নেওয়া চলে না। 'অংশ' কখনো 'পূর্ণে'র সমতুল হতে পারে না,—এই জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ অনুসারেই এ-কথা সত্য। আমাদের বক্তব্য, মঙ্গলকাব্যিক শক্তি-cult এবং রামপ্রসাদী-গীতির শক্তি-cult একই ধারার ক্রমপরিণতি নয়; দুই পৃথক্ cult-এর স্বতন্ত্র সাহিত্যিক অভিব্যক্তি।

রামপ্রসাদী গীতের ঐতিহাসিক শিল্প-স্বভাব

ওপরের যুক্তি-কয়টি আংশিকভাবেও গ্রহণ-যোগ্য হলে বোঝা যাবে, রামপ্রসাদী সংগীতের সুপ্রচলিত উৎস-বিচারের মাধ্যমে এই শ্রেণীর সাহিত্যের ঐতিহ্য-পরিচয়, তথা সার্থক ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয় সম্ভব নয়। বৈষ্ণব পদাবলী-প্রভাবিত ভক্তি-ধর্মী রাগাত্মিক ভাবপ্রবণতার একটি নব-রূপ মাত্রই রামপ্রসাদের সংগীত নয়: অষ্টাদশ শতকের সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্রেণীর শিল্প-কর্মের এক নূতন মূল্য উদ্ভাসিত হতে পারে।

'যুগান্তরের পথে'র মূল্যাবধারণ করতে গিয়ে বলেছি, আলোচ্য যুগে দেববাদ-নির্ভর-মানবতাবোধের মধ্যযুগীয় আদর্শ ক্রমেই শিথিল হয়েছে;—সেই সংগে বিচ্ছিন্ন-বিস্রস্ত হয়েছে মধ্যযুগের সমাজ-মানসের গোষ্ঠি-সংবদ্ধ জীবন-মূল্যবোধ। গোষ্ঠি-জীবনের এই বিনষ্টির পথ বেয়েই একদিন অষ্টাদশ শতকের বাঙালি জীবনে দেখা দিয়েছে একান্ত-অন্ধ ব্যক্তি-সর্বস্বতা। আবার,

সমাজ-ইতিহাস

এই ব্যক্তি-সর্বস্বতা যতই সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়েছে, ততই ব্যক্তিত্ব (Personality) এবং স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব (Individuality)-এর সম্ভাবনা-মুখে ক্রম অংকুরিত হয়ে উঠেছে আধুনিক বাঙালি জীবন-স্বভাবের অনাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণ। পরবর্তী অধ্যায়ে রামপ্রসাদ-সমকালীন কবি ভারতচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে লক্ষ্য করব সমাজ-বিবিক্ত একান্ত ব্যক্তি-সর্বস্ব আত্মপারতন্ত্র্যের স্বভাব-ধর্ম। ঐ আত্মপারতন্ত্র্যের ঐতিহাসিক বিবর্তন-পথ বেয়েই বাংলা সাহিত্যে ক্রমশঃ আত্মসচেতনা, ব্যক্তিত্ববোধ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি ক্রম-বিকশিত হয়েছে। এই অর্থেই ভারতচন্দ্র অনাধুনিক যুগে জাত ও বর্ধিত হয়ে আধুনিক যুগের সংগে পরোক্ষ ভাব-সেতুর সংযোগ রচনা করেছেন। এখানে তাঁর প্রতিভা 'যুগান্তর-পথে'র ঐতিহাসিক লক্ষণ-চিহ্নিত।

রামপ্রসাদের কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যেও 'যুগান্তর পথে'র আরো একটি সুস্থতর

লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়েছে। রামপ্রসাদের জীবন ভারতচন্দ্রের মত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না; বরং জন্মগ্রামের মমতাতুর সান্নিধ্যে তাঁর আজীবন অতিবাহিত হয়েছিল বলে, তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব ছিল আমূল সমাজ-প্রোথিত।

রামপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব

অন্যদিকে যুগ-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই রামপ্রসাদের আত্ম-পরতন্ত্রতা না থাকলেও ছিল গভীর মন্ময় আত্মলীনতা। রামপ্রসাদের সমাজ-অভিমুখী সহৃদয় শিল্পি-মানস সমকালীন বাঙালি জীবনের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির সকল খাতে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনায়াস-সঞ্চরণ করে ফিরেছে। অন্যদিকে, তাঁর স্পর্শ-কাতর আত্মলীন ব্যক্তি-স্বভাব সমকালীন জীবন-প্রবাহের দিকে দিকে অবক্ষয়-বিনষ্টির পরিচয় প্রত্যক্ষ করে হয়েছে মর্ম-পীড়িত। রামপ্রসাদের গীতি-কবি-কর্ম মাত্রই বিস্রস্ত সমাজ-ব্যবস্থায় মর্মপীড়িত কবি-ব্যক্তিত্বের মন্ময় আর্তি-প্রসূত।

এদিক্ থেকে শক্তি-সাধনার সংগে তথাকথিত রামপ্রসাদী শাক্ত-সংগীতের সাহিত্যিক অংশের সংযোগ প্রাসঙ্গিক এবং পরোক্ষমাত্র। রামপ্রসাদের কবিত্বের উৎস তাঁর সমাজ-প্রিয় আত্মলীন ব্যক্তিত্ব; আর, অন্যদিকে তাঁর সেই ব্যক্তিত্বই ছিল তান্ত্রিক শক্তি সাধনায় পূর্ণ-সিদ্ধ। ফলে, ব্যক্তি জীবনের ধর্ম-বিশ্বাস ও সিদ্ধি তাঁর কাব্যিক অনুভূতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিমিশ্র পরিমাণে

রামপ্রসাদী গানের সাহিত্যগুণ ধর্ম নিরপেক্ষ

সংলগ্ন হয়েছে। রামপ্রসাদের শক্তি-গীতি এদিক্ থেকে একাধারে তাঁর সমাজ প্রীতি, ধর্মীয় সিদ্ধি ও কাব্যিক মন্ময় উপলব্ধির ত্রিবেণী সংগম। আর এই কারণেই, অর্থাৎ, এই তিনটি প্রবাহের প্রতিটি স্তর পৃথক্‌ভাবে স্পর্শকাতর ব্যক্তিত্বের মর্মোৎসারিত বলেই রামপ্রসাদী সংগীত আবেগপুষ্ট গীতিমুখর। বৈষ্ণব পদাবলী গোষ্ঠিগত প্রেম-বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। তাই, এই পদ-সাহিত্যে ধর্ম ও মর্মানুরাগ সমসূত্রে বিধৃত; একে অন্য থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু, শাক্ত সংগীতের মর্মোৎসারিতা ধর্ম-নিরপেক্ষ; ব্যক্তি-চিত্ত-প্রবাহে সমাকুল। এখানেই এই দুই শ্রেণীর ধর্মনির্ভর গীতি সাহিত্যের ঐতিহাসিক পার্থক্য-মূল।

আমাদের পূর্ব-সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এই বক্তব্য হঠাৎ বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু উদ্ধৃতি-প্রমাণ সহযোগে এই আকস্মিকতা বোধের গ্রন্থিমোচন করা অসম্ভব নয়। প্রথমেই উল্লেখ করব আগমনী বিজয়া সংগীতের। এই

রামপ্রসাদের সাহিত্যে সমাজ বনাম ব্যক্তি

শ্রেণীর গীতি-কবিতাবলী অন্তর্নিহিত ভাব-স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে কিছুতেই শাক্ত-সাহিত্যের মর্যাদা দাবি করতে পারে না। সত্য বটে, ঐ কবিতাবলীর বাহ্যবিষয়ে দেবী পার্বতীর প্রতি পর্বত-বধূ জননী-মেনকার বাৎসল্যের কারুণ্য-ই প্রধান হয়ে আছে। আর, পণ্ডিতেরা 'উমা' শব্দের যে উদ্ভব-তাৎপর্য-ই নির্দেশ করুন না কেন, আলোচ্য প্রসঙ্গে এই পার্বতী উমা বা দুর্গা পৌরাণিক শক্তির-ই এক বিশেষ রূপ। কিন্তু, আগেই বলেছি, কেবল ঐ পৌরাণিক শক্তির নাম-মাত্র ব্যবহারের জন্যই আলোচ্য সাহিত্য-সংগীত শাক্ত-সাহিত্যের মর্যাদা দাবি করতে পারে না। পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক শক্তিবাদের জ্ঞান অথবা কর্ম-কাণ্ডগত কোন প্রত্যক্ষ সচেতনাই নেই ঐসব কবিতাবলীর পেছনে। ধীর-ভাবে অনুধাবন করলে দেখ্‌ব, ঐ কবিতা-সংগীতাবলীর উৎস কোন ধর্ম-প্রেরণা নয়; বরং এক বিশেষ ধর্মগত জাতীয় অনুষ্ঠানের সামাজিক ফলশ্রুতিই এই সাহিত্যকে জন্ম দিয়েছে। দুর্গোৎসব বাঙালির ধর্মোৎসব-ই নয় কেবল,—আবহমান কাল থেকে প্রচলিত নিখিলবাংলার শ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসবও। শারদীয় দুর্গোৎসবের এই সামাজিক প্রেরণাই রামপ্রসাদের সমাজ-প্রিয় মন্ময় কবি-মানসে সামাজিক বেদনার যে আর্তি রচনা করেছিল, তারই কাব্য-ফল 'আগমনী-বিজয়া' সংগীত। বাংলা সাহিত্যের ভক্ত-ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশ চন্দ্রও আলোচ্য সংগীতাবলীর এই সামাজিক আবেদনের অনন্যতুল্য শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন। সমকালীন বাল্য-বিবাহ-পীড়িত সমাজ-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি লক্ষ্য করে ডঃ সেন লিখেছেন,—"বাংলার কুটীরের বালিকা-দুহিতাদের স্বামিগৃহে যাওয়ার পর মাতৃ-হৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদি-গঙ্গা, হরিদ্বার এই প্রসাদ-সংগীত। আশ্বিন মাসের ঝরা শিউলিফুলের মত এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা-বধূদের চক্ষুজল দিনরাত্রি ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রু-রচিত হার,—উহা তৎকালিক বঙ্গ-জীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ-রসে পুষ্ট।"[৩] বিদগ্ধ সাহিত্য-ইতিহাস-রসিকের এই সিদ্ধান্ত কোন মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না; তাঁর উক্তির পরিপোষণের জন্য কেবল একটিমাত্র রামপ্রসাদী আগমনী গানের উদ্ধার করছি:—

৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

"ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ, চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া,
এসো, না, সংগে আমার গো॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়ে শুধি ধার গো॥
রাণী ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুণ্ডল ভার।
নিকটে দেখে যারে, শুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার।
বলে, মা এলে, মা এলে, মা কি ভুলে ছিলে;
মা বলে এ-কি কথা মার গো॥"

রাম-প্রসাদের অন্যান্য বিষয়ক শক্তি-গীতিতেও এই সামাজিক হৃদয়াবেদনের প্রাবল্য দুর্লক্ষ্য নয়:—

"বল্ মা, আমি দাঁড়াই কোথা,
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে-বাপ বিমাতাকে ধরে শিরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা?
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,
দূরে যাবে মনের ব্যথা॥
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা—
ওমা, যে জন তোমার নাম করে
তার কপালে ঝুলি কাঁথা॥"

এই কবিতার মধ্যেও "বেদাগমের" উল্লেখ-মাত্র থাক্‌লেও, কোন শাক্ত-বিশ্বাস-দর্শনের ভাব-পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে নি। বরং, সমাকালীন বাংলার কুলীন-সমাজে বহু বিবাহজনিত দুরাচরণের সামাজিক বিষফল-ই কাব্যিক মহিমা অর্জন করেছে রামপ্রসাদের সমাজপ্রিয় স্পর্শকাতর ব্যক্তি-মনের সংস্পর্শে। রামপ্রসাদ নিজেও ছিলেন বিমাতার ঘরের সন্তান; এই কবিতায় বর্ণিত অভিজ্ঞতার সংগে তাঁর নিজের ব্যক্তি-জীবন-বেদনাও কি পরিমাণে জড়িয়েছিল, সে-কথা আজ কে বল্‌বে?

আর একটি গানের উল্লেখ করি :—

"মাগো তারা, ও শঙ্করী,
কোন্ বিচারে আমার 'পরে কর্‌লে দুখের ডিক্রী জারি?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি তারে দিলে জমিদারী॥
হুজুরে উকিল যে জনা, ডিস্‌মিশে তার আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যে রূপেতে আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী॥"

এই কবিতায় গতানুগতিক ভাবে হলেও ধর্মগত-আদর্শ চেতনার প্রতি অবধানতা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু তা হলেও, কৃষ্ণ পান্তির মত অযোগ্য জনের জমিদারী লাভ-জনিত অর্থনৈতিক অসংগতির বিরুদ্ধে কবি মানসের অভিযোগ-পূর্ণ আর্তিও অস্পষ্ট নয়,—বরং ঐটুকুই কবিতাটির শিল্পমূল্যে নিহিত জীবনাবেদন রচনা করেছে।

রামপ্রসাদ কবিতাবলীর অন্তর্বর্তী শাক্ত-প্রেরণা যেটুকু আছে, তাকে অস্বীকার করবার কোন দুরভিসন্ধি আমাদের নেই। কিন্তু, ঐটুকুই রামপ্রসাদী সাহিত্য-সংগীতের প্রধান উপজীব্য যে নয়, এই তথ্যটুকুই ইতিহাসের পক্ষ থেকে উপস্থিত করা প্রয়োজন। ধর্মচেতনার দিক্ থেকে লক্ষ্য করলে দেখ্‌ব,—তান্ত্রিক শক্তিবাদ প্রধানতঃ আচরণীয় ধর্ম। গৌড়ীয়

বৈষ্ণব ধর্ম-চেতনার মত স্বভাবতঃ তা নিষ্ঠামূলক নয়। সন্দেহ নেই, এই ধর্মশাস্ত্রের একটি দার্শনিক জ্ঞানকাণ্ডাত্মক দিক্ রয়েছে। কিন্তু সব-কিছুকে ছাপিয়ে আছে তন্ত্র-সাধনার আচার-অনুষ্ঠান-মূলক কর্মকাণ্ড। ফলে, এই ধর্মচেতনাকে নিয়ে ভাবমূলক কাব্য-রচনার প্রেরণা সহজাত ছিল না; ধর্মের চেয়ে কর্মানুষ্ঠানের প্রেরণাই যে এতে বেশি। হিন্দুর প্রায় সকল প্রকার ধর্মাদর্শের মধ্যেই জ্ঞান ও কর্মের সংযোগ-সূত্র হিসেবে ভাবানুভূতি (ভক্তি)র অস্তিত্ব পরিকল্পনা করা হয়েছে। শাক্ত তান্ত্রিকতার মূলেও সেই ভাব প্রেরণা নিঃসন্দেহে বিদ্যমান। "যত্র জীবস্তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী"—ইত্যাদি ধরণের ভাব-মূল্যের বিঘোষণ তন্ত্র-সাহিত্যে অতি সুলভ। তাছাড়া, ডঃ সুশীল কুমার দে-ও স্বীকার করেছেন, "The Tantras no doubt, inculcate the worship of the diety under the image of the mother; but no votary of the cult before Ramprasad realised the exceedingly poetic possibilities of this form of adoration."[৪]

শক্তি বিষয়ক গানে তান্ত্রিক শক্তিবাদ

এর জন্য, আগেই বলেছি, দায়ি ছিল শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মের 'ক্রিয়াকাণ্ড'-সর্বস্বতা। শাক্ত সাধকেরা তন্ত্রসাধনায় কর্মাচরণের 'পরে কেবল জোরই দেন নি, একটি গোষ্ঠি-জীবন-সীমায় তাকে একান্ত গোপনীয় করে রাখ্তে চেয়েছেন। তান্ত্রিক ধর্ম-বিদ্যা "গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন জ্ঞেয়ং শাস্ত্রকোটিভিঃ।" শুধু তাই নয়; "ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব।" এমন কি, তান্ত্রিক শক্তি সাধনার গোষ্ঠিগত নির্দেশ অনুসারে "কুলপুস্তকানি চ গোপয়েৎ।" একদিকে ভাব-বিমুখ আচার-সর্বস্বতা, অপরদিকে আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রসারে সহজ বৈরূপ্য হেতু তান্ত্রিক শক্তি-ধর্মকে নিয়ে সার্থক সাহিত্য রচনা সম্ভব ছিল না। এ-বিষয়ে গ্রন্থাদি যা-কিছু রচিত হয়েছে, এ-দেশের সকল প্রাচীন গুপ্ত ধর্ম-বিদ্যা গ্রন্থের মতই তার সব কয়টিই গুহ্য সাংকেতিক ভাষাকে আশ্রয় করেছে; তাছাড়া, আগম-নিগম-তন্ত্রাদির ঐ বৃহৎ গ্রন্থরাজ্যে ভাব-বিহীন শুষ্ক কর্মানুষ্ঠানের প্রেরণাহেতু সাহিত্যিক সম্ভাবনা সহজে বিলুপ্ত হয়েছে।

৪। History of Bengali Lit. during the 19th century.

এমন অবস্থায় রামপ্রসাদ ঐ শক্তিমন্ত্রের সাধক হয়েও এমন ভাব-তদ্গত গীতি-সাহিত্য রচনা করেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়। আর, ঐ সকল সংগীতাবলীতে ক্রিয়াকাণ্ডাত্মকতার পরিবর্তে বাৎসল্য-রসের ভাব-নিবিড়তা প্রত্যক্ষ করে সহজেই মনে হয়েছে, এই সাহিত্য-কর্মে বৈষ্ণব রাগাত্মিক মর্মানুসারী ধর্মসাধনার ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে বুঝি। কিন্তু, লক্ষ্য করলেই দেখ্‌ব, শাক্তসাহিত্যের রচনায় রামপ্রসাদ তান্ত্রিক শক্তিসাধকের দায়িত্ব ও পূর্বৈতিহ্যকে বিস্মৃত হন নি :—

"ভবের আসা খেল্‌ব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো॥
প'বার, আঠারো; ষোল যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হল॥
ছ-দুই আট, ছ-চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হল॥
হদ্দ হলো চোদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া।
রামপ্রসাদের বুদ্ধি দোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো॥"

গীতটির মধ্যে পাশাখেলার একটি রূপ-চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু ক্রীড়াবিষয়ক ঐ সংকেতগুলো জান্‌লেও অ-সাধক জনের পক্ষে উদ্ধৃত কবিতার অর্থ-বোধ অসম্ভব। সাধকের কাছে প্রশ্ন করলে তন্ত্রের ভাষায় উত্তর মিলে :— "গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন জ্ঞেয়ং শাস্ত্রকোটিভিঃ।" তন্ত্রসাধনার এটি মূল কথা ; —আগম-নিগমাদি তন্ত্রগ্রন্থের অর্থাবধারণ সম্বন্ধেও এটি চরম কথা। বিশুদ্ধ সাহিত্যাদর্শের বিচারে এই কবিতাকে কিছুতেই কাব্য-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। আগম-নিগম অথবা যে-কোন তন্ত্রের যে-কোন শ্লোক কাব্য-পদবাচ্য না হলে, এটিও কাব্য নয়। রামপ্রসাদী সংগীত, এমন কি অন্যান্য তন্ত্র-সাধকদের রচনাতেও এই ধরণের গীতি-কবিতার সংখ্যা কম নয়। তাছাড়া, ধর্মাত্মক পরিমণ্ডল-বিশিষ্ট আরো কিছু সংখ্যক সংগীত রয়েছে, যাদের মধ্যে পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক শক্তিবাদের পরিচিততর বোধগম্য উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এ-সব কবিতাংশেরও অনেক কয়টিই সার্থক রসোত্তীর্ণতা দাবি করতে পারে না। রামপ্রসাদী সংগীত অথবা তাঁর অনুগামীদেরও যে-সব সংগীত-কবিতা উৎকৃষ্ট কাব্য-সমৃদ্ধি লাভ করতে

পেরেছে, তার অধিকাংশই সমকালীন সমাজ-মানসের প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে আছে। এদের মধ্যে কোন কোনটিতে শক্তি-cult এর বিশেষ ভাব-প্রভাব রয়েছে ; কোনটিতে তার প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু সব-কয়টিতে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে কবি-ব্যক্তির মন্ময় উপলব্ধি-জনিত সহজ হৃদয়ার্তি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গোষ্ঠি-জীবনাশ্রিত ধর্মভাবকে অবলম্বন করে ব্যক্তিমানসের মন্ময়তার প্রথম মুক্তিপথ উৎসারিত হয়েছিল রামপ্রসাদের সমাজ-প্রিয় কবি-ব্যক্তিত্বের আত্মলীন উপলব্ধির মধ্যে। এই অর্থে ইতিহাসের দৃষ্টিতে তিনি কেবল শক্তিবিষয়ক সংগীতেরই নন, বাংলা কাব্যে ব্যক্তিত্ব-স্পৃষ্ট গীতিকাব্য (Lyric)-প্রবাহেরও "আদিগঙ্গা হরিদ্বার।" বৈষ্ণব-কবিতায় ব্যক্তির হৃদয়ার্তি, তথা ব্যক্তি-চিত্তের সহজ অনুরক্তি গোষ্ঠিগত জীবন-মূল্যবোধের পরিভাষায় মণ্ডিত হয়ে অভিন্ন-হৃদয় সর্বজনীনতা লাভ করেছে। জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের পদাবলীতে কবির ব্যক্তি-স্বভাব "প্রেমের পরমসার" "মহাভাব"-সাধনার সাধারণ ঐতিহ্য মণ্ডিত হয়ে নিরবচ্ছিন্ন অভিন্নতা লাভ করেছে। আর, রামপ্রসাদী শক্তি-সংগীতে গোষ্ঠিগত জীবন-বাসনাকে ব্যক্তির হৃদয়ার্তি-পরিচ্ছিন্ন করে আত্মলীন (Subjective) কাব্য-কৃতির মুক্তিপথ হয়েছে উৎসারিত। এখানে ধর্মগত বিশেষ ভাব-চেতনার প্রকর্ষ অপরিহার্য নয়। এই কারণেই মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা বৈষ্ণব-কবিতা নয় কিছুতেই ; কিন্তু তাঁর নিম্নোক্ত পদটি সার্থক বিজয়া সংগীত :—

শক্তি-গীতির ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

"যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে' তারা দলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি ; কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুণ্ডলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?
তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার শুনিতেছি বাণী
মিষ্টতম এ-সৃষ্টিতে, এ কর্ণ-কুহরে।

দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি,—কহিলা কাতরে,—
নবমীর নিশাশেষে গিরিশের রাণী।”

আধুনিক কালের বাংলা কবিতার শিল্প-স্বভাব আলোচনা করলে দেখ্‌ব, গোষ্ঠি-জীবনবোধ মুক্ত ব্যক্তি-মানসার্তিই এ কালের গীতকবিতা (Lyric)র সাধারণ স্বভাব। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব-প্রধান প্রতিভার মধ্যেই এই কাব্য-স্বভাবের প্রথম সার্থক মুক্তি ঘটেছিল। “যুগান্তর পথের” কবি রামপ্রসাদ গোষ্ঠি-জীবনের সীমাকে অতিক্রম না করেও ব্যক্তি-চিত্তের উপলব্ধি-তন্ময়তাকে সার্থক মুক্তি দিয়েছেন, এই অর্থে মধুসূদনীয় কাব্য-স্বভাবের তিনি সার্থক পূর্বসূরী। আর, এই কারণেই রামপ্রসাদী কবিতায় শাক্ত-চেতনা গীতি-রূপায়নের নির্ঝর-উৎস, ‘যুগান্তরের পথে’র গোষ্ঠিচেতনামোক্ষণের সার্থক ঐতিহাসিক প্রেরণা। ধর্মাশ্রিত গীতি-কবিতা রচনার এই নবীন প্রয়াসে রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-পদাবলীর বহিরঙ্গ রূপাবয়বের উত্তরাধিকারকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু, ভাব-প্রেরণার দিক থেকে বৈষ্ণবপদ ও শক্তি-সংগীত স্বভাব-পৃথক্‌, এ-কথা স্মরণ রাখ্‌তে হবে।

বাংলা গীতিকবিতার (Lyric) ক্রমবিকাশে রামপ্রসাদ-প্রতিভার যুগ-সন্ধি-লক্ষণ-চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যের সুদীর্ঘ আলোচনার শেষে এবারে উদ্ধার করি কবির ব্যক্তি-পরিচিতি।

হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্য বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতার নাম ছিল রামরাম সেন। রামরামের দুই পত্নী ছিলেন; রামপ্রসাদ দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। কবির সহোদর ভাই ছিলেন একজন,—আর ছিলেন দুটি বোন। ভাই বিশ্বনাথ,—বোন দুটির নাম অম্বিকা ও ভবানী। নিধিরাম নামে কবির এক বৈমাত্রেয় ভাইও ছিলেন। রামপ্রসাদের দুটি পুত্রের নাম রামদুলাল ও রামমোহন। পরমেশ্বরী এবং জগদীশ্বরী নামে কবির দুটি কন্যা ছিল। এঁদের বংশের আদি পুরুষের নাম কৃত্তিবাস। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরকাব্যে কবির বংশ-পরিচিতি উদ্ধৃত আছে।

রামপ্রসাদের ব্যক্তি-পরিচয়

কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। ডঃ দীনেশ-চন্দ্রের অনুমান,—১৭১৮—১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন-সময়ে ইনি জন্মগ্রহণ

করেন। সিদ্ধি-কামী কবি স্বগ্রামে তান্ত্রিক সাধনায় কায়মনোবাক্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁর আরাধনার ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং দেবী-কালিকা কন্যা-রূপে কবির ঘরের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন,—এরূপ লোক-প্রসিদ্ধি আছে। রামপ্রসাদের সাধনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে আরো বহু প্রবাদ রয়েছে। তার মধ্যে একটি থেকে জানা যায়,—কবি কোন সেরেস্তায় কাজ করতে গিয়ে হিসাবের খাতায় শ্যামা-সংগীত রচনা করতে থাকেন। এবং হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে যান। ঐ খাতারই সংগীতাবলীর মধ্যে নাকি রামপ্রসাদের বিখ্যাত সংগীতটিও ছিল,—

"আমায় দে মা তবিলদারী,—
আমি নিমক-হারাম নই' শঙ্করী ॥"……ইত্যাদি।—

এই সংগীতাবলী পড়ে বিমুগ্ধ জমিদার ৩০৲ মাসোহারার ব্যবস্থা করে কবিকে স্ব-গৃহে প্রেরণ করেন। রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় নামক অপর একটি জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই যে কবি কালী-কীর্তন রচনা করেছিলেন,—এ কথা তিনি স্বয়ং উল্লেখ করে গেছেন। তাছাড়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট থেকে কবি একশ' বিঘা জমি এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেন।

রামপ্রসাদ-রচিত কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরকাব্যের পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত হবে। এবারে শাক্ত-কবিতায় তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরীদের কবি-কৃতির উল্লেখ করেই প্রসঙ্গ শেষ করব।

এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কবি হচ্ছেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। কাল্‌নার অম্বিকানগর গ্রামে কবির মূল নিবাস ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কমলাকান্ত কোটালহাটে বাস-পরিবর্তন করেন। ইনি বর্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের গুরু এবং সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাব্যে শ্যামা-চরণ-লাভের আর্তি, এবং বিশেষভাবে মানব-ধর্মী হৃদয়াবেগের পরিচয় নিবিড়। এদিক থেকে কমলাকান্ত রামপ্রসাদের সার্থক পদাঙ্কবাহী।

কমলাকান্ত

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ অচেতনে কত ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে,
আধ আধ 'মা' বলিয়ে বিধু-বদনে ॥"

এই একটি পদাংশ থেকেই কমলাকান্তের আগমনী-সংগীতের মানবিক-রস-নিবিড়তা অনুভূত হতে পারবে। বস্তুতঃ, অজস্র সৃষ্টি ধারার মধ্য দিয়ে কমলাকান্তই আগমনী গানকে একটা সম্পূর্ণ রস-পরিণাম দান করেছিলেন। কমলাকান্তের শ্যামাসংগীতে লোক-প্রিয় তত্ত্ব-কথার সংগে জন-হৃদয়ানুকূল ভক্তি-নিবিড়তার পরিচয় সুস্পষ্ট,—

"জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ' ভব-যাতনা সয় ॥'
যেরূপে যেজনা করয়ে ভাবনা, সেরূপে তার মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে, কমল মাঝারে করে উদয় ॥"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শ্যামাসংগীতের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং স্বয়ং এ বিষয়ে পদরচনা করে গেছেন। পরবর্তীকালে রাজকুমার-দ্বয় শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র এবং রাজপরিবার-ভুক্ত অপরাপর অনেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর পদ রচনা করেন। মহারাজ মহ্‌তাব-চাঁদও একাধিক শাক্ত-সংগীত লিখেছিলেন,—শুধু তাই নয়, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কমলাকান্তের স্বহস্ত-লিখিত পুথিখানির মুদ্রণ-ব্যবস্থা করে বাংলাসাহিত্য-ইতিহাসের বিশেষ সেবা তিনি করে গেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ও পরিবার

মহারাজ নন্দকুমার রায় কালী-সংগীত রচনা করতেন। তাছাড়া, বর্ধমান-রাজের দেওয়ান নন্দকিশোরের ভণিতায়ও শক্তি-গীতি পাওয়া গেছে। নন্দকিশোরের অন্যতম ভ্রাতা রঘুনাথ-দেওয়ানও (১৭৫০ খ্রীঃ—১৮৩৬ খ্রীঃ) শক্তি-গীতি রচনা করেছিলেন। রঘুনাথের লেখা কৃষ্ণলীলা-গীতের পরিচয়ও পাওয়া গেছে।

মহারাজ নন্দকুমার

এই সকল সাধক-ভক্ত পদকর্তৃগণের কথা ছেড়ে দিলেও নিছক গীতিকার হিসাবে আরো কয়েকজন কবি স্মরণ-যোগ্য। শক্তি-গীতি-কার অপেক্ষা 'কবিওয়ালা', পাঁচালীকার, তর্জা-টপ্পাদির শিল্পী রূপেই এঁদের সমধিক খ্যাতি। কিন্তু, ঐ সকল বিশেষ ধরণের সৃজনী-প্রচেষ্টার আকার রূপে

শক্তি-লীলা যখন অবলম্বিত হয়েছে,—তখনই অন্য-নিরপেক্ষ একটা শক্তি-গীতিমূল্যও যে এরা অর্জন করেছিল, তারই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি-স্বরূপ এঁদের দুয়েক জনের পরিচয় উদ্ধার করি।

বিখ্যাত কবি-ওয়ালা রামবসু (১৭৮৬ খ্রীঃ—১৮২৮ খ্রীঃ) বৈষ্ণব এবং শাক্ত-সংগীত,—উভয়ই রচনা করেন। রামবসু এবং অনুরূপ অন্যান্য কবি-ওয়ালাগণের রচিত পদসমূহে অন্ত্যানুপ্রাস-প্রাচুর্য, শব্দালংকার-সমৃদ্ধি,—চটকদার বাগ্‌জাল বিস্তার,—ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়,—

রাম বসু

"গত নিশি যোগে আমি হে দেখেছি সুস্বপন।
এল হে সেই আমার তারাধন।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে,—মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।
অমনি দুবাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি, আমি নই।
ও হে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয়।
উঠ 'দুর্গা দুর্গা' বলে, দুর্গা কর কোলে
মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয়।
কন্যা-পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায় তুচ্ছ করা নয়॥" ইত্যাদি।

বিখ্যাত পাঁচালীকাব্য-রচয়িতা দাশুরায় বা দাশরথি রায় (১৮০৪-১৮৫৭ খ্রীঃ) শাক্তপদ রচনা করেন। দাশরথি শাব্দিক কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যদি না-ও হন, তবু অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বিখ্যাত 'আগমনী' গানের অংশবিশেষ উদ্ধার করলেই দাশরথির প্রতিভা-পরিচয় স্পষ্ট হবে :—

দাশুরায়

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে।
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকাল॥
কহিছে শিখরী, কি করি অচল।
নাহি চলাচল, হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥"

লক্ষ্য করা উচিত,—শব্দ এবং অর্থালংকারের প্রাচুর্যের মধ্যেও বাঙালি-ধর্মী

ব্যক্তিগত হৃদয়ার্তিটুকু বিনষ্টপ্রাপ্ত হয় নি ;—কথার বর্ণাঢ্য চিত্রাবলীর মধ্যে কবির নিভৃত 'মনেরি বাসনা'টিও অকপটেই প্রকাশিত হয়েছে ;—

"মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী, কালী॥
হৃদয়মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন করবে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌ব জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥"......ইত্যাদি

শক্তি-বিষয়ক গীতি-কার কবিওয়ালাদের মধ্যে সর্বশেষে হলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য মৃজাহুসেন ও এণ্টুণী ফিরিঙ্গি। এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। এ-কালেও মুসলমানকবি নজরুল ইস্‌লাম শ্যামা-বিষয়ক কবিতা রচনায় উল্লেখ্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। শুধু সংখ্যায় নয়, পদমাধুর্যের বিচারেও শক্তি-বিষয়ক নজ্‌রুল-গীতি মনোমুগ্ধকর। স্বীকার করা উচিত,—এই রস-মাধুর্যের মূলে কোন বিশেষ বিশ্বাস-নিষ্ঠার প্রেরণা না থাকলেও এরা সার্থক হয়েছে কেবল গীতিকাব্যের হৃদয়ানুভূতির ঐকান্তিকতা (Subjective sincerity) প্রভাবে। আর আগেই বলেছি,—গোষ্ঠিগত নিষ্ঠা-বিশ্বাস-নিরপেক্ষ ব্যষ্টি-মূলক চিত্ত-বিক্রিয়াই শাক্ত-সংগীতের মূল প্রেরণা; মৃজাহুসেন এবং এণ্টুণী ফিরিঙ্গির প্রচেষ্টার মধ্যে সেই প্রাথমিক পর্যায়েই এই ঐতিহাসিক তথ্য-পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল,—এইখানেই এদের স্বীকৃতির অপরিহার্যতা।

মৃজাহুসেন ও এণ্টুণী-ফিরিঙ্গি ইত্যাদি

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

কালিকামঙ্গল অথবা বিদ্যাসুন্দর কাব্য

পূর্ববর্তী বিচার উপলক্ষ্যেই উল্লেখ করেছি,—'কালিকামঙ্গল' নামে অভিহিত কাব্যপ্রবাহকে 'বাংলা মঙ্গলকাব্য'-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। কালিকামঙ্গলের দেবী কালিকা বিশেষ পারিভাষিক অর্থে 'মঙ্গল-দেবতা' নন,—পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত তান্ত্রিক কালিকাদেবীর সংগেও ইনি সর্বাংশে সমসূত্র-জ নন। 'কালিকামঙ্গল' বিশেষ-ভাবে বিদ্যা ও সুন্দরের রোমান্টিক লোক-জীবনাশ্রয়ী প্রেম-চাতুর্য-গাথা। কেবলমাত্র বাংলাদেশেই এই অবিমিশ্র মানবিক প্রেম-কাহিনী দেবী কালিকার কৃপাবরণের অন্তরালবর্তী হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, এখানেও জীর্ণ আবরণজাল-অপসারণে কোন অসুবিধা হয় না। তাই, পূর্ববর্তী আলোচনা-অংশে উল্লেখ করেছি,—এই শ্রেণীর কাব্য-প্রবাহকে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য নামে অভিহিত করাই অন্ততঃ ঐতিহাসিক বিচারে সংগত-তর। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের গল্পাংশের অনুধাবন করলেই যুক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে।

'কালিকামঙ্গল নয়,— 'বিদ্যাসুন্দর'

একদা গভীর রজনীতে অপূর্ব রূপ-গুণান্বিত রাজকুমার 'সুন্দর' কালিকার আরাধনায় দেবীর সন্তুষ্টি বিধান করে অতুলনীয়া সুন্দরী-বিদুষী রাজকন্যা বিদ্যার পাণি-লাভের বর-প্রাপ্ত হন। তপঃসিদ্ধ সুন্দর দেবী-প্রদত্ত শুকপক্ষী সহ গোপনে গৃহত্যাগ করেন এবং বিদ্যার পিতৃরাজ্যে উপনীত হন। রাজান্তঃপুরের পুষ্পব্যবসায়িনী বৃদ্ধা মালিনী সুন্দরের রূপগুণে স্নেহাসক্ত হয়ে তাকে আপন গৃহাশ্রয়ে আহ্বান করে। সুন্দর মালিনীকে মাসী-সম্বোধনে আপ্যায়িত করে তারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরদিন প্রাতে মালিনী যখন বিদ্যার ফুল যোগাতে যায়,—তখন সুন্দর একগাছি মনোমুগ্ধকর মালিকা রচনা করে তার মধ্যে রতি-কামদেবের পুষ্পচিত্রাংকণ পূর্বক, তার সংগে কৌশলে প্রণয়লিপি প্রেরণ করেন। সুন্দরের শিল্পবোধ ও পাণ্ডিত্যে চমৎকৃতা বিদ্যা তার প্রতি আকৃষ্টা হন,—বিদ্যার সাংকেতিক নির্দেশানুযায়ী সরোবর-স্নানকালে বিদ্যা-সুন্দরের সাক্ষাৎ

কাহিনী

এবং সাংকেতিক ভাষায় প্রেম-বিনিময় ঘটে। নিভৃত রজনীতে বিদ্যার শয়ন-গৃহে উপনীত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুন্দর মালিনী-গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে,—তথাপি বিদ্যার গৃহে উপনীত হওয়ায় কোন নিরাপদ উপায় উদ্ভাবনে অক্ষম সুন্দর কালী-স্তোত্র আবৃত্তি করতে থাকেন। পরিতুষ্টা দেবী আবির্ভূতা হয়ে সুন্দরের শয্যাগৃহ থেকে বিদ্যার শয্যাগৃহাভ্যন্তর পর্যন্ত গোপন সুড়ঙ্গ-পথ গঠনের বর দান করেন। প্রতি রজনীতে সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিদ্যার শয়নগৃহে উপনীত হতে লাগ্‌লেন,—উভয়ের প্রেম-নিবিড়তার শেষে গোপন বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হল। আরও পরে বিদ্যার দেহে সন্তান-সম্ভাবনা-লক্ষণ প্রস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল। দাসীর নিকট এই সংবাদ শুনে রাণী কন্যাকে যৎপরোনাস্তি ভৎ‍র্সনা করলেন এবং স্বামীর নিকট এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করেন। ক্রুদ্ধ রাজা অবিলম্বে দুষ্কৃতকারীকে ধরে রাজ সভায় উপস্থিত করার আদেশ দিলেন,—নতু, নগরপালের মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত। কিন্তু সুন্দরকে ধরবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হতে লাগল। অবশেষে কোটাল বিদ্যার শয়নকক্ষের আগাগোড়া সিন্দূর-লিপ্ত করে রাখে। রাত্রিতে সুন্দর বিদ্যার গৃহে উপনীত হলে তার পরিচ্ছদে সিন্দূর লিপ্ত হল এবং রজক-গৃহে প্রদত্ত সেই পরিচ্ছদের সূত্র অবলম্বন করে কোটাল মালিনীর গৃহে সুন্দরের শয্যাকক্ষ, গোপন সুড়ঙ্গ সবকিছুই আবিষ্কার করল। রাজার বিচারে সুন্দরের শূল-দণ্ড হয়। মশানে সুন্দর কালিকার স্তবারাধনা করেন এবং দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে সুন্দরকে রক্ষা করেন। রাজা সুন্দরের পরিচয় জ্ঞাত হয়ে, বিদ্যাকে তার হস্তে সমর্পণ করে কন্যা-জামাতাকে বরণ করে নেন।

বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-কথার সংঘটয়িত্রী কালিকাদেবীর উল্লেখ বাংলাদেশের কাব্য-সমূহেরই বৈশিষ্ট্য; অন্যত্র এই বিষয়ের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় না। ডঃ সুকুমারসেনের ধারণা,—"বর্তমান সহস্রাব্দীর প্রারম্ভের তিন চারি শতাব্দী হইতে এই কাহিনীর দুটি বিভিন্নরূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল।"[১] এই কাহিনী দুটির প্রথমটিতে আছে দিগ্বিজয়োদ্দেশ্যে বহির্গত পণ্ডিত-কবি

কাহিনী-মূল

শিক্ষা-গুরুর প্রতি "কলাবিৎ রাজ-দুহিতা ছাত্রীর প্রণয় সঞ্চার।"[২] দ্বিতীয়টিতে আছে,—'চৌর' (<চতুর) "কবি-প্রণয়ীর সঙ্গে রাজ-বালা প্রণয়িনীর গোপন মিলন।"[৩] ডঃ সেন মনে

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)। ২। ঐ। ৩। ঐ।

করেন বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী দ্বিতীয়শ্রেণীর গল্পের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। পূর্বোক্ত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে বররুচি-কৃত সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরম্'কাব্য এবং কাশ্মীরী কবি বিল্‌হনের নামে প্রচলিত 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্যের প্রভাব যে রয়েছে, পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।[৪] বিল্‌হন সম্বন্ধে জনশ্রুতি রয়েছে—কাশ্মীরের এই জনপ্রিয় কবিটি গুজরাট্-রাজসভায় রাজকন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা-দানকালে গুরু-শিষ্যার মধ্যে প্রণয়াসক্তি ঘটে। রাজা এই সংবাদ অবগত হয়ে বিল্‌হনের মৃত্যুদণ্ড বিধান করেন। মৃত্যু সমীপবর্তী জেনে কবি অপূর্ব চতুরতাপূর্ণ ভাব-ভাষায় আপন দয়িতা রাজকন্যার রূপ-গুণ এবং তৎপ্রতি প্রণয়ানুভূতির বর্ণনামূলক পঞ্চাশটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। এই শ্লোক কয়টিই 'চৌর-পঞ্চাশৎ' নামে বিখ্যাত। কবি-বিল্‌হন সম্বন্ধীয় এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপিত না হলেও, 'চৌর-পঞ্চাশৎ' কাব্যের প্রভাব বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্য-কথার 'পরে স্পষ্টরূপেই পরিলক্ষিত হয়। বিল্‌হনের মতই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত সুন্দর বিদ্যার রূপ-গুণাত্মক পঞ্চাশটি চাতুর্যপূর্ণ শ্লোকে আপন প্রণয়েতিহাসের সংকেত জ্ঞাপন করেছিলেন। তা ছাড়া, বাংলা ভাষায় রচিত 'চৌরপঞ্চাশৎ'-কাব্যের সংখ্যাও কম নয়।

বররুচি

বিদ্যাসুন্দর কাব্য-প্রবাহের পথিকৃৎ কবি বররুচির সঠিক পরিচয় কিছু জানা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণরাম, বলরাম কবিশেখর, রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্রের বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্য-কয়খানির 'পরে বররুচির কাব্যের সুনিশ্চিত প্রভাব-আবিষ্কার কষ্ট-সাধ্য নয়। অথচ বররুচি-রচিত মূল 'বিদ্যাসুন্দরম্' সংস্কৃত গ্রন্থের কাহিনী-ভাগে দেবী-কালিকার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। কাব্যের তৃতীয় শ্লোকে উল্লিখিত আছে :—কালী কবির কুলদেবতা ছিলেন। হয়ত এই জন্যই "ওঁ নমঃ কালিকায়ৈ" বলে কবি গ্রন্থারম্ভ করেছিলেন। বররুচির কাব্যে কালিকার পরিচয় এই পর্যন্তই।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কালিকা

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনী-সম্বলিত প্রাচীনতর কাব্য-পুথি-সমূহে কালিকার উল্লেখমাত্রও পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলে অনুমিত[৫] কবি-কঙ্কের রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কালিকার কোনো উল্লেখ নেই। ষোড়শ শতাব্দীর কবি

৪। দ্রষ্টব্য—মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস ; ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (সাহিত্যপরিষৎ সং)।

৫। কঙ্কের প্রাচীনতা সম্বন্ধে ডঃ সুকুমারসেন আপাত্ত প্রকাশ করেছেন, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।

বলে অনুমিত দ্বিজ শ্রীধরের কাব্যেও কালিকা অনুপস্থিত। চাটি গাঁয়ের মুসলমান-কবি সাবিরিদখাঁ'র 'বিদ্যাসুন্দর'ও ধর্ম-সম্পর্ক-বিবর্জিত। অতএব, বোঝা গেল, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কোন এক পর্যায়ে কালিকাদেবী বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্য-সমূহের চাতুর্য-কলার সংগে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। এ সম্পর্কে অনুমান নানাপ্রকার ;—কিন্তু তা ঐতিহাসিক তথ্যানুগ নয়। সে যাই হোক্,—বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্য-সমূহ কালিকামঙ্গল নামে অভিহিত হয়ে থাকলেও, মূলতঃ,—রূপে, গুণে এরা মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয় ;—এই তথ্য এতক্ষণে স্পষ্ট হওয়া উচিত।

কবি-পরিচিতি প্রসঙ্গে প্রথমেই কবি-কঙ্ক বিশেষভাবে স্মর্তব্য। কঙ্কের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। কাব্যমধ্যে একস্থানে শ্রীচৈতন্য দর্শনাভিলাষী কবির ব্যাকুল আকৃতি প্রকট হয়েছিল,—

কবিকঙ্ক

"কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
সফল হৈবে মোর মনুষ্য-জনম॥
পাপী তাপী মুঞি প্রভু, আমি অল্পমতি,
হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥"—ইত্যাদি উক্তির প্রতি লক্ষ্য করে অনুমিত হয়ে থাকে কবি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,—·· "কঙ্কের রচনা ষোড়শ শতাব্দীর হওয়া অসম্ভব। যে ভাবে চৈতন্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে কবিকে চৈতন্যের সমসাময়িক মনে করা নিতান্ত মূঢ়তা। 'শ্রীচৈতন্যকে আমি কবে দেখিব'—এইভাব বিংশ শতাব্দীর পল্লীকবির রচনায়ও দেখিয়াছি। অতএব; কবি-কঙ্ককে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি মনে করা চরম বিচার-মূঢ়তা।"[৬] এ সকল কথা ছেড়ে দিলে,—কবির আত্ম-পরিচয় তাঁর কাব্যমধ্যেই নির্ভর-যোগ্য রূপে বর্ণিত হয়েছে।—রাজেশ্বর নদীর তীরবর্তী বিপ্রগ্রামের ব্রাহ্মণবংশে কবির জন্ম হয় ;—তাঁর পিতার নাম ছিল গুণরাজ,—মাতা গুণবতী। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে কবি মুরারি ও কৌশল্যা নামধেয় চণ্ডাল-দম্পতির দ্বারা প্রতিপালিত হন। বস্তুতঃ, এঁরাই কবির পিতামাতার স্থান অধিকার

৬। ঐ।

করেছিলেন ;—কবির নামকরণও করেছিলেন এঁরাই। বাল্যকালে কবি গর্গ নামক ব্রাহ্মণের ঘরে গো-পালকের কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। গর্গ ও তাঁর পত্নী প্রায়শ্চিত্তান্তর কঙ্ককে 'সমাজস্থ' করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সমাজপতিগণের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যর্থ-কাম হন। গর্গ-কন্যা লীলা এবং কঙ্কের প্রণয়কাহিনী-মূলক মৈমনসিংহের জন-প্রিয় গাথা-কাব্য মৈমনসিংহ-গীতিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। কঙ্কের কাব্যও ঐ অঞ্চলে বহুল-প্রচারিত। স্বয়ং কবি কাব্যখানিকে "পীরের পাঁচালী" নামে অভিহিত করেছেন ;—গ্রন্থখানিতে সত্যনারায়ণ পাঁচালীর আবরণে বিদ্যা-সুন্দরকাহিনী রচিত হয়েছে।

দ্বিজ শ্রীধর

দ্বিজ শ্রীধর-রচিত বিদ্যা-সুন্দর-কাহিনীর দুখানি-মাত্র নিতান্ত খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে। হোসেনশাহের পৌত্র, নুসরৎশাহের পুত্র ফিরোজসাহের আদেশে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

সাবিরিদ্ খাঁ

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি সাবিরিদ্ খাঁর বিদ্যাসুন্দরকাব্যের একখানি পুথির মাত্র কয়েকখানি পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। পুথিখানির আবিষ্কৃত অংশে স্থানে স্থানে সংস্কৃতশ্লোকের অশুদ্ধ উদ্ধৃতি ও তার অনুবাদ-চেষ্টা থেকে অনুমিত হয়,—কাব্যখানির পশ্চাতে কোন সংস্কৃত রচনার প্রভাব-প্রেরণা ছিল।

বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্য-কথায় কালিকাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন-চেষ্টা প্রামাণ্যরূপে লক্ষিত হয়,—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি কৃষ্ণরামের রচনায়। কিন্তু, এই উপলক্ষ্যে 'চট্টলী' কবি গোবিন্দদাসের রচনাও অবশ্য-উল্লিখিতব্য। ডঃ দীনেশচন্দ্র গোবিন্দদাসের কাব্য-রচনা-কাল-প্রসঙ্গে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ করেছেন,—কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কোন সূত্র-সঙ্কেত দীনেশচন্দ্র করেন নি। অপরপক্ষে ডঃ সুকুমার সেন আলোচ্য কাব্যের আবিষ্কৃত পুথিগুলির একটির লিপিকালের সূত্রাবলম্বনে উল্লেখ করেছেন,—"কাব্যটির রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পরে নয়।"[৭]

কবি গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের কাব্য-কাহিনী পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আছে,—বৃত্রাসুর বধ এবং দেবলোকে ভগবতীর মাহাত্ম্যপ্রচার, দ্বিতীয়ভাগে ইন্দ্রকর্তৃক

৭। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।

অহল্যা-সম্ভোগ জনিত পাপ-ভোগ এবং দেবী-কৃপায় উদ্ধার লাভ, তৃতীয় ভাগে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণে মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ. চতুর্থভাগে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক ভানুমতী-বিবাহ ও তাল-বেতাল-সিদ্ধি এবং সর্বশেষভাগে আছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী উপলক্ষ্যে দেবী-কালিকার মাহাত্ম্য-বর্ণন। ডঃ দীনেশচন্দ্র বলেছেন,—"গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরে শীলতার অভাব আদৌ নাই। উহা কালীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক ও ধর্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ।"[৮] এই মন্তব্যের সংগে ইতিহাসের পাঠক এটুকুও লক্ষ্য করবে যে, এই কাব্যখানি বিশেষভাবে 'বিদ্যাসুন্দর-কাব্য'-প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত নয়;—তথাকথিত কালিকামঙ্গল কাব্য-শ্রেণীর রূপাবয়বগত বৈশিষ্ট্যও এই কাব্যখানিতে নেই। বিভিন্ন সূত্র থেকে আহৃত কালিকামাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনী সমূহের মধ্যে নিতান্ত প্রাসঙ্গিক রূপেই কালী-কথা-বিমিশ্র বিদ্যা-সুন্দরের গল্পও বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, আলোচ্য কাব্যের প্রাসঙ্গিক বিদ্যা-সুন্দর গল্পের প্রেম-সংঘটন-স্থান রূপে কবি 'রত্নপুর' নামক রাজ্যের উল্লেখ করেছেন;—রত্নপুরাধিপতি বীরসিংহ ছিলেন বিদ্যার পিতা,—আর সুন্দরের পিতা ছিলেন,—কাঞ্চনগরাধিপ গুণিসার। গোবিন্দদাস হীরা-মালিনীকে রম্ভা মালিনী নামে পরিচায়িত করেছেন।

গোবিন্দদাসের কাব্য-পরিচয়

এবারে কবি কৃষ্ণরামদাসের কথা। এঁর নিবাস ছিল কলকাতার নিকটবর্তী 'নিমিতা' (আধুনিক নিমতে) গ্রামে;—পিতার নাম ভগবতীদাস। কৃষ্ণরাম কালিকামঙ্গল ছাড়া আরো তিনখানি কাব্য রচনা করেন,—(১) ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যখ্যাপক রায়মঙ্গল, (২) ষষ্ঠীর পাঁচালী ও (৩) শীতলার পাঁচালী। কালিকামঙ্গলই কবির প্রথম এবং উৎকৃষ্ট রচনা। কিন্তু কাব্যখানির রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। গ্রন্থমধ্যে একটি কালজ্ঞাপক সাংকেতিক শ্লোক পাওয়া যায়;—লিপিঘটিত অশুদ্ধিহেতু তা অর্থহীন। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্লোকটির পাঠ শুদ্ধ করে ১৫৯৮ শকাব্দ কাব্য-রচনাকাল বলে অনুমান করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন "এই তারিখ সমীচীন মনে" করেন না। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য একই শ্লোকের সহায়তায় গ্রন্থ-রচনা কাল ১৫৮৬ শকাব্দ

কৃষ্ণরাম দাস

৮। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

তথা ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে শ্রীভট্টাচার্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণ উদ্ধারও করেছেন।

কৃষ্ণরামের পরেই উল্লেখযোগ্য কালিকামঙ্গলের বিখ্যাত কবি 'বলরাম-কবিশেখর'। বলরামের কাব্যের আবিষ্কৃত পুথির শেষাংশ খণ্ডিত;—গ্রন্থ-রচনাকাল জানা যায় না। সাধারণভাবে অনুমিত হয়ে থাকে,—কবি ভারত-চন্দ্রের পূর্ববর্তীকালে কাব্য রচনা করেছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকাংশে সম্পাদক-দ্বয় ৺ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কিন্তু মনে করেছিলেন,—বলরাম কবিশেখর এবং রামপ্রসাদ উভয়েই ভারত-চন্দ্রের পরবর্তীকালে কাব্য-রচনা করেন। কারণ-স্বরূপ এই সম্পাদক-দ্বয় উল্লেখ করেছেন,—সাধারণভাবে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্য-সমূহ বররুচির সংস্কৃত কাব্যেরই অনুসারী। ফলে, বররুচির কাব্যের মতই একাধিক বাংলা কাব্যেও বিদ্যার পিতৃ রাজ্য, তথা, কাহিনীর মূল-পটভূমি নির্দশিত হয়েছে উজ্জয়িনীতে। কিন্তু ভারতচন্দ্র, বলরাম, রামপ্রসাদ তিনজনই বিদ্যা সুন্দরের প্রণয়-সংঘটন-স্থল নির্দেশ করেছেন,—বর্ধমানে। ভারতচন্দ্রের জীবনী-বিচারে প্রমাণিত হয়,—বর্ধমান রাজ-সরকারের সংগে তাঁর বংশগত এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল আক্রোশ-পূর্ণ। সেই আক্রোশের বশেই ভারতচন্দ্র বর্ধমান রাজবংশকে কলঙ্কিত করেন। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতচন্দ্র কৌমার্যে সন্তান-সম্ভবা বিদ্যার পিতৃ-পরিচয়কে বর্ধমান রাজবংশের সংগে যুক্ত করেছিলেন, আলোচ্য সম্পাদক-যুগ্ম একথা মনে করেন। তাঁদের ধারণা,—ভারতচন্দ্রের কাব্যের অনুসরণ করেই বলরাম কবিশেখর এবং রামপ্রসাদ বর্ধমানে কাব্য-সংঘটন-স্থল-নির্দেশ করেছেন। কিন্তু, এই অনুমানের ভিত্তি যে দুর্বল, তা স্বতঃ-স্ফুট। অপর পক্ষে, মনে করা যেতে পারে,—বলরামের কাব্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের পরে রচিত হয়ে থাকলে রুচি, বর্ণনাভঙ্গী, কাব্যাঙ্গিকাদি বিষয়ে বলরামের রচনায় ভারতচন্দ্রের কাব্য-কৃতির প্রভাব স্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু, তথ্য বরং বিপরীতটিই প্রমাণ করে,—বলরামের রচনায় বররুচির প্রভাবই সমধিক।

বলরাম কবিশেখর,—রচনাকাল

বলরামের আবির্ভাব-ভূমি সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য যথেষ্ট। বলরামের কাব্য-সম্পাদক অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ধারণা, কবি

পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন এবং শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য কবিকে পশ্চিমবঙ্গীয় বলে নির্দেশ করেছেন। কাব্যের একস্থানে কবির সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায়,—

কবি-পরিচিতি

"পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চন নাম, তার সুত বলরাম
কালিকা পূরিল যাঁর আশ॥"

বলরামের বিভিন্ন ভণিতার সার-সঙ্কলন করে জানা যায় কবির পূর্ণ-নাম ছিল,—কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী। কবি ছিলেন বিষ্ণুদাস বংশধর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের 'সভাসদ'।

কাব্য-পরিচয়

বলরামের কাব্যে বিদ্যা-সুন্দর প্রণয়কথার 'পরে কালিকা-মাহাত্ম্যের আবরণ ভক্তি-ঘন। তাই প্রণয়াংশেও আদি-রস বর্ণনায় আপেক্ষিক সংযম বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। বলরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু, সহজ অনুভূতির প্রকাশে পাণ্ডিত্য কোথাও বাধা সৃষ্টি করে নি।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর

এবারে উল্লেখ করব,—রামপ্রসাদ সেনের কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কাব্যের। পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—একদিকে আত্মানুভূতি-নিবিড় শ্যামাসংগীত ও অপরপক্ষে মানবিক জীবনাবেদনের Subjective অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ আগমনী-বিজয়া সংগীতের আদি-স্রষ্টা,—তথা, শক্তি-সংগীতের "আদিগঙ্গা হরিদ্বার" ছিলেন এই রামপ্রসাদ সেন। বঙ্গ-সাহিত্য-সমালোচক এবং ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা,—রামপ্রসাদের মত মাতৃ-চরণ-তদাত্ম সাধক-শিল্পীর পক্ষে 'কালিকামঙ্গল' আখ্যা-ভূষিত করে একখানি নিতান্ত রুচি-বিগর্হিত আদি-রসাত্মক কাহিনী-কাব্য-রচনা কিরূপে সম্ভব হয়েছিল? কিন্তু, পূর্ববর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচ্য যুগ-জীবন-প্রবণতার যে পাথেয়টুকু আবিষ্কৃত হয়েছে,—তার থেকে সন্ধানী ঐতিহাসিকের দৃষ্টি স্পষ্টই উপলব্ধি করবে,—রামপ্রসাদের এই পরস্পর-বিরোধী শিল্প-চেষ্টার মধ্যে সমসাময়িক বাঙালি-জীবনের দ্বিধাখণ্ডিত চিত্ত-বৃত্তিরই সমধিক বিকাশ ঘটেছে। পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, রামপ্রসাদী যুগে মধ্যযুগীয় গোষ্ঠি-সর্বস্ব গ্রামীণ সমাজ ভঙ্গুরতার

শেষপর্যায়ে সর্বাধিক পরিমাণে ক্লেদ-ক্লিন্ন হয়েছিল। এই অসুস্থ গোষ্ঠি-চেতনার গলিত দেহ অতিক্রম করে উদ্ভিন্ন হতে চলেছিল নূতন আত্ম-সর্বস্ব ব্যষ্টি-চেতনা ;—কিন্তু গোষ্ঠি-চেতনার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং ব্যষ্টি-মানসের সম্পূর্ণ সংগঠন তখনও হয়ে ওঠেনি। তাই রামপ্রসাদের কবিত্বময় ব্যক্তি-সত্তার ছিল দুটি পৃথক্ দিক,—একটি, সেই মুমূর্ষু গ্রামীণ্ গোষ্ঠি-জীবনের পচন-শীল গ্লানির উত্তরাধিকারী,—এই সত্তাই ক্লেদাক্ত গ্রাম্য সমাজ-মানসের অসুস্থ রূপটিকে অনাবৃত অভিব্যক্তি দান করেছে বিদ্যাসুন্দরকাব্যে,—দিয়েছে, আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের মধ্যবর্তী নিতান্ত সংকীর্ণ-পঙ্কিল বাদানুবাদের মধ্যে। আর একটি সভ্য, সুস্থ নব-যুগ-সম্ভাবনাকে কি ক'রে বলিষ্ঠতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করেছিল,- শক্তি-সংগীতাবলীর আলোচনায় তার উল্লেখ করেছি,—পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল একটি কথা অবশ্য-স্মরণীয়,—'বিদ্যাসুন্দর'কাব্যের প্রায়-সমসাময়িক লেখক রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের রচনা সমধর্মী নয়, তার কারণ এঁদের কাব্যের সৃজন-কাল প্রায় একই হলেও, সৃজন-পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুই কবির শিল্প-কৃতির পার্থক্য প্রদর্শন উপলক্ষ্যে ডঃ দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,—"যাঁহারা তৎকালীন রাজ-সভার দূষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবতঃ ধর্ম প্রবণতা সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া পারেন নাই,—ইহার সাক্ষী রামপ্রসাদ। আমরা রামপ্রসাদের ভক্তি-বিহ্বলতায় মুগ্ধ, তাঁহার উন্নত চরিত্রের সর্বদা পক্ষপাতী, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তৎপ্রণীত বিদ্যা-সুন্দরের বীভৎস রুচির সমর্থন করিতে প্রস্তুত নই, ভারতচন্দ্রের রচনা যে গর্হিত রুচি-দোষ-দুষ্ট, রামপ্রসাদ তাহার পথ-প্রবর্তক। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ বীভৎস আদি-রস-পূর্ণ কবিতা আপাত-সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন নাই ;—কিন্তু তাহা শক্তির অভাব-জন্য, ইচ্ছার ত্রুটি-হেতু নহে।[১]" এই মন্তব্যের প্রথমাংশেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে আলোচ্য যুগে 'রুচি-বিকা'র কেবল সংঘটিত হয়েছিল 'রাজ-সভার সান্নিধ্যে'। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, এই রুচি-বিকার একটি সাধারণ জাতীয় বিপর্যয়-লক্ষণ রূপে প্রকট হয়েছিল;—অপরপক্ষে, আরো লক্ষ্য করা উচিত, - রামপ্রসাদ স্বল্প-দিন মাত্র জমিদারী সেরেস্তায় নিতান্ত ব্যর্থতার সংগে কাজ করে থাকলেও, কিংবা স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ব্রহ্মোত্তর লাভ করে

ইতিহাসের সংকেত

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

থাকলেও, রাজ-সভার ঐতিহ্য তাঁর কবি-চেতনাকে স্পর্শ করতে পারে নি। জমিদারী খাতায়ও 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর পরিবর্তে তিনি বরং শ্যামা-সংগীতই নিবদ্ধ করেছিলেন। আর, কিংবদন্তী-কথা সত্য হলে কৃষ্ণচন্দ্র-সভার সংগেও রামপ্রসাদের সম্পর্ক শ্যামাগীতি অবলম্বনেই। আসলকথা,—গ্রাম-নগর, রাজসভা সমাজ নির্বিশেষে সর্বত্রই সে-যুগে এই রুচিবিকার সাধারণ-ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আর বিদ্যাসুন্দর কাব্য-কাহিনী তার সাহিত্যিক প্রকাশের সাধারণ মাধ্যম-রূপে হয়েছিল ব্যবহৃত। তবে, পল্লীর নিরাবরণ নিরাভরণ জীবনযাত্রার মধ্যে যা নিতান্ত রুচি-বিকার-মাত্রে পর্যবসিত ছিল,—বিদগ্ধ নাগরিক বাগ্‌ভঙ্গী ও সূক্ষ্ম শালীনতার আবরণে আবৃত হয়ে তাই প্রকাশিত হয়েছিল,—বিকৃত রুচি-বিলাস-রূপে। বিদ্যাসুন্দর কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে গ্রামীণ কবি রামপ্রসাদ ও নাগরিক-কবি ভারতচন্দ্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এইখানেই ;—আর দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যের শেষাংশে এই মূল-পরিচিতিরই দ্যোতনা করা হয়েছে।

বক্তব্যের স্পষ্ট অনুধাবন-জন্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়,—কিন্তু তার আগে 'বিদ্যা-বিলাপ' নাটকের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যা-বিলাপ নাটক

'নেপালে বাঙালা নাটক'-পর্যায়ে সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশনী-মধ্যে বিদ্যা-বিলাপ প্রথম নাটক। "অনুমান, ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত[১০]।" নাটকমধ্যে বিদ্যা আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন উজ্জয়িনী-রাজকন্যা বলে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের যুগান্তকারী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্য-সাধনার মধ্যে অতীত যুগসমাপ্তির সংগে সংগে আধুনিক যুগাভ্যুদয় কি করে

ভারতচন্দ্র

সম্ভাবিত হয়েছিল, তার উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক সংকেত কবির ব্যক্তি-জীবন এবং অন্নদামঙ্গলকাব্য-কথার মধ্যে নিহিত আছে। গুপ্তকবি ঈশ্বর চন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ভারতচন্দ্রের নিম্নরূপ জীবন পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে।—

বর্ধমানের ভুরসুট্ পরগণাস্থ পেঁড়োবসন্তপুর গ্রামের ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ফুলিয়া-মেল-মুখুটি ব্রাহ্মণবংশে আনুমানিক ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৩৪ শক) ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। কবির পিতা "রাজা" নরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন প্রতিপত্তিশালী

১০। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী—ভূমিকা (সাহিত্যপরিষৎ সং)।

জমিদার। বর্ধমান রাজের সংগে বিবাদে নরেন্দ্রনারায়ণ সর্বস্বান্ত হন এবং বালক ভারতচন্দ্র "নাওয়াপাড়া" গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় লাভ করে তাজপুরস্থ টোলে সংস্কৃত-শিক্ষায় ব্রতী হন।

জীবন-কথা

কিন্তু, কিছুদিন পরে, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে মঙ্গলঘাট পরগণার সারদা গ্রামবাসী 'কেসর কুনী' আচার্য বংশের একটি বালিকাকে বিবাহ করে গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হন। এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অভিভাবক অগ্রজগণ কর্তৃক কবি বিশেষ ভর্ৎসিত হন এবং একাকী গৃহত্যাগ করে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয় লাভ করেন। সেখানেই কবি ফারসী-শিক্ষায় ব্রতী হন। দেবানন্দপুরে বাসকালেই ভারতচন্দ্র ত্রিপদী-ও চৌপদী ছন্দে দুখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করে কবি-কর্মের পরিচয় দান করেন। অবশেষে ফারসীভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়ে কবি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পাণ্ডিত্যের জন্য সাদরে গৃহীত হন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাগ্যে স্থিতি-লাভ ছিল না। বর্ধমান রাজ-সরকারের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপার মীমাংসার জন্য রাজধানীতে গিয়ে কবি কারারুদ্ধ হন; কিন্তু কৌশলক্রমে মুক্তি লাভ করে কটকে পলায়ন করেন। সেখানে মহারাষ্ট্রাধিকার ভুক্ত উড়িষ্যার শাসনকর্তার নিকট 'কর-মুক্ত তীর্থবাসী' রূপে অবস্থানের অনুমতি লাভ করে কবি পুরুষোত্তম হয়ে শ্রীক্ষেত্র গমন করেন। কিছুকাল শ্রীক্ষেত্র-বাসের পর এক সন্ন্যাসিদলের সংগে সন্ন্যাসিবেশে ভারতচন্দ্র বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে হুগলীজেলার খানাকুল পরগণাস্থ কৃষ্ণনগর গ্রামে শ্যালিকা-পতির পীড়াপীড়িতে তাঁর গৃহে কিছুকাল কবি পত্নীর সংগে অবস্থান করেন। পরে স্ত্রীকে সেখানেই রেখে ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় গমন করেন এবং সেখানকার ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহায়তায় ৪০৲ টাকা বেতনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি নিযুক্ত হন। সেখানেই রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় কবি প্রথমে 'রসমঞ্জরী' নামক কাব্য-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং পরে তাঁর বহু-বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্র-রচিত বিবিধ-বিষয়ক পদ-সংগীতও কিছু কিছু পাওয়া গেছে। ১৬৮২ শকাব্দ তথা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্রের দেহান্ত ঘটে।

এই সংক্ষিপ্ত তথ্য-সার হতেই ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।—(১) ভারতচন্দ্র কেবল বিদ্বান্-পণ্ডিত ছিলেন না, বুদ্ধিমান্,—চতুর ব্যক্তি ছিলেন। এবং এই চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার 'পরেই

কবি প্রয়োজনকালে সমধিক নির্ভর করেছিলেন। কেবল বর্ধমানরাজ-সরকারে কারারুদ্ধ থাকা কালেই নয়, প্রথম গৃহত্যাগের পর দেবানন্দপুরের আশ্রয় লাভে, উড়িষ্যার মারাঠা-শাসকের কৃপার্জনে এই সত্যই বারে বারে প্রকট হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের সার-নিষ্কাসন

(২) ভারতচন্দ্র বিশেষ ভাবে আত্মপরতন্ত্র ছিলেন,—সমাজ, পরিবার এমন কি অভিভাবক-অগ্রজগণের অনুশাসনকে মেনে চল্‌বার অপেক্ষা তিনি করেন নি। নিতান্ত বালক বয়সে বিবাহ-ব্যাপারেই কেবল তা প্রকাশ পায় নি, সদ্যোবিবাহিতা বালিকাকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রথমবারে পলায়ন, দ্বিতীয়বারে সন্ন্যাস-গ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে ভারতচন্দ্রের আত্ম-পরতন্ত্রতা আত্মপরতায় পর্যবসিত-প্রায় হয়েছিল।

(৩) ভারতচন্দ্রের প্রথম জীবনের পরিবেশ তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রের এই আত্ম-পারতন্ত্র্যের সহায়তা করে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই স্বাতন্ত্র্য-প্রীতির,—এই একক রস-বিলাসের ছড়াছড়ি। কোন সমাজ-গোষ্ঠী,—তথা সমষ্টি-মাত্রেরই সংগে একাত্মতা-সাধনের অবকাশই কবির যাযাবর জীবনে ঘটে নি,—তাই ছিন্ন-মূল বৃক্ষের বৃন্তহীন পুষ্পের মত সেই সমষ্টি-শ্রেষ্ঠতার বিপর্যয়-যুগে ভারতচন্দ্রের একক-ব্যক্তিত্ব উত্তুঙ্গ হয়েছিল।

ভারতচন্দ্রের ব্যক্তি-চরিত্র বিশ্লেষণের এই চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য,—তাঁর কাব্যের মধ্যেও কবি-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সমধিক প্রকট হয়েছে। আর বস্তুতঃ, ভারতচন্দ্রের সৃষ্টির নূতনত্ব এইখানেই। অন্নদামঙ্গলে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-সাহিত্য সমষ্টি-সমাজ-প্রধান গ্রামীণতার ক্ষেত্র অতিক্রম করে একক ব্যষ্টি-প্রধান নাগরিকতার পথে,—সর্বাত্মক অনুভূতি-নিবিড়তার ক্ষেত্র হতে ব্যক্তি-মূলক বুদ্ধি-দীপ্তির ক্ষেত্রে, স্বাভাবিকতা থেকে শালীনতার অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর আলোচনায় এই সত্যই অতঃপর উদ্‌ঘাটিত হবে।

কাব্য ও কবি-ব্যক্তিত্ব

পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—ভারতচন্দ্রের প্রাথমিক-রচনা দুখানি সত্য-নারায়ণের পাঁচালী দেবানন্দপুরে লিখিত হয়েছিল। গ্রন্থ দুখানির একখানি ত্রিপদী এবং অপরখানি চৌপদী ছন্দে রচিত। কোন্‌খানি যে প্রথম রচনা, সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়ার উপায় নেই। চৌপদী ছন্দে রচিত পাঁচালীখানিতে ফারসী শব্দবাহুল্য দেখে সাধারণতঃ অনুমিত হয়ে থাকে যে,—'ত্রিপদী' ছন্দেই

ভারতচন্দ্র প্রথম পাঁচালী রচনা করেন। পরে দেবানন্দপুরে ফার্সী-শিক্ষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করার পরই ফার্সী সমৃদ্ধ 'চৌপদী' ছন্দের পাঁচালীটি রচিত হয়েছিল। 'চৌপদী'-গ্রন্থখানির শেষ ছত্রাংশে কাল-সংকেত আছে,—"সনে রৌদ্র চৌগুণা"।—গুপ্ত-কবি এই সংকেতের সমাধান করে ১১৩৪ বাংলা সাল পেয়েছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সংকেতটির অর্থ করেছিলেন ১১৪৪ সাল। আবার শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে ঐ একই শ্লোকাংশ ১১৪৩ সালের দ্যোতক। সন-তারিখের এই সামান্য ইতর-বিশেষের কথা ছেড়ে দিলেও দেখ্‌তে পাব,—সেই অপেক্ষাকৃত অপরিণতবয়সেই ভারতচন্দ্রের কবি-ব্যক্তিত্বের আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অকুণ্ঠ প্রকাশ লাভ করেছে। নিষ্ঠা অপেক্ষা চাতুর্য, অনুভূতি অপেক্ষা বুদ্ধি,—ভাব-গভীরতা অপেক্ষা বাগ্‌দীপ্তি, এই অনুল্লেখ-যোগ্য প্রস্তুতি-যুগেই পাঠকের সকৌতুক কৌতূহল আকর্ষণ করবে। 'চৌপদী' কবিতার কৌতুকোজ্জ্বল সামান্য অংশ উদ্ধার করি,—

সত্যনারায়ণের পাঁচালী

"সেলাম হামারা পাঁড়ে ধুপমে তোম্‌ কাহে খাড়ে,
পেরেসান দেখে বড়ে মেরে বাৎ ধর তো॥"……

এর পর 'রসমঞ্জরী'। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' হইতেছে মৈথিলকবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' নামক নায়ক-নায়িকা-লক্ষণ গ্রন্থের অনুবাদ।"[১১] সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ভারতচন্দ্রের যে বিশেষ অধিকার ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কাব্য-রচনা-ক্ষেত্রেও নায়ক-নায়িকা-চরিত্রে আলংকারিক ভাবাদি-প্রকটনে কবির বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হয় বিদ্যাসুন্দর কাব্যাংশের যত্র-তত্র। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করলেই এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের ব্যুৎপত্তির পরিমাণ অনুমিত হতে পারবে,—

সুন্দর কহেন রামা (বিদ্যা) কত ভর্ৎস আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার॥

* * *

'রসমঞ্জরী'

আপন চিহ্নিতে কেন হৈলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা॥

১১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)

ভাবি দেখ বাসকসজ্জা নিত্য নিত্য হও।
উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনো নও ॥
কখনো না হইল করিতে অভিসার।
স্বাধীন-ভর্তৃকা কেবা সমান তোমার ॥
প্রোষিত-ভর্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাও আমায় ॥

কিন্তু, অলংকারশাস্ত্রের প্রতি কবির এই স্বভাব-জ অনুরাগ বাগ্-বৈদগ্ধ্য ও কাব্যিক কলাচাতুর্য-সৃজনেই পর্যবসিত হয়নি, আলোচ্য "রসমঞ্জরী" তার প্রমাণ। আলংকারিক জটিল ধারণা-সমূহ সরল বাংলায় প্রকাশ করেই ভারতচন্দ্র ক্ষান্ত হন্ নি, ভাবের স্পষ্টীকরণের জন্য উদাহরণেরও সহায়তা গ্রহণ করেছেন। বস্তুতঃ, 'রসমঞ্জরী' সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের লোকপ্রিয় (popular) প্রতিরূপ।

কিন্তু, ভারতচন্দ্রের প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিভূ তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য। কবি স্বয়ং গ্রন্থ-রচনা-কাল নির্দেশ করেছেন,—

'অন্নদামঙ্গল'

"বেদ লয়ে ঋষি রস ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥"—১৬৭৪ শক, তথা—

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল। অন্নদামঙ্গল কাব্যকে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরবর্তী মঙ্গলকাব্যিক পর্যায়রূপে উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে। মুকুন্দরামের জীবন-পরিবেশ, সমাজাশ্রয়ী নিষ্ঠা-বিশ্বাস ও গ্রামীণ ভাব-নিবিড়তা ভারতচন্দ্রের কাব্যে অনুপস্থিত। কেবল তাই নয়—বোধ হয় এটিই প্রথম মঙ্গলকাব্য-নামধেয় গ্রন্থ, যেখানে আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা-বিশ্বাসের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আধিভৌতিক চেষ্টাই একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই,—প্রথমযুগের মঙ্গলকাব্যে সাম্প্রদায়িকতা-প্রধান আধি-দৈবিকতা এবং পরবর্তী চৈতন্যোত্তর যুগে দেববাদ-নির্ভর মানবতাবাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার যে বিকাশ ঘটেছিল,—পূর্বে তার বিশদ্ উল্লেখ করেছি। কিন্তু, ভারতচন্দ্রের কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন এবং তৎফল-প্রসূত ব্যক্তিগত আধিভৌতিক সমুন্নতি। সেদিক থেকে অন্নদা-মঙ্গলকে 'ভবানন্দমঙ্গল' নামে আখ্যাত করলেই ভাল হত। কৃষ্ণচন্দ্রের

পূর্বপুরুষ ভবানন্দের বিজয়কথা বর্ণনই ভারতচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ; প্রসঙ্গতঃ এসেছে ভবানন্দের কৃপাকর্ত্রী অন্নপূর্ণার কথা। এখানেই দেখ্‌ব নূতন বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত। পূর্বেই বলেছি, ভারতচন্দ্রের প্রতিভা ছিল ব্যষ্টি-মূলক,—আত্মপরতন্ত্র। এখানে একটি আত্মপরতন্ত্র ব্যক্তি-প্রতিভা আর একটি ব্যক্তিত্বের বিজয়-কথা বর্ণনা করেছে,—যে সর্বপ্রকার দৈবী মহিমা-বিবর্জিত, নিছক চাতুর্য-কলাকুশল আধিভৌতিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মানবিক ব্যক্তিত্ব মাত্র।—এই ব্যক্তি-সর্বস্বতা এবং এই মানবিকতা,—individuality এবং humanity-ই নবযুগের লক্ষণ।

পূর্বেই দেখেছি, অতীত-বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তির মধ্যেই এই নবীনতার জন্ম। ভারতচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে এর প্রকাশ ঐ স্বাভাবিক বিবর্তন-সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ,—স্বয়ংস্ফূর্ত নয়। প্রতিভার অন্তর্নিহিত কুণ্ঠা-হেতু individuality এবং humanity-র আদর্শ আচ্ছন্ন হয়েছে মঙ্গল-কাব্যিক কাঠামোর ব্যর্থ অনুকরণ চেষ্টার মধ্যে,—এইজন্য ভারতচন্দ্র যুগ-বাসনার অনুকারীমাত্র,—যুগ-স্বরূপের স্রষ্টা নন।

যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি ভবানন্দ-মাহাত্ম্য-কীর্তনে ব্রতী হয়েছিলেন,—তবু পূর্ব-কথিত কুণ্ঠা-হেতু ভবানন্দ-কথাকে তিনি ভবানন্দ-কৃপাকর্ত্রী অন্নপূর্ণা কথার আবরণে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। কবির উদ্দেশ্য এবং কাব্যের রূপাবয়বের মধ্যে সঙ্গতির এই অভাব-হেতু কাহিনীর সংহতি বিনষ্ট হয়েছে। এইজন্যই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য পৃথক্ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত।

অন্নদামঙ্গলের কাহিনী

(১) প্রথমখণ্ডে বন্দনা, 'গ্রন্থসূচনা' কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন, ইত্যাদির পরে গীত আরম্ভ হয়েছে। এখানেই কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত কবি মঙ্গলকাব্যিক উপায়ে দ্বিতীয়বার গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা করেছেন,—

"অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে॥"

প্রথমখণ্ডের প্রথমাংশে অতঃপর এই মাতৃ-রূপিণী দেবী-অন্নপূর্ণার মহিমা বর্ণিত হয়েছে পৌরাণিক আধারে। দ্বিতীয়াংশে একই দেবীর কৃপা-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে লৌকিক কিংবদন্তীর আশ্রয়ে। প্রথমাংশে আছে,—দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, উমারূপে পুনর্জন্ম, হরগৌরীর বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন, দেবীর

অন্নপূর্ণা-মূর্তি-পরিগ্রহ, বিশ্বকর্মাকর্তৃক অন্নপূর্ণা-পুরী নির্মাণ, কাশী-মাহাত্ম্য, ব্যাসকাশী-কথা ইত্যাদি। পরবর্তী-অংশে,—দেবী-অন্নপূর্ণার কৃপায় গাঙনীর তীরবর্তী বাগুয়ান পরগণার বড়গাছি গ্রামের দরিদ্র বিষ্ণুহোড়ের পুত্রলাভ, দেবীর বরপুত্র হরিহোড় কর্তৃক পৈত্রিক দারিদ্র্য-মোচন, দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর মোহ হেতু হরিহোড়ের অধঃপতন ও অশান্তি, দেবী-কর্তৃক হরিহোড়ের গৃহত্যাগ ও ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা ইত্যাদি লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

(২) অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয়খণ্ড আরম্ভ হয়েছে মানসিংহের বর্ধমান আগমনে। রাজা প্রতাপাদিত্যের দমনোদ্দেশ্যে মানসিংহ বর্ধমানে উপনীত হলে, অন্নদা-কৃপা পুষ্ট 'ভবানন্দ মজুন্দার' তাঁর সহায়তার জন্য বর্ধমান যাত্রা করেন। সেখানে 'সুন্দরে'র সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়ে রাজা মানসিংহ বিদ্যা-সুন্দর-কাহিনী শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং 'কানুনগো' ভবানন্দ আদ্যন্ত কাহিনীটি বর্ণনা করেন। এইরূপে বিবৃত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সংগে সংগে অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে।

(৩) তৃতীয়খণ্ডই যথার্থ ভবানন্দ-মঙ্গল ;—ভারতচন্দ্রের মৌলিক রচনা। এই খণ্ডে মানসিংহের যশোর-গমন,—সুপ্রকট দৈবী-মাহাত্ম্যের প্রভাবে, তথা দেবানুগৃহীত ভবানন্দের সহায়তায় মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের পরাজয়-সাধন, পরিতৃপ্ত-চিত্ত মানসিংহ কর্তৃক দিল্লী দরবারে পুরস্কৃত করার ইচ্ছায় ভবানন্দকে দিল্লীনয়ন, সেখানে মুসলমান-সম্রাট-সকাশে দেবী-মাহাত্ম্যের পূর্ণ-প্রকাশ, ভবানন্দের 'রাজা' উপাধিলাভ, ইত্যাদি বহুকাহিনীর শেষে "মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা"য় অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্যোচিত সমাপ্তি লাভ করেছে।

কাব্য-কাহিনীর এই সংক্ষিপ্তসার হতেই প্রতিভাত হওয়া উচিত ;—ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাবানুভূতির নিবিড়তা অপেক্ষা বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যের প্রাধান্যই সমধিক। অষ্টাদশ শতাব্দী-পূর্বকালের মধ্যযুগীয়-সাহিত্যের প্রাথমিক বিপর্যয়-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি,—সর্বাত্মক জীবনানুভূতির দৃঢ়তার ক্ষেত্রে প্রথম যখন শিথিলতার টান পড়েছিল, তখন থেকেই কাব্য-সাহিত্যে ভাবৈক্যের ঐকান্তিকতার পরিবর্তে বিভিন্ন সূত্র থেকে সমাহৃত বিচিত্র কাহিনী-কথার একত্র সংগ্রন্থনে চাকচিক্য সৃষ্টির প্রয়াস হয়েছিল সমধিক প্রবল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতির স্বরূপ উপরি উদ্ধৃত কাহিনী-পরিচিতির সহায়তায় স্পষ্ট হতে পারবে। কিন্তু

কাহিনী-বৈশিষ্ট্য

এই পরিণামের মধ্যে ভারতচন্দ্রের কাব্যের যে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য আত্ম-গোপন করে আছে,—বর্তমান প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। মধ্যযুগীয় কাহিনী-কাব্যসমূহের মধ্যে কাহিনী-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত যে আনুপূর্বিকতা,—যে সর্বাবয়ব সম্পূর্ণতাই ছিল সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, ভারতচন্দ্রের কাব্য-কাহিনী বৈচিত্র্যের ক্ষণিক চাকচিক্যের মধ্যে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে,—গ্রামীণতা ও নাগরিকতার পার্থক্য এইখানেই।

গ্রামীণসাহিত্য সর্বাঙ্গীণ, সম্পূর্ণসংহত, দৃঢ়-পিনদ্ধ, সর্বাত্মক বলেই সর্বাবয়বসমৃদ্ধ। কিন্তু, নাগরিক-সাহিত্য একক, প্রোজ্জ্বল,—সর্ব-পরিচ্ছিন্ন ক্ষণিক সৌন্দর্য-চাকচিক্যে প্রখর। সর্ব-বিরহিত এই একাকিত্বের জন্যই তীব্র এবং প্রদীপ্ত। ভারতচন্দ্রের কাব্য-কলা এই একক দীপ্তি-তীব্রতার পথেই অগ্রসর হয়েছে।

প্রথমে কাব্য-কথার মঙ্গলকাব্যিক রূপাবরণের বিশ্লেষণে এই সত্য স্পষ্ট প্রকট হতে পারবে। কাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে পৌরাণিক অন্নপূর্ণা, লৌকিক অন্নদা এবং বিদ্যাসুন্দর-কথার কালিকার যে-বর্ণনা ভারতচন্দ্র উদ্ধার করেছেন, তার কোথাও নিষ্ঠা-নিবিড়তার স্পর্শটি-ও দুর্লভ। স্পষ্টই বোঝা যায়, কয়েকটি জৌলুষ-চাকচিক্য-পূর্ণ কাব্যিক-মুহূর্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কবি মঙ্গলকাব্যিক বর্ণনার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। যশোরের যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা দিল্লীর রাজ-দরবারে দেবী-অন্নদার আত্ম-প্রকটন-চিত্রাবলীর অনুধাবনে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধ হবে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কালিকার উল্লেখ ত বাহুল্য মাত্র।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য

ভারতচন্দ্রের এই চাকচিক্য-প্রতিফলন-প্রয়াসী প্রতিভার সহায়ক উপাদান রূপেই বিদ্যাসুন্দর কাহিনী তাঁর কাব্যে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে। রূপ-সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতা ও তীব্রতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি বিদ্যাসুন্দরের আদিরসাত্মক কাহিনীর চূড়ান্ত সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে আলোচ্যকাহিনীর রুচিহীনতার প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই উত্থাপিত হয়। সার্থক সৃষ্টি-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নৈতিক রুচি-বোধের স্থান-নির্দেশের বিতর্ক-বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে লাভ নেই। তবে, এ কথা বলা যেতে পারে, দেশকালপাত্রানুযায়ী নৈতিক রুচির মান এবং পরিমাণ-বোধও বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক রুচির মাপ-কাঠিতে

বিদ্যাসুন্দর কাব্যাংশ ও ইতিহাসের শিক্ষা

ভারতচন্দ্রের যুগের বিপর্যস্ত জীবন-নীতিকে দুর্নীতি-মাত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করাও হয়ত যায় না। কিন্তু, একথা অবশ্য-স্বীকার্য যে,—ভারতচন্দ্র যুগ-প্লাবী বিপর্যয়ের মধ্যেও ভাব এবং রুচি-বিকৃতিকে অপূর্ব বাক্-সংযমের মধ্যে শালীন রূপদান করেছেন। এই শালীনতা-বোধ নাগরিক রুচির প্রধান লক্ষণ; রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যালোচনার প্রসঙ্গে দেখেছি গ্রামীন রস-চেতনার বিপর্যয় 'গ্রাম্যতা-দোষের' সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু, রাম-প্রসাদের রচনায় যে ব্যভিচার-চিত্র গ্রাম্যতা-দুষ্ট, ভারতচন্দ্রের নাগরিক চেতনার পরিশোধিত প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে তা আশ্চর্যরূপে সৌষ্ঠবোজ্জ্বল হয়েছে। প্রকাশের এই সুষ্ঠুতা,—এই সংযম-সমুজ্জ্বল আবরণ এবং আভরণ-বিন্যাস নাগরিক রুচি-বোধের চরম নিদর্শন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভারতচন্দ্রের কাব্যের চূড়ান্ত সম্ভোগ-চিত্রটির উল্লেখ করতেও বাধা নেই। কৌতূহলী পাঠক রামপ্রসাদের বর্ণনার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের আলোচ্যাংশ তুলনামূলক বিচার সহ পাঠ করলে এ বিষয়ে যথার্থ প্রতীতি সম্ভব হবে। কেবল, সেই বিচারের সহায়তা কামনায় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধার করি,— "১৬৭৪ শকে.........ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের তখন অতিশয় দুর্দিন চলিতেছে। মহাজন-পদাবলী ও নানাবিধ মঙ্গলকাব্যের অতিশয় ব্যর্থ অনুকৃতিতে এবং অন্য নানাবিধ বিকৃতিতে 'বঙ্গভারতী'র পদ্মাসনের তলাকার পাঁক ঘুলাইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্র নিখুঁত বুলি ও সরস ছন্দের সাহায্যে এই বিকারের প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম গ্রাম্যতা-দোষ দুষ্ট সাহিত্যের উপর নাগরিক সভ্যতার প্রলেপ বুলাইয়াছিলেন। এই কারণে অনেকে তাঁহাকে পুরাতন যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলিয়া থাকেন। যিনি যাহাই বলুন, এ কথা মানিতেই হইবে যে, সে-যুগে ভারতচন্দ্র অসাধারণ ছিলেন; তাঁহার শিল্প-জ্ঞান, ছন্দ ও শব্দের উপর দখলও অসাধারণ ছিল[১৪]।" ভারতচন্দ্রের সূক্ষ্ম-'শিল্পজ্ঞানের' শালীনতা এবং তৎপ্রসূত 'ছন্দ ও শব্দের উপর দখল'ই তাঁর নাগরিক কলাকুশলতার (Power of poetic embelishment) দ্যোতক।

১৪। 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা—সাহিত্যপরিষৎ সং)।

ভারতচন্দ্রের কলা-সমৃদ্ধ রূপ-সৃষ্টির অন্যতম প্রধান সহায় হয়েছিল,—সংস্কৃত শব্দাবলী এবং ছন্দ-অলংকারের সম্পদ্। ভারতচন্দ্রের আলংকারিক দক্ষতা লোক-বিশ্রুত। ছন্দোরচনার ক্ষেত্রেও যে কবি সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রের সাহায্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন,—সে স্বীকৃতি কাব্য মধ্যেই অজস্র বিদ্যমান।

ভারতচন্দ্রের বাগী-কুশলতা

"ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

অথবা

"মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে॥" ইত্যাদি

রচনাংশে কবি স্বয়ং তাঁর অনুসৃত ছন্দ-সমূহের (ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক) নামোল্লেখ করেছেন।

ভারতচন্দ্রের প্রতিভার এই নাগরিক-জনোচিত বাক্-সংযম ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তাঁর রচনা-ভঙ্গিতে একটি স্বাভাবিক দক্ষতার সূচনা করেছিল, যার ফলে নিতান্ত গ্রাম্য ভাব-ভাষার মাধ্যমে বর্ণিত অংশ পড়েও মনে হয়, ঠিক যেন যথোচিত হয়েছে। গৌরীর বর-দর্শনে নারীগণের অপ্রসন্ন চিত্তের ক্ষোভকে গ্রাম্য ধামালী-ছন্দে প্রকাশ করেছেন ভারতচন্দ্র :—

"আই আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামরছটা,
তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁকায় ফণী
দেখে আসে জ্বর লো।"— ইত্যাদি।—

প্রাচীন সমালোচকের ভাষায় একেই বলি রচনার 'মুন্সিয়ানা'। এই মুন্সিয়ানার ফলে ভারতচন্দ্রের রচনার বহু অংশ বহুপ্রচলিত প্রবচনে পরিণত হয়েছে।—

১। 'যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।'
২। 'নীচ যদি উচ্চভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে,'

৩। "বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে,
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।"— ইত্যাদি ভারতচন্দ্রেরই চিন্তা-সম্ভূত বহু-সমুদ্ধৃত প্রবচনাবলী।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই নাগরিক বাচন-কলার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হয় মধ্যযুগীয় গ্রামীন বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাণীধর মুকুন্দরামের রচনাংশের সঙ্গে তুলনায়। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের কাব্য-কৃতির দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের বহুস্থলে মুকুন্দরামের কাহিনী কিংবা ভাবই কেবল অনুকৃত হয়নি,—মুকুন্দরামের বর্ণনাভঙ্গীকে নাগরিকের ভাষায় অনুবাদ করেই যেন ভারতচন্দ্র বহুস্থলে উদ্ধার করেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মুকুন্দরামের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে বিশদরূপে বিশ্লেষিত হর-গৌরী কোন্দল-চিত্রাংকণের ভারতচন্দ্র-কৃত অনুকৃতির অংশবিশেষ উদ্ধার করি,—

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

"ভবানীর কটুভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধলোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
হেঁট মুখে পঞ্চানন গৌরীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।

* * *

ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সেজন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস॥"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পূর্বোদ্ধৃত মুকুন্দরামের রচনাংশের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সদ্য-উদ্ধৃত রচনাংশের তুলনামূলক বিচার করলেই প্রকাশ-ভঙ্গির স্বাভাবিকতা এবং শালীনতার,—চেতনার গ্রামীণতা ও নাগরিকতা জনিত মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধ হতে পারবে।

পদসংগীত

ভারতচন্দ্র-রচিত পদ-সংগীতের উল্লেখ করেছি পূর্বে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যাংশের বিভিন্ন স্থানে কবি ক্ষুদ্রাবয়ব পদ-সংগীতের-সহায়তায় আলোচিতব্য প্রণয়-কথার রসভূমিকা রচনা

করেছেন।—আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় পদগুলি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। কিন্তু, বৈষ্ণব-পদাবলীর পটভূমিকাগত মৌলিক গোষ্ঠি-বিশ্বাস, কিংবা চেতনার সর্বাত্মকতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত চিন্তা ও বুদ্ধির সূক্ষ্মতা,—প্রকাশের শালীনতা ও বৈদগ্ধ্য কবিতাগুলিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ কবি-কৃতি (Individualistic poetry)-র নূতন রস-মূল্যে মণ্ডিত করেছে :—

"একি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে॥
মোহন চিকণকালা নানাফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জা ফলে।
বরণ কালিম ছাঁদে বৃষ্টি হলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুটায় পায় ধরার আঁচলে॥
কস্তূরী মিশালে মাখি, কবরী মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাখি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিতে যা'রে ধৈরজ ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনি মন চলে॥"—

একদিন বাংলা দেশে কানু ছাড়া গীত ছিল না। ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেই কানু-গাথার অঞ্জলি নর-'সুন্দরে'র উদ্দেশে অর্পিত হয়েছে ;—এখানেই রায়গুণাকর কবি প্রাচীন ঐতিহ্য দিয়ে নবীনের সংগে যোগ-রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ভারতচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের রাজসভাকবি।

নির্ঘণ্ট